Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] বৈশাখ ১৩২১ সাল। [১ম সংখ্যা।





উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক ;—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১০নং শম্ভু চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে"

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

নববর্ষ—১৩২১—নির্ভয় ও নির্ভাবনা।

(১)

নির্ভয় হও, নির্ভাবনা হও। হইয়া ব্যবহারিক কার্য্য কর।

দেশের এই হাল—গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে লোকে অর্থাভাবে হাহাকার করিতেছে, প্রতি পরিবারে বিবাদ বিসম্বাদে, রোগে শোকে, বিবাহ উপনয়নাদির দায়ে লোকে ঘোর অশান্তি ভোগ করিতেছে—এই বিপদে মানুষ নির্ভয় হইতে কি পারে? নির্ভাবনায় থাকিতে কি পারে?

যাহাতে থাকিতে পারে, তাহার উপায় করা উচিত। শুধু হায় হায় করিলে কি ফল হইবে?

কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বল?

লোকে কোন্ উপায় অবলম্বন করিতেছে দেখ, অথবা বুদ্ধিমান্ লোকে সাধারণ লোককে কোন্ পথে চালিতকরিতেছে, অগ্রে তাহাই দেখ। যদি মনে কর সে উপায় সম্পূর্ণ নহে, তবে অসম্পূর্ণ উপায়কে সম্পূর্ণ কর—করিলে নির্ভয় ও নির্ভাবনা হইতে পারিবে।

চারিদিকে দেখি আজকালকার লোকে সমবেত শক্তিতে কর্ম্ম করিয়া, লোকের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে, সকলে একত্র হইয়া নূতন বৈজ্ঞানিক

প্রণালীতে দেশে নানা প্রকার নূতন নূতন প্রথা আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। কৃষি, বাণিজ্য ; ট্রাম, মোটর, ইলেকট্রিক লাইট্ ফ্যান, নূতন ফ্যাসনের বাড়ী বাগান, নূতন ধরণের সাজ পোষাক, নূতন ধরণের চলা ফেরা, সকলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিতে সংস্কারক মানুষকে সুখী করিতে চায়। ইহা কি মন্দ ?

কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি কর, লাইট ফ্যান আন, একসঙ্গে খাওয়া শোওয়া বাদ দিয়া লোককে একীভূত করিতে চেষ্টা কর, সকলে সকলের বাড়ীতে বিবাহাদি না করিয়া যাহাতে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপিত হয় চেষ্টা কর—এ সব ভালই কিন্তু শুধু এই সব করিলে মানুষ কিছুতেই নির্ভয়ও হইবে না, নির্ভাবনায় থাকিতেও পারিবে না ; শান্তিও পাইবে না।

তুমি বলিতেছ দুঃখ দূর করিবার আধুনিক উপায়গুলি অসম্পূর্ণ। কথাটা সত্যও বটে। সভ্য জগতের কত নূতন প্রথা ত দেশের লোকে সমাজে আনিতেছে, কিন্তু হাহাকার ত ঘুচিতেছে না। সামাজিক অশান্তি, পারিবারিক অশান্তি সর্ব্বত্রই ত লক্ষ্য হইতেছে। তুমি কি করিতে বল ?

সমবেত শক্তিতে যে সমস্ত কার্য্য হয় তাহা কর, কিন্তু ব্যক্তিগত শক্তিতে যাহা পার তাহা বাদ দিয়া যদি উন্নতি করিতে চাও তবে মনের শান্তি কিছুতেই পাইবে না। মনের শান্তি জন্য ব্যক্তিগত শক্তির সৎব্যবহার কর এবং দারিদ্র্যাদি দুঃখ দূর করিবার জন্য সমবেত শক্তিরও ব্যবহার কর। সমকালে এই উভয়ের ব্যবহার না করিলে অন্য কোন উপায়ে জীবকে সুখী করিতে পারিবে না।

জপ তপ লইয়া থাক সমাজ যা হয় হউক ইহা যেমন সকলের পক্ষে অসম্ভব সেইরূপ সমাজ লইয়া সর্ব্বদা থাক, আর জপতপ একবারেই বাদ দাও, ইহাতেও কাহারও মনের অশান্তি কিছুতেই দূর হইতে পারে না। এই দুই মিলাইয়া কার্য্য কর।

পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মিলন হইবে কিরূপে ? সমাজ লইয়া দৌড়ধাপ করিলে মন এত বিক্ষিপ্ত হয়, যাহাতে জপতপ হয় না, আবার জপতপ লইয়া একাগ্র হইলে সমাজহিতকর কার্য্যেও যোগ দেওয়া যায় না। তাই বলিতেছি এই দুই কার্য্য সমকালে হইবে কিরূপে ?

নির্ভয় ও নির্ভাবনা হইবার কার্য্যটিকে নিত্য কর্ম্ম করিয়া ফেল—ফেলিয়া সমাজের হিত জন্য ব্যবহারিক কার্য্য কর হইবে। শ্রীগীতা ভাল করিয়া

পড়িয়া দেখ, শ্রীভগবানও এই দুই কার্য্য সমকালে করিতে বলিতেছেন।

আচ্ছা—সমবেত শক্তিতে যে কার্য্য হইবে তাহা অন্য সময়ে আলোচনা করিও কিন্তু নির্ভয় ও নির্ভাবনা জন্য ব্যক্তিগত যে শক্তির ব্যবহার করিতে বলিতেছ তাহাই আগে বল; কেননা নিজের চেষ্টায় যাহা পারা যায় তাহা সকলেরই প্রথমে করা উচিত।

হাঁ তাই। দুঃখের বা সুখের—যেমন অবস্থাতেই তুমি পড় না কেন—স্ত্রী হও বা পুরুষ হও—যতপ্রকার কার্য্যেই তুমি ব্যাপৃত থাক না কেন নির্ভাবনার কার্য্য সকলেই করিতে পারে—যদি সে তজ্জন্য প্রাণপণ করে।

বল ইহা কিরূপে পারা যায়।

শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভব দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করা যাউক, চিত্তকে নির্ভয়ে ও নির্ভাবনায় আনা যায় কিরূপে ?

উপস্থিত সময়ে শাস্ত্রশ্রদ্ধা যাঁহাদের নাই তাঁহারা যতদিন শাস্ত্রশ্রদ্ধা না আনিতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহাদিগকে অশেষ অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহাদের পীড়া সাংঘাতিক। যাঁহারা শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত তাঁহাদের সুবিধা অনেক।

শাস্ত্র বলেন—

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥

যে সকল মানব-এই পৃথিবীতে রাম রাম এইটি সর্ব্বদা জপ করেন, তাঁহাদের কখন মৃত্যুভয়াদি থাকে না।

শাস্ত্র বলেন—নির্ভয় হইতে চাও রাম রাম নাম সর্ব্বদা জপ কর।

অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

বল।

যাঁহারা শ্রীরামের উপাসক তাঁহাদের না হয় হইল, অন্যের উপায় কি? দ্বিতীয় কথা রাম রাম জপ করিলে নির্ভয় হওয়া যাইবে কিরূপে? তৃতীয় কথা কলিতে তন্ত্রোক্ত নাম না ধরিলে যে হইবে না? ইত্যাদি।

রামোপাসকগণ যেমন রাম রাম করিবেন, সেইরূপ কৃষ্ণোপাসকগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিবেন। আবার শিব, দুর্গা, কালী, ইত্যাদির উপাসকগণ আপন আপন

উপাস্য দেবতার নাম করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রীভগবানের যে কোন নাম আপন কুলে চলিতেছে তাহা জপিতেই শাস্ত্র বলেন।

শৈবশাস্ত্রে শিব প্রশংসা. শাক্তশাস্ত্রে শক্তি প্রশংসা বৈষ্ণবশাস্ত্রে এক ভাবেই বিষ্ণুর প্রশংসা শাস্ত্রে দেখা যায়।

নাম বহু হইলেও নামী সেই একই শ্রীভগবান্। তাঁহাকে যে নামে বা যে লীলা জড়িত করিয়া ডাক তাহাতে আপত্তি নাই। সকল নামই যখন এক নামীকে লক্ষ্য করে তখন একটিকে ধরাই কর্ত্তব্য। যদি অন্য কাহাকেও ভাল লাগে তবে সেই এককেই লক্ষ্য করিয়া অন্যের ভাব প্রকাশ করাই উচিত। নতুবা এখন এক, তখন আর, এরূপ করিলে সাধনার পরিপক্কাবস্থা আসে না।

পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া রাম রাম জপ করিলে যে সচ্চিদানন্দ, সৃষ্টিস্থিতি—প্রলয়কর্ত্তাকে পাওয়া যায়, দুর্গা দুর্গা, কালী কালী, শিব শিব, সীতা সীতা, রাধা রাধা ইত্যাদি নাম জপিলেও তাঁহাকেই পাওয়া যায়। পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া নাম জপ করার অর্থ—নাম যে নামীকে ভাবিতে বলেন, তিনি পৃথকভাবে পৃথক লীলা করিলেও পরমভাবে তিনিই সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং তিনিই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকর্ত্তা। কাজেই শাক্ত শৈব বৈষ্ণব ইঁহাদের কোন বিবাদ নাই। ইঁহাদের সকলকেই শাস্ত্র বেদান্তের ঈশ্বরে পৌঁছাইয়া দিতেছেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর বুঝিলাম কিন্তু নাম জপে নির্ভয় কিরূপে হইবে? নির্ভাবনা আসিবে কিরূপে?

শাস্ত্রবাক্য মিথ্যাকি কখন হয়?
কৈ একালে সত্যই বা হয় কৈ?
কাহার হইল না দেখিতেছ?

একজন মনে করা হউক সর্ব্বদা রাম রাম করেন কিন্তু তাঁহার বড় ছেলেটির জ্বর হইয়া লাট খাইয়া গেল তাহার কি কোন ভয় হইবে না? ছোট মেয়েটির হাম হইয়া আবার বিসূচিকা হইল—কোন ভাবনা তাঁহার থাকিবে না? তিনি নিজে অজীর্ণ, অর্শ ইত্যাদি রোগে সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছেন, তথাপি তাঁহার কোন ভয় ভাবনা থাকিবে না—ইহা কি হয়?

হয় বৈ কি। শাস্ত্র যেমন ভাবে নাম করিতে বলিয়াছেন. সেইরূপ ভাবে নাম করিলে নিশ্চয়ই কোন ভয় থাকে না। সেইরূপ ভাবে না ডাকিতে পারিলেও যাঁহাদের শাস্ত্রশ্রদ্ধা আছে তাঁহারা শাস্ত্রশ্রদ্ধা দ্বারাই মনকে অনেকটা

নিশ্চিন্ত করিতে পারেন। সাধারণ লোকে স্ত্রী-পুত্রাদির অকাল মৃত্যু বা আকস্মিকভাবে অর্থনাশ হইলে এতদূর অশান্ত হইয়া উঠে যে তাহারা হয় পাগল হয়, না হয় আত্মহত্যা করে, কিন্তু যাঁহাদের শাস্ত্রশ্রদ্ধা আছে তাঁহারা বিপদ-কালে কাতর হইলেও যখন যখন শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী স্মরণ করেন—যখন যখন স্মরণ করেন 'তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন" যখন যখন স্মরণ করেন "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" তখন তখনই শ্রীভগবানের কৃপায় ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন, বিপদে ধৈর্য্য ধরিয়া বিপদ সহ্য করিতে করিতে রাম রাম করেন। শেষে একটু কাল অতিক্রম করিলেই তাহারা বুঝিতে পারেন শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়—তিনি যাহা করেন তাহাতে জীবের মঙ্গলই হয়।

(৩)

যাহারা শাস্ত্রবিধি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে না কেবল শাস্ত্রশ্রদ্ধায় কার্য্য করে, তাহাদের উপকার কি হয় তাহা সংক্ষেপে বলা হইল; কিন্তু যাহারা রামকে বুঝিয়া সর্ব্বদা রাম রাম করে তাহারা যে সর্ব্বদা নির্ভয় হয় এবং সর্ব্বকালে নির্ভাবনায় থাকে এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

কাহার কাছে কি মানুষ নির্ভয় হইতে পারে?

পুত্রাদপি ধন ভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা বিহীতা নীতিঃ।

ধনবান লোক পুত্রকেও ভয় করে। এই নীতি সর্ব্বত্রই বিধান করা হইয়াছে—ইহা মনে করিয়া কি বলিতেছ কাহারও কাছে মানুষ নির্ভয় নহে?

শুধু কি তাই—"বিত্তে চৌরভয়ং" ইত্যাদি। ভয়, সকল বিষয়ে আর সকলের কাছে।

সকলের কাছেই ভয় আছে তুমি এই বুঝিয়া রাখিয়াছ? বেশ ভাল করিয়া দেখ দেখি কাহারও কাছে তুমি নির্ভয় কি না?

বেশ ভাল করিয়া দেখিতেছি সকলের কাছেই ভয়। এমন কি প্রেমময় শ্রীভগবানের কাছেও যাহা যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহা বলিতে ভয় হয়।

সত্য। কিন্তু তোমার নিজের কাছে?

হাঁ ঠিক। আমার আপনার কাছে আমি আপনি নির্ভয়। সর্ব্বদা রাম রাম করিলে যে মানুষ নির্ভয় হয় বলিতেছ ইহার সঙ্গে আপনার কাছে আপনি নির্ভয় ইহার কি কোন যোগ আছে?

আছে বৈকি। বিশিষ্টরূপে আছে; নতুবা একথা পাড়িব কেন?

বল বল ইহা কিরূপ? আহা শতদুঃখ আসুক তাতে আমার ভয় কি—যদি আমি ভিতরে নির্ভয় হইয়া যাই।

রামতত্ত্ব অথবা কোন নামতত্ত্ব বুঝ—দেখিবে ঐ তত্ত্বের ভিতরে ভয়শূন্য ভাবটি আছে।

প্রথমে দেখ শ্রুতি কি বলেন। শ্রুতি বলেন—

দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।

দুই থাকিলেই ভয়। দ্বিতীয় হইতেই ভয়। যখন দ্বিতীয় আর কিছু না থাকে তখন ভয় নাই। যখন আপনি আপনিই থাকে আর দ্বিতীয় কিছুই থাকে না, তখনই নির্ভয়। ভয় যখন না থাকে, তখন আর ভাবনাও থাকে না।

অহো! এইটি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। রাম আমার সব এইটি ভাল করিয়া ধারণা করিতে হইবে।

ত্রেতাযুগে দশরথরাজার পুত্র হইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন তিনিই সমস্ত—ইহার ধারণা কিরূপে হইবে?

রামতত্ত্ব ত তাই। রামই সেই পরমপদ। রামই নির্গুণব্রহ্ম। আবার ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী সীতার সাহায্যে তিনিই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। মায়ার সাহায্যে, তিনি সগুণ হইয়া জগৎচক্র পরিচালন করিতেছেন। আবার হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধাদির উৎপাতে যখন জগতে অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখন এই অশান্ত জগতে শান্তিস্থাপন জন্য তিনিই মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার গ্রহণ করেন এবং তিনি মহাকাশরূপী থাকিয়াও প্রতি ঘটে প্রবেশ করিয়া—প্রতি জীবের আত্মারূপে অবস্থিত—এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

কি উপায়ে বুঝিব?

যতদিন না ইহা অনুভবে আসিতেছে ততদিন শাস্ত্রসাহায্যে ইহা ধারণা করিয়া তাঁহাতেই বিশ্বাস স্থাপন কর। করিয়া শাস্ত্র আজ্ঞা মত চল তাহা হইলেই হইবে। কারণ যাঁহাকে বিশ্বাস কর তাঁহার আজ্ঞামত যখন না চল তখন তুমি ঠিক ঠিক বিশ্বাস কর না ইহা নিশ্চয়। যদি বল তাঁহার আজ্ঞা কোথায় পাইব? সকল শাস্ত্রই তাঁহার আজ্ঞা ঘোষণা করিতেছেন। ঋষিগণ শাস্ত্র আজ্ঞামত কার্য্য করিয়া সুন্দর অবস্থা লাভ করিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন

শাস্ত্র আজ্ঞামত কার্য্য করাই মানুষের কর্ত্তব্য। আবার এই অধঃপতিত সময়েও সাধকেরা শাস্ত্র আজ্ঞা মত চলিয়া অনুভব করিতেছেন শাস্ত্র আজ্ঞাই মানুষকে শান্তি দিতে পারে।

শাস্ত্রও ত অনেক। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। নানা মুনির নানা মত। কার মতে চলিব?

সকল মুনি একমত হইয়া সমাজে যাহা চালাইয়া গিয়াছেন সেই মতে চলিলেই হয়। মত তোমার আমারও ভিন্ন হইতে পারে। গন্তব্য স্থান সকল মুনিরই এক। হরিশ্চন্দ্রের ঘাট, কেদার ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, ক্ষেমেশ্বরের ঘাট, রাজ ঘাট—এক গঙ্গাতে যাইবার ঘাট অনেক কিন্তু সকল ঘাট দিয়াই সেই এক গঙ্গাতেই যাইবার ব্যবস্থা। যে ঘাট দিয়া যাওয়া যাহার সুবিধা সেই ঘাট দিয়াই তাহার যাওয়া উচিত। সত্ত্ব রজস্তম গুণের বিভিন্নতা অনুসারে মানুষের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই সকল প্রকৃতির জন্য একটি পথ মাত্র দেখান উচিত নহে এই জন্য অধিকারী ভেদ শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

ইহা বুঝিলাম। এখন বল রাম যে নির্গুণব্রহ্ম তাহা কোন শাস্ত্রে আছে?

রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্।
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥

রাম যে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম সমকালে তাহা অধ্যাত্মরামায়ণে আছে। বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের সাত শ্লোকে আছে।

সহি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।

বেদে কি রামকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে?

যাহা বেদে নাই তাহা কোন শাস্ত্রেই থাকিতে পারে না। বেদের কথাই পুরাণ তন্ত্রাদি প্রকার করিতেছেন।

রামই যে সব শ্রুতি এই কথা বিশেষরূপে বলিয়াছেন:—

ওঁ যো বৈ শ্রীরামঃ স ভগবান্ যশ্চাখণ্ডৈকরসাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ইত্যাদি—মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন রামই ভগবান্, রামই অখণ্ড একরস আত্মা

তিনিই ত্রিলোকব্যাপী, তিনিই অদ্বৈত পরমানন্দাত্মা পরমব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মানন্দ, অমৃত, তারকব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ঈশ্বর, সর্ব্ববেদে আত্মা, সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ সশাখ, বেদ পুরাণ তাঁহারই কথা বলে, তিনিই জীবাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মারাত্মা, তিনি দেব মনুষ্য অসুরাদি ভাব, তিনি মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার, তিনিই প্রাণ, অন্তঃকরণচতুষ্টয়াত্মা, যম, অন্তক, মৃত্যু, অমৃত পঞ্চমহাভূত, স্থাবরজঙ্গমাত্মক, পঞ্চাগ্নি, সপ্তব্যাহৃতি, তিনিই বিদ্যা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরী, জানকী; তিনিই ত্রৈলোক্য, তিনিই সূর্য্য সোম নক্ষত্র নবগ্রহ, অষ্টবসু, অষ্টলোকপাল, একাদশরুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বহির্ব্যাপী বিরাট, তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই ওঙ্কার, চতস্র অর্দ্ধমাত্রা, পরমপুরুষ, মহেশ্বর মহাদেব, তিনি ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় মহাবিষ্ণু পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, সচ্চিদানন্দাদ্বৈতৈকরসাত্মা।

বেদ ত রামকে সমস্তই বলিতেছেন। যাহা রামকে বলিতেছেন তাহাই শিবকে বলিতেছেন, কৃষ্ণকে বলিতেছেন, দুর্গাকে বলিতেছেন, কালীকে বলিতেছেন; সকল অবতারকেই বলিতেছেন।

শাস্ত্র বিশ্বাসে সবই আমার রাম—সর্ব্বদা মনে রাখিয়া প্রথমে তিন বেলা আহ্নিক করিবার সময় হৃদয়পদ্মে জ্যোতির মধ্যে ইষ্টমন্ত্র দ্বারা রামকে ডাকা অভ্যাস কর এবং বাহিরে ব্যবহারিক জগতের সর্ব্ববস্তুতে তিনি আছেন ইহা মনে ভাবনা করিতে ভুলিও না। প্রথম প্রথম ভুল হইতে পারে কিন্তু ইহা প্রত্যহ তিন বেলায় অভ্যাস করিতে করিতে ভুল কম হইতে থাকিবে; ক্রমে আর ভুল হইবে না।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বিচার করিও। যাহা বলিতে যাইতেছি সেইটিই মূল তত্ত্ব। ভাল করিয়া মনোযোগ কর।

মনে করা হউক তুমি যাহা তাহাই মনরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। রজ্জু যাহা তাহা রজ্জুই আছে। রজ্জুটি সর্পরূপে বিবর্ত্তিত হইল। রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইল। এখন রজ্জুটিই যেন সর্প হইয়া গিয়াছে। তুমিও যেন মন হইয়া গিয়াছ। এখন মনটা সঙ্কল্প বিকল্প মাত্র। যদি এমন হয় যে তুমি যাহা সঙ্কল্প কর তাহা বস্তুরূপে পরিণত হইয়া যায় তাহা হইলে তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া যাও। কিন্তু তুমি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ নও। যিনি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ তিনিই সৃষ্টি-কর্ত্তা। তিনি যেমন যেমন সঙ্কল্প করিতেছেন সেইরূপ বস্তু সৃষ্ট হইয়া যাইতেছে।



যদি এই হয় তবে স্থূলজগৎটা ত সঙ্কল্পেরই স্থূল আকার মাত্র। যদিও স্থূলজগৎটা বিচিত্র তথাপি সৃষ্টিকর্ত্তা সেই একজন মাত্র। তুমি যেমন মনকে অবলম্বন করিয়া কোটি কোটি সঙ্কল্প তুলিয়াও তুমি যাহা তাহাই থাক সেইরূপ রাম যিনি তিনি মায়াসাহায্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কল্প তুলিয়াও আপনি আপনি থাকেন—মিথ্যা তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। শাস্ত্রের খাঁটি সত্য এই যে জগৎটা মায়িক মিথ্যা একমাত্র আত্মপুরুষই সত্য। তুমি আমি যদি আত্মপুরুষ ভিন্ন আর কিছু হই তবে তুমি আমি সঙ্কল্প মাত্র।

কার সঙ্কল্প ?

সেই আত্মপুরুষের সঙ্কল্প। সেই আত্মপুরুষই রাম। তবেই ত হইল রাম ভিন্ন আর কিছুই সত্য নাই। যাহা নাই যাহা অসত্য তাহা যখন তুমি ত্যাগ করিতে পার তখন তোমার রামই আছেন—আর যাহা দেখিতেছ তাহা রামের উপরেই ইন্দ্রজাল মত ভাসিয়াছে। সবই তুমি। সবই তুমি এই ভাবনা প্রবল করিতে করিতে সর্ব্বজীবে হিংসা দ্বেষ ত্যাগ হইয়া সর্ব্বত্র তোমার আত্ম-পুরুষরূপী রামকে যখন দেখিতে থাকিবে তখন নিজের দিকে চাহিলে বুঝিবে আহা! আমিও রাম। তবেই রামের দেখা মিলিল। আপনি আপনি ভাবই রাম আপনি আপনি রামের কাছে থাক—আপনার কাছে আপনি নির্ভয় হওয়ার মত সর্ব্বদাই নির্ভয় হইয়া যাইবে। বল তখন কাহাকেও মরিতে দেখিলে বা কাহাকেও রোগযাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিলে তুমি কি ভাবনা করিবে? তুমি যদি ভিতরে রামকে দেখ তখন আর কিছুতেই বিচলিত হইবে না; না হইয়া মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া লোকব্যবহার করিয়া যাইতে পারিবে।

আজকালকার কেহ কি এইরূপ হইয়াছে?

মহাত্মা কবিরের সাধনা এই ছিল।

কেমন করিয়া রামনাম করিতে হয় কবির তাহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই বলিয়া গিয়াছেন :—

"কহে কবির এক রামনাম বিনু জীউকে দাহ না যাওয়ে।"

কবির বলেন এক রামনাম বিনা জীবের জ্বালাপোড়া আর কিছুতেই যাইবার নহে।

কবির রামতত্ত্ব জানিয়া রাম রাম করিতেন, না করিয়া থাকিতে পারিতেন

না। তত্ত্বটি জানিয়া নাম করিলে সেই নামই তখন সর্ব্বস্ব হইয়া যায়—নাম ছাড়িয়া আর থাকা যায় না। কবিরের তাই হইয়া গিয়াছিল। রামই কবিরের সকল সাধের সমষ্টি। সবই রাম। কবির বলিতেছেন :—

কবির রাম হমারে মাত হ্যায় রাম হমারে তাত্।
রাম হমারে মিত্র হ্যায় রাম হমারে ভ্রাত্।
কবির রাম হমারে আশ্রম রাম হমারে বরণ
রাম হমারে জাতি হ্যায় রাম হমারে শরণ।
রাম হমারে মোহনী রাম হমারে শিখ্
রাম হমারে ইষ্ট হ্যায় রাম হমারে রিখ্।
কবির রাম হমারে মন্ত্র হ্যায় রাম হমারে তন্ত্র
রাম হমারে ঔষধি রাম হমারে যন্ত্র।
কবির রাম হমারে ভূমীয়া রাম হমারে দেও।
রাম হমারে সাধ্ হ্যায় করহি তিন্‌হি কে সেও॥
কবির তীরথ হমারে রাম হ্যায় বরত্ হমারে রাম।
দান হমারে রাম হ্যায় নেহি আওর সো কাম॥
কবির মোতি চুণি রাম হ্যায় হরি হীরা ও লাল্।
রূপা সোণা রাম হ্যায় ভোজন্ সাজন্ মাল॥
কবির সোণা রূপা কাল্ হ্যায় কঙ্কর পাথর হীর্।
এক নাম মুক্তামণি তাকো জপহি কবির॥

কবির বলেন রামই আমার মাতা, রামই আমার পিতা, রামই আমার বন্ধু, রামই আমার ভাই। রামই আমার আশ্রম, রামই আমার বর্ণ, রামই আমার জাতি, রামই আমার শরণ সম্বল। রামই আমার মোহিনী স্ত্রী, রামই আমার শিষ্য, রামই আমার ইষ্টদেবতা, রামই আমার ঋষি। রামই আমার মন্ত্র, রামই আমার তন্ত্র, রামই আমার ঔষধি। রামই আমার যন্ত্র। রামই আমার আধার, রামই আমার দেবতা, রামই আমার সাধনা, আমি তাঁরই সেবা করি। রামই আমার তীর্থ, রামই আমার ব্রত, রামই আমার দান; রাম ছাড়া আমি কোন কাজ করি না।

মতি চুণী আমার রাম, রামই আমার হরি, হীরা ও মূল্যবান্ প্রস্তর—লাল, রূপা, সোণা এও আমার রাম। ভোজন, বেশভূষা, আনন্দ সবই আমার রাম।

সোণা রূপাই কাল, হীরা—কাঁকর পাথর। এক নামই আমার মুক্তা মণি। কবির তাহাই জপ করেন।

বর্ষারম্ভে আমরা বলি যাঁহারা নাম অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা নামকে কবিরের মত সর্ব্বব্যাপী করিয়া ফেলুন। সকলকেই রাম দেখুন। সবই রাম দেখিবার জন্য রামতত্ত্বটি বুঝুন। তবেই ত আর নাম ছাড়া যাইবে না। যাহা দেখিবেন, যাহা শুনিবেন, যাহা করিবেন সকলই সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য লইয়া ভাসিয়াছে দেখিবেন। সকল দেখায় রাম দেখা হইবে—সকল শোনায় রামেই দৃষ্টি পড়িবে। তুমি যে তাঁহাকে বিশ্বাসে দেখিতে চেষ্টা কর, সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও রাখিও তিনি সর্ব্বব্যাপী আকাশের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়া সর্ব্বদা তোমায় দেখিতেছেন সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছেন।

সেই এক মাত্র আত্মপুরুষ—আপনি আপনি থাকিয়া যে সঙ্কল্প তুলিয়াছেন তাহাই জগৎরূপে ভাসিয়াছে জানিয়া দৃশ্যদর্শনকে সঙ্কল্প, মায়া, মিথ্যা জানিয়া একমাত্র সত্য সেই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রামকেই স্মরণ করিতে পারা যাইবে। যতদিন ইহা অনুভবে না আসিতেছে ততদিন নামতত্ত্ব জানিয়া বিশ্বাসে বলিতে অভ্যাস করা হউক রাম ভিন্ন আর কিছুই নাই। এক রাম সাধনায় সব সাধনা হইয়া যাইবে যদি নামতত্ত্বটি বুঝিয়া নাম করা অভ্যাস করিয়া ফেলা যায়।

আমরা উপসংহারে আর একটি কথা বলিতেছি। এইটি অনুরাগে উপাসনা। এইটি লইয়া তিনবেলা বসিতে অভ্যাস করা উচিত।

উপ—সমীপে আসন বসা—সমীপে বসাই উপাসনার স্থূল অর্থ। তোমার সমীপে বসাই তোমার উপাসনা। যাহাকে ভালবাসি তাহার কাছে বসিতে কত ভাল লাগে?

সবাই ত একদিন মাকে ভাল বাসিয়াছে। আজ মা নাও থাকিতে পারেন কিন্তু ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক পার হইয়া নাভিচক্রের উপরে হৃদয়পদ্মে মাকে ত বসান যায়। এক রাম ভিন্ন জগতে যখন আর কিছুই নাই তখন মাই ত রাম। উপাসনার সময় যেন মারূপিণী রামের কাছে বসিয়াছি এই ভাবনা করিয়া রাম রাম করিলে ত একটা অনুরাগ আসিবেই। যাহার ভালবাসা কোথাও নাই তার পক্ষে অন্ততঃ এইরূপে অনুরাগ আনা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা রামতত্ত্ব জানিয়াছেন রামের জন্ম কর্ম্ম জানিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে নামজপ বড়ই প্রীতিপ্রদ। যাঁহারা নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক করেন তাঁহাদের সন্ধ্যা আহ্নিকের সমস্তই রাম। তাঁহারা নির্গুণব্রহ্মের চিন্তা করুন, সগুণ

বিশ্বরূপে সকল বস্তুকে সকল ব্যক্তিকে রামরূপে চিন্তা করুন, হৃদয়বিহারী রামকে অবতাররূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার লীলা চিন্তা করুন—আবার তাঁহাকেই আত্মতত্ত্বরূপে চিন্তা করুন—এরূপ করিলে আর কি বিষয়চিন্তা থাকিতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন সকল বস্তু সেই হৃদয়বিহারীকে স্মরণ করাইয়া দিবে, তখন কত যে সুখ তাহা ত বলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম তত্ত্বটি জানিয়া নাম কর—তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে অনুরাগে উপাসনা করিতে পারিবে।

শেষে এক কথা বলি—যাঁহারা তিনবেলায় সন্ধ্যা আহ্নিক করেন তাঁহারা সন্ধ্যায় মন্ত্রগুলির অর্থচিন্তাকে যেন প্রতিদিনের স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করেন। যাঁহারা নাম করেন তাঁহারাও নামের তত্ত্বকে স্বাধ্যায়রূপে যখন প্রতিদিনের ভাবনার বিষয় করিয়া ফেলিবেন তখন তাঁহারা সত্বরই যে নির্ভয় হইবেন ও নির্ভাবনা হইবেন তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকে?

নির্ভয় ও নির্ভাবনা হইয়া যখন সমবেত শক্তির জন্য ব্যবহারপরায়ণ হওয়া যায় তখনই জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কর্ম্ম ত নিষ্কামভাবে হইবেই। অবিচলিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে একান্তে যাইবার সময় আসিবে। তখন জ্ঞানলাভে মুক্তি যে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত নির্ভয় ও নির্ভাবনার কর্ম্মটি বাদ দিয়া শুধু সমবেত শক্তিতে যাঁহারা কাজ করিতে পরামর্শ দেন তাঁহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন মাত্র। দুই চারি দিনের জন্য সমবেত মানুষ সকল একটা হৈচৈ করে মাত্র—ইহাতে সমাজের কোন স্থায়ী উপকার হয় না। ইতিহাস ইহার প্রমাণ। কারণ সমবেত শক্তিতে কাজ করিয়াও মানুষ মনের শান্তি কিছুই পায় না ইহা ধ্রুব সত্য। সমবেত শক্তির কার্য্যে যখন কিছু সুফল ফলে তখন হর্ষ, যখন বিফল মনোরথ হয় তখন বিষাদ। এই দুইটি ফলের দ্বারাই মানুষের বন্ধন। হর্ষের বন্ধন সোণার শৃঙ্খল আর বিষাদের বন্ধন লোহার শৃঙ্খল। শৃঙ্খল কিন্তু উভয়ই। ঋষিগণ সমকালে মুক্তির কার্য্য এবং লোকহিতকর কার্য্য করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ঋষিগণের পরামর্শ না শুনিয়া নিত্যকর্ম্মাদি একবারে না করিয়া শুধু সমাজহিতকর কার্য্য করিতে বলেন তাঁহারা সমাজের উপকার করিতে গিয়া মূঢ়তার জন্য অপকারই করেন। ইহাতে সাবধান হওয়া উচিত। ইতি।

জীবের দুঃখ।

নবীন জগতের যত প্রকার উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, সবই ত দেশে আসিয়া পড়িল; দেশের মধ্যে যাঁহারা ধনবান্, যাঁহারা বিদ্বান, যাঁহারা হৃদয়বান্ সকলেই ত দেশের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছেন; রাজাও ত সকল বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন; আমরা কিন্তু সকল হৃদয়বান্‌কে জিজ্ঞাসা করি, জীবের দুঃখ কি কমিতেছে? কমিবার কি আশা আছে?

যে ভাবে আজকালকার জগৎ চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, ব্যবহারিক জগতের কোন অভাব অসুবিধা যেন আর নাই। নবীন জগতের কোন এক বিখ্যাত নগরে যাও, সেখানে যাহা কিছু দেখ, সবই যেন সুন্দর মনে হয়। সহরের ঘর বাড়ী দেখ কত সুন্দর; গাড়ী ঘোড়া কত বিচিত্র; মোটর বাইশ কত আশ্চর্য্যময়। কোনদিকে দেখিবে? এখানে কত লোক, কত কল কারখানা কত দোকান পাট, কত অপূর্ব্ব জিনিষপত্র, কত বিচিত্র পোষাক অলঙ্কার। মানুষের দিকে চাহিয়া দেখ, কত অপূর্ব্ব সাজ সজ্জা। আজ যে সাজ সজ্জা দেখ কাল তাহা থাকে না—আবার নূতন ভাবে নূতন আড়ম্বরে উদয় হয়। এখনকার মানুষ সর্ব্বদাই যেন সাজিয়া থাকে, মানুষ এখন যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত। চারিদিকেই উন্নতি। বড় সহরে রাত্রিতেও আর অন্ধকার থাকে না। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে ঘরে কত বিদ্যুতের আলো, কত কলের পাখা। ঘরে ঘরে বাগান, বাগানে বাগানে টব, টবে টবে ফুলের গাছ সাজান। তার পর রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ, জাহাজে জাহাজে সার্চ্চ লাইট, রাস্তায় রাস্তায় ট্রাম-গাড়ী, আবার কত আকাশের রথ। কোন কিছু অভাব কি আছে?

তার পর মানুষের সুখের জন্য কত আয়োজন! কত সার্কাস, কত স্কেটিং-রিঙ্ক, কত থিয়েটার, কত গ্রামোফন, কত বায়স্কোপ, কত ফুটবল, কত লন-টেনিস, কত ক্রিকেট, কত বিলিয়ার্ড। সহরে সহরে কত পশুশালা, সহরে সহরে কত মিউজিয়ম; বাড়ীতে বাড়ীতে কত ছবি।

অন্যদিকে মানুষের উন্নতির জন্য কত চেষ্টা। কত বিশ্ববিদ্যালয়, কত স্কুল-কলেজ, কত সংস্কৃত পরীক্ষার স্থান, কত উচ্চপ্রাইমেরী, কত নিম্ন প্রাইমেরী, কত বালিকাবিদ্যালয়। মানুষের দুষ্কর্ম্মের শাস্তি জন্য কত বিচারালয়, কত বিচার-

পতি, কত উকীল মোক্তার, কত জজ বারিষ্টার, কত কৌন্সলী, কত এটর্ণি। মানুষের শিক্ষার জন্য কত ছাপা বই, কত মাসিক, সাপ্তাহিক, কত পাক্ষিক, দৈনিক। কত ধর্ম্ম গ্রন্থ, কত ধর্ম্মপ্রচারক, কত পণ্ডিত, কত পাদরী, কত মৌলবী, কত সভাসমিতি। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই মানুষে বুদ্ধিকৌশল, সেই দিকে মানুষের দুঃখ দূর করিবার আয়োজন। আবার মানুষের ব্যাধিবিনাশ জন্য কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হকিম, কত দাওয়াই, কত দাওয়াইখানা, কত যন্ত্র, কত অস্ত্র, কত ডাক্তারি বিদ্যালয়, কত হাঁসপাতাল।

আবার আমরা দেশের সকলকে জিজ্ঞাসা করি, এত ত উন্নতি, কিন্তু, জীবের প্রকৃত দুঃখ কি কমিয়াছে? কমিবার কি কোন আশা নবীন জগতের উন্নতি দ্বারা করা যায়?

মানুষের মনের অশান্তিই প্রকৃত দুঃখ। মনের অশান্তি কি কিছু কমিয়াছে? কোন সমাজে কি মানুষ মনের শান্তি পাইতেছে? আর যদি মনের শান্তি না থাকে, তবে কি সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? আমরা বলি, তাহা কখনই হইতে পারে না।

আমরা বলি, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির প্রকৃত চিকিৎসা করিতে পারিলে তবে সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়। প্রকৃত চিকিৎসা তাহাকেই বলে—যে চিকিৎসায় রোগের আশু প্রতিকার করিয়া এমন ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার রোগের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হয়; নতুবা যত যত বার রোগ হইবে, তত তত বার ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে, কিন্তু যাহাতে রোগ আর না হইতে পারে, তাহার প্রকৃত ব্যবস্থা করা হইবে না—ইহা একবারে কুচিকিৎসা না হইলেও, ইহাকে যথার্থ চিকিৎসা বলা যায় না।

আধুনিক সময়ের চেঞ্জে যাওয়া যেমন, রোগের চিকিৎসাও প্রায় সেইরূপ। চেঞ্জে যাও, আশু উপকার আছেই। চেঞ্জের উপকার কিন্তু ক্ষুধা ও দাস্তের উপকার। কিন্তু অভ্যাস পরিবর্ত্তনের উপকারই যথার্থ উপকার। শরীর সুস্থ যখন থাকে, তখন মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য কতকগুলি মানসিক ব্যাপার অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। মনকে সুস্থ রাখিবার অভ্যাস যিনি করেন, তিনি শরীরকে বহুদিন সুস্থ রাখিতে পারেন। আর বিশেষ যত্ন করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি হইতে শরীর ও মন উভয়কে একবারে পরিত্রাণও করিতে পারেন। যাঁহারা রীতিমত মনের ক্রিয়া করিবার অভ্যাস রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে এমন

কার্য্যও আছে, যাহাতে কোন প্রকার রোগ আদৌ শরীরে বা মনে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি মনের চিকিৎসা না করা যায়, তবে দারজিলিংএ-চেঞ্জে যাওয়া মানুষের মত শিলিগুড়িতে নামিতেই নামিতেই, কোথাও বা বাড়ীতে আসিয়া দুই চারিদিন থাকিতেই থাকিতেই চেঞ্জটা উপিয়া যায়।

ব্যাধির যথার্থ প্রতীকার করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদের এক ব্যবস্থা আছে। আয়ুর্ব্বেদের প্রথমে যে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্ঞানের কথার ব্যাখ্যা দেখা যায় তাহা এই দুই প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা জন্য শারীরিক রোগের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাধিরও চিকিৎসা সমকালে আবশ্যক। সমাজের প্রকৃত কল্যাণ জন্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা যদি না করা হয়, তবে, কখনও জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। মানুষের শরীরের মত সমাজ শরীরের রোগ সর্ব্বকালে না থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজ মনের রোগ সর্ব্ব কালেই থাকে। সর্ব্বকালে যে রোগ থাকে তাহার চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা থাকা উচিত।

আমরা দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—মনের চিকিৎসার জন্য তাঁহারা নিজে কতটুকু চেষ্টা করেন এবং সমাজকেই বা কি করিতে বলিতেছেন?

প্রাচীন ভারতে মনের চিকিৎসার ব্যবস্থাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে মানসিক ব্যাধির বহু উল্লেখ আছে। মানসিক ব্যাধির প্রতীকার জন্যই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য। মানবজাতির শোক নিবারণ জন্যই ঋষিদিগের সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্রেই শোক কি দেখান হইয়াছে এবং কিরূপে তাহার প্রতীকার হয়, তাহাও বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর আমাদের আধুনিক সাহিত্য? আধুনিক ভারতের সাহিত্য কোন্ পথে চলিতেছে? সে দিন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন—সমাজের ব্যাধি একদিকে প্রসারিত হইতেছে, আর সাহিত্য অন্যপথে লোককে টানিতেছে। ইহাতে সমাজের ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতেছে।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে যদি দেখা যায়, তবে আমরা কি দেখি? মানুষ এক প্রকার লেখে কিন্তু সে লেখার কোন কিছুই চরিত্রে দেখা যায় না। কেন এমন হয়? সাহিত্য চরিত্র গঠন করিতে পারিতেছে না কেন? সাহিত্য মানসিক ব্যাধির প্রতীকার করিতে পারিতেছে না কেন? মনকে শান্ত করিতে

পারিতেছে না কেন? প্রাচীন সাহিত্য ইহা পারিত; নবীন জগৎ পারিতেছে না কেন? একমাত্র উত্তর,—সত্যের অনাদর, ধর্ম্ম-জীবনের অভাব।

মনের চিকিৎসার জন্য প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা,—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। ঈশ্বরের দিকে মনকে অগ্রসর করার জন্য অভ্যাস আবশ্যক। আবার যে কারণে মন ঈশ্বরের অভিমুখে যাইতে চায় না, তাহার নিবারণ জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। নবীন সাহিত্যে অথবা নবীন জগতে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য কতটুকু স্থান পাইয়াছে? যদি বিশেষরূপে স্থান না পাইয়া থাকে, তবে নবীন জগতের চেষ্টাকে কি উন্মত্ত চেষ্টা বলা যাইবে না? এই উন্মত্ত চেষ্টা নিবারণ যত দিন না হইতেছে, ততদিন সমাজের শান্তি কি হইবে? আমরা বলি,—কখনই নহে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজ ও সাহিত্যের কথা আর একটু আলোচনা করা যাউক।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রচারও ত সমাজে বিলক্ষণ দেখা যায়। লোকেও ত ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করেন। আবার ধর্ম্মানুষ্ঠানও অনেকেই করেন। তথাপি আটপৌরে এবং পোষাকী চরিত্র এত অধিক দেখা যায় কেন?

কারণ আছে। যাঁহারা ইংরেজীশিক্ষিত, তাঁহারা অনেক জ্ঞানের আলোচনা করেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ জন্য কর্ম্ম করিতে প্রায়ই প্রস্তুত নহেন; এই কর্ম্মশূন্য জ্ঞানালোচনার ফল কি? ফল,—মূর্খ-পাণ্ডিত্য এবং কর্ম্ম-অসাধুতা। কর্ম্মশূন্য জ্ঞানালোচনার ফল, শাস্ত্র বলেন,—নাস্তিকতা। আজ কাল শিক্ষিত লোকের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাসী কয়জন? ঈশ্বরে নির্ভর করিতে কয়জন পারিতেছেন? ইহার উত্তর শিক্ষিত লোকেরাই দিবেন।

অন্যদিকে যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদেরও প্রায় চরিত্র দেখা যায় না। কেন যায় না? কর্ম্ম করা হয় কিন্তু জ্ঞানে লক্ষ্য নাই বৈরাগ্যে লক্ষ্য নাই। কাজেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান দোষ আসিয়াছে, "গোঁড়ামি"। শাস্ত্র, জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম এবং কর্ম্মশূন্য জ্ঞান, উভয়েরই দোষ দিয়াছেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানসহ জ্ঞানালোচনা এবং জ্ঞানে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান—ইহাই আধুনিক রোগের প্রতীকার। ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন কিছুতেই মনের রোগ সারিবে না। সারিতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যে সাধনা আবশ্যক, প্রাচীন সাহিত্যে তাহা বিশেষরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে সাধনার স্থান কতটুকু? হৃদয়বান্ লোক কি মনের চিকিৎসার জন্য একবার বদ্ধপরিকর হইবেন না?

(২)

পূর্ব্বে বলা হইল, প্রাচীন ভারতে নবীন জগৎ মনোহর সাজ-সজ্জায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন কি নবীনের বেশভূষা দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছে না? যদি বলা যায় হইতেছে, তবে লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, প্রাচীন ভারত নবীন উন্নতি গ্রহণ করিতে কি অসম্মত?

যথার্থ উন্নতি যাহা, তাহা গ্রহণ করিতে প্রাচীন ভারত কখন অসম্মত নহেন। প্রাচীন ভারত কখনই উন্নতির বিরোধীও নহেন—যদি সেই উন্নতিতে মানবের বিশেষত্ব নষ্ট না হয়। প্রাচীন ভারত, সকল প্রকার পরিবর্ত্তন সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে প্রস্তুত; কিন্তু যাহা সত্য, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে রাজী নহেন। সত্যকে ত্যাগ করিয়া অসত্য গ্রহণ করা অপেক্ষা মৃত্যুও শত-গুণে শ্রেয়স্কর।

কালে কালে লৌকিক ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু সত্য অপরিবর্ত্তনীয়। কালে কালে সাজ-সজ্জায় পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, পবিত্রতার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, সতীত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। সর্ব্বকালে রজস্তম গুণের গতির পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কোনকালেই শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের গতির পরিবর্ত্তন হয় না। কালে কালে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কোন কালেই একাগ্র ও নিরোধভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

প্রাচীন ভারত যাহাকে সত্য নিশ্চয় করিয়া পূজা করিয়াছেন, ঈশ্বরের ধারণা, পবিত্রতা, সতীত্ব, সাত্ত্বিকগুণ,একাগ্র ও নিরোধভাব—নবীন জগৎ এইগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি আর সমস্ত পরিবর্ত্তন করিতে চান, তবে তাহাতে প্রাচীন ভারতের কোন আপত্তি নাই।

আমরা উপস্থিত প্রবন্ধগুলিতে মনের চিকিৎসা জন্য প্রাচীন ভারতের সত্য ও নবীন জগতের পরিবর্ত্তন যথাসম্ভব দেখাইতে চেষ্টা করিব। একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা যখন প্রাচীনের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হই, তখন প্রাচীন হাসিতে হাসিতে বলেন, "আমি প্রাচীন—আমার কিন্তু মৃত্যু নাই। মৃত্যুসংসার-সাগর অতিক্রম করাই ছিল আমার প্রধান শিক্ষা। তোমরা যে আপদ্ দেখিয়া ভীত হইতেছ, আমি এইরূপ আপদ্ বহুবার দেখিয়াছি। আপদ্ কত শতবার উঠিল নিবিল, আমি কিন্তু চিরদিনই আছি, চিরদিনই

থাকিব।" প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ এইরূপ আপদের কথা জানিতেন। এই অশান্তির কথা তাঁহারা উল্লেখ করিয়া, তাহার নিবারণ জন্য কি করা উচিত তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। নবীনের উন্নতি যদি বিলাসিতার অন্য নাম হয়, তবে প্রাচীন এই বিলাসিতায় ভুলিবে না। বিশেষতঃ এই কলিযুগের আয়ু চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। এখন সবে ৫,০০০ বৎসরের কিছু অধিক অতিবাহিত হইয়াছে। এখনিই এত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? এখনও অনেক বাকী। যে সত্য ধরিয়া থাকিবে তাহার মৃত্যু নাই। যাহারা অসত্য ধরিয়া কোলাহল করিবে তাহারাই পুনঃ পুনঃ মরিবে।

প্রাচীন ভারত বলেন, সত্য কি, অসত্য কি বিচার কর, করিয়া সত্যটি অনুষ্ঠান কর; জগতের লয় হইবে, কিন্তু যে সত্য ধরিয়াছে, সে মরিবে না।

আমরা ঈশ্বর-ধারণা, পবিত্রতা, সতীত্ব, শুদ্ধসত্ত্ব ভাব, একাগ্র ও নিরোধ অবস্থা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারত ও নবীন জগতের মীমাংসার কথা ক্রম অনুসারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। যাঁহার ইচ্ছায় সব চলে তাঁহার ইচ্ছা হইলে, ইহাও চলিবে।

সতীত্ব—মহাকালী পাঠশালা।

শিক্ষায় যতটুকু হয়, মহাকালী পাঠশালার বালিকাগণ তাহা যে লাভ করে, আমরা তাহাই এখানে দেখাইতেছি।

সতীত্ব সম্বন্ধে, মহাকালী পাঠশালার প্রথম চারি শ্রেণীর বালিকাগণের লেখা আমরা দেখিলাম। বালিকারা যাহা লিখিয়াছে, যদি সমাজে স্ত্রীলোকেরা এখনও কার্য্যে তাহা আচরণ করেন, তবে সমাজ যে আবার জীবিত হইয়া উঠে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সতীত্বই স্ত্রী-জাতীর জীবন। সতীত্ব যিনি নষ্ট করেন, তিনি শূকরী অপেক্ষাও অধম হইয়া যান; যাঁহার সতীত্ব নাই, তিনি নারী নামের অযোগ্যা। অতি যত্নে এই সতীত্ব রক্ষা করা উচিত। যাহাতে সতীত্বের বিঘ্ন ঘটিতে পারে এরূপ কার্য্য বা এরূপ ব্যবহার কখনও করা উচিত নহে। এই বিষয়ে বাল্যকালে

পিতা-মাতার শিক্ষা থাকা উচিত, যৌবনে স্বামীর দৃষ্টি থাকা উচিত এবং পুত্রেরও দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য।

যাহারা কোন কারণে কলঙ্কিত হয়, তাহাদেরও উচিত যাহাতে আর না কলঙ্কের স্রোত বর্দ্ধিত হয়। দোষ করিয়াও যদি কেহ শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, করিয়া অনুতাপ করিতে করিতে শাস্ত্রমত তিন বেলা ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে থাকে, এবং পূর্ব্বকৃত পাপ কর্ম্ম হইতে একবারে দূরে আগমন করে—তবে সে আবার পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সতী হইতে পারে। অহল্যা এই বিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত। আমরা বালিকাদিগের সতীত্ব রচনা হইতে নিম্নে কতক কতক উদ্ধৃত করিলাম।

মহাকালী পাঠশালার ১ম শ্রেণীর বালিকা শ্রীমতী ইন্দুমতীর লেখা—

স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করা মহাপাপ। কিন্তু কেহ সতীত্ব রাখিতে পারে না। [কেহ রাখিতে পারে না, বালিকার পক্ষে এইরূপ ধারণা হওয়া একবারেই উচিত নহে। যাহারা সতীধর্ম্মে থাকিতে চেষ্টা করে, শ্রীভগবান্ তাহাদের সহায় হয়েন। সতীত্ব রক্ষা জন্য প্রাণপণ করিলে নিশ্চয়ই অনুভব করা যায়—শ্রীভগবান্ শত শত বিপদ্ হইতে তাঁহার আশ্রিতাকে রক্ষা করেন। হিন্দুশাস্ত্রে এবং আধুনিক সমাজেও ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বরং মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর, তথাপি সতীত্ব নষ্ট হইবার কোন কার্য্য করা উচিত নহে]

সতীত্ব রাখিতে হইলে মনকে খুব কঠিন করিতে হয়; এবং ঈশ্বরের দিকে কেবল মন রাখিতে হয় ইত্যাদি। [নিত্য পূজা, নিত্য আহ্নিক এবং সর্ব্বদা ভগবানের নাম জপ, এবং রামায়ণ, ভাগবত, মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ নিত্য এই সমস্ত লইয়া থাকিতে হয়।]

২য় শ্রেণীর শ্রীমতী শৈবলিনীর লেখা :—

স্বামীর আদেশ যাহারা প্রতিপালন করে, যাহারা স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে, প্রত্যহ স্বামীর চরণামৃত পান করে, তাহারা পতিব্রতা। যাহারা স্বামীকে কটু বাক্য বলে, স্বামীর আদেশ পালন করে না, প্রত্যহ স্বামীর সহিত ঝগড়া করে, স্বামীর চরণামৃত পান করে না, স্বামীকে তুই বলিয়া কথা কয়, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বিচরণ করে তাহারা সতী নহে। যিনি সতী তিনি স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিতে ভাল বাসেন।

পতিব্রতাদিগের মন সরল হয়। তাঁহারা কিছুতেই ভয় পান না। যাঁহাদের স্বামী অসভ্য, কাণা, খোঁড়া, বৃদ্ধ বা বোবা—যদি তাঁহারা পতিব্রতা হয়েন, তবে ঐরূপ স্বামীকেও তাঁহারা কখন উপেক্ষা করেন না। স্বামীর যদি পরস্ত্রীতে দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে প্রথমে স্বামীকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে হয়। তাহাতেও যদি স্বামী না শুনেন, তাহা হইলে অন্য সকল কার্য্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তাহাতেও না হয়, তাহা হইলে ভগবান্‌কে সহায় করিয়া প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিতে হয়। ইত্যাদি—

শ্রীমতী শশিমুখীর লেখা :—

স্বামীগৃহে সকল গুরুজনকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, সকলের সহিত মিষ্ট কথা কহিতে হয়, প্রত্যহ দেবতাদিগকে প্রণাম করিতে হয়, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ক্রোধ করিতে নাই। স্বামীর বসনভূষণাদি যত্ন করিয়া রাখিতে হয়। স্বামীর আহার হইয়া গেলে অন্ন, ফলমূলাদি মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। স্বামীকে ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং স্বামী হরিহর হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গতি নাই। কখন বাচালতা করিবে না। স্বামী নীচে বসিয়া থাকিলে, কখন উচ্চাসনে বসিতে নাই। স্বামীকে কখন অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। সন্ধ্যার সময় নিদ্রা যাইবে না। স্বামীকে কোন জিনিষ নাই, এই কথা শুনাইবে না। এই কথা বলিবে যে, আনা কর্ত্তব্য। একটিও অন্ন নষ্ট করিবে না। পদশব্দ করিয়া চলিবে না। উচ্চৈঃস্বরে হাসিবে না। নখ দিয়া মাটী খুঁড়িবে না। গৃহাদি কখন অপরিষ্কার রাখিবে না। বেশীক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে না। ইত্যাদি।

অনেকেই লিখিয়াছে—স্বামী বিদেশে গেলে কোন প্রকার অঙ্গ-সংস্কার করিবে না। এবং অন্যের গৃহে যাইবে না। ইত্যাদি।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বালিকাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি, এবং শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—যেন ইহাঁরা সংসারে এই সমস্ত কথা পালন করিয়া, সতীত্বের আদর্শ-পথে চলিতে প্রাণপণ করেন। জীবন তুচ্ছ করিয়া সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন।

একটা কথা আমরা এই বলি—নিজের জন্য কোন কিছু যাচ্ঞা করা নীচতা। নিজের সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনকে সন্তুষ্ট করাই

যে ভগবানের উপাসনা—ইহা যেন বালিকারা বিশেষরূপে ধারণা করিয়া রাখে। প্রত্যহ শিবপূজা, দীক্ষাগ্রহণ, রামায়ণাদি পুস্তক নিজে পড়া, এবং গুরুজনকে পড়িয়া শোনান—সাংসারিক কার্য্যের উপরে এইগুলিকেও কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম্মশূন্য হইয়া সংসার করা আর পশুর মত থাকা একই কথা। যাহাতে সংসারে এইগুলি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে যদি গৃহস্বামী যত্ন করেন, তবে এই দুর্দ্দিনে সংসারে অনেকটা শান্তি থাকা সম্ভব।

মা—বালকের কবিতা।

(১)

জানিনাকো আমি কোথা হতে আসি,
কোথা পুনঃ চলে যাই।
জানি না কিছুই মোহগত আমি,
তব পদাশ্রয় চাই॥

(২)

জানি না কি আছে করণীয় মোর,
কেমনে তাহা সাধিব।
জানি না কি হতে নরক বিধান,
স্বর্গসেতু বা বাঁধিব॥

(৩)

জানিনাকো আমি বিশুদ্ধ আচার,
বিরুদ্ধও নাহি জানি।
দর্শন স্পর্শন যাহা করি আমি,
অনুসরি কার বাণী?

(৪)

বুঝিয়াছি মাতা তুমি যে করাও,
তুমিই হৃদয়পতি।
দেহ-প্রাণ-মন সকলি তোমার।
তব পদে দাও মতি॥

(৫)

তুমিই ধারণ কর এ জগৎ,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তুমি।
প্রকাশ তোমার আকাশে বাতাসে,
ব্যাপিয়া এ বিশ্বভূমি॥

(৬)

সবিতা তোমায় করেগো আরতি,
কিরণে জ্বালায়ে দীপ্।
পবন তোমার করুণা বহে গো,
শশধর-ভালে টীপ্॥

(৭)

কালের প্রবাহে এ দেহতরণী,
তরঙ্গে ভাসিয়া যায়।
তব পদাশ্রয় গতি গো আমার,
এ ঘোর বিপদে হায়॥

(৮)

তব কৃপা বিনা কেমনে বাঁচিব,
দয়া কর দয়াময়ি ;
তব মুখ চেয়ে সংসার-সাগরে,
বিপুল যাতনা সহি॥

(৯)

গরজে আকাশে ভীম কাল-মেঘ,
অশনি নামিছে বেগে।
কর্ণধারহীন এ তরণী পরে,
বসিয়া রয়েছি জেগে॥

(১০)

নামিছে আঁধার ভরি দশদিক্,
নাহি দেখি ভানুরেখা।
বুঝি ডুবে যাবে এ দেহ-তরণী,
কি আছে ললাট-লেখা॥

(১১)

না আছে ভকতি, পূজা নাহি জানি,
অধম পাতকী আমি।
কুপুত্র তোমার হলেও জননী,
করুণা-অযোগ্য নহি॥

(১২)

দহে গো হৃদয় অনুতাপানলে,
যাতনার নাহি শেষ
তার গো জননী প্রসারি দু'হাত,
শমনে ধরেছে কেশ॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যে বালকটি উপরের কবিতাটি লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের বাড়ীর অন্যান্য বালকদিগের অশিষ্ট ব্যবহার নিবারণ জন্য একটি প্রশংসনীয় উপায় করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, সেই বিশিষ্টবংশের অভিভাবকগণ বালকদিগের কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। এমন কি, স্ত্রীলোকেরাও এই কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

বলিতে হইবে না এই সংসার ধনবানের সংসার। ৭।৮টি বালক দল বাঁধিয়া নিয়ম করিয়াছে যে, যে কেহ অশিষ্ট ব্যবহার করিবে এবং যে তাহা দেখিবে—সে তৎক্ষণাৎ বাঁশী বাজাইয়া জানাইয়া দিবে যে, উৎপাত হইতেছে। ইহারা সকলেই এক একটি বাঁশী সঙ্গে রাখে। একবার বাঁশী বাজাইলে কোন নির্দ্দিষ্ট বালককে চুপ করিতে হইবে। দুইবার বাজিলে অন্যকে, তিন-বারে আর একজনকে। এইরূপে এক এক জনকে সতর্ক করিবার জন্য এক-বার, দুইবার, তিনবার, চারিবার ইত্যাদি বাঁশী বাজান হয়। কোন বালক যেন ভাত খাইতে বসিয়া থালা আছড়াইতেছে, বা ভাত ছড়াইতেছে—দলের কাহারও কাছে এ সংবাদ পঁহুছিলে বাশী বাজাইয়া তাহাকে সতর্ক করা হইল। বালক তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, মায়েরাও অন্য বালককে ডাকিয়া বলেন ওরে আমায় একটা বাঁশী দে বাজাই। নইলে দুরন্ত বালকের উৎপাত থামে না। যদি কেহ শাসন না মানে তবে দলের অন্য বালকেরা তাহার সহিত কথা বন্ধ করিয়া দেয়। বহু সংসারে ইহা প্রচারিত হইলে, আমরা মনে করিব সমবেত শক্তির সৎব্যবহার হইতেছে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

যাজ্ঞ] মন সেই একটী দেবতা। কেননা বাক্ ও মনোরূপ যজ্ঞের দুইটী অঙ্গের মধ্যে ব্রহ্মা ধ্যানবলে মনোরূপ অঙ্গের সংস্কার করেন, সুতরাং মনকেই সেই দেবতা বলা হইল। ব্রহ্মা এই এক দেবতা মনের সাহায্যে যজ্ঞ রক্ষা করেন। এই মন বৃত্তিভেদে অনন্ত; মনের এই অনন্ততা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ, মনের এই অনন্ত-বৃত্তিভেদে অভিমান সম্পন্ন দেবতাও অনন্ত; মনের এই আনন্ত্য-দর্শী উপাসক উপাস্যের অনন্ততায় অনন্ত লোক জয় করেন।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! আ'জ উদ্‌গাতা (সামবেদজ্ঞ পুরোহিত) কতগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বনে স্তব করিবেন?

যাজ্ঞ] তিনটী অর্থাৎ ত্রিবিধ বেদমন্ত্র অবলম্বনে স্তব করিবেন।

অশ্বল] সে ত্রিবিধ বেদমন্ত্র কি প্রকার?

যাজ্ঞ] পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা। অধ্যাত্ম-বিভাগে প্রাণই পুরোনু-বাক্যা, কারণ প্রাণ ও পুরোনুবাক্যা এই দুই শব্দের আদিতে পকার রহিয়াছে এই পকারাদি-সাম্যে, প্রাণকে পুরোনুবাক্যা বলা হইয়াছে। অপানই তৎপরবর্ত্তী যাজ্যা, কেননা অধ্যাত্মদেবতাগণ যেমন অপান বায়ুর উপহৃত গন্ধাদি হবি ভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অধিযজ্ঞদেবগণ যাজ্যামন্ত্র-উপহৃত হবি গ্রহণ করেন, সুতরাং অপানকে যাজ্যা বলা হইল। ব্যানই শেষোক্ত শস্যা; ঋক্‌মন্ত্র সমূহকে শস্যা বলে, এই সমুদয় মন্ত্র ব্যানের সাহায্যে উচ্চারিত হয় এইজন্য ব্যানবায়ুকেই শস্যা বলা হইল।

অশ্বল] যজমান এই ত্রিবিধ ঋক্ দ্বারা কোন্ কোন্ স্থান জয় করেন?

যাজ্ঞ] যজমান পুরোনুবাক্যা দ্বারা পকারাদি-সাম্যে পৃথিবীলোক জয় করেন, মধ্যবর্ত্তিতা-সাদৃশ্যে যাজ্যা দ্বারা অন্তরীক্ষ লোক, ঊর্দ্ধত্ব সাদৃশ্যে শস্যা দ্বারা দ্যুলোক জয় করেন।

আচার্য্য] বৎস! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একে একে সকল প্রশ্নেরই উত্তর করি-লেন দেখিয়া মহর্ষি অশ্বল বিরত হইলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ড।

আর্ত্তভাগ-ব্রাহ্মণ।

আচার্য্য] বৎস! এখন যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ডের আর্ত্তভাগ ব্রাহ্মণ নামক দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা করিব, একবার সংক্ষেপে অশ্বল-ব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য বর্ণনা কর দেখি।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আমি যথাসাধ্য অশ্বল-ব্রাহ্মণের মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়াছি, তাহাতে ইহার মর্ম্ম আমার যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, বলিতেছি—

আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত এই দৃশ্য প্রপঞ্চ অবিদ্যাকল্পিত। এক বস্তু অপররূপে বিবর্ত্তিত হইবার মূলে অজ্ঞান থাকিবেই। ভূতাবেশজনিত অজ্ঞানই কুলবধূকে দেশান্তর-বাসী পুরুষরূপে ভাবনা জন্মাইয়া পুরুষ করিয়া তুলে। এইরূপে মূলে অজ্ঞান থাকিলেও বিনা বিক্ষেপে বা বিনা ভাবনায় অন্য স্বরূপাপত্তি ঘটে না; এই জন্যই, অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনতিদূরে অস্পষ্ট আলোকে শাখাপ্রশাখা হীন বৃক্ষকাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে, দর্শক পুরুষ দৃষ্টিদোষে দেখিল—একটী পুরুষ তাহার দিকে আসিতেছে। এখানে দর্শকের এই দৃষ্টি-দোষ কেন ঘটিল—চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তদীয় অবিদ্যাই বাহ্য সাধারণ অবলম্বন পাইয়া আপন আবরণশক্তি দ্বারা দর্শকের প্রমা-দৃষ্টি আবরণ করিয়াছে, অপরদিকে এই অবিদ্যা আপন অনির্ব্বচনীয় বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা বৃক্ষকাণ্ডকে হস্তপদাদি অবয়বে এবং সম্ভবমত বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে অভিমুখগতি প্রদান করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক বস্তু যেখানে অন্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, সেখানে মূলে থাকে—তত্ত্বাবরণ-কারিণী অবিদ্যা; আর উপরে থাকে—অচিন্ত্যরচনা-চতুরা অঘটন ঘটন পটীয়সী অবিদ্যারই বিক্ষেপ-শক্তি বা ভাবনা।

কর্ম্ম অনুসারে এই ভাবনা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্নরূপ জন্ম, বিভিন্নরূপ আয়ু এবং বিভিন্নরূপ ভোগ রচনা করে। এই কর্ম্ম কোথাও

প্রাক্তন কর্ম্মের সাহায্যে তীব্র সংবেগ প্রাপ্ত হয় এবং অচিরে সুফল প্রসব করে, কোথাও প্রাক্তন দুষ্কৃতির প্রতিবন্ধকতায় মন্দগতি হইয়া সুদূর কালান্তরে ফলদান করে। যাহা হউক, এই কর্ম্ম অনুসারেই শুভভাবনা করিয়া করিয়া জীব হিরণ্যগর্ভ ভাব ধারণ করে, আর এই কর্ম্মই বিকৃত হইলে জীব স্থাবরান্ত অধোগতি লাভ করিতে বাধ্য হয়।

কর্ম্ম-সহচরী অসম্ভবসম্ভবকারিণী ভাবনাই শুভ অশুভ সর্ব্ববিধ ফলের প্রসূতি, সুতরাং ভগবতী উপনিষদ্দেবী অশ্বলযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদচ্ছলে ভাবনা শুদ্ধির উপদেশ করিতেছেন। বলিতেছেন—জীব! তুমি কর্ম্মলভ্য হিরণ্যগর্ভপদ ভুলিয়া একি চর্ম্ম-কূপে পড়িয়া আছ, তোমার দুষ্কৃতিফলে অধিভূতরূপে তুমি যে পরিচ্ছিন্ন বিষয় দর্শন করিতেছ এবং অধ্যাত্মভাবে যে পরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা দর্শন অভিমান করিতেছ, তুমি অধিদৈব ভাবনায় অভ্যস্ত হও—দেখিবে ভূতাবেশ-নির্ম্মুক্ত কুলবধূ যেমন আপন সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয় এবং যেমন লব্ধস্মৃতি হইয়া আপন সম্পদ দর্শনে আহ্লাদ-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তুমিও তোমাতে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের অঙ্গভাব দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে। তুমি অঘটন ঘটনাপটীয়সী আপন ভাবনা-বলে সূচিকাচ্ছিদ্রনিহিত গজরাজের মত যে সূর্য্যদেবরূপ আপন বিরাট্ চক্ষুকে ক্ষুদ্র চর্ম্মকোটরে আবদ্ধ করিয়াছিলে, আজ ভাবনা-বিশুদ্ধিতে বিরাট্ চক্ষু সূর্য্যদেব সে চর্ম্মবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমার বিশ্বব্যাপী বিরাট্ সুষমাদর্শনে তোমাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। তুমি দেখিবে শুভ ভাবনাই সংসার-রাত্রির দুঃস্বপ্ন সদৃশ তোমার ক্ষুদ্র পার্থিব চর্ম্মদেহ অপসারণ করিয়া তোমাকে সুখের স্বপ্নরাজ্যে টানিয়া লইয়াছেন। অগ্নি, আদিত্য চন্দ্র, দিক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়ে সুশোভিত করিয়া তোমাকে বিরাট্ অঙ্গিরূপে পরিণত করিয়াছেন। কি তোমার সেই অঙ্গ; সে অঙ্গের পদদেশে অতলাদি সপ্তপাতাল সমন্বিতা শস্যশ্যামলা হিমাদ্রি-কিরীটিনী সমুদ্রমেখলা পৃথিবী, কটিদেশ হইতে হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত মধ্যভাগ অগণিত নক্ষত্রমালায় অলঙ্কৃত, গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতির্ম্মণ্ডলীতে মণ্ডিত; আর শিরোদেশে নয়নস্থানীয় সূর্য্যরশ্মিতে প্লাবিত।

ভগবন্! এইরূপ মননপূর্ব্বক যখন আমি এই বিরাট্ সুষমায় চিত্ত ধারণ করিয়া নিদিধ্যাসন করি, তখন বস্তুতঃই দেহ-দুঃস্বপ্ন কাটিয়া যাইয়া যেন এক সুখের স্বপ্ন দর্শন করিতে থাকি। কিন্তু দেব, কি দুর্ভাগ্য, পথের কাঙ্গাল

যেমন স্বপ্নে রাজা হইয়াও স্বপ্নভঙ্গে পূর্ব্বাবস্থা লাভ করে, আমিও যে পুনরায় জীবন্ত নরকসদৃশ দেহকূপে নিমগ্ন হই।

আচার্য্য] বৎস! বারংবার দেহবিষয়ক ভাবনা করিতে করিতে যেমন এখন তুমি দেহভাবনায় সিদ্ধ হইয়াছ, তদ্রূপ বিরাট্‌ভাবনা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে তুমি হিরণ্যগর্ভভাব লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

অপিচ বৎস! আমি তোমার সর্ব্বদা ভাবনার বিঘ্ন বর্ণনাচ্ছলে মৃত্যুর অপর স্বরূপ এই আর্ত্তভাগ-ব্রাহ্মণে উপদেশ করিব।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আপনি ভাবগ্রাহী, আমার হৃদয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াই বলিতেছেন। আপনি আমাকে সর্ব্বদা হিরণ্যগর্ভ ভাবনা করিতে উপদেশ করিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম—সর্ব্বদা যে তাঁহাকে লইয়া থাকিতেই পারি না, কে যেন আমাকে ভুলাইয়া দেয়, তাই ভাবিতেছিলাম কে এই পাপপুরুষ, যে আমাকে প্রতিনিয়ত ভুলাইয়া এই ভৌতিকচিন্তায় ব্যাপৃত করে?

আচার্য্য] বৎস! আমি তোমাকে তাহাই আপাততঃ বলিতেছি। বৎস! যদিও পূর্ব্বে তুমি কাল ও কর্ম্মরূপে মৃত্যুর পরিচয় পাইয়াছ, কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ মৃত্যু কোন্‌রূপে তোমাকে আকর্ষণ করে, তাহাই একবার বিচার কর দেখি। তোমাকে যদি বলি ঐ—দেখ আহা কি সুন্দর সরোবর! আহা কি স্ফটিকের মত স্বচ্ছজল, আগা কুমুদকমলকহ্লারে উহা কেমন সুশোভিত! তুমিও যদি আমার বর্ণনামত কল্পনায় উহা একবার আঁকিয়া ফেল তাহা হইলে উহা কিছু নয় মনের বৃথা কল্পনা, উহা মুছিয়া ফেল; বলিলেই কি ঐ কুমুদকহ্লারসুশোভিত সরোবর হৃদয় হইতে সরিয়া যায়, বরং যতই তুমি সরাইতে চাও, ততই পুনঃ পুনঃ চিন্তায় ঐ দৃশ্য দ্বিগুণতর প্রস্ফুট হইয়া উঠে। তদ্রূপ এই যে গন্ধর্ব্বনগর একবার উঠিয়াছে, উহা তুমি যতই সরাইতে চাহিবে, উহা ততই তোমাকে আক্রমণ করিবে।

বৎস! ভাবনাই মৃত্যু, আবার ভাবনাই অমৃত। অশুভভাবনা ভাবয়িতার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়া বাড়বাগ্নির ন্যায় তাহাকেই দগ্ধ করিতে থাকে, আর শুভভাবনা, সমুদ্রহৃদয়গত চন্দ্রকলার ন্যায় আপন আশ্রয়কে শতগুণ বৃদ্ধিমান করে।

অবিদ্যা এই অশুভ-ভাবনাকেই জীবের নিকট সুশোভন কণ্ঠমালা বলিয়া অর্পণ করে, আর আবৃতচক্ষু মূঢ় জীব পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া এই কণ্ঠ-

পাস্তামীত্যেবং বায়ুর্ব্রূতে ইত্যর্থঃ। কীদৃশী ধেনা? প্রপৃঞ্চতী প্রকর্ষেণ সোমসম্পর্কং কুর্ব্বতী সোমগুণংবর্ণয়ন্তীতার্থঃ। উরূচী উরূন্ বহূন্ যজমানান্ অঞ্চন্তী গচ্ছন্তী যে যে সোমযাজিন স্তান্ সর্ব্বান্ বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ। হোতাব্রূতে—হে বায়ো ত্বং যজমানমুদ্দিশ্য হে যজমান! ত্বদ্দত্তং সোমমেবোঽহং পিবামীত্যেবং যং কিঞ্চন ব্রবীষি—সা তব স্বীকার-বাণী সোম-মাহাত্ম্যং প্রকটয়ন্তী তান্ তান্ সোমযাজিনশ্চ বর্ণয়ন্তী যজমানমুপৈতি ॥৩

পদনির্ব্যাহ্নিনী] বায়ো! তব (তোমার) প্রপৃঞ্চতী (বর্ণনারূপে সোমলতার সম্পর্ক করিতে করিতে) ধেনা (বাণী) জিগাতি (গমন করিতেছ) দাশুষে (দাতার নিকট) উরূচী (বহু যজমানের বর্ণনা কারিণী) সোমপীতয়ে (সোমরস পান করিবার জন্য।

বঙ্গানুবাদ] হে দেব বায়ো! পানার্থ সোমরস-দাতা যজমানকে লক্ষ্য করিয়া তুমি যে বলিতেছ, যে হে যজমান! তোমার প্রদত্ত সোমরস আমি পান করিব, এই তোমার গ্রহণবাণী ভূতপূর্ব্ব বহু সোমযাজি যজমানের এবং সোম-রসের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে যজমানের নিকট উপনীত হইতেছে ॥৩॥

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! বায়ুর বাক্য যজমানের নিকট যাইতেছে, ইহার অর্থ কি? আমার বাক্য যেমন আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছে, ঠিক এইরূপ কি দেবতার বাক্য মানব শুনিতে পারে?

আচার্য্য] বৎস! যদি মানবের সে অধিকার থাকে, যদি তোমার কাতর নিবেদন তিনি শুনিতেছেন, অনুভব করিতে পার, তবে কেমন হয়?

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! তাহাও কি আবার বলিতে হইবে? তাহা হইলে মনে হয়, জগতের সম্বন্ধ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারই শ্রবণ-মনোরম উপদেশ শ্রবণে সতত প্রণিহিত থাকি; তাঁহারই স্নেহ-সিক্ত নয়নারবিন্দে নয়ন স্থাপন করিয়া, দৃশ্যদর্শন ভুলিয়া যাই, কিন্তু গুরুদেব! ইহা কি জীব পারে?

আচার্য্য] বৎস! কেন পারিবে না? ইহা করিতেই জীব মানবদেহ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু জীব মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া যায়, মূঢ় জীব মায়ারই

সৌন্দর্য্য-দর্শনে ব্যাকুল-দৃষ্টি হইয়া তাঁহার দিকে সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়া পড়ে, তাই জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহার কথা শুনিতে পায় না। এই ঘোর কলিদুর্দ্দিনেও সাধুদের মুখে শুনা যায়, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করেন। কর্ম্মদ্বারা আধিভৌতিক মল চিত্ত হইতে অপসারিত হইলেই আধি-দৈবিক দেহে সর্ব্বদা দেব দর্শনের যোগ্যতা জন্মে। এই ভাবেই জীব ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়, এই ভাবেই অন্যযুগের লোক দেবতার সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিতেন। তুমিও কর্ম্মদ্বারা বীতমল হও, দেব-দর্শন-যোগ্য হইবে। যাবৎ তুমি এই অবস্থা লাভ করিতে না পার, তাবৎ কল্পনায়ও যদি ইহা ভাব ; যে তিনি তোমার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার জন্য প্রতিনিয়ত তুমি যে অসহনীয় যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতেছ, বিশ্বতশ্চক্ষু তোমাকে না জানাইয়া তাহা দেখিয়া দেখিয়া মৃদু-পদবিক্ষেপে ক্রমে তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তুমি যদি ইহা ভাবনা কর, তবে দেখিবে, এই ভাবনাই কত মধুর ; এই ভাবনারই কত শক্তি, এই ভাবনা মাত্রেই তোমার হৃদয় হইতে ভয় বিক্ষেপ অপসারিত হইবে, তোমার হৃদয় দিব্য আনন্দে ভরিয়া যাইবে। ভিতরের ভাবনা যতই বদ্ধমূল হইবে, ততই বাহিরের এই ভাবনা সরস হইবে, তখন প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে তুমি তাঁহারই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে, তাঁহারই জলভরা স্নেহময় দৃষ্টি দেখিতে পাইবে। পাখী আপন মনে গাইতেছে, তাঁহার মধ্যে তুমি তাঁহার আহ্বান শুনিতে পাইবে, পুষ্পস্তবকাবনম্রা লতিকা ফলভারাবনত তরু শাখা দর্শনে তাঁহারই কত কি কথা তোমার মনে পড়িবে। তখন বুঝিতে পারিবে, শ্রুতির এই বাক্যের মর্ম্ম কি।

ইন্দ্র বায়ু ইমে সুতা উপপ্রয়োভিরাগতম্। ইন্দবো বা মুশন্তিহি ॥ ৪ ॥

পদানুসরণী] হে ইন্দ্রবায়ু! ভবদর্থম্ ইমে সোমাঃ সুতাঃ অভিষুতাঃ, তস্মাদ্ যুবাম্ প্রয়োভিঃ অন্নৈঃ অস্মভ্যং দাতব্যৈঃ সহ উপাগতম্ অস্মৎসমীপং প্রত্যাগচ্ছতম্ হি যস্মাৎ ইন্দবঃ সোমা বাং যবামুশন্তি কাময়ন্তে, তস্মাদাগমন মুচিতম্॥

পদ-নিষ্যন্দিনী] হে ইন্দ্রবায়ু (হে দেব ইন্দ্র বায়ু!) ইমে (এই সোমরস) সুতাঃ (সংস্কৃত হইয়াছে) প্রয়োভিঃ (অন্নের সহিত) উপাগতম্ (অস্মৎসমীপে আগমন কর) ইন্দবঃ (সোমরস) বাম্ (তোমাদের উভয়কে) উশন্তি (কামনা করিতেছে—তোমাদের শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছে)।

অনুবাদ] হে দেব ইন্দ্রবায়ু! এই তোমাদের জন্য সোমরস সুসংস্কৃত হইয়াছে। তোমরা দাতব্য অন্ন লইয়া এই যজ্ঞভূমিতে আগমন কর। কেননা সোম তোমাদের শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছে॥ ৪॥

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্ম] ভগবন্! পূর্ব্বে আমি যে সমুদয় মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে প্রতি মন্ত্রে এক একটী দেবতা দেখিতে পাইয়াছি, এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও বায়ু দুইটী দেবতা দেখিতেছি, এরূপ হইবার কারণ কি?

আচার্য্য] বৎস! তুমি যথাস্থানেই এই প্রশ্ন করিয়াছ। বলিতেছি, শ্রবণ কর—ইহার পূর্ব্বে এবং পরে তুমি যে সমুদয় মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, এবং অধ্যয়ন করিবে, তাহার অধিকাংশই একদৈবত; কিন্তু এই মন্ত্র হইতে তৃতীয় সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র দ্বিদৈবত, অর্থাৎ দুইটী করিয়া দেবতা এই মন্ত্রের স্তবনীয়। এইরূপ হইবার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি সমাম্নাত হইয়াছে।

পুরাকালে সোমপানের পৌর্ব্বাপর্য্য লইয়া ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের মধ্যে মতভেদ ঘটে। ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সকলেই "আমি পূর্ব্বে পান করিব" বলিয়া অহংপূর্ব্বিকা-পরবশ হয়েন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিয়া পূর্ব্ব পান কামনা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই সিদ্ধান্ত স্থির হয় না, পরিশেষে স্থির হইল—আমরা সকলে সমকালে ধাবিত হইব, যিনি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌছিতে পারিবেন, তাহারই জয়; তিনিই অগ্রে সোমপান করিবেন। এইরূপে সীমা নির্ণয় করিয়া তাঁহারা যুগপৎ ধাবিত হইলেন, কিন্তু দেখা গেল বায়ুই সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, তৎপরে দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র, তৎপর মিত্র ও বরুণ, এবং তৎপরে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় নিরূপিত স্থানে পৌছিলেন। সোমপানের পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে ইন্দ্র বায়ুর নিকট উপস্থিত হইয়া বায়ুকে একপাত্রে পান এবং অর্দ্ধভাগের জন্য অনুরোধ করিলেন। বায়ু তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে এক-তৃতীয়াংশের জন্য পুনরপি ইন্দ্র অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বায়ু

তাহাতেও অসম্মত। অবশেষে ইন্দ্র এক চতুর্থাংশের জন্য সহপান প্রার্থনা করিলেন, বায়ু তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তদবধি ইন্দ্র বায়বীয়-গ্রহের (সোম পাত্রের) চতুর্থাংশভাগী এবং সহসোমপায়ী হইলেন। অপিচ তৎপর মিত্র ও বরুণ একসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন, এ জন্য ইন্দ্রবায়ুর পরেই মিত্র ও বরুণ সোমপান করিবেন স্থির হইল, এবং এইরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয় তৎপরে যথাস্থানে একসঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই জন্য ইঁহারাও উভয়ে সহপায়ী ও একপাত্রপায়ী নির্ণীত হইলেন।

বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ। তাবায়াতমুপদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

পদানুসরণী] হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ যুবামুভৌ সুতানাম্ অভিষুতান্ সোমান্ চেতথঃ জানীথঃ। যদ্বা অভিষুতানাং সোমানাং বিশেষমিত্যধ্যাহারঃ। কীদৃশৌ যুবাম্? বাজিনীবসূ, (বাজিনীশব্দো যদ্যপি উষোনামসু পঠিতঃ, তথাপ্যত্রাসম্ভবান্নগৃহ্যতে; বাজঃ অন্নম্ তদ্বত্তাং হবিঃ সন্ততাবস্তি সা বাজিনী, তস্যাং বসত ইতি তৌ বাজিনীবসূ, অন্নবতি হবিঃ সন্তানে ব্যাপকতয়াঽবস্থিতা-বিত্যর্থঃ। তৌ তথাবিধৌ যুবাং দ্রবৎ ক্ষিপ্রম্ উপ সমীপে আয়াতমাগচ্ছতম্ ॥ ৫ ॥

পদনিষ্যন্দিনী] বায়ো ইন্দ্রশ্চ (হে দেব বায়ো! তুমি ও ইন্দ্র তোমরা উভয়ে) চেতথঃ (অবগত আছ) সুতানাম্ (সুসংস্কৃত সোমরসের বিষয়) বাজিনীবসূ (অন্ন মিশ্রিত হব্যরাশিতে ব্যাপকরূপে অবস্থিত) তৌ (সেই উভয়ে) আয়াতম্ উপ (সমীপে উপনীত হও) দ্রবৎ (শীঘ্র)।

বঙ্গানুবাদ] হে দেব বায়ো! তুমি এবং দেব ইন্দ্র তোমরা উভয়ে অভিষুত সোমরসের বিষয় অবগত আছ। তোমরা অন্নমিশ্রিত হব্যরাশিতে অবস্থিত। তোমরা অবিলম্বে আমাদের সমীপে আগমন কর ॥ ৫ ॥

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! সোমের কথা যেখানেই শ্রুতিতে আছে, সেখানেই সুত বা অভিষুত রহিয়াছে, দেখিতে পাই; এরূপ নির্দ্দেশের কারণ কি?

আচার্য্য] বৎস! শ্রুতি স্বাধীনা রাজমহিষীর বাক্যে ‘কেন?’ এই অনুযোগ করিবার শক্তি যেমন দাসীর নাই, তদ্রূপ রাজরাজেশ্বরী শ্রুতির বাক্যে কাহারও প্রশ্ন চলে না, স্বাধীনা রাজমহিষীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে দাসীর

ল।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত।

মূল. সমস্ত ভাষ্য ও টীকার আবশ্যকীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ; এবং প্রতিশ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা। গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা আর নাই—ইহা সকলেই বলিতেছেন।

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তত্ত্বসমূহের এমন সুন্দর প্রণালীতে আলোচনা এখন পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের সাধনা দ্বারা জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা অন্য কোথাও এখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম ষট্‌ক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূল্য ৪।০; দ্বিতীয় ষট্‌ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় মূল্য ৪।০: তৃতীয় ষট্‌ক ১৩ অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় মূল্য ৪।০।

গীতা সম্বন্ধে মতামত।

কাশীধামের স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস লিখিয়াছেন:—

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমূল্য নিধি আমায় দি'চ্চ এর তুলনা নাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদের যত রকম ভাষ্য টীকা আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা যা আমার চ'খে পড়েচে,—তোর দয়ার কাছে তাঁদের দয়া আমার অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। তাঁরা সংস্কৃত লিখে

আমার বোধের অগম্য করে রেখেছেন; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরল তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভরা। এক কথায় ব'লতে গেলে তোমার গীতাই গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। যত দিন তুমি আমার হাতে "ধ্রুবনীতির্মতির্মম" না দি'চ্চ তত দিন তোমায় দয়াল বল্‌তে আমার জিহ্বা আপনা আপনি সংকোচ হ'চ্চে।

রাম! তোমার দেহটা চির দিনের নয়, এই ভেবে গীতাকে শীঘ্র আমার হাতে দাও—এই আমার ব'লতে ইচ্ছা হ'চ্চে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ. বি এল, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম। নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি সুন্দর. অনুবাদের ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

একটু একটু মনে পড়ে ৺পিতৃদেব বহু চেষ্টা করিয়া একখানি হাতের লেখা গীতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা। ইদানীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষা নাই যাহাতে গীতা অনুদিত না হইয়াছে। সভ্যজগতের বহু স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সুগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল; এবং উহাখানি পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু "উৎসব" অফিস হইতে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতা সংস্করণ বাহির হইতেছে তাহার নিকট সকলেই হেটমুণ্ড হইতে হইবে। এই বিরাট্ গ্রন্থে যে প্রকার সুপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য মজুমদার মহাশয়! হৃদয়ের ভক্তির মাধুর্য্য না থাকিলে লেখনী হইতে এবম্বিধ অমৃতময় কথা লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যবান্ লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখনও সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব।

শোভাবাজারের ৺মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম. এ, মহাশয় মান্যবরেষু।

প্রণামনিবেদনমিদং

আপনার প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গানুবাদ ও ভাষা সরল ও মধুর। গীতার তত্ত্ব পয়োত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্যবোধের সহিত

সহজ ভাষার লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই গীতা পাঠে দুর্ব্বোধ্য গীতার গূঢ়মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া দেখিতে বিশেষ অনুরোধ করি, যাঁহাদের অদৃষ্ট শুভ তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কার্য্যে আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে আপনাকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। জগতে আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই ধন্য। গ্রন্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের সকলেরই পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এরূপভাবে বঙ্গভাষায় গীতা আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। আপনার বিংশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল সার্থক হইল। ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৮ সাল।

ভদ্রা—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত। মহাভারতীয় সুভদ্রা-চরিত অবলম্বনে সামাজিক উপন্যাস। বিবাহ জীবনের নব অনুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। প্রতি যুবকের পাঠ করা উচিত। মূল্য ১।০।

কৈকেয়ী—মানুষ আপনা হইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মূল। দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হইতে পারেন—রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে। কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী ও কৌশল্যা-চরিত্র ধরিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। না কাঁদিয়া পড়া যায় না। মূল্য ।০ আনা।

ভারতসমর ১ম ভাগ—মূল মহাভারত, কালিসিংহের অনুবাদ এবং কাশী দাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমুখ পত্রিকা বলেন—এমন ভাব মহাভারতের চরিত্র সময়ের উপযোগী করিয়া কেহ পূর্ব্বে দেখান নাই। যেমন ভাষা তেমনি শিক্ষা পুরাতনকে নূতন করিয়া এরূপে কেহ আঁকেন নাই। প্রতি স্থানেই ভাবে লেখা। অতি উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৮০ আনা।

সাবিত্রী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—সর্ব্বজন প্রশংসিত এই পুস্তক প্রতি স্ত্রীলোকের পাঠ করা উচিত। সাবিত্রী সত্যবানের চরিত্র এরূপ ভাবে দেখান হইয়াছে যে, যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছা করে। বহুজনে ইহার ভাষা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা।

উৎসব—মাসিক পত্র ৮ম বৎসর চলিতেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলেন আজ কালকার কোন পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বঙ্গবাসী বলেন এতদিনে হিন্দুর পাঠ্য মাসিক পত্রিকা দেখিলাম। যেমন বিষয় বৈচিত্র তেমনি লেখার কৌশল। বাজে কথা, বাজে গল্প একবারে নাই। যাহাতে জীবনে উপকার হয়, সাধনা হয়, তাহা জ্বলন্ত ভাষায় মধুর করিয়া লেখা। মূল্য বার্ষিক ১॥০ মাত্র। আর এক সুবিধা, যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহারা ঋগ্বেদসংহিতা, মাণ্ডূক্য উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ এই চারিখানি পুস্তক কাগজের সঙ্গে সঙ্গেই পাইতে থাকিবেন।

শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী—প্রকাশক।

উৎসব আফিস,—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল। [২য় সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১০নং শম্ভু চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে"

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগীতা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা গীতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছেন সত্বর হইবেন। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪।০ আনা। শ্রীগীতা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১।।০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪।।০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২।।০, সিকি পৃষ্ঠা ১।।০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

কৈফিয়ৎ।

একটু কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক হইয়াছে। গত বৎসরের শেষ ২।৩ মাস হইতে আমি প্রত্যহ উৎসব আফিসে যাইতেছি। কার্য্যাধ্যক্ষ পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতেছেন। আমার সম্পূর্ণ স্নেহভাজন আত্মীয় শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, প্রত্যহ বহু পরিশ্রম স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়া শিবপুর হইতে উৎসব আফিসে আসিয়া উৎসবের সমস্ত দেখিতেছেন এবং করিতেছেন। আমরা এই পত্রিকার উন্নতির জন্য আমাদের দ্বারা যতটুকু হওয়া সম্ভব তাহা করিতেছি। উৎসব পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা ইহার প্রতি সুদৃষ্টি করেন, তাঁহারাও ইহার উন্নতি জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই পত্রিকার উন্নতিও আমরা দেখিতেছি।

অন্য অন্য পত্রিকায় লোকরঞ্জনের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করা হয়, আমরা সেরূপ কিছুই পারি না। তথাপি অলঙ্কারশূন্য এই মাসিক পত্রিকা যখন উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহার বহুদিন ধরিয়া স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক পাঠকের যখন আগ্রহ দেখা যায়, ইহাকে উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে অনেকে যখন ক্ষুণ্ন হয়েন তখন বলিতে হইবে ইহা দ্বারা সাধারণের কোন কোন বিষয়ে উপকার হইতেছে। আমরা প্রথমে শ্রীভগবানের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা

আরম্ভ করি। এখনও আমাদের তাহাই লক্ষ্য। যতদিন আমাদের সম্পর্ক ইহার সহিত থাকিবে ততদিন ঐ লক্ষ্যই থাকিবে।

বহুচিত্তের আরাধনা হয় না। সকলকে সন্তুষ্ট করাও মানুষের সাধ্য নহে। সেই জন্য শ্রীভগবান্‌কে প্রসন্ন করার উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমরা চলিতেছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মধ্যে ২।৪ জন গ্রাহক অতি তীব্র ভাষায় উৎসবকে ব্যবসাদারী পত্রিকা বলিয়া চিঠি লিখিয়া থাকেন। ইহাতে আমরা দুঃখিত নহি। বরং যখন লোকের রুচি একরূপ নহে তখন এইরূপ হওয়াই সম্ভব আমরা মনে করি। সেই জন্য এই কৈফিয়তের প্রয়োজন হইয়াছে।

উৎসব কাগজের লক্ষ্য যাঁহারা বিস্মৃত তাঁহারাই ইহার প্রতি বিরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

তপস্যাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। তপস্যাবর্জ্জিত হইয়া যে অধ্যয়ন তাহাকে আমরা ক্ষণিক চিত্তবিনোদন ভিন্ন অন্য কিছুই বলি না। ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য আজকাল অনেক উপায় সমাজে চলিতেছে। সেই সমস্ত উপায়মত কার্য্য করিয়া সমাজে যে ব্যভিচার চলিতেছে, সমাজ সেই ব্যভিচারের বিষময় ফলও ভোগ করিতেছে। এই পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনার জীবন লাভে যত্ন। যাঁহারা উৎসব পাঠ করেন, তাঁহারা সকলেই ত বহু উপদেশ শুনিয়াছেন, বহু উপদেশ জানেন এবং অন্যকেও বহু উপদেশ দিয়া থাকেন। আমরা বলি যাহা নিজের জীবনে লাভ করিতে প্রাণপণ করা যায় তাহাই অন্যকে বলা আবশ্যক। লোকের উপদেষ্টা হওয়া অপেক্ষা নিজে শাস্ত্রমত চলিতে প্রয়াস পাওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কি সংসার কি সমাজ কি ব্যক্তি—প্রায় সর্ব্বত্রই আজকাল এই বিষয়টির নিতান্ত অভাব দেখা যাইতেছে। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কিছু করিলে কখনই পরমানন্দপ্রাপ্তি-পথে যাওয়া যাইবে না। তপস্যাশূন্য জীবন কখনই আর্য্যজীবন হইতে পারে না। সেই জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণকে তিন বেলা সন্ধ্যা পূজা করার কথা বলি, আর ব্রাহ্মণেতর সকলকে ঐ ভাবে তিন বেলা জপ করার কথাও বলি। এইটিই তপস্যার মুখ্য কথা। ইহা অবলম্বন করিলে যিনি যতটুকু উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহার নিকটে উচ্চ সাধনার অঙ্গগুলি ততই প্রকাশিত হইবে।

কেহ কেহ বলেন এক কথাই পুনঃ পুনঃ উৎসবে লেখা হয়। আমরা

বলি—এক প্রকার সাধনার কথাই বহুভাবে লেখা হওয়াই উচিত। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে বলি সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন করিয়া কোন প্রকার ভাবনা, কোন প্রকার কথা কওয়া এবং কোন প্রকার কার্য্য করাকে ব্যভিচারিণী হওয়া মনে করেন আমরাও সেইরূপে বলি, শুভাদৃষ্ট বা অশুভাদৃষ্টবশে যিনি যে অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ ব্যবহারিক কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুন না কেন সেই অবস্থার কর্ম্ম, বাক্য ও ভাবনাকে প্রথমে হৃদয়ের রাজাকে জানান আবশ্যক। শাস্ত্র বলেন আপদ্ধর্ম্মকালে যদি কখন কাহাকেও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেও হয়, তথাপি তাহা প্রথমে শ্রীভগবান্‌কে জানাইতে হয়, বলিতে হয়, হে আমার দেবতা! আমার প্রারব্ধবশে আমাকে এই অনভিলষিত কর্ম্ম করিতে হইতেছে—কিন্তু আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি তুমি আমায় রক্ষা কর। উগ্রভাবে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়া যদি অবস্থার উপযোগী কার্য্য করা যায় তাহাতে কর্ম্মের কোন বন্ধন পড়ে না। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া সেই কর্ম্মকে নিষ্কামভাবে করাইয়া লয়েন। যতদিন সংসারাশ্রম আছে ততদিন বহুকর্ম্ম মানুষকে করিতে হইবে। সেই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে চেষ্টা করাই একমাত্র উন্নতি লাভের সোপান। এখন যতদিন না প্রতিভাবনায় ঈশ্বর স্মরণ হয়, যতদিন না প্রতিবাক্য উচ্চারণকালে হৃদয়ের রাজার অনুমতি লওয়া অভ্যস্ত হয়, যতদিন না প্রতিকার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া করা অভ্যাস হয়, যতদিন প্রতি সঙ্কটাবস্থায় আমার করণীয় কি ইহা প্রথমে তাঁহাকে জানাইতে অভ্যাস না করা হয়—এক কথায় যতদিন না প্রতি বাক্য, প্রতি কার্য্য প্রতি ভাবনা—তাঁহাকে জানাইয়া করার অভ্যাস না হয় ততদিন ঐ এক কথাই বহুভাবে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা আবশ্যক। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে এক কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে। শুধু উপদেশ জানিয়া লাভ কি যদি সেই উপদেশ মত জীবন গঠিত না হয়? যাঁহারা উৎসবে এক বিষয়ের পুনরুক্তির জন্য তীব্র বাক্য প্রয়োগ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে আপনার ভাবিয়াই জিজ্ঞাসা করি আমরা কি সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য, সকল ভাবনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীভগবান্‌কে প্রথমে তাহা জানাইতে অভ্যাস করিয়াছি? যদি এখনও তাহা অভ্যাস না হয় তবে যাহাতে তাহা অভ্যাস হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা কি উচিত নহে? এ প্রশ্নের উত্তর যিনি করিতে যাইবেন তাঁহাকেই বলিতে হইবে পুনঃ পুনঃ উক্তি বিশেষ আবশ্যক। ফলে এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসই সাধনা। একদিন

আহার করিলেই যদি জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত তবে আর ভাবনা কি ছিল ?

কেহ কেহ বলেন, যে ভাবে উৎসবে ঋগ্বেদ, যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, উপনিষৎ বাহির হইতেছে, সে ভাবে ৫০ বৎসরেও পুস্তক শেষ হইবে না। আমরা বলি ঐ সমস্ত পুস্তক ত অতি অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তক বাহির করা উৎসবের লক্ষ্য নহে, শাস্ত্র অধ্যয়নই ইহার লক্ষ্য। যতদুর বাহির হইতেছে তাহা আয়ত্ত করাই শ্রেয়ঃ না সমগ্র পুস্তকখানি না পড়িয়া আল্‌মারীতে সাজাইয়া রাখা শ্রেয়ঃ ? স্বাধ্যায়কে শাস্ত্র তপস্যার প্রধান অঙ্গ বলেন। আমরা উৎসবে স্বাধ্যায়কে লক্ষ্য রাখিয়াই উপরোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি।

যাহাতে আমরা স্বাধ্যায়সম্পন্ন সাধক হইতে পারি আমরা উৎসবে তাহারই চেষ্টা আজ আট বৎসর ধরিয়া করিতেছি। অধিক আর কি বলিব আসুন আমরা আমাদের এই দুঃখের দিনে স্বাধ্যায়সম্পন্ন শাস্ত্রমত কর্ম্মাভ্যাসী হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে সকল অবস্থার প্রতি অনাদর করিয়া শ্রীভগবানের প্রসন্নতা হৃদয়ে অনুভব করার জন্য প্রাণপণ করি। আসুন আমাদের এই দুর্দ্দশার দিনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরক্ত না হইয়া সকলে মিলিয়া ভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে প্রাণপণ করি। ইতি—

জীবের দুঃখ।

২য় প্রবন্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য মনের চিকিৎসা আবশ্যক। মনের চিকিৎসা জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য নিত্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য অনুষ্ঠান কখনই ফলপ্রদ হইবে না—যতক্ষণ না ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ ঠিক ঠিক ধারণা করিতে পারে। পবিত্রতা, সতীত্ব, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, একাগ্র ও নিরোধভাব, এইগুলি সমস্তই ঈশ্বরধারণার উপর নির্ভর করে। এই জন্য

প্রথমেই আমরা প্রাচীন ভারত ও নবীন জগতের ঈশ্বরধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যদি ভুলধারণা থাকে, তবে মানবজাতি, মানবসমাজ, মনুষ্য ইহাদের সকলের জীবনে ভুল থাকিয়া যাইবে। মানুষ কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। এইরূপ অবস্থায় মানুষ উপস্থিত ইন্দ্রিয়সুখের জন্য আপনা আপনি বিবাদ করিবে। আর ইন্দ্রিয়সুখের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, আহার নিদ্রা ইত্যাদির সুখ অর্জ্জন ও রক্ষণের জন্য যাহা চাই, তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে। একজনের বিলাসিতাসাধন-জন্য যদি দশজনের জীবিকা উচ্ছেদ হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিবে না। পশুর মত, যাহার গায়ের জোর বেশী, সেই জীবিত থাকিবে, অন্যগুলি মরিবে।

একমাত্র ঈশ্বরকে যথার্থরূপে ধারণা না করিতে পারিলে যখন জীবনে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তখন প্রথমে ঈশ্বর কি ইহাই সুন্দররূপে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রাচীন ভারত "ঈশ্বর কে ?" এই প্রশ্নের এই উত্তর করেন যে, বিশ্বাসে ভাল বাসিয়া লোকে যাঁহাকে ডাকে, বহিরঙ্গ কর্ম্মে লোকে যাঁহাকে ডাকে, অন্তরঙ্গ কর্ম্মে লোকে যাঁহাকে ডাকে, এবং কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া লোকে ধ্যানযোগে যাঁহাতে স্থিতিলাভ করে, তিনিই ঈশ্বর। এই ভাবে ঈশ্বরকে বুঝিতে গেলে শুধু সাধনার ভাবই প্রকাশ করা হইল—যাঁহার জন্য সাধনা সেই সাধ্য বস্তুর কথা বিশেষ বলা হইল না। প্রাচীন জগৎ যে এইরূপ বলেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে—বিশ্বাস, কর্ম্ম—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, নৈষ্কর্ম্ম্য ও ধ্যান যোগ যদি কেহ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঈশ্বরে পঁহুছিতে পারিবে। ইহা সত্য হইলেও প্রাচীন জগৎ যে অন্যভাবে ঈশ্বরকে বুঝান নাই, তাহা নহে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহাকে দেখিতে হইবে।

(১) যখন সৃষ্টি ছিল না তখন তিনি কি ?

(২) যখন সৃষ্টি প্রকাশ হইল তখন তিনি কি ?

(৩) যখন মনুষ্য, সৃষ্টির উপর নানাপ্রকারে অত্যাচার ব্যভিচার করে, যখন ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় করে, তখনই বা তিনি কি ?

প্রাচীন ভারত সাধ্যবস্তুকে আত্মা বলেন। ইনিই ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি

আপনি আপনি ভাবে যখন থাকেন, তখন ইহাকে অবিজ্ঞাতস্বরূপ নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়। আবার যখন সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে তখন নির্গুণব্রহ্ম আত্মমায়ার সহিত মিলিত হইয়া সগুণ ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েন। সগুণ ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলা হয়। আবার সৃষ্টির বিপর্য্যয়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এই আত্মাই অবতার গ্রহণ করেন। তবেই হইল আত্মা, নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও অবতার এই চারিভাবে ঈশ্বরকে বুঝিবার কথা প্রাচীন ভারত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

নবীন জগৎ ঈশ্বরকে উপরোক্তভাবে দেখেন না। তিনি যে ভাবে ঈশ্বরকে দেখেন, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রাচীন ভারতের যিনি ঈশ্বর তিনি নবীন জগতের ঈশ্বর বটেন, কিন্তু নবীন জগতের যিনি ঈশ্বর, তিনি প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরের একদেশ মাত্র। যিনি পূর্ণ তাঁহাকে অংশভাবে যখন দেখা হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশদর্শনকারিগণ যে বিবাদ করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। নবীন জগতে ঈশ্বরসম্বন্ধে সেইরূপ একটা বিবাদ চলিতেছে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা হউক।

একজন চক্ষুষ্মান্ কতকগুলি অন্ধকে একটি জন্তু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিল—জানোয়ারটি কি, তোমরা নিশ্চয় কর। আমি ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র যাইতেছি, এখনি আসিতেছি। চক্ষুষ্মান্ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—অন্ধগুলি কি করে। অন্ধের মধ্যে কেহ কেহ সেই অতি বৃহৎ জানোয়ারের পা ধরিল, কেহ ধরিল শুঁড়, কেহ ধরিল কর্ণ, কেহ ধরিল পুচ্ছ। যে যে অংশটি ধরিল, সে সেই অংশটিতে হস্ত চালনা করিয়া বুঝিল ইহা সমস্তটি এইরূপ।

অন্ধগুলি ঐভাবে জানোয়ারটিকে নিশ্চয় করিয়া ফিরিয়া আসিল, আসিয়া চক্ষুষ্মানের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। চক্ষুষ্মান্ নিকটেই ছিলেন। কিছুই বলিলেন না। তখন অন্ধগণ পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিল—কাহার কি ধারণা? যে পা ধরিয়াছিল, সে বলিল—জানোয়ারটি থামের মত; যে কাণ ধরিয়াছিল সে বলিল কুলোর মত; যে পুচ্ছ ধরিয়াছিল—সে বলিল ঝাঁটার মত, যে শুঁড় ধরিয়াছিল,—সে বলিল অতি বৃহৎ জোঁকের মত। তখন কথায় কথায় তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া গেল। পরে কথা

কাটাকাটি ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ হইল। বেগতিক দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ অন্ধগণের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন। কাহারও নিকটে যাইতে তাঁহার ভরসা হইল না। কারণ তিনি জানিতেন যে তাঁহার বাক্য ইহারা সত্য বলিয়া যদি ধারণা না করে, তবে বাগে পাইলে সকলে মিলিয়া ইহাঁকে ধরিয়া প্রহার আরম্ভ করিয়া দিবে এবং সকলেই আপন মনের ঝাল মিটাইয়া তবে ছাড়িবে। সহজ পাত্র ইহারা কেহই নহে বলিয়া তিনি জানিয়াছিলেন; তাই দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন—তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা আংশিক সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে পূর্ণ সত্যটি যদি দেখিতে—

চক্ষুষ্মান্ দেখিলেন—অন্ধগুলি তাঁহার আওয়াজ ধরিয়া "কি"? বলিতে বলিতে তাঁহার দিকে বাহুড়িয়া আসিতেছে। তখন তিনি পলায়ন করিলেন। প্রাচীন ভারত এই দৃষ্টান্তকে 'হস্তিদর্শন-ন্যায়" বলেন।

দৃষ্টান্তের রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতে হইলে দেখা যায়, ঈশ্বরসম্বন্ধে এই হস্তি-দর্শন-ন্যায়ের মত একটা ব্যাপার নবীন জগতে ঘটিয়াছে। নতুবা এই বিবাদ কেন? প্রাচীন ভারত এক্ষেত্রে দূর হইতে তাঁহার বক্তব্য বলিলেই বোধ হয় ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাঁচিতে পারেন। আর প্রাচীন ভারতের কথা যিনি বলিবেন, তাঁহার ভাগ্যে কি আছে তাহা ফলেন পরিচীয়তে। বিশেষ সতর্ক হওয়াই তাঁহার উচিত।

আমরা ভয়ে ভয়ে নবীন জগতে ঈশ্বরধারণার বিরোধ দেখাইতে প্রস্তুত হইতেছি।

নবীন জগতে কোন সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার; কেহ বলেন—ঈশ্বর কখনই নির্গুণ হইতেই পারেন না, তিনি নিরাকার বটেন; কিন্তু সগুণ নিরাকার। কেহ বলেন কি মূর্খতা—গুণ থাকিলে আবার নিরাকার কিরূপে হইবে। গুণ যাহার আছে, তাহা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ হইলেই আকার থাকিবে। কেহ বলেন "দয়া" একটি গুণ। যাঁহাতে দয়া আছে, তিনি দয়াময়। দয়াময় কথাটা আমরা সাকার মানুষের সম্বন্ধে ব্যবহার করি বলিয়াই কি বলিতে হইবে নিরাকার দয়াময় ঈশ্বরও সাকার? মানুষের বুদ্ধি ক্ষুদ্র, তাই মানুষ ধারণা করিতে পারে না—সগুণ নিরাকার কিরূপ? ইহা মানুষের দোষ। ইহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ যাহা তাহার বিপর্য্যয় হইবে কেন? কেহ বলেন—ঈশ্বর চিরদিনই সাকার। নিরাকার বলিয়া

কোন কিছু নাই। যাহাকে তুমি নিরাকার বল—সেটা সগুণ সাকার ঈশ্বরের অঙ্গজ্যোতি মাত্র। ইহার বিরুদ্ধে কেহ বলেন—ঈশ্বর যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন তিনি সাকার হইলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের সংহার হয়। আর সব করিবার তাঁহার সামর্থ্য আছে, কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিময়। তথাপি ন্যায় বিচারে ইহা অবশ্যই বলিতে হয় যে, তাঁহার স্বরূপ-সংহারের শক্তিটি মাত্র তাঁহার নাই— আর সব শক্তি তাঁহাতে আছে বল তাহা স্বীকার করি। আবার কেহ বলেন—ঈশ্বর মানুষরূপ ধরিয়া অবতার গ্রহণ করিলে যে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের সংহার হয় বলিতেছ, ইহা তোমাদের মূঢ়তাই প্রকাশ করিতেছে। তিনি আপন অবিজ্ঞাত নিরাকার নির্গুণ আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়াও আত্মমায়ায় অন্যরূপে ভাসিতে পারেন। বুঝিতেছ না? একজন মানুষ বৃদ্ধ হইয়াও তাহার ছেলের সহিত খেলা করিবার জন্য যদি বালক সাজিয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলিতে পারে, তুমি আপনি কত কি করিয়াছ সর্ব্বদা জানিয়াও ধর্ম্মাসনে বসিয়া সাধু সাজিয়া যদি ধর্ম্মকথা কহিতে পার, যাত্রার বালক আপনাকে পোদের সন্তান জানিয়াও কৃষ্ণ সাজিয়া—হে রাধে! হে মানময়ি! বলিতে বলিতে সত্য সত্যই কাঁদার অভিনয় করিতে পারে, তখন সর্ব্ব-শক্তিমান্ যিনি তিনি সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও ভক্তচিত্তের মায়ামানুষ বা জন্য মায়ামানুষী সাজিয়া জগৎলীলা করিতে না পারিবেন কেন? বৃদ্ধের বালক সাজিয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলায় যদি আত্মসংহার না হয়, পূর্ব্বে অসাধু কর্ম্মকারীর সাধু সাজিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা হইলে যদি আত্মসংহার না হয়, পোদের ছেলে কৃষ্ণ সাজায় যদি আত্মসংহার না হয়, তবে নিরাকার নির্গুণ অবিজ্ঞাত-স্বরূপ পরমব্রহ্মের অবতার গ্রহণ করিলেই যে স্বস্বরূপের সংহার হইবে তাহা কিরূপে বুঝিলে? শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আপন সাকার মূর্ত্তিকেই বিশ্বরূপে অর্জ্জুনকে দেখাইতে কি ভার বোধ হইয়াছিল? না আকাশের সর্ব্বত্র অবস্থান সত্ত্বেও একস্থানে কোন মূর্ত্তিতে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব? স্বপ্নকালে নিজের মনের মধ্যে নানা প্রকার সাপ বাঘের মূর্ত্তি দেখিয়াও ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সাপ বাঘ বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছে ইহা যদি অসম্ভব না হয়, তবে ঈশ্বরের মধ্যে থাকিয়াও দর্পণদৃশ্যমান নগরীতুল্য এই মায়িক জগতের বাহিরে অবস্থান অসম্ভব হইবে কেন? রজ্জুর সর্পরূপে ভাসা যদি অসম্ভব না হয়, সুষুপ্তির স্বপ্নমত ভাসা অসম্ভব যদি না হয়, তবে ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপে ভাসা অসম্ভব কেন

হইবে ? সৃষ্টিরূপে বহুমূর্ত্তি লইয়া ভাসিলে কি নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের স্বরূপের ধ্বংস হয় ? নবীন জগতের বহু সম্প্রদায় ঈশ্বরের সম্বন্ধে কত নূতন নূতন মত উঠাইতেছেন, কে ইহার ইয়ত্তা করিবে ? নবীন জগতে যাঁহারা অবতার মানেন, তাঁহারা বলেন—ঈশ্বরের কৃষ্ণ অবতারটিই স্বয়ং। এইটিই মাত্র উপাস্য। অন্য অবতারগুলির কোনটিই উপাস্য হইতে পারে না। আবার যিনি অপর মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তিনি আবার বহুভাবে এই মতের খণ্ডন করিয়া বলেন—ঈশ্বর একটি, তাঁহার সকল অবতারই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। একটি মানুষের যেমন বহু ফটোগ্রাফ থাকে, সেইরূপ এক তাঁহার বহুমূর্ত্তি হইলেও পরমভাবে লক্ষ্য রাখিলে সকল মূর্ত্তিই একরূপ। আবার কেহ বলেন জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। জীবাত্মা অংশ, পরমাত্মা পূর্ণ। জীবাত্মা চিরদিনই ভগবানের নিত্য দাস। জীব কখনও শিব হইতে পারে না। ইহার বিরুদ্ধে আবার কেহ বলেন, সুষুপ্তিকালে যখন জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যান, একাগ্রতা সময়ে যখন উপাস্য উপাসক মিশিয়া গিয়া এক জ্ঞানস্বরূপমাত্র ভাসে, তখন জীব কখন পরম হইতে পারে না একথা সত্য কিরূপে ?

নবীন জগতের ঈশ্বর-ধারণা এত গোলযোগের সৃষ্টি করে দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নবীন কোন কোন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এক কোপে সব কাটিয়া প্রতিপন্ন করেন—ঈশ্বর বলিয়া কোন কিছুই নাই। ঈশ্বরটা অশ্বডিম্ব। মানুষ সুবিধার জন্য ঈশ্বর ব'লয়া একটা কিছু মানিয়া লয়। জড়ই উপাস্য। জড়ের মধ্যে সূর্য্যই উপাস্য। কেন না সূর্য্যই সকল সৃষ্টবস্তুর প্রাণ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীন জগতের ঈশ্বরধারণার এইরূপ বিরোধ দেখিয়া প্রাচীন ভারত দূরে দাঁড়াইয়া যাহা বলেন—তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে তাহাই বিশদ করিবার চেষ্টা করা হউক।

আমি মা'র

কে তুমি সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাক, কিছু বল না শুধু নীরবে চাহিয়া থাক। আমি যেখানে যাই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাও। আমি

দাঁড়াইলে দাঁড়াও, আবার চলিলে চল, শুধু আমায় দেখ, কিছু বল না। আমি ত তোমার দিকে ফিরিয়াও দেখি না. তবু যখন দৃষ্টি পড়ে তখনই দেখি তাকাইয়া আছ। আমি কত সময়ে কত কাজে ব্যস্ত থাকি কিন্তু যখন কখনও হঠাৎ তোমার দিকে লক্ষ্য পড়ে তখনই দেখি তোমার ঐ বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু দুটি আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমার অনেক কাজ। আমার ঘর আছে, সংসার আছে, চাকরী আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, আমাকে সব দিক্ দেখিয়া, সব দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয় সুতরাং আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু আমি কতদিন কতবার দেখিয়াছি তুমি আমার কাছ ছাড়া কখনও থাক না, সংসারের তাড়নায় যখন ভীত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া আকুল চিত্তে ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকি তখন কখনও কখনও দেখিয়াছি তোমার ঐ শান্ত, উৎসাহপূর্ণ, আনন্দভরা, স্নেহমাখা দৃষ্টি আমার মৃতকল্প চিত্তে জীবন সঞ্চার করিতেছে। আবার যখন সংসারের কুহকে ভুলিয়া, আত্মীয়-স্বজন পরিবার লইয়া নিশ্চিন্ত মনে, মহাসুখে নানাবিধ লৌকিক চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি তখনও অকস্মাৎ এক এক বার দেখিতে পাই সেই শান্ত স্নেহভরা, কিন্তু কিছু বিষাদমাখা আয়তলোচন দুটি আমারই গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আমি ভুলিয়াও কখন তোমার কথা ভাবি না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, কখন ত মনে মনে ভাবিয়াও দেখি না, তুমি কে। তোমাকে দেখি, দেখি মাত্র আবার তখনই ভুলিয়া যাই। আবার দেখি, আবার ভুলিয়া যাই। কখনও ভাল করিয়া দেখি না। কিন্তু তুমি ত কখন ভুলিয়াও আমার কাছ ছাড়া হও না, ভুলিয়াও ত অন্য দিকে চাও না। কেন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াও, কেন তুমি স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাক? তোমার কি অপর কোন কাজ নাই? তোমার কি আত্মীয়-স্বজন নাই, ঘর সংসার নাই? তোমার কি সুখ দুঃখ নাই, আহার নিদ্রা নাই, ভয় উদ্বেগ নাই? তোমার কি কাহারও সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না? এমন কি কেহ তোমার নাই যাহার সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ তুমি অনুভব করিয়া থাক? কিছু বুঝি না কে তুমি, কোথায় তোমার স্থান, কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়? কি উদ্দেশ্যে তুমি সর্ব্বদা আমার অনুগমন কর? কোন্ প্রয়োজনে তুমি সর্ব্বদা আমার পানে চাহিয়া থাক? আমার ইচ্ছা হইতেছে ভাল করিয়া তোমার পরিচয় লই। কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া আর আমার জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা

হইতেছে না। আমি দেখিতেছি আমার প্রতি কথায় তোমার সুন্দর মুখখানিতে যেন একটু একটু করিয়া বিষাদের ছায়া পড়িতেছে। তোমার উদ্দেশ্যের কথায়, তোমার প্রয়োজনের কথায় তোমার ঢল ঢল চক্ষু দুটি যেন স্নেহাশ্রুতে ভরিয়া আসিতেছে। আমার আর জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তোমার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ আকুলিত হইতেছে, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে ছুটিয়া গিয়া তোমার কোলে উঠিয়া মা বলিয়া তোমার গলা ধরিয়া কাঁদি। মা—এ কথায় যেন চোখের একটা পরদা সরিয়া গেল। মা—তুমি আমার মা। বাস্তবিকই তুমি আমার মা। আমি ইহা এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। মা'ই ত—মা না হইলে এত গরজ কার, মা বলিয়াই ত তুমি সর্ব্বদা আমার পাছে পাছে, কাছে কাছে থাক। আমি তোমায় দেখি না দেখি, তুমি কখনও আমায় চক্ষের আড়াল কর না। আমার খেলা-ধূলা আছে, সঙ্গী সহচর আছে, কিন্তু আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে? তাই মা তোমার এত আগ্রহ, তাই তোমার এত দয়া, তাই আমার প্রতি তোমার এত সোৎসুক দৃষ্টি। সন্তানের মায়া বড় মায়া তাই মা আমাকে চখে চখে রাখ। কিন্তু আমি তোমার অবোধ সন্তান। তোমার দিকে কখনও লক্ষ্য করি নাই, তোমার দিকে কখনও চাহিয়া দেখি নাই। খেলিতে চাহিলাম, তুমি খেলিতে পাঠাইয়া দিলে। খেলিতে খেলিতে খেলায় এত মজিয়া গেলাম, যে ঘর বাড়ী ভুলিলাম, পূর্ব্বাপর ভুলিলাম, শেষে তোমাকেও ভুলিলাম। আমি ভুলিলাম বটে কিন্তু তুমি ভুলিলে না। আমি সংসার-কাননে উন্মত্ত হইয়া প্রজাপতি ধরিতে ছুটিলাম, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলে। আমি পড়ি, আবার পড়িতে যাই, তুমি ধরিয়া আমায় ঘুরাইয়া দেও। কখনও সামান্য উপলখণ্ড লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি, তুমি আমায় উন্মাদ দেখিয়া বিষণ্ণ হও কিন্তু সে বিষাদ করুণায় ভরা। কখনও ধূলার ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে দুঃখে অধীর হইয়া পড়ি। তুমি হাসিয়া হাসিয়া আমায় কোলে নিতে এস। আমি তোমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাই। তুমি ক্ষুণ্ণ হও, আমি তাহা বুঝি না। আমি দুঃখে কাতর হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠ কি প্রস্তর বুকের কাছে চাপিয়া ধরি। তুমি বিষাদভরা নয়নে আমার দিকে চাহিয়া দেখ, কিছু বল না। মা না হইলে এত দয়া কার?

মা তোমার মুখ দেখিয়া কত কথা আমার মনে উঠিতেছে। তোমার সকরুণ

দৃষ্টিতে আমার শুষ্ক হৃদয়ে কত আনন্দ, কত আশার সঞ্চার হইতেছে। তোমার দিকে তাকাইয়া যাহা দেখিতেছি তাহাই যেন বড় সুন্দর দেখাইতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্য, পূর্ণিমার চাঁদ, অমানিশার নক্ষত্রপুঞ্জ, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, পত্র সবই যেন কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া যাইতেছে। এই অনিত্য অসার সংসার আবার যেন আনন্দময় বোধ হইতেছে। ইচ্ছা হইতেছে একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার পূজা করি। কিছু নাই, কিন্তু তবু শুধু গঙ্গাজল আর দূর্ব্বাদল দিয়াই তোমার পায় একটা অঞ্জলি দিতে ইচ্ছা হইতেছে আর ইচ্ছা হইতেছে একবার তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া, পূর্ব্বের যাবতীয় অপরাধের কথা একটি একটি করিয়া বলি, আর তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষমা চাই। তুমি ক্ষমা করিয়াই আছ, কিন্তু তবু যেন আমার অপরাধগু'ল তোমার কাছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তোমাকে না জানি আমি কতই উপেক্ষা করিয়াছি। তোমার স্থানে, তোমার পবিত্র আসনে, তোমাকে উঠাইয়া দিয়া তোমার সাক্ষাতেই অপরকে বসাইয়াছি। তোমার বসন, তোমার ভূষণ, তোমার পূজার সামগ্রী তোমাকে না দিয়া অপরকে দিয়াছি। তুমি কাছে থাকিয়া দেখিয়াছ, কিন্তু কিছু বল নাই। আমি কতদিন কত ব্যস্ত হইয়া পরের সেবায় কত ছুটাছুটি করিয়াছি, পরের সন্তোষের জন্য কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছি, এবং অত করিয়াও যখন তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই তখন কতবার মনে মনে কত কাতর হইয়াছি। তুমি ত কাছে কাছেই ছিলে। বল তোমার মনে তখন কি হইয়াছিল? কতবার মিছামিছি তোমাকে ডাকাডাকি করিয়াছি। তুমি ত কাছেই থাক, আরও নিকটে আসিলে। আমি কিন্তু তোমায় ভুলিয়া পরের সেবায় মনোনিবেশ করিলাম। তুমি বসিলে কি দাঁড়াইয়া রহিলে, থাকিলে কি চলিয়া গেলে তাহা আর আমি ফিরিয়া দেখিলাম না, তাহা ছাড়া সামান্য ক্লেশে কতবার তোমাকে নিন্দা করিয়াছি, কত গালি দিয়াছি কত কুকথা বলিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই কিন্তু তুমি ত কাছে থাকিয়া সমস্তই শুনিয়াছ। বল মা তুমি তখন কি ভাবিয়াছিলে? বলিতে গেলে অনেক কথা বলা যায় কিন্তু আর বলিব না। আমি দেখিতেছি আমার কাতরতা দেখিলে তুমি ব্যথিত হও। সুতরাং আর পুরাতন কথা না তুলিয়া আমি মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কাছেই থাকিব। ইতি—

অধ্যাস তত্ত্ব।

অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংস্থতিরধ্যাসবন্ধস্তমুনৈবকল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনো জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ ॥১৮১॥
অতঃ প্রাহুর্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৮২ ॥

বি, চূড়ামণি (শঙ্করাচার্য্য কৃত)।

বুঝিলাম—অধ্যাস ও অবিদ্যা দ্বারা জীব সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া থাকে। ইহারাই দুঃখনিদান। অধ্যাস হইতেই অবিদ্যার সৃষ্টি অতএব অধ্যাসই সর্ব্বদুঃখের হেতু। অধ্যাস উত্তীর্ণ হওয়াই পরমপুরুষার্থ।

অধ্যাস কাহার নাম? অধ্যাস কোথায়? কোথা হইতে জন্মে? ইহার স্বরূপ কি? ইহার লক্ষণ কি?

অধি+আস্—অধিষ্ঠিত হইয়া বসা; সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসা। ইহা দ্বিবিধ। প্রথম আপনার অধিকারে তাহার আধিপত্য করা। তাহাতে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করা সর্ব্বপ্রকারেই ন্যায়সঙ্গত ও আবহমানকালের প্রথিত নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত।

দ্বিতীয়তঃ—যাহা আপনার বলিয়া দাবী করা সঙ্গত নহে যাহাতে নিজস্ব দাবীকরা দোষ অপরকে তাহার ন্যায় সঙ্গত দাবী হইতে চ্যুত করিয়া নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব এমন ভাবে বিস্তার করা হয় যাহাতে ইহা যে অপরের ন্যায্য প্রাপ্য সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত না হইয়া সাহসে ও সদর্পে আপনার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও বিক্রম জারি করা—ইহাই অধ্যাসের দ্বিতীয় প্রকট মূর্ত্তি।

মুখ্যতঃ—অধ্যাসে কোন দোষ নাই—তাহাতে সকলের হৃদয়ের সম্পত্তি আছে কাহারও কোন আপত্তি বা ওজর নাই; বরং এই ক্ষমতার অপলাপে অধিকারী বা স্বামীর স্বীয় সম্পদ্ তৎরক্ষণ ও উপভোগার্থ যে কর্ত্তব্য অবহেলা বা ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা হয় তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়ায় ন্যায্য দাবী আছে।

গৌণতঃ—অধ্যাস সম্পূর্ণ দোষাবহ। ইহাতে অনধিকারচর্চ্চা আছে। এতাদৃশ অনধিকার-চর্চ্চাকারীর দাম্ভিকতা, দর্প, নীচতা এবং সর্ব্বোপরি অন্তঃসার-

শূন্যতা আছে। 'যাহার যাহা নহে তাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা-স্থাপন ইহা চিরকালই ধর্ম্ম ও শাসন নীতির অনুমোদনীয় নহে।' ইহা প্রত্যবায়মূলক ইহা কেবল অনার্য্য নহে; ইহা অনার্য্য জনোচিত।

"অনার্য্য জুষ্টম স্বর্গমকীর্ত্তিকরম্"

সর্ব্বোপরি ইহা মহাপাপ। ইহা মহামোহের অনুচর। বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন ঈদৃশ পাপাচরণে পরিতুষ্ট থাকিতে পারে না। ইহা দ্বারা জগতে প্রভূত অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে। এবং ইহার নিবারণের জন্য "সম্ভবামি যুগে যুগে"। ভগবান্ স্বয়ং এই গৌণ অধ্যাসের দমন ও বিনাশ করিয়া মুখ্য অধ্যাসের অটল আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। ইহাই জীবের দুঃখ—ইহাই জীবের পাপ। ইহা হইতেই জীবের সংসার-আবর্ত্তন—ইহার জন্য গর্ভবাস মহাদুঃখ হইলেও, বড় আদরণীয়। এই অধ্যাসতত্ত্ব বড় রহস্যপূর্ণ। এই অধ্যাসতত্ত্ব যুগে যুগে আলোচিত হইলেও প্রতিব্যক্তির জীবনের সমস্যা-সমন্বয়ের সময় নব দীপ্তি ও প্রতিভা প্রকাশ পায়।

অধ্যাসের কি বিপুল শক্তি, কি অসীম প্রতাপ, ইহার কি বিশাল রাজ্য, কি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত আলোড়নকারী সংসারভোগ-ক্ষোভ, কি বিপুল এই মহাম্ভোধির তরঙ্গ—না জানি জীবের কোন্ মহাপাপ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশ্চিতো দুরত্যয়া' জলধি সৃজন করিয়া জন্ম-মরণ-তরঙ্গ-ভঙ্গ-সংকুল অপার ক্লেশরাশি উত্তীর্ণ হইবার অগ্নি-পরীক্ষা অনাদিকাল ধরিয়া চলিতেছে। তাহা বর্ণনাতীত।

কারুণিক! পতিতপাবন! দীনদয়াময়! বল কিসে এই অপার সংসার-জলধির দারুণ নক্র মকর সমন্বিত অধ্যাস-তরঙ্গ-ভঙ্গ-গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? কিসে তোমার নিজবোধরূপ স্বরূপকে জানা যায়? তত্ত্বতঃ জানা ভিন্ন ত কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। "জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন ন ভবতি মুক্তি জন্মশতেন"—এই শাস্ত্রোপদেশে জানাইয়া দিতেছ—এই সংসার-জলধি জ্ঞানপ্লবের দ্বারা উত্তীর্ণ হও। হইয়া "মামেব প্রাপ্নুবন্তি সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ"।

বল—আর প্রতারণা করিও না। বল কিসে 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো হওয়া যায়। হইয়া 'বৃণুতে তনুং স্বাংবরণ' করিয়া লও। 'গাব ইব গ্রামং' গরু যেমন গ্রামকে প্রাপ্ত হয়, 'যুযুধি অশ্বান্' যোদ্ধা যেমন অশ্বকে প্রাপ্ত হয়, "পতিরেব জায়াম্" পতি যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হয়—তেমনি করিয়া তুমি এস! হে অন্তর্য্যামিন্, হে বিশ্বপ্রসবিতা বরণীয় ভর্গ! আদিত্যপথগামিনী হইয়া শক্তি-

মানের সহিত মিলনের অশাভরসায় চলিয়াছ—আহা! আমাকেও কি লইয়া যাইবে না। আমি যে তোমারি। আমি যে তোমার হইয়া আছি। আমাকে তুমি আসিয়া বরণ করিয়া লও নতুবা আমার শক্তি নাই। আমার আর কে আছে বল?

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।

আবিরাবীর্ম্ম এধি!!!

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

দুর্গের শেষ অংশে কেহ বড় একটা আসিত না, সে জন্য এদিকটা নির্জ্জনেই পড়িয়া থাকিত। কেহ আসিত না, কেহ থাকিত না, সুতরাং কেহ সন্ধ্যা-দীপও দেখাইত না। আলিশার নিম্নস্থ ঘুলঘুলীগুলি পারাবতের বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের স্বর দিবাভাগে এদিকটা সরগরম রাখিত এবং রাত্রি-কালে পক্ষের খস্-খস শব্দ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিত।

কুন্তীদেবী একাকিনী অন্ধকারে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত শূন্য ঘরের সম্মুখ দিয়া দালান ও উঠান পার হইয়া আলোকিত জনাকীর্ণ পূর্ব্বভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শীঘ্র একটি ঘরে সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উপরে মাতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পুত্রপ্রাপ্তি এবং যমুনায় বিসর্জ্জনের কথা কেহ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিল না।

রাজা তখন সবেমাত্র বাহির হইতে আসিয়া স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে বসিয়াছেন। রাণী চিত্রিত হর্ম্ম্যতলে জানুতে ভর দিয়া বসিয়া তাঁহার পাদুকা খুলিয়া দিতেছেন। সতীলক্ষ্মী মহিষী, এত দাস দাসী থাকা সত্ত্বেও স্বামী-পরিচর্য্যা স্বহস্তে করিতেন।

ঘরে কে প্রবেশ করিল দেখিয়া রাজা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন কুন্তী। তিনি স্নেহ-বিজড়িত স্বরে—“এস আমার মা এস” বলিয়া ডাকিলেন।

রাণী পাদুকা উন্মোচন করিতে করিতে মেয়েকে বলিলেন,—"কুন্তি, এতক্ষণ অতিথি-শালায় ছিলে বুঝি? আহা মাব আমার দীন-দুঃখীর কথা ভাবিয়াই দেহটা মাটী হইল!"

কুন্তীদেবী দেয়ালে ঝুলান একখানি রত্নজড়িত ময়ূরপুচ্ছের পাখা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে পিতার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে মাতার কথার উত্তর দিলেন—"না মা, আমি আজ অতিথি-শালা হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি; এতক্ষণ একটু যমুনার ধারে বুরুজের বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম।"

কুন্তীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে রাজা বলিলেন—"বেশ করিয়াছ মা। রোজ রোজ যদি এরূপ সেখানে গিয়া একটু বস, তাহা হইলে মন প্রফুল্ল থাকে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।"

কুন্তী চুপ করিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ তিন জনের কেহ কোন কথা কহিলেন না। রাণী পাদুকা খুলিয়া উঠিয়া একে একে স্বামীর মুকুট ও জামা খুলিতে লাগিলেন, খোলা হইল সেগুলি লইয়া গিয়া দেয়ালের সন্নিকটস্থ বসন ধারে রাখিলেন; তাহার কাষ্ঠদণ্ডের উপর এক-পাশে একখানি পবিত্র বস্ত্র রক্ষিত ছিল; সে খানি আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন এবং পূর্ব্ব হইতে দরজার পার্শ্বে একটী রৌপ্যময় জলপূর্ণ গাড়ুর মুখে গাত্র-মার্জ্জনী রাখিয়াছিলেন, সেটিকে রাজার সম্মুখে সরাইয়া দিয়া কুন্তীকে বলিলেন;—"মা একবার নীচে গিয়া পাচিকাকে ইহাঁর খাবার সাজাইয়া রাখিতে বলিয়া আইস। আমি এখনি খাবার আনিতে যাইব।"

পিতা ও কন্যা উভয়ে পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুন্তী, পিতার খাবারের উদ্যোগে পাক-শালার দিকে গেলেন, এবং রাজা বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন।

কাপড় পরা হইলে রাজা, জরী-জড়োয়ায় মোড়া পা-জামাটি বসনাধারে রাখিয়া রাণীকে বলিলেন—"শুনিতেছ?"

রাণী তখন তাহার জন্য মেঝায় আসন পাতিয়া আহারের স্থান করিতেছিলেন; তিনি রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেন?"

রাজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"মেয়েরও বয়স হইতেছে। লোকেও এখন হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার আমাদের এত স্নেহের কুন্তীকে পর করিতে হইবে।

কি করিব। শুধু যে আমাদের ঘরে এরূপ তাহা নহে। জগৎ সংসারের এই এক দশা। আমার ইচ্ছা কুন্তী স্বয়ংবরা হউক, এবং সেজন্য আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি যে, কল্য রাজ-সভায় ভাটগণকে আহ্বান করিয়া কুন্তীর স্বয়ম্বরের কথা প্রচার করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিব। কি বল—তোমার মত কি? বলিয়া রাজা চুপ করিলেন।

রাণী রাজার কথায়—"তুমি যাহা ভাল বুঝিবে করিও।" বলিয়া খাবার আনিতে পাক-শালায় গেলেন। রাজা হস্ত পদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত গামছা খানি কাঁধে ফেলিয়া স্নানাগারের দিকে চলিলেন।

ক্রমশঃ—

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

জাতিভেদ স্বাভাবিক। প্রাণিজগতে এবং উদ্ভিজ্জগতে ইহার প্রভাব উপলব্ধি হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণের বিমিশ্রিত সত্তা, প্রাণি-জগতে এবং উদ্ভিজ্জগতে সমভাবে নিত্য বর্ত্তমান। একটু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেই, ইতস্ততঃ তাহার শত শত প্রমাণ বিক্ষিপ্ত।

বর্ত্তমান জাতিভেদ, বর্ণতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব লইয়া সমাজে বেশ একটু আন্দোলন চলিয়াছে এ সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধও ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এবং এই জাতিভেদপ্রথা, যে সমূহদোষের আকর, তাহাও একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত। তাঁহারা বলেন—"ভারতবাসীর চরিত্র-গত আত্মনির্ভরতা এবং অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সাহসের অভাব, বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার অন্যতম ফল।" "নাচিতে পারেন না—দেন মজ্‌লিসের দোষ।" ইহাও একরূপ সেইরূপ মীমাংসা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সম্পূর্ণ জাতিভেদসত্ত্বেও মহাভারতের বীরগণ কেমন করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন?

মহাভারত না হয় তাঁহাদের মতে একখানা উপন্যাস হইল। রাজস্থানের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন,—রাণাপ্রতাপ সিংহের কথা স্মরণ করুন,—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, উপরোক্ত মতটি নেস্‌ফিল্‌ড সাহেবের একটা ভুল ধারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান জাতিভেদপ্রথা সহস্র দোষের আকর,

তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু, তথাপি আমরা তাহার সংস্কারের প্রয়াসী; ধ্বংসের প্রয়াসী নহি। ইয়ুরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগতে জাতিভেদ নাই সত্য, কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। পূর্ব্বে তাহা গুণগত ছিল, এক্ষণে অর্থগত হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের সহিত এ বিষয়ে আমাদের কোনও সংস্রব নাই। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আমরা হিন্দু; আমাদিগকে হিন্দুর পথেই চলিতে হইবে।

মনু বলিতেছেন ;—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ, মৎস্যাশ্চ, পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতাদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্র জন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্ত, পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয় যজ্ঞীয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরণ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তিকর্শিতঃ॥"

অনুবাদ।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী দেবভূমিকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাবর্ত্ত কহিয়া থাকেন। এই স্থানের বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং সঙ্কর জাতির আবহমান কাল বর্ণিত আচারকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ এবং মথুরা এই কয়টি দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। এই সমুদয় দেশের অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয়, উত্তর দক্ষিণে হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরি। ইহার মধ্যস্থানকে পণ্ডিতেরা

আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। যে স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই দেশকে যজ্ঞীয় দেশ বলে। তদ্ভিন্ন স্থানকে ম্লেচ্ছ দেশ কহা যায়। প্রযত্ন সহকারে এই সমস্ত পবিত্র দেশ আশ্রয় করা দ্বিজাতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রগণ জীবিকাকৃষ্ট হইয়া যে কোনও দেশে বাস করিতে পারে।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের গন্ধও ইহাতে নাই। জীবন্মুক্ত রাজর্ষি জনকের মিথিলাপুরীও বাদ পড়িল। ইহাতে মনে হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামগুলি ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইলেও শাস্ত্রীয় নহে। কিন্তু মিথিলার নাম কেন বাদ পড়িল? এ রহস্য-দ্বার উদ্‌ঘাটন অবশ্যই সহজ নহে। রামায়ণে মিথিলার উল্লেখ আছে। মনুতে নাই কেন?

কুরুক্ষেত্রের ভগদত্ত কামরূপের রাজা ছিলেন। শাস্ত্রে সে দেশ প্রাগ্-জ্যোতিষপুর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি-প্রাপ্ত কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে বর্ত্তমান ইতিহাসে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কোথায় কুরুক্ষেত্র, আর কোথায় কামরূপ? এত ব্যবধান সত্ত্বেও যখন একটা মিলনের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তখন কান্যকুব্জ হইতে মিথিলা বাদ পড়িবে কেন? অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গই বা মৎস্য দেশের অন্তর্ভূত হইবে না কেন? বিশেষতঃ মনু যখন পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গকে আর্য্যাবর্ত্তও ধরিয়া লওয়া চলে।

মানবের মন আর প্রকৃতি যেন একসুরে বাঁধা। প্রকৃতি গত বৈচিত্র্য অনুসারেই তাহাদের মন এবং দেহের সংগঠন হইয়া থাকে। একজন ইংরেজ দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন, 'Minds of men are formed with their habitations." হিন্দুর হিন্দুস্থানে বাস সর্ব্বতোভাবে বিধি। অন্যথায় তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই শ্রেষ্ঠ বর্ণত্রয়ের যথাশাস্ত্র উপনয়ন-সংস্কার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ কার্পাসসূত্রে, ক্ষত্রিয় শণসূত্রে, এবং বৈশ্য মেষসূত্রে উপবীত ধারণ করিবেন। ইহার মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণের বেদ-অধ্যয়ন বিধি। বেদ, শ্রুতি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি। ইহা বিচার এবং বিতর্কের অতীত। যে ব্রাহ্মণ কুতর্ক আশ্রয় করিয়া বেদ ও স্মৃতি অমান্য করেন, সেই বেদ-নিন্দুক ব্রাহ্মণকে সমাজের বাহিরে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ—

সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥
শ্রীগীতা, ধ্যানযোগ॥

যম।

কনিষ্ঠ—দাদা যম বলিতে কি বুঝায় আজ বলিবে কি ?

জ্যেষ্ঠ—বলিব বৈ কি ভাই। এইরূপ আলোচনাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লাভের সেতু স্বরূপ। ইহাতে কি 'না' বলিতে আছে। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন :—

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ॥

কনিষ্ঠ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ—এইগুলি যমসাধনের অঙ্গ। কিন্তু দৈনিক সন্ধ্যা আহ্নিকের ভিতর (যাহা তোমার মতে যোগী হইয়া করিতে হইবে) এগুলির স্থান কোথায় ? বিশেষতঃ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার সঙ্গে এইগুলির উপযোগিতাই বা কি ?

জ্যেষ্ঠ—শুধু সন্ধ্যাবন্দনা কেন—জগতের সকল কাজেই যমসাধনের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। সে কথা তুমি ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

কনিষ্ঠ—তবে আজ সে বিষয়ে কিছু বল।

জ্যেষ্ঠ—দেখ, দুঃখ পাইতে কেহই ইচ্ছা করে না। কিন্তু এই দুঃখ পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা করে কয় জন ? যিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে অগ্রসর হন, প্রথমেই তাঁহাকে দৃঢ় অভ্যাসের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। কেননা অভ্যাস ঠিক মত না হইলে, কোনও কর্ম্মই সত্বর এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। তাই প্রথমেই অভ্যাস; কিন্তু এই অভ্যাসটীও আবার বিবেক পূর্ব্বক করিতে হইবে। শুধু স্থূল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে, অনেক সময় যথার্থ উপসনার বিঘ্ন ঘটিতে পারে। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

যথা পশুর্ভারবাহী ন তস্য ভজতে ফলম্।
দ্বিজস্তথার্থানভিজ্ঞো ন বেদফলমশ্নুতে॥

ভারবাহী পশু যেমন ভারের ফল ভোগ করে না, অর্থজ্ঞানহীন দ্বিজও

সেইরূপ বেদের ফলভাগী হইতে পারে না। তাই বলিতেছি, অভ্যাসের প্রথম অবস্থায় স্থূলভাবে অভ্যাসের বিষয়টীর মর্ম্ম বুঝিয়া লওয়া খুব ভাল। কেননা এই বোঝা বা জ্ঞান হইতে ক্রমশঃ অভ্যাসানুশীলনের ফলে প্রগাঢ় চিন্তা বা ধ্যান আসে। ধ্যানের পথে অগ্রসর হওয়ার পরই, ধ্যেয়বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ বা মিলন হয়। তখন জগতের প্রতি বস্তুতেই আপনার উপাস্যের অনুভূতি হয় এবং তাহার ফলে বাহিরের লোকব্যবহারই হউক আর জীবসেবাই হউক, বড় মধুর ভাবে সম্পন্ন হইয়া যায়। ইহাই অভ্যাসেরর সার্থকতা বা উপাসনা।

কনিষ্ঠ—ইহাতে কি তুমি বলিতে চাও যে, শুধু ব্যবহারিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্যই অভ্যাসের প্রয়োজন, এবং এই অভ্যাসটী ঠিক মত অনুশীলিত করিবার জন্যই যমাদির অনুষ্ঠান?

জ্যেষ্ঠ—তা' কেন? দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত উপাস্যের সহিত মিলিত হইবার জন্যই যমাদির অনুষ্ঠান, আর এই অনুষ্ঠানজ জ্ঞানকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার জন্যই অভ্যাসের আবশ্যকতা।

কনিষ্ঠ—বুঝিলাম। আচ্ছা, এইবার তুমি যমসাধনের বিভিন্ন অঙ্গগুলির কথা বল।

জ্যেষ্ঠ—প্রথম অঙ্গ "অহিংসা"॥ "সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ অহিংসা," "মনোবাক্‌কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নমহিংসা"। এই দুই মহাবাক্যে তুমি অহিংসার লক্ষণ পাইলে। আবার শ্রীভগবান্‌ও গীতার ভক্তিযোগে ভক্তপুরুষের যে যে গুণসমন্বিত হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" বাক্য দ্বারা তিনি এই অহিংসাপরায়নতার কথাটী বিশেষ ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। তাই সর্ব্ব সুখের আধার শ্রীশ্রীমন্নারায়ণাশ্রয় লাভ করিতে গেলে, এই অহিংসা সাধন করিতেই হইবে।

কনিষ্ঠ—তোমার এ সব কথা শুনিতে গেলে তো আজকাল মারা পড়িতে হইবে দেখিতেছি। তুমি বোধ হয় Survival of the fittest কথাটা ভুলিয়া গিয়াছ—তাই অহিংসা অত ব্যাখ্যা করিতেছ।

জ্যেষ্ঠ—ভুলি নাই, ভাই। Survival of the fittest কথাটা বড় ভয়ানক। ইহাতে রাক্ষসী প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়—ইহাতে শিখায় কেমন করিয়া পরকে মারিয়া আপনার পেট অযথা পুরাইতে হয়। সুতরাং অনার্য্যোচিত এই ঘৃণিত মতবাদ পরিত্যাগ কর, করিয়া ব্রাহ্মণ তুমি, ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞানার্জ্জনে যত্নবান হও, সুখী হইবে।

ক্রমশঃ—

আর্ত্তভাগ-ব্রাহ্মণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নাল স্থানীয় বন্ধনরজ্জু আরও দৃঢ়বন্ধনে পরিণত করে, অশেষে গলপাশ বদ্ধ জীবের মত ইহা দ্বারাই রুদ্ধশ্বাস হইয়া শতবার জীবন বিসর্জ্জন করে। শূন্য শ্মশানাকাশে কল্পিত ভূত যেমন আধ্যাত্মিক এবং অধিভৌতিক দ্বিবিধ বিকৃতি লইয়া উদ্ভূত, তদ্রূপ এই ভাবনাময় মৃত্যুও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। তুমি আধ্যাত্মিক বিকৃতি জ্ঞানদ্বারা নাশ কর, ভিতরে সাহসে নির্ভর কর, বাহিরে যেস্থানে—বেতালদৃশ্য ফুটিয়াছে তথায় গমন কর। ভাল করিয়া দেখ, তোমার ভূতময়ী কল্পনা যেমন অধিষ্ঠান ভূত শ্মশান-আকাশরূপে পরিণত হইয়া তোমায় অভয়দান করিবে, তদ্রূপ এই যে তোমার পরিচ্ছিন্নবিষয়দর্শিনী দৃষ্টি, ইহার বিকৃতি অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতা ভাবনা দ্বারা নষ্ট কর ; ইহাও সূর্য্যরূপে পরিণত হইয়া যাইবে। আধিভৌতিক পরিচ্ছিন্ন বিষয়ও অপরিচ্ছিন্ন আধিদৈবিকমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া তোমার অভয় লাভের কারণ হইবে।

যে পর্য্যন্ত তুমি ইহা করিতে না পারিতেছ, তাবৎ এই চক্ষু ও রূপাদি তোমার নিকট মৃত্যুর সহচর হইয়া তোমায় মৃত্যুদ্বারে লইয়া যাইবে। ইহাই দেখাইতেই আপাততঃ আর্ত্তভাগ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করিতেছি, প্রণিহিত মনে শ্রবণ কর।

অনন্তর জরৎকারুগোত্রীয় ঋতভাগপুত্র আর্ত্তভাগ, ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আর্ত্তভাগ বলিলেন—

আর্ত্ত] যাজ্ঞবল্ক্য ! গ্রহ কয়টি, কতটিই বা অতিগ্রহ ?

যাজ্ঞ] আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ।

আর্ত্ত] যাজ্ঞবল্ক্য ! যে আটটি গ্রহ ও অতিগ্রহের কথা বলিলে, কি সেই আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ ?

যাজ্ঞ] আটটি গ্রহের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস-সহকৃত ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্যতম গ্রহ। উহা অপান-উপহৃত গন্ধরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত। তৎপর অধ্যাত্মভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া যাহা সত্য, মিথ্যা, অশ্লীল, বীভৎস নানারূপ বচন ব্যাপারে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে; এই বাক্ অপর একটি গ্রহ, কেননা ইহা যেন জীবকে গ্রহণ অর্থাৎ বশীকরণ করিয়া রাখিয়াছে। বশীকরণমন্ত্রে মুগ্ধ

জীব যেমন অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসত্ত্বে বশীকর্ত্তার অনুসরণ করে, তদ্রূপ এই বাক্যের নিকটে জীব ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া রহিয়াছে, বিনা প্রয়োজনে কত কথাই যে জীব বলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং বাক্ গ্রহ বলা হয়। এই বাক্ আবার নাম অর্থাৎ বক্তব্যবিষয়রূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, এই জন্য নাম অতিগ্রহ। কারণ জীবের কর্ম্মানুসারে হিরণ্যগর্ভের আজ্ঞাক্রমে বাক্, জীবের বক্তব্য ও অবক্তব্য বিষয় বলিতে নিযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং সে রাজাদেশ প্রতিপালন না করিয়া বাকের নিস্তার নাই, এই জন্য বাক্ নির্দ্দিষ্টকালের জন্য বক্তব্য বিষয় রাশির নিকট অধীন হইয়া রহিয়াছে। বক্তব্য বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই বাক্, ক্রীতদাসীর মত তদ্বর্ণনায় নিযুক্ত হয় সুতরাং বক্তব্য বিষয় সমূহ অতিগ্রহ নামে অভিহিত। এইরূপ জিহ্বা ও একটী গ্রহ। উহা আবার রসরূপ অতিগ্রহে নিগৃহীত। চক্ষু একটী গ্রহ, উহা রূপ নামক অতিগ্রহে গৃহীত। শ্রোত্র একটী গ্রহ, উহা শব্দরূপ অতিগৃহে গৃহীত। তৎপর মন একটী গ্রহ, উহা কামরূপ অতিগ্রহে গৃহীত। হস্ত একটী গ্রহ, ইহা স্পর্শরূপ অতিগ্রহে গৃহীত হইয়া রহিয়াছে।

আচার্য্য। বৎস, তুমি একবার নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তে নিভৃত হৃদয়ে এই গ্রহ, অতিগ্রহের ব্যাপার আলোচনা করিয়া দেখিও,—সত্যই তোমার মনে হইবে, এই যে ভিতরে বাহিরে হাহা হুহু হীহী হৈ চৈ এই যে তুমুল জাগতিকধ্বনি দিবারাত্র উঠিতেছে, ইহা আর কিছুই নহে। এই গ্রহ অতিগ্রহ রূপে দংষ্ট্রা দ্বারা মৃত্যুর চর্ব্বণ শব্দ, রোমন্থ ধ্বনি। ব্যালপদস্থিত ভেক যেমন আপন মৃত্যুমুহূর্ত্তেও সম্মুখস্থিত আহারের দিকে পিপাসিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে, তদ্রূপ কালের করাল গ্রাসে অর্দ্ধ কবলিত হইয়াও জীব গ্রহ অতিগ্রহের জন্য লোলুপ হইয়া রহিয়াছে ; আপন কল্পনা দ্বারা এই বিকট দৃশ্যকে মধুর আবরণে ঢাকিয়া জীব ইহার ভোগে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে। অহো, আত্মবিস্মৃতি কি গুরুতর অপরাধ, নচেৎ এই অনন্ত শব্দ স্পর্শরূপ রসময় আদি জীব হিরণ্যগর্ভ অচিন্ত্য-রচনা-চতুরা এই ক্ষুদ্র ভাবনা দ্বারা আমি তুমি প্রভৃতি বেশে এক আপনাকে বহু করিয়া তুলিয়া অনন্ত জীবরূপে কি যন্ত্রণাই না দিবারাত্র ভোগ করিতেছেন। প্রণিহিত হইয়া আলোচনা করিলে, একদিকে যেমন অসহনীয় যাতনায় জীব অধীর হয়—অপর দিকে এই রঙ্গময়ীর ক্রিয়া কলাপ দ্রষ্টা হইয়া দেখিতে পারিলে প্রভূত আনন্দ লাভ হয় ; মনে হয় ধন্য এই অঘটনঘটনপটীয়সী বলিতে ইচ্ছা

হয়—ভাবনাময়ি! তুমি ধন্য! তোমার রচনায় আমরা পৃথিবীকে, জলকে, তেজকে বা বায়ুকে খণ্ড করিতে পারি না, আর তুমি আকাশ অপেক্ষাও পরম সূক্ষ্ম অখণ্ড আত্মতত্ত্বকে কত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছ। ধন্য তোমার পরিচ্ছেদ-পটুতা! তুমি অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন করিয়াছ! ধন্য তোমার পরিহাস-রসিকতা! তুমি সহজানন্দময় আপনার আশ্রয়ীভূত পুরুষকে কত দুঃখের বেশ পরাইয়াছ!

কিন্তু বৎস! যাহারা এই তত্ত্বাবরণকারিণী ভাবনার রঙ্গমঞ্চের বাহিরে যাইয়া দ্রষ্টাভাবে ইহাকে না দেখিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের তত্ত্ব-দৃষ্টি বিকসিত করিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—কত ভাবে এই জীবহত্যা কুতূহলিনী ভাবনা, জীবকে বিনাশ করিতেছে, তাহার পরিচয় করিয়া দিয়া জীবকে সাবধান করিতেছেন। বৎস! ভগবতী উপনিষদ্দেবীর অভিপ্রায় এই—জীব তুমি সতর্ক হও, হতভাগ্য! এখনও প্রবুদ্ধ হও, তুমি যে কল্পলতিকা বোধে বিষলতার ফল আহরণে ব্যাকুল হইয়াছ! যাহারা প্রত্যক্ষ মৃত্যুর অনুচর, তুমি যে তাহাদিগকেই পরম বন্ধু মনে করিতেছ! বৎস! এই দৃশ্যমান জগৎ অতিগ্রহে পরিপূর্ণ, আর তোমার এই দেহ গ্রহগণে পরিপূর্ণ। তুমি অবিলম্বে এই দেহ ও জগৎ সঙ্গ পরিত্যাগ কর। দেহ ও জগৎ হইতে গ্রহণীয় তোমার কিছুই নাই। মায়ার দ্বারে গ্রহণীয় আছে একমাত্র বৈরাগ্য। বিষয়রাশি-মূর্ত্তিতে যে মৃত্যুর লোলরসনা তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তুমি আমার অণুবীক্ষণী শক্তি লইয়া তাহা আলোচনা কর, বৈরাগ্য আসিবে। দানবিমুখ কৃপণের দ্বারে ইহাই যথেষ্ট ভিক্ষা মনে করিয়া তুমি দ্রুতপদে আমার সুখময় ক্রোড়ে ফিরিয়া এস। এই যে আমি তোমারই জন্য ভূর্ভুবঃস্বব্যাপিনী ভুবনভরা মূর্ত্তিতে কোল পাতিয়া বসিয়া আছি। তুমি যে গ্রহ-অতিগ্রহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছ; তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার হৃদয়দ্বার বিকসিত আমার সহিত মিলিত হও। আমি আমার বরণীয় ভর্গদ্বারা তোমাকে তোমার সুখময় স্বরূপে পৌঁছাইয়া দিব। আর যদি গ্রহাতিগ্রহ বন্ধন ছাড়িতে না পার, এখনও তোমার বৈরাগ্য না আসিয়া থাকে, তবে তৎসমুদয় তোমার হৃদয়যন্ত্র-বিকসিত আমার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে হোম করিতে থাক; হোমের ছলে পুনঃ পুনঃ আমার সঙ্গ করিতে থাক। আমার ভুবনমোহিনী সুষমায় দৃষ্টি পড়িলে, বাহ্যবৈরাগ্যসহকৃত মাতৃবৎসলতা স্বভাবতঃ তোমার হৃদয়ে উদিত হইবে; কিন্তু এজন্য আগে চিনিয়া লও বিষয় ও ইন্দ্রিয় যে মৃত্যু।

পক্ষে যেমন তাহার ইঙ্গিতজ্ঞ হওয়া উচিত, তদ্রূপ ঈশ্বর-নিশ্বসিতরূপা স্বাধীন শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে চাও—তাঁহার ভূর্ভুবঃ ব্যাপিনী মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে চেষ্টা কর, তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিবে।

এরূপ চেষ্টা করিতে যদি উদাসীন হও, তবে শ্রুত্যর্থঃ আমি পুনঃ পুনঃ বলিলেও তোমার হৃদয়ে উহা স্থানলাভ করিবে না; এই জন্য যথাবিধি সদাচার-পরায়ণ হইয়া গায়ত্র্যানিষ্ঠ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। স্মৃতি বলেন—ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তাইব জাতপক্ষাঃ (দঃ ভাঃ ১১।২) "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।" ষড়ঙ্গের সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, কিন্তু সদাচারবর্জ্জিত হইলে উহা তোমাকে পবিত্র করিবে না। যাহা হউক বৎস! আমি আপাততঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। সোম-যাগে সোমরস সংস্কার করিবার জন্য কতিপয় মন্ত্রঃ সমাম্নাত হইয়াছে; ঐ মন্ত্রসংস্কার বর্জ্জিত সোমদেব-ভোগ্য নহে। পাক-সংস্কার না হইলে শুধু শাক দ্বিদলাদি যেমন মানবের ভোগ্য নহে বা পাক-সংস্কার হইলে কক্কুরাদির স্পৃষ্ট অন্ন যেমন সদাচারী-ভোগ্য নহে, তদ্রূপ অসংস্কৃত সোমরস ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হেয়। বৎস! ইহাই অধিযজ্ঞ ভাবে ইহার অর্থ। আধিদৈবিক ভাবে ইহার অর্থ আরও সুন্দর! ইন্দ্র ও বায়ু অন্তরীক্ষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের হৃদয়স্থলে দেবতা। আধিদৈবিকভাবে অনুরঞ্জিত দৃষ্টি-তৈজস-ভাবাপন্ন যাজ্ঞিক আপন উপাস্য হিরণ্যগর্ভের হৃদয়-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

হে বিশ্বজীবনরূপী বায়ো! হে ইন্দুরমণকারী ইন্দ্র! তোমারা ভাব-বিশোধিত সোম অর্থাৎ সোমাধিষ্ঠিত আমার চিত্তের ভাব অবগত আছ; আমি যে তোমারই অভিধায়ক মন্ত্রের সাহায্যে তোমারই ভুবনমোহন বিরাট্ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তোমারই ভাবরসে এই অনাদিকাল অস্নাত চিত্তকে স্নান করাইয়া করাইয়া অসংস্কৃত ইহাকে সংস্কৃত করিয়াছি। হে বাজিনীবসু; হে হৃদয়-ভাবাধিষ্ঠিত ভাবগ্রাহী দেবদ্বয়! তোমরা তাহা বিশেষ অবগত আছ; সুতরাং এ হেন তোমরা শীঘ্র আমাদের উপলব্ধির বিষয়ে আগমন কর।

বৎস! এ অর্থ তোমার ভাল বোধ হইতেছে না?

ব্রহ্মচারী] ভগবন্! এই অর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা সরসতর। পূর্ব্ব মন্ত্রেও কি এই ভাবেই 'ইন্দবো বা মুশন্তিহি' বুঝিতে হইবে।

আচার্য্য] বৎস! হঁা, পূর্ব্বমন্ত্রেও 'ইন্দবঃ' অর্থে ইন্দু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত চিত্তবৃত্তিগণ। আর উশন্তি অর্থে কামনা করিতেছে, আমাদের এই চিত্ত তোমাদের শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছে। বৎস! এখানে তোমার মনে হইতে পারে—তাহা হইলে 'ইন্দবঃ' বহুবচন কেন? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর-চ্ছলে এক্ষেত্রেই তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলিয়া রাখি।

স্বপ্নকালে জীবের প্রাণবর্গ স্বভাবতঃ যেমন প্রত্যাহৃত হইয়া হৃদয়কেন্দ্রে মিলিত হয়, সুপ্ত জীবের চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ যেমন এক হৃদয়ে মিলিত হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে করিতে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়, তখনও চক্ষুরাদি প্রাণবর্গ হৃদয়কেন্দ্রে মিলিত হইয়া থাকে, তবে স্বপ্নে ও উপাসনায় পার্থক্য এই—স্বপ্ন কর্ম্ম পরিশ্রান্ত জীবের জন্য প্রকৃতির প্রদত্ত সর্ব্ব সাধারণ বিশ্রাম উপহার, আর উপাসনার অবস্থা পুরুষকারের ফলে শ্রীভগবদ্দত্ত অসাধারণ পুরস্কার। সুতরাং অধিকারী কর্ম্মদ্বারা প্রাণবর্গকে হৃদয়দেশে আনয়ন করিয়া অধিদৈবত দৃশ্যে চিত্তস্থাপন করিবার শুভ অবসর পাইয়াছে; শুধু এমন অধিকারীই আপন প্রাণবর্গ সহকৃত চিত্তময় হইয়া বলিবে, ইন্দবো বা মুশন্তিহি! অর্থাৎ আমার বাহ্য আভ্যন্তর চিত্ত এখন তোমায় চাহিতেছে। আমি যে বহুকষ্টে ইহাদিগকে ফিরাইয়াছি। মৃত্যু যখন বিবিধ বেশে সুসজ্জিত হইয়া আমার রূপ-লোলুপ নয়নাচঞ্চল আকর্ষণ করিত, নানা সুরসের লোভে রসনা যখন অবশ হইয়া পড়িত, নাসা যখন বাহ্য সৌরভ গ্রহণে উন্মত্ত হইত, শ্রবণ যখন শ্রবণ-মনোরম আমার উপদেশে বধির হইয়া বাহ্য শব্দানুসন্ধানে প্রণিহিত হইত, কামিনীর আপাতমাত্র কমনীয় অঙ্গস্পর্শের জন্য ত্বগিন্দ্রিয় যখন কত সূত্র অনুসন্ধান করিত,—হৃদয়রাজ! আমার কোন্ চেষ্টা তোমার অজ্ঞাত, আমি যে কত রূপরসাদি প্রলোভন দেখাইয়া ইহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছি; সুতরাং হে নয়নাভিরাম! হে মনোভিরাম! তুমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি লইয়া আমার এই চিরপিপাসিত চিত্তের সম্মুখে এস, আর আমার এই বাহ্যাভ্যন্তর চিত্ত তোমার রূপ রসাদি ভোগে আনন্দবিহ্বল হইয়া, বাহ্য বিষয়-স্মৃতি মুছিয়া তোমারই ভাবে আত্মহারা হউক,—তাই বলিতেছি ইন্দবো বা মুশন্তিহি।

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আয়াত মুপনিষ্কৃতম্। মক্ষি,ত্থাধিয়া নরা ॥ ৬

পদানুসরণী] হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ সুন্বতঃ সোমাভিষবং কুর্ব্বতো যজমানস্য

নিষ্কৃতং সংস্কর্ত্তারং সোমম্ উপায়াতম্ আগচ্ছতম্। নবা হে নরৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেন উপেতৌ যুবয়োরাগতয়োশ্চ সতো ধিয়া অমুনা কর্ম্মণা মক্ষু স্বরয়া সংস্কারঃ সমপৎস্যতে ইতিশেষঃ ইত্থা সত্যম্ ॥ ৬

পদ-নিষ্যন্দিনী] বায়রিন্দ্রশ্চ (হে দেব বায়ো! তুমি এবং ইন্দ্র উভয়ে) সুন্বতঃ (সোম-সংস্কারকারী যজ্‌মানের) নিষ্কৃতং (সংস্কারক সোমরসের নিকট) উপায়াতম্ (আগমন কর) নরৌ (হে নরবৎ পৌরুষগুণ সম্পন্ন তোমরা আসিলে) ধিয়া (ঐ সোমযাগ দ্বারা) মক্ষু (শীঘ্র সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইবে) ইত্থা (ইহা সত্য)।

বঙ্গানুবাদ] হে দেব বায়ো! তুমি এবং ইন্দ্র উভয়ে সোম-সংস্কারকারী, যজমানের সংস্কারের কারণ স্বরূপ সোমরসের নিকটে আগমন কর। হে নরবৎ পৌরুষসম্পন্ন দেবদ্বয়! তোমরা শুভাগমন করিলে এই সোমযাগে ত্বরায় সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইবে ॥৬

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবান্! সোমরসের সংস্কার হইলে ঐ সোমরসই আবার যজমানের সংস্কারের কারণ হইবে, বলা হইতেছে। এখানে আমার মনে হয়—,সোম-সংস্কার যাবৎ না সম্পন্ন তাবৎ যজমান অসংস্কৃত থাকেন, এরূপ অবস্থায় অসংস্কৃত যজমান কিরূপে সোমরসের সংস্কার করিবেন?

আচার্য্য] বৎস! অধিযজ্ঞ অর্থে ত ইহার উত্তর সহজ। কারণ যজ্ঞ-সংস্কাররূপ তৃতীয় জন্মের জনকস্বরূপ ঋত্বিগ্‌গণ ত সেখানে সংস্কৃতই রহিয়াছেন তাঁহারা সোমরসের সংস্কার দ্বারা যজমানের সোমসংস্থ সংস্কার নির্ব্বাহ করেন। আর আধিদৈবিক অর্থে সোমশব্দ সোম বা চন্দ্রাধিষ্ঠিত যাজ্ঞিকের হৃদয়। এই অর্থে হৃদয়গত হিরণ্যগর্ভবিষয়ক ভাবরাশিই সোমরসনামে অভিহিত। এই ভাবরাশির আলম্বন অজিরূপে হিরণ্যগর্ভ হইলেও তদীয় হৃদয়স্থান দেবতা বায়ু বা ইন্দ্রদ্বারাই তিনি জীবহৃদয়গত ভাবরাশি গ্রহণ করেন। এই জন্য ইন্দ্রবায়ুর

অধিষ্ঠান জন্য যজমান প্রার্থনা করিতেছেন। ঋত্বিগ্‌গণের প্রার্থনার মর্ম্ম এই—যজমানের আত্মা ত স্বতঃ শুদ্ধবোধস্বরূপ, কিন্তু অসংস্কৃত চিত্ত-উপাধিতে উপহিত হইয়া এই মহাপুরুষ আত্মা, দুঃসঙ্গ-কবলিত সুজনের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন। চোরের সঙ্গে বাসের ফলে সুজন চোর বলিয়া গৃহীত হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যেমন দুর্জ্জনের সংস্কার আবশ্যক হয়, তদ্রূপ এই চিত্তের সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে; তজ্জন্যই ইন্দ্র ও বায়ুরূপ হিরণ্যগর্ভ হৃদয়দেবতার নিকট তাহাদের শুভাগমন প্রার্থনা করা হইতেছে।

উঠে, আর তিনি যখন তাহাতে অভিমান করেন—তখনই না তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়া "অহং বহুস্যাম" রূপ সঙ্কল্পে বহু হওয়ার মত হয়েন? ইহাতে কি তাঁহার স্বস্বরূপের—আপনি আপনি ভাবের ধ্বংস হয়?

রাম—অতি সুন্দর। আমি বুঝিয়াছি। আপনি পরমাত্মার কথা যাহা বলিতেছিলেন তাহাই বলুন।

বশিষ্ঠ—অধিক বলিবার প্রয়োজন কি—জীবের মনোনিবৃত্তি বা চিত্তত্যাগে যে স্বভাবতঃ আপনি আপনি রূপ পরম শান্ত ভাবে স্থিতি তাহাই পরমাত্মার রূপ! পরমাত্মাকে যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে মনকে একবারে সঙ্কল্পশূন্য কর। একবারে সকল সঙ্কল্পশূন্য হইতে যদি না পার, তবে প্রথমে অশুভ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া একটি শুভ সঙ্কল্পে মন একাগ্র কর। ইহাই ভক্তিমার্গ। পরে সেই একটি সঙ্কল্পে একাগ্র ভাব স্থায়ী ভাবে রাখিতে রাখিতে যখন তাহাও ছাড়িয়া যাইবে, যাইয়া নিরোধ ভাব আসিবে, তখনই মন সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য হইয়া পরমাত্মা ভাবে স্থিতি লাভ করিবে।

জাগ্রৎবর্জ্জিত ও স্বপ্নবর্জ্জিত অবস্থায় যে একে স্থিতি তাহাই পরমাত্মার রূপ। মহাপ্রলয়ে স্থাবর জঙ্গমাদি লয় প্রাপ্তে যে আপনি আপনি ভাবে স্থিতি তাহাই পরমাত্মার রূপ। বিশ্বসংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া যে অদ্বয় ভাবে স্থিতি তাহাই পরমাত্মার রূপ।

১১ সর্গঃ।

পরমার্থ বর্ণন।

রাম—মহাপ্রলয়ে অনন্তকোটি জীব পূর্ণ এই জগৎ কোথায় যাইবে? কিসে থাকিবে?

বশিষ্ঠ—বন্ধ্যাপুত্র কোথা হইতে আইসে? কোথায় বা যায়? আকারই বা কিরূপ? "ক যাতি কুত আয়াতি বদ বা ব্যোম কাননম্" আকাশকানন কোথায় যায়, কোথা হইতেই বা আসে বল।

রাম—বন্ধ্যাপুত্র, আকাশ-কানন ইহারা ত কখনই নাই, কদাপি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার আবার দৃশ্যতা কি? নাস্তিতাই বা কি?

বশিষ্ঠ—বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোমবন যেমন নাই, জগদাদি অখিল দৃশ্যও তেমনি কদাচ নাই। যাহা উৎপন্ন হয় নাই, যাহা ধ্বংসও হয় নাই, যাহা আদৌ বর্ত্তমান নাই তাহা আবার উৎপত্তি কিরূপ? তাহার নাশ হয় এটাই কি কথা?

ন চোৎপন্নং ন চ ধ্বংসি যৎ কিলাদৌ ন বিদ্যতে।
উৎপত্তিঃ কীদৃশীতস্য নাশশব্দস্য কা কথা ॥ ৫ ॥

রাম—প্রত্যক্ষসিদ্ধ, উৎপত্তিমৎ এই জগতের সঙ্গে বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশ-কাননের উপমা কিরূপে দেওয়া যায়? আবার বন্ধ্যাপুত্র নভোবৃক্ষ কল্পনা—ইহাত আছে। সেই কল্পনাটা যখন জন্মায় ও নাশ পায় সেইরূপ এই জগৎটা না হয় কেন?

বশিষ্ঠ—গগনের সহিত কাহার তুলনা দিব? সাগরের সহিত কাহার সাদৃশ্য? কাজেই বলিতে হয় "গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" ইহাদের উপমার বস্তু কোথায়? সুবর্ণবলয় সুবর্ণব্যতীত আর কি? সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে পরব্রহ্মে পৃথক্ জগৎ নাই এবং অনুভূতও হয় না। স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হয় অথচ তাহা নাই। আবার স্বাশ্রিত অবিদ্যারূপ স্বপ্নে—পরমাত্মাতে যথার্থ ইহা না থাকিলেও থাকার মত দেখায়।

আকাশ ও শূন্যতা অভেদবৎ। আকাশ হইতে অভেদবৎ শূন্যতা ভিন্ন যেমন তাহাকে আর কিছুই বলা যায় না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে পরব্রহ্মে জগৎ নাই ও অনুভূতও হয় না। পরম পদের সহিত জগতের পার্থক্য নাই যেমন রজ্জুতে সর্পের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই অথবা হিমের সহিত শৈত্যের পার্থক্য নাই সেইরূপ।

মরুনদীতে যেমন জলের অভাব, দ্বিতীয়ার চন্দ্রে যেমন চন্দ্রত্বের অভাব সুস্পষ্ট—সেইরূপ ব্রহ্মেও জগতের অভাব।

আদাবেব হি যন্নাস্তি কারণাসম্ভবাৎ স্বয়ম্।
বর্ত্তমানেপি তন্নাস্তি নাশঃ স্যাৎ তত্র কীদৃশঃ ॥ ১৩ ॥

কোন কারণ নাই বলিয়া যাহা আদৌ নাই বর্ত্তমানেও তাহা নাই। বল তাহার আবার নাশ কিরূপ?

জড়ের কারণ জড়ই হয়। ব্রহ্ম জড় নহেন। আতপ যেমন ছায়ার কারণ নহে, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের কারণ নহে। চেতন ব্রহ্মে অচেতন জগতের সত্তা কিরূপে থাকিবে?

যেখানে কারণ নাই সেখানে কার্য্য কোথায়? তথাপি জগৎকার্য্য যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রান্তি মাত্র। যদি বল অবিদ্যাই জগতের কারণ, তবে বলিব অবিদ্যা কখন সত্যজগৎ সৃজন করে না। অবিদ্যা সেই ব্রহ্মকে জগদাকারে অবভাসিত করে মাত্র—কিছুমাত্র বিকৃত করিতে পারে না।

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ সদৈবাত্মনি সংশ্রিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগৎ কিঞ্চিৎ কদাচন॥ ১৮॥

যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা সর্ব্বদা আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই ভাসে। জগৎ কখন অস্ত প্রাপ্তও হয় না, উদিতও হয় না।

সলিল যেমন দ্রবরূপে প্রকাশ পায়, বায়ু যেমন স্পন্দরূপে প্রকাশ পায়, প্রকাশ যেমন আভার আকারে পরিচিত হয়—সেইরূপ ব্রহ্মও জগদাকারে পরিচিত মাত্র।

যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার অন্তরের বিজ্ঞান, নগরাদি আকারে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানঘন পরমাত্মাও জগদাকারে অবভাসিত হয়েন মাত্র।

রাম—স্বপ্নে মানুষের অন্তরের বিজ্ঞান, নগরাদি আকারে বিবর্ত্তিত হয় বলিতেছেন—কিন্তু স্বপ্নত ক্ষণস্থায়ী। আর জগৎস্বপ্নত কল্পান্তস্থায়ী। জগৎ-স্বপ্ন সম্বন্ধে এই কল্পান্তস্থায়ী দৃঢ় প্রত্যয় কেন? ইহাতে মুক্তি কিরূপে হইবে? দৃশ্য থাকিলেই দ্রষ্টা থাকিবে, দ্রষ্টা থাকিতে দৃশ্যের অপলাপ অসম্ভব। একটা থাকিলেই উভয়ের দ্বারা বদ্ধ হইতেই হইবে। দৃশ্যজ্ঞান না যাওয়া পর্য্যন্ত আত্মার জগদ্দর্শন কিছুতেই যাইবে না। জগদ্দর্শনই বন্ধের কারণ। দৃশ্য আদৌ না থাকিলে কথা স্বতন্ত্র। তবে কিরূপ বুদ্ধিতে দৃশ্যজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে?

বশিষ্ঠ—জগৎ অসত্য হইলেও যে প্রকারে সত্যমত মনে হইতেছে আমি দীর্ঘ উপাখ্যান দিয়া তোমায় তাহা বুঝাইতেছি; এ না হওয়া পর্য্যন্ত হ্রদ হইতে যেমন ধূলিকণা উড়ে না সেইরূপ তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্যজ্ঞান যাইবে না।

এই জগৎ নিতান্ত মিথ্যা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া ব্যবহারপরায়ণ হও। তবেই প্রয়োজনটি গ্রহণ, অপ্রয়োজনটি ত্যাগ—সত্যটিকে সত্য বলিয়া ব্যবহার এ সমস্ত ভ্রম তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

জগদত্র যথোৎপন্নং তত্তে বক্ষ্যামি রাঘব।

আত্মাতে জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

অসঙ্গ পরমাত্মাই আছেন। তিনিই বহিরিন্দ্রিয়রূপ মায়া দ্বারা রূপ, রসের আস্পদস্বরূপ বহির্জ্জগৎ এবং অন্তরিন্দ্রিয়রূপ মায়াদ্বারা মননের আস্পদস্বরূপ অন্তর্জ্জগৎ হইয়া উদিত ও লয় হওয়ার মত হইতেছেন।

১২ সর্গঃ।

বিশ্ব কি – কোথা হইতে আসিল।

অপূর্ব্ব গ্রন্থ এই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। উৎপত্তি প্রকরণের দ্বাদশ সর্গটি অত্যন্ত মনোহর; কিন্তু ইহা অতিশয় কঠিন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে আমরা ইহা বুঝিতে প্রয়াস পাইতেছি। তাঁহার কৃপা ভিন্ন, এরূপ দুরূহ বিষয় বুঝিতে যাওয়াও অসম্ভব।

বশিষ্ঠ—পরম শান্ত, সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত, সচ্চিদানন্দ, অসঙ্গ পরমব্রহ্মই আছেন। স্বভাবতঃ তাঁহা হইতে যেন স্পন্দন উঠে। মণি হইতে যেমন ঝলক উঠে সেইরূপ। ইহাকে স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্প শক্তি বলা হয়। ইহারই অন্য নাম মায়া। পরমব্রহ্মে যেন মায়ার উদয় হয় - ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক। ইহার পরে বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি।

তোমার আমার মধ্যে কত সঙ্কল্প উঠে। লোকে অসত্য সঙ্কল্প বলিয়া তাহাদের সঙ্কল্পগুলি স্থূল অবয়ব ধারণ করিয়া সৃষ্টবস্তুরূপে দাঁড়ায় না; কিন্তু সত্যসঙ্কল্প সেই আত্মপুরুষ হইতে যে সমস্ত সঙ্কল্প উঠে, তাহাই আশ্চর্য্য কৌশলে অনন্তকোটি জগৎ হইয়া দাঁড়ায়। বহু সঙ্কল্প তুলিয়াও সাধারণ মানুষ যাহা তাহারা যেমন তাহাই থাকে, অনন্তকোটিজগৎসঙ্কল্প তুলিয়াও সেই আত্মপুরুষ যাহা তাহাই থাকেন। তোমার আমার সঙ্কল্প যেমন অসত্য সেইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীবজন্তুপরিপূরিত বিচিত্র সৃষ্টি সেই পরমব্রহ্মের সঙ্কল্প মাত্র—এজন্য সৃষ্টি মিথ্যা। নরনারী জীবজন্তু যাহা কিছু দেখা যায় তাহা তাঁহারই সঙ্কল্পমূর্ত্তি—জীবন্ত সঙ্কল্প চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় মাত্র। আবার এই সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে অন্য সঙ্কল্প উঠে—উঠিয়া সৃষ্টিকে বিচিত্র করে। সেইজন্য অসত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই সত্য। এই সমস্ত অসত্য সঙ্কল্প তাঁহার সত্তাতে সত্তা লাভ করিয়া সত্যমত মনে হয়; যেমন মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণকে জল বলিয়া বোধ হয়, যেমন কাচকে জল বলিয়া বোধ হয়, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়—সেইরূপ। অন্যান্য শাস্ত্র তাই বলেন—তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা। ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইয়াও অমৃষা মত বোধ হয়—তেজ জল মৃত্তিকার বিনিময় যেরূপ—সেইরূপ।

আমার বোধের অগম্য করে রেখেচেন; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরল তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভরা। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে তোমার গীতাই গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। যত দিন তুমি আমার হাতে "ধ্রুবনীতির্মতির্ম্মম" না দি'চ্চ তত দিন তোমায় দয়াল বল্‌তে আমার জিহ্বা আপনা আপনি সংকোচ হ'চ্চে।

রাম! তোমার দেহটা চির দিনের নয়, এই ভেবে গীতাকে শীঘ্র আমার হাতে দাও—এই আমার ব'ল্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম। নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি সুন্দর, অনুবাদের ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

একটু একটু মনে পড়ে ৺পিতৃদেব বহু চেষ্টা করিয়া একখানি হাতের লেখা গীতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে আজ পঞ্চান্ন বৎসরের কথা। ইদানীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষা নাই যাহাতে গীতা অনুদিত না হইয়াছে। সভ্যজগতের বহু স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সুগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল; এবং দুইখানি পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু "উৎসব" অফিস হইতে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতা সংস্করণ বাহির হইতেছে তাহার নিকট সকলেই হেটমুণ্ড হইতে হইবে। এই বিরাট্ গ্রন্থে যে প্রকার সুপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে তাহাতে পাঠকের ভরপূর হইবার কথা। ধন্য মজুমদার মহাশয়! হৃদয়ের ভক্তির প্রাখর্য্য না থাকিলে লেখনী হইতে এবম্বিধ অমৃতময় কথা লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যবান্ লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখনও সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পাপের ধূলা মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব।

শোভাবাজারের ৺মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম, এ, মহাশয় মান্যবরেষু।

প্রণামনিবেদনমিদং

আপনার প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গানুবাদ ও ভাষা সরল ও সুমিষ্ট। গীতার তত্ত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্যবোধের সহিত

সহজ ভাষায় লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই গীতা পাঠে দুর্ব্বোধ্য গীতার গূঢ়মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া দেখিতে বিশেষ অনুরোধ করি, যাঁহাদের অদৃষ্ট শুভ তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কার্য্যে আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে আপনাকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। জগতে আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই ধন্য। গ্রন্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের সকলেরই পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এরূপভাবে বঙ্গভাষায় গীতা আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। আপনার বিশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল সার্থক হইল। ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৮ সাল।

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।]　　আষাঢ় ১৩২১ সাল।　　[৩য় সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১।৷৹ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১০নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে"

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥৹ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য।৹ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম।৹ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥৹, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২॥৹, সিকি পৃষ্ঠা ১॥৹, সিকির অর্দ্ধেক ৸৴৹ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

কালস্রোত।

যুগ যুগ ধরি বহে এক মধু গান।
গান নহে—পশে কর্ণে শুধু মৃদু তান॥
শব্দ নহে—নীরবতা মুখের ঝঙ্কার।
মনভৃঙ্গ গুঞ্জরিছে শুনি সেই স্বর॥

নিশ্বসিছে যুগ যুগ ধরি প্রভঞ্জন।
লোকালোক আলোকিয়া প্রসন্ন তপন॥
সলিল করিছে সদা অমৃত ক্ষরণ।
শুনি মুগ্ধ সেই স্তব্ধ মধুর নিস্বন॥

জীব পারাবার ভাসে অবিরাম স্রোতে।
মোহ-সুধা পান করি অবিরাম মাতে॥
মোহ মায়াঞ্জন ত্যজ স্বপন-সংসার।
উঠো জাগো শুন শুধ প্রণবঝঙ্কার॥

ভয় ও প্রেম।

(১)

ঘোর অমানিশা,
　　ঘনায়ে আসিছে নেমে।
(ক্ষুদ্র) পরাণ বিহগ,
　　সদা ভয় পায় মনে ॥

(২)

ব্যথিত মরম,
　　কার তরে ভয় হেন ?
কহে মৃদুস্বরে,
　　আর কেহ নয়। প্রেম !

জীবের দুঃখ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

সকল মানুষের—তাই বা কেন—সকল প্রাণীর সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, নিজের দুঃখ যেন না আসে। কেহই শারীরিক বা মানসিক দুঃখ ইচ্ছা করিয়া ভোগ করিতে চায় না। তবে যে তপস্যার দুঃখ মানুষ ভোগ করে ? তা কেবল অধিক সুখলাভের জন্য। সকল প্রাণীই চায় সুখ হউক, আর দুঃখ না হউক। মানুষ যেমন ইচ্ছা করিয়া নিজের শারীরিক দুঃখ বা নিজের মানসিক দুঃখ আনিতে চায় না, সেইরূপ যদি অন্য কোন প্রাণীকে দুঃখ দিতে প্রস্তুত না হয়, তবে এই দুঃখপূর্ণ সংসারই নিত্য সুখের স্থান হইয়া যায়। তখন এ জগতে আর যেন কোন বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না, কোন সম্প্রদায়ও থাকে না। মানুষের ব্রত যদি এই হয় যে, নিজের শারীরিক বা মানসিক দুঃখ যেমন ইচ্ছা করি না, তেমনি কোন মানুষের শারীরিক বা মানসিক দুঃখও ইচ্ছা করি না—তবে যথাসাধ্য উক্ত ব্রতধারী মানুষকে সকলে মহাপুরুষ বলে।

মহাপুরুষ যিনি তিনি দেবতা। সকলের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে তিনিই যথার্থ বড় লোক।

প্রেমটিই গ্রহণের বস্তু আর কামটি ত্যাগের বস্তু। যাঁহার প্রেমের উদয় হয়, তিনি কাহাকেও কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। প্রেমিক কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। কাহাকে ঘৃণা করিবেন? যিনি নিজের হৃদয়ে ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য সাধনা করেন, তিনি সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেন, সকল প্রাণীর মধ্যে আপন হৃদয়ের রাজাকে দেখিয়া। সত্য সত্য দেখিতে না পাইলেও তিনি বিশ্বাসে দেখেন। ইহাই তাঁহার সুখ। এ অবস্থা যাঁহার হয়, তাঁহার নিকটে শত্রু ও মিত্রের ভেদ থাকে না। সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন ভাবনা করিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। ইহা সত্য হইলেও তিনি পাপীকে ঘৃণা করেন না বটে, কিন্তু পাপকে ঘৃণা করেন, কারণ তাঁহার প্রেমময় দেবতা পাপকে ভালবাসেন না বলিয়া।

আমরা প্রেম বলিয়া কোন কিছুই বুঝি জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। না পারিলেও ইচ্ছা করি সকলকে ভালবাসি। ইচ্ছা করি যদি কাহাকেও কিছু বলিতে চাই তবে যেন তাহাকে ভালবাসিয়াই বলি। কারণ ভাল না বাসিয়া কাহাকেও কিছু উপদেশ দিতে গেলে তাহার কোন ফল নাই ইহা আমরা বুঝিতে পারি। নিজের দোষ সংশোধন জন্য যেমন আপনাকে ভালবাসিয়া উপদেশ করিতে হয়, আপনার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া লইয়া, আপনার শত দোষ ক্ষমা করিয়া তবে আপনাকে আপনি উপদেশ করি, অন্য সম্বন্ধেও তাহাই করা উচিত, তাহা আমরা বুঝি। সাধনা ঠিক মত হয় না বলিয়া নিজের সম্বন্ধে যাহা করি অন্যের সম্বন্ধে তাহা পারি না। এ দোষের জন্য আমরা সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি অথবা যিনি সকলের হৃদয়ে রাজা হইয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। কোন সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করা আমাদের ইচ্ছা নহে। কেবল যাহা যুক্তি অনুভব ও বেদাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ—তজ্জন্য যাহা সদাচারবিরুদ্ধ, যাহা পবিত্রতার বিরুদ্ধ, যাহা সতীত্বের বিরুদ্ধ, তাহাই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া আমরা মনে করি। অজ্ঞানীকে ঘৃণা করাও পাপ, কিন্তু অজ্ঞানকে দূর করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মানুষ যখন নিজের অজ্ঞান দূর করিবার জন্য যত্ন করে—আর সেই প্রয়াসটি সমাজে যখন জানায় তখনই সমাজের প্রভূত কল্যাণ হয়।

বেদ বলেন—"মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব।" নিজের পিতামাতা আচার্য্যকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া যদি বোধ করিতে না পারি, তবে অন্যের পিতামাতা বা আচার্য্যকে শ্রদ্ধা হইতে পারে কিরূপে? নিজের মাকে যদি জগজ্জননী বলিয়া কখনও ভাবনা না করিয়া থাকি তবে ভারত-মাতার উপর শ্রদ্ধা কি আসে? তাই বলিতেছিলাম, ভালবাসিয়া আমরা সকলে সকলের দোষ সংশোধন করিতে যদি চেষ্টা করি, তবেই আমাদের যথার্থ উপকার হওয়া সম্ভব।

যথাসাধ্য মুখবন্ধ করিয়া আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। নবীন জগতের ঈশ্বরধারণা কত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতে বিবাদতরঙ্গ উঠাইয়াছে, আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কথঞ্চিৎ বলিতেছি এই জন্য যে, নবীন জগতের ঈশ্বর ধারণার সমস্ত মূর্ত্তি দেখাইতে কাহারও যে সাধ্য আছে, তাহা আমাদের বোধ নাই। কারণ দেখিতে পাই এই কালে জনে জনের ঈশ্বর ধারণা স্বতন্ত্র।

যখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধর্ম্ম অংশ দেখাইবার জন্য প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মের অপব্যবহার—তখনকার লোকে যাহা করিতেছিল—তাহাও দেখাইতে হয়। তথাপি সেই যুগে গুরুর পরাজয়ে সকল শিষ্যই পরাজয় স্বীকার করিত—এক মণ্ডনমিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার যাট হাজার শিষ্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আর এখন? আমাদের এইকালে? গুরুত এখন নামে মাত্র। গুরুর পরাজয়ে এখন শিষ্য কি পরাস্ত হয়? এখনকার শিষ্য কি বলে না "গুরু পরাস্ত হইলেন ভালই, কিন্তু আমাকে পরাজয় করিতে না পারিলে গুরুর পরাজয়ে আমি পরাজয় স্বীকার করিব কেন?"

যখন মানুষের এই অবস্থা হয়, যখন মানুষ আপন আপন অহঙ্কারের মন্ত্র চেলা হইয়া দাঁড়ায়, তখন কোন্ সাধুর এত গরজ দাঁড়ায় যে তিনি প্রতি কুতার্কিকের সহিত তর্ক করিয়া শাস্ত্রসমর্থনে প্রস্তুত হন? তাই বলিতেছিলাম, যখন নবীন জগতের প্রায় লোকের ঈশ্বর ধারণা স্বতন্ত্র; তখন একালে প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার সাক্ষাৎ ভগবান, অথবা বশিষ্ঠ ব্যাসাদি সমগ্র বিভূতিশালী মহাপুরুষ ভিন্ন নবীন জগতের আটপৌরে পোষাকী-চরিত্রের মানুষের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

ঈশ্বর ধারণা যখন বহু প্রকারের তখন তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ও যে বহু প্রকারের হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। নবীন জগতের এই সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রাচীন ভারতের ভিতরে বাহিরে উদ্ধত নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন ভারত কি এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজের ঈশ্বর-ধারণার পরিবর্ত্তন করিবেন? না তাঁহার ঈশ্বর ধারণা নবীন জগৎকে একবার খুলিয়া দেখাইবেন?

প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরধারণা সর্ব্বশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। আমরা তাহাই এখানে উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। তবে অনেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, নবীন জগতের এই সমস্ত সম্প্রদায়ের গতি কি হইবে?

একদিন এক জন নবীন প্রতিভাশালী দিগ্‌বিজয়ী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারককে বেদের বিকৃত অর্থকারী অভ্যুদয়শীল কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ স্থিতির কথা, ঐ অভ্যুদয়শীল নবীন সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নবীন প্রতিভাশালী সংস্কারক কতকটা নিম্নলিখিত ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন।

হস্তী বড় বড় গাছের ডাল চিবাইয়া চিবাইয়া তাহা গলাধঃকরণ করে। একদ্বার দিয়া উহাকে উদরে ফেলে এবং খাদ্যবস্তুর সারটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া অন্যদ্বার দিয়া ছিবড়াগুলি নিঃসারণ করিয়া দেয়। ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মহস্তী এই আপাততঃ অভ্যুদয়শীল ধর্ম্মের সারটুকু আত্মসাৎ করিয়া নিম্নদ্বার দিয়া এই ধর্ম্মটাকে বাহির করিয়া দিবেন। কথাটা সত্য। শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণসম্মত ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই সারটুকু গ্রহণ করিয়া ইহাকে নিম্নদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রাচীন ভারতের এক অতি ভয়ানক বিদ্যার কথা আমরা অবগত আছি। এই বিদ্যার নাম শোষণ-বিদ্যা। নবীন জগৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু আনিতেছে, প্রাচীন ভারত তাহাকেই গিলিয়া খাইয়া দেখাইতেছেন, এ কথা বেদে আছে। পরে বেদোক্ত সম্পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখাইয়া দিয়া নূতন ধর্ম্মটিকে নিম্নদ্বার দিয়া নিঃসারিত করিয়া দিতেছেন। পূর্ব্বেও ইহা হইয়াছিল; এখনও ইহা হইতেছে, ভবিষ্যতেও ইহা হইবে। ইহা হওয়াই উচিত। যিনি সম্পূর্ণ ধর্ম্মের মুখ দেখিয়াছেন তাহার নিকট কোন্ নবীন ধর্ম্ম প্রাচীনভারতের সম্পূর্ণ ধর্ম্মের কোন্ অঙ্গ তাহা নির্দ্ধারণ করা আর দুঃসাধ্য কি? তবে প্রাচীন ভারত ইহাও বলেন যে,

জগতে যাহা যাহা উঠিতেছে তাহারও কোন না কোন প্রয়োজন আছেই। দুর্ব্বল বিকৃত জীবের পক্ষে ইহা কোন না কোন কার্য্য করিবেই। করিয়া যখন দুর্ব্বল বিকৃত জীবের বিকার কিছু কাটিতে থাকিবে, তখন নবীন ধর্ম্মের আবশ্যকতা আর থাকিবে না। নবীন ধর্ম্ম তখন অধঃসারিত হয়। আর নবীন সম্প্রদায়ের ভাবুক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তখন প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মই গ্রহণ করেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই ভাবে চার্ব্বাক্‌ধর্ম্মও অধঃসারিত হইয়াছে। চারু বাক্ যাঁহারা বলেন তাঁহারাই চার্ব্বাক। চার্ব্বাক্-সম্প্রদায় এখনও সমাজ মধ্যে কখন কখন উঠিতেছেন আবার নিবিয়াও যাইতেছেন। অন্ধকাররাত্রে জোনাকির মত, খাও দাও আমোদ কর, কোন কঠিন কিছু করিবার আবশ্যক কি, সূর্য্যের কিরণ লাভ করিতে যেমন সাধনার আবশ্যক হয় না, বায়ু পাইতে যেমন মানুষকে কোন ক্লেশ করিতে হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মের জন্যও কোন সাধনার আবশ্যক নাই,—যোগটা সেলফ্ হিপনটিসম মাত্র, প্রাণায়ামটা বিকৃতি মাত্র, বৈরাগ্যটি আত্মপ্রতারণা মাত্র, ভক্তিটি মস্তিষ্কের বিকার মাত্র, জ্ঞান জ্ঞান—ধ্যান ধ্যান মাত্র,—অন্ধকার রাত্রিতে জোনাকির আলোকের মত এই সমস্ত চারুবাক্—মুখরুচিকর কথা—এক একবার ক্ষণিকের জন্য দুর্ব্বল জীবের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে সত্য। যুগে যুগে ইহা হইবেও। কিন্তু মনুষ্য যখন বুঝিবে কৈ তোমার চারুবাক্ অবলম্বন করিয়া আমাদের মন ত শান্ত হইল না, আমাদের মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ত গেল না; কাজেই জীবের দুঃখের নিবৃত্তিও হইল না তখন তাহারা আবার ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মের সমস্ত আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করিতে ছুটিবে।

উপস্থিত সময়টিকে সাধুরা কলির অন্তর্গত সত্যযুগ বলেন। এই কলির অন্তর্গত সত্য যুগটিতে সুকৃতশালী মনুষ্য যেন কিছু সাধনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবে। হইতেছেও তাই। মনুষ্য আর মুখের উপদেশে সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। প্রবন্ধের চটকে ভুলিতে চায় না, কবিতার সরস বাক্যে স্থায়ী কিছুই না পাইয়া শান্তি পায় না। মানুষ যেন কিছু করিতে চায়। যেখানে সাধনার কথা পায় মানুষ সেইখানেই ছুটিয়া যাইতেছে। কলি-সত্যও চিরদিন থাকিবে না। এই সময়ে যিনি শাস্ত্র মত যতটুকু সাধনা করিয়া রাখিতে পারিবেন তিনিই ততটুকু অগ্রসর হইয়া থাকিবেন। এই শুভ মুহূর্ত্ত ত্যাগ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রমত সাধনা লইয়া নাড়াচাড়া করা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই

এখনকার কর্ত্তব্য। আমরা সেই জন্য প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরধারণার কথা আলোচনা করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা বলিয়াছি। ঈশ্বরই সাধ্য বস্তু। সাধ্য বস্তু নির্ণীত না হইলে সাধনা কি হইবে? ঈশ্বরকে ভাল না বাসিলে নিষ্কাম কর্ম্ম কিরূপে হইবে? ঈশ্বরকে না ভাল বাসিলে সতীত্বই বা কি আর পবিত্রতাই বা কার জন্য হইবে? শুদ্ধ সত্বের আবশ্যকতাই বা তখন কোথায়? একাগ্র ও নিরোধ ভাবই বা কার জন্য?

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব এই তিনই স্বরূপে এক। প্রভেদ যাহা তাহা উপাধি গত। উপাধিটি তুলিয়া ফেলিলে আর কিছুই থাকে না, থাকেন একমাত্র পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। আমরা 'জীবের দুঃখ' প্রবন্ধে ঈশ্বর বলিয়া যাঁহাকে বলিতেছি, তাঁহার স্বরূপটি মাত্রই আমাদের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে ব্রহ্ম ঈশ্বর আত্মা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আমরা সেই পরম বস্তুকেই লক্ষ্য করিতেছি।

পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ঈশ্বর ধারণার কথা বলিতে গিয়া আমরা বলিয়াছি, সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, সৃষ্টির সঙ্গে যিনি আছেন, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যিনি মায়া-মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রতি জীবে যিনি আত্মারূপে আছেন, তিনি একই বস্তু। লোকে বিশ্বাসে ইহাঁকেই ভজনা করে, বহিরঙ্গকর্ম্মে ইহাঁরই পূজা করে, অন্তরঙ্গ কর্ম্মে ইহাঁকেই উপাসনা করে, আর ইহাঁকেই ধ্যান করিতে করিতে ইহাঁতেই স্থিতি লাভ করে।

বুঝিলাম ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়ামানুষ অবতার, আত্মা এই চারিটির কোনটি বাদ দিলে প্রাচীন ভারতের ঈশ্বর ধারণা হইল না। আরও বুঝিলাম সমকালে এই চারিটির ধারণা ভিন্ন অবিজ্ঞাতস্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ স্বাত্মারামের ধারণা পূর্ণ ভাবে করা হইল না। কিন্তু এখানেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, আমরা যতদূর জানিয়াছি, নবীন জগতের কোন ব্যক্তিকে ত এরূপ ভাবে ঈশ্বর ধারনা করিতে দেখি নাই। বরং নবীন জগতের কোন কোন প্রতিভাশালী সমাজ-সংস্কারক ইহার বিপরীত মীমাংসা করিয়া নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। নবীন ও প্রাচীনের এই বিবাদ মিটিবে কিরূপে?

এই বিবাদ মিটাইতে হইলে প্রাচীনশাস্ত্র, অনুভব ও যুক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অবতার, ও আত্মা যে একই, তৎসম্বন্ধে প্রথমে

সংক্ষেপে আলোচনা করা হউক। পরে নবীন জগতের প্রধান প্রধান আপত্তি খণ্ডন করা যাইবে।

আমরা প্রথমে সাধারণ যুক্তি অবলম্বনে প্রাচীন শাস্ত্রপথ দেখিতে সচেষ্ট হইব, ইহাতে অনুভবের কথাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হইবে।

"আমি যে তোমার মতন—আমার আবার খণ্ড ভাব হইয়াছিল কিরূপে" মনে করা হউক ঘটের মধ্যের আকাশ, ঘটের সীমার ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ মহাকাশকে দেখিয়া উপরোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিল। ঘটের ভিতরের আকাশটুকু যখন দেখিল যে, আকাশের ত খণ্ড হয় না—ঘট পট মঠ শকট, আকাশ সকলের অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও ঘটাকাশ পটাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াও, যে অখণ্ড আকাশ সেই পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন পরমশান্ত আকাশই থাকেন। তাঁহার খণ্ড কিছুতেই হয় না—ঘটাকাশ যখন দেখেন যে, তিনি বাস্তবিকই মহাকাশই, তখন ঘটের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা ঘট দেখিয়াও দেখেন না আপন পূর্ণস্বরূপ দেখিয়া ঘটাদি উপাধি সেই পূর্ণে লয় করিয়া আপনি পূর্ণ ভাবে থাকিয়াও তিনি সদা মুক্ত। মানুষ বদ্ধাবস্থা হইতে যখন মুক্ত হয়েন তখন তিনি এইরূপ। মানুষ বলিলে আমরা প্রকৃত পক্ষে আপন দেহব্যাপী চৈতন্য খণ্ডকেই বুঝি। যে চৈতন্যখণ্ড দেহে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া দেহটাকে চেতন করে, যে চৈতন্যখণ্ড দেহে থাকিয়া চক্ষু কর্ণাদিকে রূপ অনুভব করায়, শব্দ অনুভব করায়, যে চৈতন্যখণ্ড জাগ্রৎকালে মনকে ব্যাপিয়া থাকিয়া সর্ব্বদাই মনকে সঙ্কল্পতরঙ্গে নাচায়, যে চৈতন্যখণ্ড স্বপ্নকালে শরীর হইতে আপনাকে গুটাইয়া লইয়া শুধু মনটিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া স্থূল দেহ স্থূল-জগৎ ভুলিয়া মনোময় জগতে স্বপ্ন তুলিয়া ক্রীড়া করেন, আবার যে চৈতন্যখণ্ড মহামৎস্যের মত উভয় কূলে বিচরণের পর সুষুপ্তিকালে আপন অখণ্ড স্বরূপে মিশিয়া পরে মিলিত হইয়া সমস্ত দৃশ্য দর্শন ছাড়িয়া আপনি আপন ভাবে অবস্থিত হয়েন, এই খণ্ড চৈতন্যই জাগ্রৎ ও স্বপ্নের খণ্ডাবস্থায় জীবাত্মা, আবার সুষুপ্তিকালে অখণ্ডে মিশিয়া তুরীয়ে অখণ্ড হইয়া আপন আপন ভাবে স্থিতি লাভ করিয়া ইনিই পরমাত্মা। এই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরব্রহ্মই অবিজ্ঞাতস্বরূপ, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, নির্গুণ, নিরাকার, অবাঙ্মনসগোচর। স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াই ইনি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবে ক্রীড়া করেন॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহঁাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন,—

প্রাতঃস্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎস্বপ্নজাগরসুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥

কেন শ্রুতি ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচোহ বাচঃ স উ প্রাণস্য প্রাণ
শ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতি মুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেনস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥

কাঁহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া মন স্ববিষয়ে পড়ে? শ্রেষ্ঠ প্রাণই বা কাঁহার নিয়োগে গমনাগমন করে? লোকে কাহার ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করে? এবং কোন্ দেবতা চক্ষুকে কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন?

শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য যিনি তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তাঁহাকে এইরূপে জানিয়া ধীরগণ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া প্রেতত্ত্ব লাভের পর অমর হয়েন।

সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না। তাঁহাকে জানি না। ইহঁার সম্বন্ধে কি উপদেশ করা হয় তাহাও জানি না। বিদিত স্থূল বস্তু হইতে তিনি পৃথক্, অবিদিত বস্তু হইতেও তিনি পৃথক্। পূর্ব্বের লোকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই শুনিয়াছি।

মাতেব হিতকারিণী ভগবতী শ্রুতি—মাণ্ডূক্যশ্রুতি—ইহা লক্ষ্য করিয়াই

বলিতেছেন "সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ"। উপরের বিষয়টি যখন আমরা বেশ করিয়া ধারণা করি, তখন কি ইহা বোধ হয় না যে, ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশখণ্ডের মত আমাদের দেহমধ্যবর্ত্তী অথবা ভিতরে বাহিরে দেহব্যাপী চৈতন্যখণ্ড যখন আপনার অখণ্ডস্বরূপ দেখেন আর ঘটের ভিতরে বাহিরে মহাকাশের অবস্থান মত সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য দর্শনে আপনার খণ্ড কখনও হয় না, যখন ইহা বুঝিতে পারেন; আবার বলি, তখন ইহা কি বোধ হয় না যে, সর্ব্বব্যাপী আত্মাই আছেন, কোন এক অদ্ভুত কৌশলে চৈতন্যস্পর্শে চৈতন্যমত দেহটাই অজ্ঞান বশে একটা খণ্ড চৈতন্য বলিয়া কিছু মনে করে মাত্র? তখন কি মনে হয় না বাস্তবিক অখণ্ডের খণ্ড কখনও হয় না? অজ্ঞানে মাত্র একটা জীব ভাব কল্পিত হয় মাত্র?

সাধারণ যুক্তিতে দেখা গেল, আকাশ যেমন এক; ঘটাকাশ, পটাকাশ, বলিলেও আকাশের যেমন খণ্ড হয় না, সেইরূপ আত্মা একটিই। রামের আত্মা শ্যামের আত্মা এইরূপ বহু আত্মা অজ্ঞানবিজৃম্ভিত মাত্র। শ্রুতি এইজন্য বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি। ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥" সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্।

উপাধি ত্যাগের জন্য সাধনা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই জানেন উপাধিত্যাগে জীবাত্মাই পরমাত্ম। সম্প্রদায় রক্ষা জন্য কেবল বলা হয়—জীবাত্মা চিরদিনই জীবাত্মা; জীবাত্মা কখন পরমাত্মা হইতে পারে না—এইরূপ উক্তি সত্যের অপলাপ মাত্র, কারণ ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। তবে যতদিন দেহাত্মবোধ আছে ততদিন চিড়িয়ার বুলির মত যদি কেহ "সোঽহং" কথা মুখে শিখিয়া—অভেদত্ব অনুভব না করিয়া কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞানী লোকের নিকট ইহা প্রচার করেন তবে তিনি ও তাঁহার শিষ্য যে পরস্পর পরস্পরকে টানাটানি করিয়া মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়েন, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

মনের প্রতি উপদেশ

মন—রজস্তমতরঙ্গে নাচিয়া কি হইবে? তুমি পণ করিয়াছ কিছুতেই আমাকে সত্ত্ব লইয়া থাকিতে দিবে না। তোমার সঙ্গে এমন কি বাদ সাধিয়া

আসিয়াছি যে তুমি আমায় পুনঃ পুনঃ রজস্তম মধ্যে ফেলিতে চাও? ধন্য তোমার রঙ্গ—ধন্য তোমার প্রাণ। অজ্ঞ জীব তোমার লীলা কি বুঝিবে?

আমি বড়ই কাতর আমি বড়ই দুঃখী। তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমায় আর এ তরঙ্গে ফেলিও না। আমায় লইয়া আর এত নাচানাচি করিও না, আমি আর পারিতেছি না—দেখ আমার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, আমি জীবনধারণও দুর্ব্বিষহ মনে করিতেছি, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত; তুমি শান্ত হও।

নিম্নে যাইয়া কি হইবে! ঐ কি জন্ম-মৃত্যুর কি ভীষণ তরঙ্গ! টানা টানি ঘুরা ফেরা পুনরপি জননং পুনরপি মরণং।

চল—উর্দ্ধদিকে অন্বেষণ করি—কি দেখ!

আহা! অপূর্ব্ব! মনোহর! মধুর! পরম সুন্দর! দৃষ্টি যে আর ফিরে না, আর ফিরিতে চায় না!

আহা! মোহন বেশে কে তুমি?

মন উঠিল সত্ত্বে, পরে বুদ্ধিতত্ত্বে—সেখানে অহং নাই, রজস্তম নাই, ঝড় তুফান নাই কল্লোল নাই, জরামরণ নাই, অবিদ্যাক্লেশ নাই। সত্ত্বের অস্মিতা নাই—নাই বুদ্ধির স্বচ্ছ দর্পণ; নির্ম্মল—আহা! তাহার বুঝি তুলনা দেওয়ার আর কিছু নাই! দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন নাই—সব গলিয়া যেন কি এক পরম রসে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় নাই -শুদ্ধ প্রকাশ—তবু যেন কি একটা আবরণ; একটা পাতলা পরদা! যে দিকে দেখ সেই দিকেই অনন্ত অপার অসীম—আহা তাহাতেও যেন বলিয়া বলা হইল না—সে কি প্রকাশ করা যায়?

স্বপ্রকাশ সম্বিৎময়ী বুদ্ধি যেন একটু একটু নাচিতেছে। কিছুতেই থামা নাই—ঈষৎ অল্প মৃদু হাস্য যেন বিম্বাধর হইতে ছাড়িতেছে না—সেখানে শুধু হাস্য, শুধু আনন্দ—কে এই অকারণ আনন্দের ধারা যোগাইতেছে?

জানা যাইতেছে না জানা গেল না, তবে হইল কি? জানিয়া জানা হ'ল না, যাইয়া যাওয়া হ'ল না, তবে কেমন জানা, কেমন যাওয়া?

মন, উঠ, আরও উঠ; আহা! রজস্তম বুঝি টানিতেছে? এই অকারণ আনন্দময় দেশের অমৃত ধারা তোমার রুচি হইতেছে না; বিষয়-বিষ-তরঙ্গে

না নাচিতে পারিলে বুঝি ভাল লাগে না। ধন্য ভাল! ধন্য ভাললাগা! বলি এত ভাললাগা, লাগা খাইয়াও, দাগা খাইয়াও থামে না? বলি—এতই কি উতলা হইতে হয়? উতলা হওয়ার সময় আছে। উতলা হইতে যখন চাহিবে না, তখনই উতলা হইবার অবসর জানিও, উতলা হইবে, নাচিবে; মন ভাবিবে তুমি খুব নাচিতেছ, কিন্তু তুমি ভিতরে খুব স্থির থাকিও, তখনই তুমি 'পাকা' হইবে, তখনই তুমি, উপরে উঠিয়া পাকা ফল পাড়িয়া সবাইকে বাঁটিয়া দিতে পারিবে, তাই বলি স্থির হও। শান্ত হও। আর একটু উঠ, উঠিয়া দেখই কি আছে?

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রৎ প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!" মন উঠিতেছে না, মন উঠিতে পারে না! মন, কাহাকে বুঝি বেদনা দিয়া আসিয়াছ, কাহাকে বুঝি ক্লেশ দিয়া আসিয়াছ, কাহাকে বুঝি বড় ভাল বাসিয়া 'বন্ধন' লইয়া আসিয়াছ, তাই, 'হৃদয়-গ্রন্থি' হইয়া পড়িয়াছ; তাই উঠিতে পারিতেছ না। তুমি মহাপাতকী সকলকে ক্লেশ দিয়া কিছু করিও না, সকলকে ব্যথা দিয়া বদ্ধ হইয়া থাকিও না; কাহারও ঋণ দিয়া রাখিও না; ঋণ শোধ কর নাই; তাই এই অর্ব্বাকস্রোত; ঋণ শোধ কর, নামিয়া যাইতে হইবে না; আচ্ছা এখানে বসিয়া পাপনাশক মন্ত্র স্মরণ কর—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

বড় মধুর এই নাম। বড় মধুর ইহার ঝঙ্কার; কেমন?

তাহাতেও হইল না। তোমার নাচন থামিল না, তুমি কেন ব্যগ্র হইতেছ?

আচ্ছা, তুমি সমস্ত দেবতা, প্রজাপতি, পিতৃ, মানব, গন্ধর্ব্ব, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর, পিশাচ, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, জড়, অণু, পরমাণু, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কর্ত্তা, হেতু, ক্রিয়া, সকলকে তুষ্ট কর।

বল—

ওঁ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।

জল নাই, স্থলজল নাই, কারণ বারি ত আছে, সূক্ষ্ম ভূত নাই, পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম কারণ ত আছে, তুমি তাই দিয়া আসন, তর্পণ-পাত্র ইত্যাদি রচনা করিয়া ভক্তিভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সকলের প্রতি কাতর হইয়া প্রসন্নতা ভিক্ষা কর।

তাহাতেও হইল না, তোমার ইষ্ট মন্ত্র জপ কর, একবার, শতবার সহস্রবার যতবারে হয় ততবার। ইষ্টমন্ত্র ইষ্টদেবকে দেখাইয়া দিবে। শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম যে অভিন্ন।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ।

ভাব অর্থযুক্ত ভাবনা। কি দেখ? দেখি মধুর মাতৃমূর্ত্তি। বড় সুন্দর আহা মা! বড়ই মনোহারিনী। মা সন্তানের দিকে দেখিতেছেন, আর তুমি কি হইতেছ, দেখ আর রজস্তম আসিতেছে? আর কামক্রোধাদি আসিতেছে? কেবল মুদিতা আর কাতরতা। আহা! মা তুমি এমন। দেখ ঐ মাতৃমূর্ত্তিতেই সব।

আহা প্রণবের তরঙ্গ ভেদ করিয়া কাহার শীতল ঈক্ষণ সুধারাশি ঢালিতেছে? মা সন্তানকে কোলে লইবার জন্য অগ্রসর। সন্তান তখন মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা হইতেছে, মা তোমার মধ্যে এত! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনন্তরূপে ভাসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে পড়িতেছে লয় পাইয়া কোথায় গেল আবার ভাসিতেছে। আহা। যাহা ফেলিয়া আসিয়াছি যাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছিলাম যাহার জন্য কাতর হইতেছিলাম সবই ত ঐ শ্রীঅঙ্গে! জাগ্রত জগতের দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য—ঐ যে এক অঙ্গে, স্থূলদেহ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্ম, পঞ্চজ্ঞান, মন, বুদ্ধি, অহংকার, সত্ব রজ তম সবই ত ঐ অঙ্গে। আহা! আরও কত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবই তোমাতে। আহা! মা! আমি বড় অজ্ঞ। তোমায় না চিনিয়া কাহাকে চিনি, তোমায় না ধরিয়া কাহাকে আপন বলিয়া ধরি; তোমার মধ্যে এত স্নেহ প্রেম ভালবাসা ফেলিয়া কোথায় যাই। মা আর না আর না! তুমি আমায় কোলে ঠাঁই দেও।

বিচার শান্ত হইল, তরঙ্গ শান্ত হইল, স্পন্দন শান্ত হইল, রোগ শোক রাগ দ্বেষ, জরামরণ, আকাঙ্ক্ষা নিরাকাঙ্ক্ষা, আশা নিরাশা, হওয়া, না হওয়া, বড় ছোট, সব শান্ত হইল।

বিচার শেষে আসিল মাধুর্য্য! মধুর তুমি! তোমার মাধুর্য্যের তুলনা কি দিব?

আমি আর আমাতে নাই !

মা প্রসন্ন হইয়াছেন—মা সন্তানকে কোলে লইয়াছেন—সন্তান তখন কোথায়? সন্তান নাই।

সব ভাঙ্গিল, সব ডুবিল, সব গেল, কোথায় মা কোথায় সন্তান, কোথায় মা ও সন্তানের দেখাদেখি ; বিচার ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য সব ডুবিল।

স্পন্দনহীন পরমশান্ত,পরমস্থির অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেশ কে জানে ইহা কেমন?

একি জাগ্রৎ, না ঘুমের ঘোরের আবেগ ; স্বপ্ন না সুষুপ্তি ; ইহা কি ? কিছুই বুঝি না। সুষুপ্তি ত অন্ধকারময়, ইহা ত তাহা নয়। জাগ্রৎ সুষুপ্তি, চৈতন্যময় ঘুমঘোর, অন্ধকার নাই কেবল আলোক ; আলোক! কে দেখে, কি দেখে, কাহাকে দেখে? ভিতরে ঢুকিয়া গিয়া কি যেন একটা কি হইয়া গিয়াছে।

নাহো ন রাত্রি ন´নভো ন ভূমি।
ন´াসীৎ তমোজ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং॥

এক—এক সুরতানের লয়ের শেষে যেন একটা নিস্পন্দ ঝঙ্কার। তালের ফাঁক নীরব নীঝুম, তবু যেন শ্রুত অশ্রুত একটা শব্দ।

আর আনন্দ—আনন্দ প্রবাহ অথবা স্থির আনন্দ বলা যায় না।

পরমশান্ত, পরমস্থির, পরমপ্রকাশ, পরম সৎ, পরম চিৎ, পরম আনন্দ।

অনেকক্ষণ পর দেখি আবার নামিতে ইচ্ছা, নামা উঠা আর কত করিব? আমি সকলের কৃপার পাত্র, একটু এই তরঙ্গ থামাইয়া দাও, সিঁড়ি ভাঙ্গিতে আর পারিব না। কত কষ্টে যদি বা আসিলাম ত আবার নামা কেন? একটু থাকুই না বাপু! তোমার পায়ে ধরি একটু থাম।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থনৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

থাকিয়া দেখি আমি ও মা কোথায় যেন মিশিয়া কোথায় গিয়াছি। আমিই মা হইয়া গিয়াছি আবার মা দেখি কাহার সঙ্গে মিলিয়া কি হইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বত্র এক, আমি মা আর সেই অপরিচিত সব এক পরম এক।

মা আর থাকিতে পারিতেছেন না—ভাব তরল হইতেছে, মা নামিতেছেন, দ্রবময়ী করুণার মূর্ত্তি লইয়া নামিতেছেন। না হইলে অন্যোন্যাতিরোহতি হইবে কেমন করিয়া?

মা নামিতেছেন—স্পন্দন শূন্য স্পন্দনময়ী হইতেছেন! কে যেন টানিয়া নামাইতেছে! একটু যেই ভাব তরল হইয়াছে অমনি দেখি অপরূপ শান্ত-মূর্ত্তি চিদ্‌ঘন চিদানন্দ প্রাণাভিরাম, মনোভিরাম, নয়নাভিরাম সদাভিরাম, সততাভিরাম।

মা নামিতেছেন কিন্তু তিনি সঙ্গেই আছেন, মা ও তিনি এক অভিন্ন মিলন উভয়ে কত রূপ কত শক্তির খেলা লীলা ছলা কলা কে বর্ণিবে?

দেখিতেছি ঐ পরম শান্তকে ভিন্ন মা এক মুহূর্ত্তও নাই, এক স্পন্দনও তাঁহা ছাড়া নয়, তবে তিনি স্থির জড় "বৃক্ষ ইব স্তব্ধ" "পাষাণ ইব অচেতনঃ"। আর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মা নাচিয়া নাচিয়া কত কি করিতেছেন—কত মনোহর বেশে সাজাইতেছেন কত অলঙ্কার কত সৌন্দর্য্য কত ভূষণ কত বেশ কত কি। তিনি পরিয়াও পরেন না দেখিয়াও দেখেন না; মা তাতে কত ক্লেশ পাইতেছেন, মা যতই পরাইতে যান সব যেন তাঁরই গায়ে আসিয়া জড়ান হইয়া যাইতেছে, মা কিন্তু থামিতেছেন না, বহুকষ্টে সাজাইলেন—

সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বতোমুখ বিশ্বতোহস্ত উত বিশ্বতস্পাৎ॥

সহস্র মস্তকে সহস্র কিরীট ঝলমল করিতেছে, সহস্র বাহুতে সহস্র আয়ুধ সহস্র অলঙ্কার; সহস্র পদে কত শত নূপুর, কত শত কিছু, বক্ষে শ্রীবৎস-কৌস্তভ; এক হস্তে বিশাল গদা, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে শঙ্খ এক হস্তে পদ্ম।

তিনি দাঁড়াইয়া আছেন; নড়েনও না বলেনও না; দেখিয়াও দেখা নাই, অন্ধের দৃষ্টি যেমন। চলিয়াও চলেন না খঞ্জের চলা যেমন। মা যতক্ষণে নাড়ান তিনি ততক্ষণে নড়েন বলেন চলেন। মা না হইলে তাঁর কিছুই হয় না।

আহা! এই শ্রীমূর্ত্তি এক, কি দুই? কখন এক কখন দুই। স্বরূপে এক লীলায় দুই। শান্তে এক, অশান্তিতে বা স্পন্দনে দুই। আহা এতে কি নাই। তোমার পরিপূর্ণ স্বরূপই ত এই। তবে আবার কি চাই?

পরমশান্ত আনন্দঘন চিদ্‌ঘনতার পাশে পাশে প্রধানতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব অহংতত্ত্ব মনতত্ত্ব ভূততত্ত্ব ইন্দ্রিয়তত্ত্ব কর্ম্মতত্ত্ব প্রাণতত্ত্ব দেহতত্ত্ব দ্রষ্টাদর্শন, দৃশ্যতত্ত্ব জড়-তত্ত্ব গৃহতত্ত্ব সংসারতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব দর্শনতত্ত্ব ইতিহাসতত্ত্ব বিজ্ঞানতত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব দেশ-তত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব দুঃখতত্ত্ব সুখতত্ত্ব আশাতত্ত্ব নিরাশতত্ত্ব আর কি চাও?

এতেও আশা পূরিল না। আশা পূরিবে না—আশা পুরাইয়া প্রয়োজন নাই। চুপ চাপ বস। প্রবাহকে দেখ—প্রবাহের পাশে বসিয়া বসিয়া দেখ। আনন্দ পাইবে। দরকার হইলে প্রবাহে নামিও—আবার তীরে আসিয়া বসিও।

ইহাই মৃত্যুসংসার সাগরে অমৃত বারি। প্রবাহে পড়িলে রজস্তম তরঙ্গ তোমাকে আবার মৃত্যুপারে লইয়া যাইবে। তখন বসিয়া কাঁদিও। আমি বারে বারে এত পারিব না। বস গান কর, যেমন আনন্দময় লোক এখানে চিত্ত বিশ্রান্তি দাও।

(১

নয়নে তপন তব মনে সুধাকর।
প্রতি লোমকূপে প্রভু বিশ্ব চরাচর,
নেত্র উন্মীলনে দিবা, মুদিলে রজনী
বুদ্ধে বৃহস্পতি, তব বাক্যে বীণাপাণি
সকলই তোমার গুণে! কি আছে আমার
হৃদি যে পূজিতে চায় এ সাধ তোমার।
বিশাল সাগর বক্ষে তরঙ্গের মালা
তুলিয়া যেমন খেল, এও সেই খেলা
তোমায় আমায় প্রভু একই পরাণ,
পূজার কারণ বুঝি 'আমি' ব্যবধান।

(২)

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে জগৎ সংসার ভাসে
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল শূন্যে শূন্য মিলাইল।
অবাঙ্মনসগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।

শ্রীআ—

নাম মাহাত্ম্য।

মধুর এই হরিনাম। কলির এই পাপী-তাপী জীবের এই নামই মহামন্ত্র। যে নাম ক্ষণিক স্মরণে বহু পাপ খণ্ডন হয়, যে নাম নিরন্তর স্মরণে প্রাণের উৎক্রমণ নিবারিত হয়, যে নামের গুণে ভব-ব্যাধি ঘুচে যায়, মৃত্যুকালীন যে নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিতে পারিলে মরণ-বিভীষিকা ঘুচে যায়, যম-কিঙ্কর সরিয়া পালায়, নির্ব্বিঘ্নে বৈতরণী পারের সহায়তা করে—সেই নামই মন! কলির অল্প পরমায়ু সাধনে অক্ষম জীবের পক্ষে একমাত্র শান্তি। এই নামই মন! তোমার মহৌষধ। সহজ সাধন এই নাম। এই পবিত্র নাম সংকীর্ত্তন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রচার করিয়া যান। এই নাম স্মরণ করিতে পারিলে মৃত্যুকালীন আর উৎকণ্ঠা হয় না, চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না। এই নামের বলে জীব আপন অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন করিতে পারে, জন্ম-জন্মান্তরে অর্জ্জিত সংস্কার খণ্ডাইতে পারে।

এই নাম মৃত্যুকালে একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া, লোকের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনকারী অজামিল ঘোর অধর্ম্মাচরণ করিয়াও স্বর্গলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন; এই রাম নাম জপে মহাদস্যু রত্নাকর শত ব্যভিচার করিয়াও জগতে এক মহাকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং জগতে আজিও পূজ্য হইয়া আছেন। এই নাম জপের গুণে দুর্ব্বল মনে বল আসে, মোহ অন্ধকার ঘুচে যায়, অজ্ঞানতা টুটে যায়—এই নামই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ। এই নামের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানে বন্ধন খুলিয়া যায়, মোক্ষলাভ হয়, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ সুখের পথে লইয়া যায়। তখন আর জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া জনন-মরণ-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না ও যোনী-ভ্রমণও করিতে হয় না। তাই বলি মন! নাম জপ কর, প্রতি শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ কর, আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে প্রতি কর্ম্মের আরম্ভে নাম জপ কর। নাম জপই তোমার প্রশস্ত।

তাই মহাত্মা ভক্ত কবি তুলসী দাস একদিন আনন্দচিত্তে ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"তুলসী অ্যায়সা ধ্যান ধরো যায়সা বিয়ান্‌কো গাই,
মুমে তৃণ চানা টুটে চেৎ রাখয়ে বাছাই"॥

এই নাম জপই তুমি দৃঢ় কর, এই নাম বারম্বার শ্রবণ কর, মনন কর, নিদিধ্যাসন

কর। এই নামের গুণে স্কন্দপুরাণোক্ত শিবশর্ম্মা বৈকুণ্ঠলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভক্ত প্রহ্লাদ হরিনামের বৈরী হিরণ্যকশিপুর মহা অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ভয় কি মন, তুমিও শত সহস্র বাধাবিঘ্ন এই নামের গুণে অতিক্রম করিতে পারিবে। পূজ্যপাদ ঋষিগণ এই নামের গুণ প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতি শাস্ত্রে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভে ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনে নশ্বর সংসারে এই নাম ব্যতিরেকে আর কি সত্য আছে মন! সৎ-চিৎ-আনন্দ এই হরিনাম কলির পাপী-তাপী জীবের একমাত্র সুহৃৎ।

তাই বলি মন, সাংসারিক সর্ব্বকর্ম্ম করিতে করিতেও নাম জপ অভ্যাস কর—যখন জানিবে সর্ব্বকর্ম্মে সুখে দুখে নাম স্মৃতিপথে আসিতেছে, তখন রাগ দ্বেষ ক্ষয় হইয়া যাইবে, কামনা বাসনা ছুটিয়া যাইবে,—তখন জানিও নাম জপ তোমার অভ্যাস হইয়াছে, তখন সেই নামরূপী নামী তোমায় কৃপা করিবেন।

ক্রমশঃ—

(রাণীগঞ্জ)

সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কনিষ্ঠ—ভাল তাহাই যেন হইল, কিন্তু কেমন করিয়া এই অহিংসা-সাধন আরম্ভ করা যাইবে?

জ্যেষ্ঠ—প্রথমে শরীর এবং বাক্য দ্বারা।

কনিষ্ঠ—খুলিয়া বল।

জ্যেষ্ঠ—পশুজগৎ পর্য্যন্ত হিংসার গতির অনুসরণ করিলে দেখা যায়, আত্মদেহ পুষ্টির জন্য, আত্মতৃপ্তির জন্য প্রথমতঃ আহার ব্যাপারেই হিংসার সূত্রপাত হয় এবং পরে ইহার ক্রমবিকাশে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া পড়েন। তবেই যদি সর্ব্ব প্রথমে আহারটী সংযত করা যায় এবং পরে কাহাকেও হস্ত দ্বারা পীড়া দিব না ও কাহাকেও বাক্যদ্বারা মর্ম্মাহত করিব না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা ভিতরে রাখিয়া বাহিরে তদনুরূপ কার্য্য করিতে অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে কালে অহিংসা-সাধনে সিদ্ধিলাভ করা যাইবে—সর্ব্বভূতের প্রতি করুণ ও

মিত্রভাবাপন্ন হওয়া যাইবে। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য দেবের "জীবে দয়া" বাক্যের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য মানসপটে বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া উঠিবে। বুঝিলে ?

কনিষ্ঠ—বৈদিক সন্ধ্যায় ইহার কি কোনও আভাষ আছে ?

জ্যেষ্ঠ—আছে বৈ কি। বৈদিক সন্ধ্যা প্রয়োগে যে "আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব, স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥" "যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥" প্রভৃতি মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মন্ত্রমন্দিরও এই অহিংসা-সাধন ভিত্তির উপর স্থাপিত।

উক্ত মন্ত্র দুইটীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, জলদেবতাগণের নিকট শরীর পোষণার্থ সেইরূপ মঙ্গলবর্ষী, রসভাগের প্রার্থনা করা হইতেছে—যাহা প্রাপ্ত হইলে রমণীয়-দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আহারটী এমন ভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" মহাবাক্যের বিরুদ্ধে লাঠি ধরিতে না হয়। আহারটী যেন শুভ হয়।

কনিষ্ঠ—তবে এখন দেখা গেল যে, অহিংসা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য প্রথমেই সংযত আহারের প্রয়োজন। আচ্ছা, এই সংযত আহারের কি আর কোনও উদ্দেশ্য নাই ?

জ্যেষ্ঠ – কে বলিল নাই ? আর যাহা আছে, তাহা পরে বলিব।

কনিষ্ঠ—এখন তবে এইরূপ সংক্ষেপে সত্য প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু বল।

জ্যেষ্ঠ—'সত্যং যথার্থে বাঙ্‌মনসে—বাক্য ও মনের যথার্থতাকে সত্য বলে। যেমন দেখা যায়, যেমন শুনা যায়, শব্দাদি দ্বারা যেমন অনুমান করা যায়, তদনুরূপ বাক্যের প্রয়োগকে সত্য বলে। কিন্তু এই সত্য যেন সকলের হিতকর হয় "সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ"। সত্য বাক্য অন্যের অনিষ্টকর হইলে, বক্তাকে দুঃখভাগী বা পাপভাগী হইতে হয়। এই কারণে অহিতকর সত্যকথন অধর্ম্ম। অহিতকর সত্যকথনের সঙ্কটস্থলে সাধুগণ মৌন আচরণের উপদেশ করিয়াছেন। ফলতঃ যম সাধনের এই স্থানেই বাক্য ও মনের সংযম প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ হয়। বাক্য ও মন সংযত হইলেই চিত্ত একাগ্র হইবার অবসর পায়—এক ভিন্ন বহুর চিন্তা আর চিত্তে উদিত হইতে পারে না। কাজেই জীব বহুর সংঘর্ষে আসিয়াও, বহু দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তাই ঋগ্বেদের শান্তিমন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে :—

"বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা,
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্,
আবীরাবির্ম এধি।"

আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আমার মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমি মনে মুখে এক হইয়া যথার্থ সত্যপরায়ণ হইয়াছি। হে স্বপ্রকাশ, তুমি এস।

মহাভারতের বনপর্ব্বের আরণ্যেয় পর্ব্বাধ্যায়ে যক্ষরূপী ধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠির সংবাদে যক্ষ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—সত্যে। এখন দেখা যাউক 'আদিত্য' শব্দের অর্থ কি।

আদিত্য শব্দে সূর্য্য বুঝায়। কিন্তু এই শব্দ আবার সকল দেবতার সাধারণ নামার্থেও প্রযুক্ত হয়—সকল দেবতাই অদিতির গর্ভজাত। 'দিতি' বন্ধনে বা ছেদনে। সুতরাং অদিতি ব'লতে বুঝায় যাহার বন্ধন নাই, সীমা নাই, যাহা খণ্ডিত নহে, এক কথায় যাহা অনন্ত। যাহা এই অদিতি বা অনন্ত সম্বন্ধীয় কিম্বা অদিতি হইতে উৎপন্ন তাহাই আদিত্য। এই হিসাবে অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও সর্ব্ববিশ্ব-প্রসূ প্রথম সূর্য্য—উভয়ই আদিত্য পদবাচ্য। এক্ষেত্রে যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আদিত্য বা অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

এখন দেখ সত্য বলিতে কি বুঝায়। সৎ—যঞ=সত্য। 'সৎ' অর্থে বর্ত্তমান থাকা বুঝায়, এই থাকার ভাবটুকু সত্য। অর্থাৎ কেহ একজন অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ বিরাট্ পুরুষ আছেন—তা আমরা ইহাঁকে ঈশ্বরই বলি বা g..্এই বলি, আর যাই বলি এই অবিসংবাদী যথার্থ আস্তিত্বের ভাবটুকু আমরা যদ্দ্বারা হৃদয়ে চিরস্থির রাখিতে পারি তাহার নাম সত্য—ইহাই আস্তিক্য বুদ্ধি। তবেই দেখ যে ব্যক্তি সত্যহীন সে "যথার্থে বাঙ্মনসে" হইতে উৎপন্ন যে ব্যবহারিক আনন্দ তাহাও পায় না, আর আস্তিক্য-বুদ্ধি-লব্ধ অনন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ফল যে অবর্ণনীয় চিত্তপ্রসাদ তাহা হইতেও একেবারে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি যথার্থ সত্যপরায়ণতার অভাবে অনন্ত স্বরূপের জ্ঞানলাভ না করিল, অজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানের মধ্যেই ডুবিয়া রহিল—তাহার দুঃখনিবৃত্তি বা শান্তি কোথায়? আমাদের সন্ধ্যা-প্রয়োগের মার্জ্জন প্রকরণে যে "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ" প্রভৃতি মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার যথার্থ মননে ও

সম্যক্ অনুশীলনে উপনীত দ্বিজ-হৃদয়ে উক্ত আদিত্য ভাব বা অনন্ত জ্ঞানের পূর্ণ চিত্র, ধীরে ধীরে আপন কনক কান্তিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মচারী মানবকের যথার্থ চক্ষুর আবরক অজ্ঞান যবনিকা অপসৃত হয় বলিয়াই তিনি এই বিরাট্ বিশ্বকে 'সৎ' পুরুষরূপে, কাজেই আপনাকেও 'সৎ' পুরুষরূপে অনুভব করেন। তখন তাঁহার নিকট জগৎ বলিয়া কিছুই থাকে না, অহং বা মমতা বলিয়া কিছুই থাকে না, কাজেই সুখ দুঃখও থাকে না—যাহা থাকে তাহা সেই চির বর্ত্তমান 'সৎ'। সত্য-সাধনের মর্ম্ম কিছু বুঝিলে কি ?

কনিষ্ঠ—কতক বুঝিয়াছি। কিন্তু একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল। তোমার কথায় বুঝিলাম, জগতে যাহা দুঃখ বলিয়া পরিচিত তাহা অতিক্রম করিবার জন্য সত্যসাধন আবশ্যক। বেশ ভাল কথা। কিন্তু তুমি এই মাত্র বলিলে এই সত্যসাধন ফলে ব্রহ্মচারী মানবকের সুখ দুঃখ নিরস্ত হইয়া যায়—এটা কি রকম কথা ? যদি সত্যসাধন করিলে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখটুকুও চলিয়া যায়—তবে আমি কিসের লোভে, কিসের আশায়—এতটা খাটিয়া মরিব ?

জ্যেষ্ঠ পরিপূর্ণ আনন্দের লোভেই তুমি আপন সামর্থ্যকে যথার্থভাবে ব্যয় করিবে !

কনিষ্ঠ—সুখ কি আনন্দ নহে ?

জ্যেষ্ঠ—না। আনন্দকে জীব দুই ভাবে উপভোগ করে—ক্ষণিকভাবে ও স্থায়ী-ভাবে। আনন্দের যে অংশ ক্ষণিক, যাহা ফুরাইলে দুঃখটা দ্বিগুণবেগে চিত্তভূমি অধিকার করে, তাহার নাম সুখ। আর তাহার যে অংশ স্থায়ী, যাহার কোনও পরিণাম নাই, যাহা ফুরায় না—তাহারই নাম পরিপূর্ণ আনন্দ বা শান্তি। আমি এই পরিপূর্ণ আনন্দ বা শান্তির কথাই বলিতেছিলাম।

ক্রমশঃ—

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রভৃতি বৈদিক সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের পাপক্ষয় এবং শরীর সংস্কৃত না হইলে তাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইতে পারেন না। মাতৃ-কুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই তাঁহাদের স্নজ-

লাভ হয় না। পরন্তু, বেদপারগ আচার্য্য যেদিন তাঁহাদিগকে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রদান করেন, সেই দিন তাঁহাদের প্রকৃত জন্ম কহা যায়। যে দ্বিজ তপস্যা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যাবজ্জীবন বেদ অভ্যাস করিবেন। বিপ্রের বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা। বেদচতুষ্টয় অধ্যয়নান্তে, দ্বিজ গুরুর অনুমতিক্রমে মাতার অসপিণ্ডা এবং পিতার অসগোত্রা, অসপিণ্ডা সর্ব্ব-সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবেন। প্রথম বিবাহে দ্বিজাতিগণের সবর্ণা কন্যাই শাস্ত্রানুমোদিত। স্বেচ্ছাকৃত পুনর্ব্বিবাহে মনু, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অসবর্ণা কন্যা বিবাহের অধিকারও দিয়াছেন। কিন্তু, তাদৃশ বিবাহ তাঁহার মতে নিতান্ত হেয়, এবং শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত। মনুর মতে অসবর্ণ বিবাহ দুই প্রকার—অনুলোম এবং প্রতিলোম। উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণের কন্যা গ্রহণ করার নাম অনুলোম এবং নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। এই প্রতিলোম বিবাহ মনুর মতে নিতান্ত অশাস্ত্রীয় এবং সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। বর্ত্তমান যুগে আমরা অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। কিন্তু অন্য পক্ষে বিবাহে এত দোষ আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার আমূল সংস্কার নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

মনুর মতে বিবাহ আট প্রকার।

"ব্রাহ্মদৈবস্তথৈবার্ষ প্রাজাপত্য স্তথা সুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ মনুসংহিতাতে পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্‌ভিন্ন মনু আর এক প্রকার মিশ্র বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন,—গান্ধর্ব্ব রাক্ষস। তাঁহার মতে অর্জ্জুন-সুভদ্রা এবং শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহ এই গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস নামে অভিহিত করা যায়।

বিদ্যা, বিনয়, সদাচার সম্পন্ন বরকে আমন্ত্রণ করিয়া যথাবিধি সাচ্ছাদিতা এবং সালঙ্কৃতা কন্যা দান করার নাম ব্রাহ্মবিবাহ।

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দৈবকার্য্য সিদ্ধি কামনায় দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে যে কন্যা দান করা যায়, তাহার নাম দৈববিবাহ।

বরের নিকট হইতে গোমিথুন লইয়া কন্যার্পণকে আর্ষবিবাহ বলে।

বর কন্যাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে অনুরোধ করিয়া, যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাদানের নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

কন্যার পিতাকে এবং কন্যাকে ধন দান করিয়া স্বেচ্ছামত যে বিবাহ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। বর এবং কন্যার অনুরাগে যে মিলন হয় তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এই বিবাহ যদিও কামমূলক, তথাপি হোমাদি দ্বারা পশ্চাৎ ইহা সিদ্ধ হয়। রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা যায় তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ।

নিদ্রিতা, মদ্যপান-বিহ্বলা, অথবা উন্মত্তা কামিনীতে নির্জ্জনে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। উক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ নিতান্ত ঘৃণিত এবং পাপজনক।

বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ হিন্দুসমাজে যে বিবাহ চলিতেছে তাহা ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহের একটা নকল মাত্র। ইহার সংস্করণ কল্যাণকামী হিন্দুর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর তাই বড় দুঃখে এবং মনক্ষোভে "বৃষোৎসর্গ" "পিণ্ডদান" প্রভৃতি সংজ্ঞা আধুনিক প্রচলিত হিন্দু বিবাহের নাম করণে ব্যঙ্গোক্তি চালাইয়া গিয়াছেন।

মনু বলেন, স্ত্রীজাতিকে বহুমান পূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান এবং ভূষণাদিতে বিভূষিত করা—কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কুলে নারীগণের আদর এবং সম্মান রক্ষিত হয়, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন। যে পরিবারে স্ত্রীজাতির পূজা নাই, যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া তথায় সমস্তই ব্যর্থ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি দুঃখে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, অভিচার হতের ন্যায় তাহা অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে পরস্পর এবং শূদ্রের সহিত কদাচিৎ ভোজ্যান্নতা দৃষ্ট হয়।

"আধিক কুল মিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মনং নিবেদয়েৎ।"

ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন:—আধিকঃ কার্ষিকঃ যো যস্য কৃষিং করোতি স তস্য ভোজ্যান্নঃ এবং স্বকুলস্য মিত্রং, যো যস্য গোপালো, যোযস্য নাপিতঃ ক্ষৌরকর্ম্ম করোতি যো যস্মিন আত্মানং নিবেদয়তি দুর্গতিরহং ত্বদীয় সেবাং করোতি তৎসমীপে বসামীতি যঃ শূদ্রঃ স তস্য ভোজ্যান্নঃ।

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতেন। শূদ্রের মধ্যেও কৃষিকারী, গোপালক, নাপিত প্রভৃতির অন্ন গ্রহণ মনুর মতে নিষিদ্ধ নহে। এই "অন্ন গ্রহণ" শব্দটির অর্থ লইয়া বড়ই গণ্ডগোল। ক্ষণজন্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর মত, লোকেও বলিয়াছেন:—

"রন্ধনটা চাকরের কার্য্য, ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে। ব্রাহ্মণের কার্য্য বেদপাঠ, উনুনে ফুঁ দেওয়া কি ব্রাহ্মণের কার্য্য হইতে পারে? দেশের দশা মন্দ না হইলে ধর্ম্ম ছাড়িয়া উপধর্ম্মে মন যায় না। এত শুচিবেয়ে হইয়া দেশের হাত পা গুলি সব পেটের মধ্যে গিয়াছে। দেশ এখন তাই অসাড়।

দয়ানন্দ সরস্বতীর উল্লিখিত বাক্যে আমাদের বিশেষ আস্থা নাই, ইহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইতে পারে না বরং ইহা তাহার বিরোধী। তিনি সন্ন্যাসী—সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত। তাঁহার আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মতামত কি? শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—

"বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাস ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ত্ততে শ্রুতি মূর্দ্ধনি॥"

অজ্ঞানবোধিনী।

যাঁহারা সন্ন্যাসী পদবাচ্য, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গণ্ডির বাহিরে। আমাদের মনে হয় তাঁহাদের সহিত আমাদের এই আশ্রম ধর্ম্মের কোনও সংস্রব নাই।

এখন দেখা যাউক—অন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? অদ্ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ, সাধারণতঃ অন্ন শব্দে আমান্নই বুঝায়। স্মৃতি শাস্ত্রে ক্ষীর, দধি প্রভৃতিও অন্ন শব্দবাচ্য।

"শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।
নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং তদপি স্মৃতম্॥"

আহ্নিক-তত্ত্ব-ধৃত অঙ্গিরঃ স্মৃতি।

মহাভারতে এবং রামায়ণে অনেক স্থলে ঐরূপ অন্ন শব্দের উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ আমান্ন, সিদ্ধান্ন নহে। রামায়ণ পাঠে জানা যায়, ভগবান্ রামচন্দ্র পরম মিত্র গুহক চণ্ডালের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে রাত্রি, ভাগীরথী-তীরে ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূলে প্রভু ভূমিশয়নে যাপন করিয়াছিলেন। গুহকের বাড়ীতেও পদার্পণ করেন নাই, কেবল মাত্র গুহকপ্রদত্ত অন্ন অর্থাৎ সিদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। * অন্ন অর্থে যদি পক্কান্ন হইত তবে তিনি লক্ষ্মণের আনীত জল পান করিবেন কেন?

---

* শাস্ত্রবাক্যগুলি একটু বিশেষরূপে দেখিয়া যদি লেখক মহাশয় লিপিবদ্ধ করিতেন তবে ভাল হইত। গুহকের অন্ন স্বীকার করিয়াছিলেন, গ্রহণ করেন নাই। ভগবান্ মনুর মতামত-গুলিও বিশেষ দেখিয়া লিখিলেই ভাল হইত। উঃ সঃ।

"ততশ্চীরোত্তরা সঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্ত পশ্চিমাম্।
জলমেবা দদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্॥" *

রামায়ণ অযোধ্যা ৫০ সঃ ৪৮।

সচারাচর অনেক স্থলে দেখা যায় ভূস্বামী প্রজার সিদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ রামচন্দ্রও তদ্রূপ করিয়াছিলেন। গুহক যে রুমালে ঢাকিয়া ক্যাটলেট, চপ্ প্রভৃতি আনিয়া দিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা মূর্খতা ভিন্ন আর কি বলিব? পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সিদ্ধান্ন গ্রহণ করিতেন, তাহারও নিতান্ত প্রমাণাভাব। বরং তাহারা অসবর্ণা স্ত্রী গ্রহণ করিলে, সেই পরিণীতা স্ত্রীর পক্বান্ন গ্রহণ করিতেন না। এরূপ প্রমাণ, প্রয়োজন হইলে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আগমোক্ত ধর্ম্মে জাতিভেদ এবং গোঁড়ামির প্রভাব বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন:—

"নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ জপার্চ্চনং।
নির্ম্মলং বসনঞ্চৈব পরিধান সমাচরেৎ।
বেদে শাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈবচ।
মন্ত্রেচৈ দৃঢ় জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা।
বলিবস্তুং তথা শ্রাদ্ধং নিত্য কার্য্য শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রং সমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।"

যার তার অন্ন গ্রহণের বিধি তন্ত্রেও নাই। আরও বিশেষ কথা, যাহার অন্ন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, এরূপ দক্র-বিরূপাঙ্গের অন্নগ্রহণবিধি, চিকিৎসা-শাস্ত্রেরও অনুমোদিত নহে। অন্নগ্রহণে বিচার, বর্ণাশ্রমপ্রয়াসী হিন্দুর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনেকে বলিবেন উপরে যে অনুবিবৃত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করা হইল, বর্ত্তমানে ইহার কয়জন ব্রাহ্মণ, কয়জন ক্ষত্রিয়, কয়জন বৈশ্য এবং কয়জনই বা শূদ্র তোমাদের হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান আছেন?" একজনও হয়তো না থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শহীন এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া কোনও ক্রমে সঙ্গত নহে। আমাদের অধঃপতনে যে বর্ত্তমান সমাজের এইরূপ দুর্গতি তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এখন শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ় সংকল্পে উন্নতি-পথে প্রধাবিত হইলে, কালে যে আমরা স্বস্থান প্রাপ্ত হইব না

* জলসেবা নহে জলমেবাদদে—লক্ষ্মণ-আনীত গঙ্গাজল পান করিয়া ইত্যাদি।

একথাও স্বীকার করা যায় না। প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলিবেন "সে আশা নিতান্ত সুদূরপরাহত—এইক্ষণ যে একটু সামান্য গণ্ডির মধ্যে আমরা আবদ্ধ আছি, পাশ্চাত্যানুকরণে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিলেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।" তাহাতে মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে তাহার মীমাংসা নিতান্ত সুকঠিন। বরং বিপত্তিও বাড়িয়া যাইতে পারে। তখন শতমুখে শত শত বাধা যে আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে না—তাহার মীমাংসা কে করিবে? বরং হিন্দুর বিশেষত্ব যে হিন্দুত্ব—যাহা হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত—যাহার অভাবে হিন্দু ম্লেচ্ছবাদবাধ্য—সেই বংশপরম্পরাসঞ্চিত, সুরুচি-মার্জ্জিত অতুল্য জ্ঞানভাণ্ডার—অজ্ঞানান্ধ, তমসাচ্ছন্ন পঙ্কিল সলিলে জন্মের মত ডুবাইয়া দিতে হইবে। দেবগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ প্রভৃতি চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িবেন। হিন্দুর নামও বুঝি, জগতের ইতিহাসে মুছিয়া যাইবে।

শরীরের কোনও অংশে ক্ষত হইলে, অস্ত্রাঘাতে তাহার চিকিৎসা প্রয়োজন। শিরশ্ছেদন কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষিত গণ্যমান্য ভ্রাতৃগণ, এ সামান্য পীড়ায় তবে কেন যে এ বিষ প্রয়োগে প্রয়াসী, তাহা আমরা বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম। নাসিকায় গন্ধ লইতে পারিবেন না—তাই নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা। একথা শুনিয়া একটি শিশুও হাসি সংবরণ করিতে পারিবে না। মনস্বী লেখক ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'হিন্দুধর্ম্মের কড়া ক্রান্তি" স্মরণযোগ্য। বংশ-পরম্পরা আর্য্যদিগের মধ্যে যে সদাচার চলিয়া আসিতেছে, তাহাই অবশ্যই পালনীয়। যুক্তিতর্কে তাহা মিলাইয়া লইতে পারিলে স্বর্ণে-সোহাগাতুল্য। আমাদের বিচার-বুদ্ধি বর্ত্তমানে এতই বিকৃত ও তমোভাবাপন্ন হইয়াছে যে, আর্য্য ঋষিগণের যোগলব্ধ জ্ঞানের সমালোচনা করিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম। বিনা বিচারে তাঁহাদের পদানুসরণ আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একটি প্রচলিত গল্প আছে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন একদা তাঁহার জননীকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া "ইথুপূজা" করিতে নিষেধ করেন। গভীর রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—গঙ্গা-গর্ভে যেন শত শত নৌকা বোঝাই হইয়া রাশি রাশি অতি পুরাতন পুঁথি আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইল "এসব ইথুপূজার পুঁথি—তোমার বোধের অগম্য"—রঘুনন্দনের তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মাতাও নিদ্রাভঙ্গে পুত্রের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। রঘুনন্দন তখন জননীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"মা তুমি ইথুপূজা করিও—ইথুপূজা অশাস্ত্রীয় নহে—শাস্ত্রীয়। সকল দেশের সকল শাস্ত্রের সর্ব্বসমষ্টি-মীমাংসায় জগতের গূঢ় রহস্য অদ্যাপিও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। জ্ঞানবৃদ্ধ বৃহস্পতি তাই বলিয়াছেন:—

ক্রমশঃ—

হ।

সমাপ্ত।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত।

মূল, সমস্ত ভাষ্য ও টীকার আবশ্যকীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কৃত ভাষা, বঙ্গানুবাদ; এবং প্রতিশ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা। গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা আর নাই—ইহা সকলেই বলিতেছেন।

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তত্ত্বসমূহের এমন সুন্দর প্রণালীতে আলোচনা এখন পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের সাধনা দ্বারা জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা অন্য কোথাও এখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম ষট্‌ক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূল্য ৪।০; দ্বিতীয় ষট্‌ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় মূল্য ৪।০; তৃতীয় ষট্‌ক ১৩ অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় মূল্য ৪।০।

গীতা সম্বন্ধে মতামত।

কাশীধামের স্বামী প্রণবানন্দ পরমহংস লিখিয়াছেন:—

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমূল্য নিধি আমায় দি'চ্চ এর তুলনা নাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদের যত রকম ভাষ্য টীকা আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা যা আমার চ'খে পড়েছে,—তোর দয়ার কাছে তাঁদের দয়া আমার অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। তাঁরা সংস্কৃত লিখে

আমার বোধের অগম্য করে রেখেচেন; কিন্তু তোমার গীতা যেমন সরল তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভরা। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে তোমার গীতাই গুরুরূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। যতদিন তুমি আমার হাতে "ধ্রুবনীতির্ম'তির্ম্মম" না দি'চ্চ তত দিন তোমার দয়াল বল্‌তে আমার জিহ্বা আপনা আপনি সংকোচ হ'চ্চে।

রাম! তোমার দেহটা চির দিনের নয়, এই ভেবে গীতাকে শীঘ্র আমার হাতে দাও--এই আমার ব'ল্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, মহাশয় লিখিয়াছেন ;---

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমদ্ভাগবদ্‌ গীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম। নির্ঘণ্ট ও পাঠক্রম অতি সুন্দর, অনুবাদের ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ;---

একটু একটু মনে পড়ে ৺পিতৃদেব বহু চেষ্টা করিয়া একখানি হাতের লেখা গীতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে আজ পঞ্চান্ন বৎসরের কথা। ইদানীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন সভ্য ভাষা নাই যাহাতে গীতা অনুদিত না হইয়াছে। সভ্যজগতের বহু স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতদ্বয় দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সুগোছ ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল; এবং দুইখানি পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু "উৎসব" অফিস হইতে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতা সংস্করণ বাহির হইতেছে তাহার নিকট সকলেই হেটমুণ্ড হইতে হইবে। এই বিরাট্‌ গ্রন্থে যে প্রকার সুপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য মজুমদা'র মহাশয়! হৃদয়ের ভক্তির প্রাখর্য্য না থাকিলে লেখনী হইতে এবম্বিধ অমৃতময় কথা লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যবান্‌ লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখনও সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পাপের ধূলা মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব।

শোভাবাজারের ৺মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম, এ, মহাশয় মান্যবরেষু।

প্রণামনিবেদনমিদং

আপনার প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গানুবাদ ও ভাষা সরল ও সুমিষ্ট। গীতার তত্ত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য্যবোধের সহিত

সহজ ভাষায় লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই গীতা পাঠে দুর্ব্বোধ্য গীতার গূঢ়মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া দেখিতে বিশেষ অনুরোধ করি, যাঁহাদের অদৃষ্ট শুভ তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কার্য্যে আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে আপনাকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। জগতে আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই ধন্য। গ্রন্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের সকলেরই পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এরূপভাবে বঙ্গভাষায় গীতা আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। আপনার বিশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল সার্থক হইল। ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৮ সাল।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাদুর,
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভরতপুর,
পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্যান্য স্বাধীন





রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত—
কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল।

গুণে অদ্বিতীয়! শিরোরোগের মহৌষধ। গন্ধে অতুলনীয়!

জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকে না, মাথায় টাক পড়ে না। যাঁহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে জবাকুসুম তৈল নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন এবং সকলেই জবাকুসুম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুসুম তৈলে মাথার চুল বড় নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্য মহিলারা পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাশুল ।৹ আনা। ভিঃ পিতে ১৷৹। ডজন (১২ শিশি) ৮৸৹ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] শ্রাবণ ১৩২১ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১০নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে"

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৹ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য।৹ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম।৹ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪৷৹, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷৹, ¼ পৃষ্ঠা ১৷৹, সিকির অর্দ্ধেক ৸৶৹ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

আকাঙ্ক্ষা।

শুচিস্নাত করি রতন মন্দির,
অগুরুচন্দন সাজে,—
বড় সাধ ছিল সাজাব যতনে
আমার হৃদয়রাজে!
(দেখি) তোমার মন্দিরে বাসনার কীট
কখন্ লয়েছে বাসা,—
তোমার আসন দিয়েছি তাহারে;
আজো' না মিটিল আশা।
দেবতা আমার! চির প্রিয় সখা,
আজো' কি ফিরাবে মোরে?
যতনে জ্বেলেছি যে হিয়া-প্রদীপ
কেমনে নিবাব তারে!
সুপ্তি-জাগরণে স্বপনে-বাঁধনে
জীবন বহিয়া যায়;

নয়ন-নীলিমা আজো মুছিল না,
এ মোহ ঘুচান দায়।
দিবস রজনী, কাল--ব্যবধান,
ভুলাবে কবেগো আসি?
বাসনার কীটে চরণে দলিয়া
দাঁড়াবে মধুর হাসি॥

মৃঃ—

যিনি ইচ্ছুক তাঁহার জন্য।

স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও, সুকৃতিশালী হও বা দুষ্কৃতিশালী হও, অত্যন্ত বিষয়ী হও বা বিষয়-বিরাগী হও, অবকাশশূন্য আফিসের চাকুরী-নিরত ব্যক্তি হও বা অবসরপ্রাপ্ত চাকুরী-বিরত ব্যক্তি হও, যদি বুঝিয়া থাক যে, ধর্ম্মপ্রবাহ লাভ ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি হইতেই পারে না, ইহপরকালের গতিও লাগিতে পারে না—যদি এইটি বুঝিয়া থাক অথচ এতাবৎকাল ধরিয়া স্থায়ী ভাবে কোন কিছুই ধর্ম্মপ্রবাহ ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া থাক, তবে একবার কিছুদিন ধরিয়া নিম্নলিখিত নিয়মে চলিতে চেষ্টা কর। করিয়া দেখ, যদি হয় গতি ফিরিয়া যাইবে, যাইবেই নিশ্চয়। আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি না হয়—তবে য হয় কর।

(১) বিষ্ণু স্মরণ।
(২) প্রণাম অভ্যাস।
(৩) প্রার্থনা অভ্যাস।

(ক) সকল ভাবনায়, সকল বাক্যে, সকল কর্ম্মে যেন অগ্রে তোমাকে স্মরণ করিয়া, তোমাকে জানাইয়া, তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া করিয়া ভাবনা, বাক্য ও কার্য্য করিতে সক্ষম হই।

(খ) 'আমি তোমার' এইটি যেন সকল সময়ে বেশ করিয়া স্মরণ করিতে পারি।

গ) তোমার নামটি যেন কখন ছাড়িয়া না থাকি। স্মরণ, প্রণাম, প্রার্থনা সকল সময়েই যেন মুখ্যপ্রাণ যে শ্বাস তাহাকে অবলম্বন করিয়া, শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বদা নাম জপ রাখিতে পারি।

(ঘ) জপে পরিশ্রান্ত হইলে আমার হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া তুমিই যে নির্গুণ সগুণ অবতার হইয়া সর্ব্বকালে সর্ব্ববস্তু ব্যাপিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছ, ফিরিতেছ—এই ভাবটি লইয়া খণ্ড আমি অখণ্ড তোমাকে ছুঁইতেছি—তোমার পাদপদ্মে মিশিতেছি—এই ধ্যানে যেন স্থির হইতে পারি।

(ঙ) আবার ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে যেন বিশেষ চেষ্টায় সুবিধা খুঁজিয়া লইয়া একান্তে নির্জ্জনে গিয়া একাকী বহুক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারি। আর বসিয়া বসিয়া, তোমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—হে আমার দেবতা, তুমি কে, কিরূপেই বা তুমি আমাতে আছ, সর্ব্বত্র আছ সব সাজিয়া আছ, আমিই বা তোমাতে কিরূপে আছি, সবই বা তোমাতে কিরূপে আছে; আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎই বা কিরূপে স্বপ্নমত তোমাতে ভাসিয়াছে; এই দেহই বা কিরূপে রজ্জুতে সর্প-ভাসার মত তোমাতে ভাসিয়াছে; স্ফটিকশিলার পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষলতাদির ছায়ার মত অসত্য চিত্তস্পন্দনগুলি মূর্ত্তি ধরিয়া কিরূপে তোমাতে ভাসিয়া—"একমেবাদ্বিতীয়ং" যে তুমি তোমাকে বহুরূপে দেখাইতেছে; ফলে আমি কে, তুমি কে, জগৎ কি—ইহা বিচার করিয়া যাহা সত্য তাহাতে সমস্ত লয় করিয়া কি জানি কি ভাবে যেন স্থিতিলাভ করিতে পারি। আর মহামৎস্যের নদীর উভয়কূলে বিচরণ করার মত মায়ানদীর জাগ্রৎস্বপ্নকূলে ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া সুষুপ্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চেতোমুখ, আনন্দভুক্ হইয়া আনন্দময় আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইতে পারি। এক কথায় স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তিতে ইচ্ছামত ভ্রমণ ও ভ্রমণ নিবৃত্তি করিয়া সমকালে এক হইয়াও বহু হইয়া, ও কি যেন কি করার মত করিতে পারি।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর যোগাসনে বসিয়া স্মরণ, প্রণাম, প্রার্থনা অভ্যাস, পরে অন্যান্য প্রাতঃকৃত্য করিয়া

(৪) সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম।

(৫) পরে স্তবাদি পাঠের পর স্বাধ্যায়।

স্বাধ্যায় জন্য উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, ভাগবত—ইহাই যথেষ্ট। পরিশ্রান্ত হইলে অন্যান্য পুরাণ পাঠ।

এইভাবে যতদূর পার কর—তার পরে তিনি।

ইতি—

জীবের দুঃখ।

৪র্থ প্রবন্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাছে মনে হইয়া যায়, জীবের দুঃখের প্রতীকারের কথা পাড়িয়া এ সব অসম্বদ্ধ প্রলাপ কেন - ইহা অপেক্ষা যাতে লোকে দুমুঠো খেতে পায় অথবা যাদের খাবার সংস্থান আছে, তারা দুটো রঙ্গরসের কথা পড়িয়া যাতে একটু তৃপ্তি পায়—তা হউক ক্ষণিক তৃপ্তি, তাতেই বা ক্ষতি কি—যাহাতে সমাজের একটু উপকার হয় এমন লেখা লেখাইত ভাল।

আমরা বলি, প্রাচীন ভারতের সহিত নবীন জগতের এ বিষয়ে বড় বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। নবীন জগৎ উপন্যাস লিখিয়া বা ডিটেক্‌টিভের গল্প রচিয়া মানুষের মনকে সুস্থ রাখিতে চান, আর প্রাচীন ভারত চলিতে উপদেশ করেন অন্য পথে। দেশের ধনবৃদ্ধি যাহাতে হয়, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা যাহাতে হয়, দেশের সম্মানরক্ষা যাহাতে হয়—উভয়েই বলেন তাহা কর; কিন্তু প্রাচীন ভারত ইহাও বলেন যে, যে কর্ম্ম করিবে তাহা নিষ্কাম ভাবে কর, তবেই জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স সমকালে করিতে পারিবে। ঈশ্বরকে যদি বাদ দাও তবে নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেই পারে না; ঈশ্বরকে যদি বাদ দাও তবে নিজের, জগতের বা সমাজের যথার্থ কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইবে না। নিষ্কাম কর্ম্ম কি বুঝ, বুঝিয়া সকল কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে প্রাণপণ কর, আপনিই বুঝিবে আত্মবিচাররূপ নিঃশ্রেয়সের শক্তি তোমায় কিরূপে জন্মে। যতদিন সংসার আছে, কর্ম্ম আছে বলিয়া তোমার ধারণা আছে, ততদিন তোমায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইবে। পরে কর্ম্মজা সিদ্ধি যখন হইতে থাকিবে, তখন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি জন্য তোমাকে আমি কি, জগৎ কিরূপ, আত্মবিচার করিতে হইবে। একটি কর্ম্ম গৃহীর, অন্যটি সন্ন্যাসীর। এই দুয়ের সম্বন্ধও আছে। গৃহীর সংসারনির্ব্বাহ কর্ম্ম আত্মবিচারের শক্তিলাভ জন্য। যদি তাহা না হইত, তবে ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করিতেন না। কর্ম্ম করা কালেও আত্মবিচারের ব্যবস্থা আছে। যদি তাহা না থাকিত, তবে স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা কেন থাকিবে? সন্ন্যাসী সর্ব্বদা ব্রহ্মাত্মবিচার অর্থাৎ আমি কি, জগৎ কি, এই বিচার লইয়া থাকিবেন। এই

বিচার সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে যিনি পারেন তাঁহার আর সংসার হয় না। আবার নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম না করিয়া আসিলে কখনই আত্মবিচার লইয়া সর্ব্বদা থাকা যায় না। আবার যতদিন আত্মবিচার না করিতে পার, ততদিন জীবের দুঃখও কখন সমূলে বিনষ্ট হইবে না। শ্রুতি এই জন্য বলেন "তরতি শোকমাত্মবিৎ"।

গৃহী ও সন্ন্যাসীর কর্ম্ম লইয়াও নবীন জগতে নানাপ্রকার মতামত চলিতেছে; তাই অতি সংক্ষেপে বিবাদ মিটাইবার কথাও একটু বলিয়া রাখা ভাল।

সম্যক্‌রূপে কর্ম্মের ন্যাস বা ত্যাগই সন্ন্যাস। সম্যক্‌রূপে কর্ম্মত্যাগ জন্যই অথবা সন্ন্যাসের জন্যই ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা বা ফল সন্ন্যাস করার ব্যবস্থা। কর্ম্মত্যাগ হইতেছে ইহা কখন বুঝা যাইবে? যখন নিষ্কাম কর্ম্ম ঠিক ঠিক হইতে থাকিবে, তখন বুঝা যাইবে কর্ম্মত্যাগের সময় আসিতেছে। তখন বুঝা যাইবে কর্ম্ম করি কিন্তু ফলাফলের দিকে লক্ষ্য থাকে না, যখন বুঝা যাইবে কর্ম্ম করি কিন্তু শ্রীভগবানের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে একবারও ভুল হয় না, কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার প্রসন্নতার অনুভবে প্রাণ ভরিয়া যায়, আর তাঁহার সুন্দররূপে, তাঁহার মনোহর গুণে মন ভরপূর হইয়া যায়, সর্ব্বশেষে কর্ম্ম করিয়াও যখন 'অহংকর্ত্তা' এই অভিমান আর জাগে না—এক কথায় ফলকাঙ্ক্ষাত্যাগ, ঈশ্বর প্রসন্নতা-অনুভব ও অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ, নিষ্কাম কর্ম্মের এই অঙ্গগুলি যখন কর্ম্মকালে ক্রম অনুসারে হইতে থাকে, তখন বুঝা যায় কর্ম্মত্যাগের সময় আসিয়াছে, একান্তে থাকার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাসের সময়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মচর্য্য কালেই এই অবস্থা আসিয়াছিল তাই তিনি গৃহী না হইয়াও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু নবীন জগতের সকল সন্ন্যাসীরই কি সেই অবস্থা হইতেছে? যদি সকলের ইহা হইত তবে কি শ্রুতি বলিতেন ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, পরে বনী হইবে, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে? ইহাই শ্রুতির সাধারণ নিয়ম। ভগবান্ শঙ্করের মত আজ নবীন জগতে কয়জনকে দেখা যায়? নবীন জগতের অধিকাংশ সন্ন্যাসীই কি আত্মপ্রতারণায় পড়েন নাই? নতুবা সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমের জন্য গরুর আবশ্যক হয়, আবার মোকদ্দমাও চালাইতে হয় ইহা কিরূপ সন্ন্যাস? ইহা কিরূপ সর্ব্বদা আত্মবিচার লইয়া থাকা? অনাসক্ত ভাবে সংসার করা বা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলা ইহা কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ অবস্থা মাত্র।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বোক্ত কথা উত্থাপন করিলাম মাত্র। বলিতেছিলাম, নবীন জগৎ বলিতে চান অন্ততঃ নবীন পন্থার বহুলোকে বলেন "জীবের দুঃখ চিরদিনই আছে, চিরদিনই ছিল; আর চিরদিনই থাকিবে"। দুখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতেই পারে না। উত্তরে প্রাচীন ভারত বলেন, হয় বৈ কি? সকল বস্তুই ভূমিকা অনুসারে সম্পন্ন হয়। এই যে মৃত্যুকালে কোন কোন সাধকের হাসিতে হাসিতে দুঃখের সাগর এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে দেখা যায়, ইহা কেন হয়? আবারি কোন কোন যোগীকে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ ছাড়িতে দেখা যায় ইহাই বা কি? সাধারণ লোকের মৃত্যু-দৃশ্য অতি ভয়ানক সন্দেহ নাই। তা বলিয়া কেহই মৃত্যু অতিক্রম করে না, ইহা বলা যায় কি? ইহার উপরে প্রাচীন ভারত উপদেশ করিতেছেন—মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম জন্যই ভগবান্‌কে আশ্রয় করিতে হয়। অত্যন্ত কঠিন দুঃখই মৃত্যু। এই যে মৃদুহাসিনী, মধুরভাষিণী, শত শত "নী" যুক্তস্ত্রী-বলনা, ইহার মৃত্যুযাতনা দূর করিবার কোন উপায় কি নবীন জগৎ নিশ্চয়ই করিয়াছেন? এই যে পুত্র-কন্যা আজ যাহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, কাল তাহাকেই অকালে কঠিন কাষ্ঠশয্যায় শায়িত করিয়া সেই সুন্দর মুখে আগুন জ্বালিয়া দিয়া এস, বল এই অকাল মৃত্যুর কোন প্রতিকার কি নবীন জগতের উন্নতি আনিয়া দিতেছে? অন্য সব দুঃখ দূর করিবার জন্য কর্ম্ম কর, কিন্তু মৃত্যুরূপ ভীষণ দুঃখ অতিক্রম জন্য প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মকথাও শ্রবণ কর। তবেই ত প্রাচীন ভারত ও নবীন ভারত এক সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।

প্রাচীন ভারতের শ্রীগীতা বলেন, যাঁহারা ভক্ত, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেন "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ"—আমি তাহাদিগকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া থাকি।

মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণ বড় হৃদয়বিদারক! এই প্রাণ-উৎক্রমণ যদি রহিত করিতে চাও, তবে প্রাচীন ভারতের পরামর্শ মত সাধনা করিয়া জ্ঞান লাভ কর। শ্রুতি বলেন, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। ইহৈব সমবলীয়ন্তে" জ্ঞানীর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। এইখানেই পূর্ণব্রহ্মের সহিত ইহার মিশ্রণ হয়। এই খণ্ড চৈতন্যের সহিত অখণ্ড চৈতন্যের মিলন ব্যাপারটি ভক্তিযোগ, আর খণ্ডের উপাধিযুক্ত অবস্থা হইতে উপাধিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারটিই জ্ঞানযোগ, ইহাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

তাই বলিতেছিলাম, জীবের দুঃখ দূর করিবার মূল কথাটির সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের উপদেশ শ্রবণ করিতে কি নবীন জগৎ রাজী আছেন? এই উপদেশ শ্রবণ করিতে হইলে পুরুষের পবিত্রতা, নারীর সতীত্ব, সাধকের একাগ্রনিরোধ ভাব এইগুলির পরিত্যাগ ত হইতে পারে না। এইগুলির জন্যই ঈশ্বরধারণাটি ঠিক ঠিক হওয়া চাই। সেই জন্য জীবের আত্মাই যে পরমাত্মা, ইনিই যে অবতার, এইগুলিও জানা চাই। জানিয়া সাধনা করাও চাই।

আত্মাই যে পরমাত্মা আরও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করা আবশ্যক। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা একরূপ বলা হইয়াছে। এখন আরও স্পষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস করা হউক, তার পরে অবতারের কথা পাড়া যাইবে।

* কোন গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্" শ্লোকের ব্যাখার এক স্থানে এই ভাবের কথা লেখা আছে—হে আমার দেবতা—আমি আর কাহার হইব? আমি কামের হইতে চাহি না, আমি ক্রোধের হইতে চাহি না, আমি লোভের হইতে চাহি না, আমি কাহারও ইন্দ্রিয়ের হইতে চাহি না, আমি কাহারও মনের হইতে চাহি না, আমি সংসারের হইতে চাই না, আমি কোন কিছু ক্ষণস্থায়ীর আর হইতে চাই না। সকলেরইত হইতে চাহিয়াছিলাম। বড় দাগা পাইয়াছি, বড় জ্বালায় জ্বলিয়াছি। আর আমি কাহারও হইতে পারি না। আর কাহার হইব? আমি তোমার হইলাম।

সংসারের ধাক্কা খাইয়া, মনের অশান্তিতে জ্বলিয়া-পুড়িয়া প্রায় লোককেই জীবনে বহুবার এই কথা বলিতে হয়, আর শেষ কালে বুঝি সকলকেই এই কথা বলিতে হয়। যাহারা পশুপক্ষিযোনিতে নামিয়া যায়, তাহাদিগের মুখ হইতেই বুঝি একথা বাহির হয় না। সাধু প্রকৃতির মানুষ মাত্রকেই যখন ইহা বলিতে হয়, তখন কথাগুলি একটু ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করা কি উচিত নয়?

"আমি তোমার" শরণাপত্তির এই প্রথম অবস্থাতে যে পূর্ব্বোক্ত বিলাপ-গাথা গায় সে-ই বা কে, এবং যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই বিলাপ করে তিনিই বা কে ইহাই বুঝিবার বিষয়। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। দৃষ্টান্ত ভিন্ন অতি সূক্ষ্ম কথা বেশ করিয়া ধারণা করিবার অন্য উপায় নাই। শ্রীভগবান্‌কে স্থায়িভাবে ধ্যান-ধারণায় আনিতে হইবে, এই জন্যই স্থূল অবলম্বনই প্রশস্ত।

* জীবের দুঃখ প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের এই অংশ পূর্ব্বে ১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত প্রবন্ধের অঙ্গ বলিয়া একটী প্রবন্ধ আবার প্রকাশিত হইল।

বিশ্বাসে যাহা হয়, তাহা কাজ চলা গোছ। কাজটাই সে স্থানে মুখ্য, আর শ্রীভগবান্ গৌণ মাত্র। এখন "আমি তোমার" বুঝিবার দৃষ্টান্ত আনা যাউক।

"ভদ্রা" নামক পুস্তকের একস্থানে আমরা পড়িয়াছি "ভদ্রা এই স্থানে উপবেশন করিয়া কখন সাগর, কখন নদী, কখন উভয়ের মধুর মিলন ভাবিতেছিল। আর একটু দূরে ঐ নদীর একটি শাখা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত আসিয়া আর যাইতে পারিতেছে না। সমুদ্রতীরে রাশীকৃত বালুকা। ঐ বালুকাস্তূপ অতিক্রম করিলেই নদী সমুদ্রে গিয়া মিশিত। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নদী শুনিতেছে, কিন্তু বালুকারাশি অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ক্ষুদ্র নদীর নাই। ভদ্রা কত কি চিন্তা করিতেছে। ভাবিতেছে, যদি কোলে করিয়া নদীকে সমুদ্রের উপরে দিয়া আসিতে পারিত!" ইত্যাদি।

আমরা স্বচক্ষে এই রকমের একটি ক্ষুদ্র নদী দেখিয়াছি পুরীধামে চক্রতীর্থে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নদীটি অন্য স্থানে শুষ্ক খাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু চক্রতীর্থটুকুতেই নদীটি থাকে। চক্রতীর্থ ও সমুদ্র এই দুয়ের মধ্যে বালুকাস্তূপ। নদী সর্ব্বদাই সমুদ্রগর্জ্জন শুনিতেছে। সীমাশূন্য সমুদ্রের নীলাম্বুরাশির প্রবল তরঙ্গভঙ্গও বুঝি ক্ষুদ্র নদী দেখিতেছে। আর মনে হয় নদীকে সমুদ্রই যেন জলবিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নদীর প্রাণভরা সাধ বুঝি নদীনাথ সমুদ্রে পড়া। ক্ষীণ বালুকাস্তূপ ভেদ করিয়া ক্ষুদ্রনদী কিন্তু সমুদ্রে মিশিতে পারিতেছে না। না পারিলেও সাধত যায় না। যাহাতে মিশিতে প্রাণ চায়, যাহার বহিত মিলন হইয়া মিশ্রণ হইলে প্রাণের সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়— এত নিকটে তারে পাইয়া—প্রতিনিয়ত তার লীলাতরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়াও যে তাতে মিশিতে পারি না, এই ত যাতনা। আরও যখন মনে হয় সমুদ্র যেন নদীকে তার রূপরাশি, তার অনন্ত রত্নরাজি দেখায় তথাপি কোলে তুলিয়া লয় না, সে ত সব পারে তবু যেন কি বুঝিয়া বিশাল বক্ষে ধরে না, তখন না জানি কেমন হয়।

কিন্তু নদীর অন্তরের প্রবল বাসনা—উগ্র আকাঙ্ক্ষা—এ আকাঙ্ক্ষা কি সমুদ্র একবারেই অসম্পূর্ণ রাখেন? তাই কি হয়? অন্য সকল অভিলাষ ছাড়িয়া, অন্য সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া যদি কেহ তার অনুরাগ গায়ে মাখে—তার অনুরাগে অনুরাগিণী হইয়া তারে পাবার জন্যই উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে তারে ভজে, তবে কি সে তারে উপেক্ষা করিতে পারে? না তাহা হয় না। শুভ সময় বুঝিয়া সাগর কখন কখন নদীকে সস্নেহ আলিঙ্গন করে। আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি।

একদিন পূর্ণিমার চন্দ্রের আলোকে সমুদ্রের ও নদীর বড় শোভা হইয়াছে। আমারা চক্রতীর্থে সান্ধ্যক্রিয়া করিতেছি। দেখি সমুদ্র ধীরে ধীরে বালুকাস্তূপ সরাইয়া বড় মধুর শব্দ করিয়া নদীবক্ষে আসিতেছে। আমরা চক্ষু বুজিয়াই ছিলাম। নদী-সমুদ্রের সুন্দর মিলন-শব্দে, সুন্দর কুল কুল ধ্বনিতে, চক্ষু চাহিয়া দেখি, সমুদ্র বালুকাস্তূপ সরাইয়া নদীতে আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে এক হইয়া গেল। নদীর জল বাড়িয়া উঠিল। আমরা দূরে সরিয়া আসিয়া যতক্ষণ দেখিলাম, বড় আশা প্রাণে জাগিল। গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঐ মিলন ভুলিলাম না। তার পরদিন প্রভাতেই ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম যেমন সমুদ্র তেমনই গর্জ্জন করিতেছে, যেমন নদী তেমনই আছে। মধ্যে সেই বালুকাস্তূপ। কেবল নদীর জল একটু বাড়িয়াছে। আর নদী সমুদ্রসঙ্গ করিয়া সমুদ্রের গন্ধ গায়ে মাখিয়া রাখিয়াছে।

এই দৃষ্টান্তই "আমি তোমার" বুঝিবার দৃষ্টান্ত, আমরা বলিতেছিলাম। আকাশ ত সর্ব্বব্যাপী। একটি ঘট কোনরূপে ভাসিল। ঘটের ভিতরেও আকাশ, আর ঘটের বাহিরেও চারিধারে আকাশ। সেইরূপ আকাশের মত অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য সর্ব্বত্র। সেই ঘট, সেই চৈতন্য—আকাশের কোন স্থানে উঠিল। ভিতরে চৈতন্য, বাহিরে চৈতন্য, দেহটাত জড়ই ছিল। কিন্তু চৈতন্য যখন ভিতরে-বাহিরে দেহটাকে ব্যাপিয়া রহিল, তখন জড় হইয়াও উহা চৈতন্যের মত হইল। হইয়া চেতন দেহ ভাবিল, দেহের মধ্যে চৈতন্য। দেহের মধ্যে চৈতন্য এইটাই ভ্রম। ইহাই অজ্ঞান। ঘটের মধ্যে আকাশ যেমন পরিচ্ছিন্ন মত দেখায়, সেইরূপ চৈতন্যদীপ্ত দেহ যখন আপন মধ্যবর্ত্তী চৈতন্যকে পরিচ্ছিন্নমত দেখে, তখনই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আধার স্বরূপ জীবভাবের উদয় হয়। অখণ্ড চৈতন্যকে খণ্ডমত বোধ করাই জীবত্ব। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ারই এই কার্য্য। মায়াই অজ্ঞান, অজ্ঞানই অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন মত দেখায়, অখণ্ডকে খণ্ডমত করিয়া তুলে। সীমাশূন্য পরব্রহ্মকে সসীম জীবভাব মত প্রকাশ করে। আকাশের বহু হওয়া যেমন স্বরূপতঃ মিথ্যা—আকাশের গ্রামে প্রবেশ করা যেমন তত্ত্বতঃ কল্পিত মাত্র, সেইরূপ শ্রুতি বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি।" এ কল্পনা কিন্তু মানুষের নহে। "ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এ কল্পনা কিন্তু মানুষে করে না। আবতারের রূপ মানুষে কল্পনা করিতে পারে না। এ কল্পনা মায়ার। নিরাকার ব্রহ্মই মায়া অবলম্বনে মায়া-মানুষ মায়ামানুষী

হয়েন। সাধারণ মানুষের যে আকার হয়, সেটা মানুষের কর্ম্মজন্য। কর্ম্মজন্যই জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশ-ক্লেশ ভোগ হয়। শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণে কোন জঠরযাতনা নাই। কারণ তিনি কোন কর্ম্মের বশীভূত নহেন। সকল কর্ম্মের আধার যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিই তাঁহার বশীভূত। তিনি "অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" বলিতেছিলাম, মানুষের দেহধারণ ও শ্রীভগবানের দেহধারণ, একরূপ কারণে হয় না। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা আপন অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপে থাকিয়াও দেহবান্ মত হয়েন, আর চৈতন্যদীপ্ত মানুষের দেহ মনে করে, দেহমধ্যবর্ত্তী চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেহাত্মবোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখী হইয়া যায়। এই স্বস্বরূপের আত্মবিস্মৃতিই জীবচৈতন্যের সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ।

"আমি তোমার" এই কথার মধ্যে যে আমিটি পাই, সেই আমিটিকে দৃষ্টান্তের ক্ষুদ্র নদীর মত করিয়া বুঝিতে বলিতেছি। আর আমিটি যাঁহার হইতে চায়, তাঁহাকে সমুদ্রের মত ভাবিতে বলিতেছি। নদী ও সমুদ্রের মিলন-প্রতিবন্ধক যে বালুকাস্তূপ তাহাকেই বলিতেছি এই দেহটা। অথবা দেহ-বোধটা। দেহের ভিতরেও তিনি, দেহের বাহিরেও তিনি—কিন্তু দেহব্যাপী চৈতন্য এই দেহ-বালুকাস্তূপ ভুলিয়া যাইতে পারিতেছে না। বাহিরে সদাই তাঁহার লীলাতরঙ্গভঙ্গ দেখিতেছে, শুনিতেছে—কিন্তু বালুকাস্তূপ অতিক্রম করিয়া তাঁহাতে মিলিয়া-মিশিয়া যাইতে পারিতেছে না। তিনি কিন্তু উৎকণ্ঠা-স্ফুটিত সাধকের অনুরাগভজনে পুণ্যমুহূর্ত্তে কখন কখন সাধককে হৃদয়ে ধরিতেছেন। ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, আমার সহিত মিলন কত মধুর দেখ। শতবার ডাকিতেছেন আয়রে দুঃখী জীব! আমার বক্ষে আয়! আর কোথাও তোর শান্তি নাই। মিলনের সামর্থ্য নদীর নাই। জীবের আছে। তাঁহার আজ্ঞামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেই—নিয়মমত করিলেই মানুষ তাঁহাতে মিলে। এই মিলনের প্রথমস্তরই "আমি তোমার"। এখন আমরা অবতারের কথা পাড়িব।

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

মিলনান্তে।

শ্রীমতী রাধিকার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের প্রথম মিলন হইয়া গিয়াছে। আনন্দময়ী বৃন্দা এবং বিশাখার কর্ম্ম-কৌশলেই রাধাকৃষ্ণের এই প্রথম মিলন সংঘটিত হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

আজ শুক্লাষ্টমী, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; বৃন্দাবনস্থ যাবট নামক পল্লীতে সুবৃহৎ অট্টালিকার কোন একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে শ্রীমতী রাধিকা এবং তাঁহার প্রিয় সখী ললিতা বসিয়া আছেন, উভয়েই নীরব। উভয়ের মুখমণ্ডলই যেন কি এক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতী কহিলেন, সখি! আমি শ্যামসুন্দরের প্রেমসাগরে ডুবিয়া গিয়াছি, আর আমার উঠিবার সাধ্য নাই। শ্রীমতীর কথা শেষ না হইতেই ললিতা কহিতে লাগিলেন, তা জানি; বহুদিন পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সখি! যাঁহার রূপ দেখিয়া "অঙ্গের পরশে কিবা হয়" বলিয়াছিলে, সেই বিশ্ববিমোহন রমণীয় দর্শনের অঙ্গ স্পর্শ করিলে যে তোমার আপন বলিতে কিছুই রহিবে না, ইহা আমরা তখনই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু বল দেখি সখি! যখন প্রথম মিলনেই এই দশা, তখন ইহার পরিণাম যে কি হইবে—ইহা ভাবিতেও যেন আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। সখি! এই যে শ্যামপ্রেমে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া আছ, বল দেখি, ইহা কি তোমার রূপজ মোহ নহে? তুমি অদ্যাবধি তাঁহার কি কোন মানসিক বৃত্তির পরিচয় পাইয়াছ? জগৎ গুণের পক্ষপাতী; তুমি সেই গুণের পরিচয় না পাইয়া কেবল মাত্র রূপ দেখিয়া এতদূর আত্মহারা হইয়াছ, জানি না এই আপাতমধুর কৃষ্ণপ্রেমের পরিণাম কোথায়?

শ্রীমতীর চক্ষে জল আসিয়াছে; পরিণামের কথা যাহা ললিতা কহিতেছেন—শ্রীমতীর যেন তাহা ভাবিতেও প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগে। তাই বলিলেন—

অল্প বয়স মোর,　　শ্যামরসে জর জর,
না জানি কি হ'বে পরিণামে।
নয়ন মুদিয়া থাকি,　　অন্তরে গোবিন্দ দেখি,
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে॥

যদি চলি যাই পথে, (যেন) শ্যাম যায় মোর সাথে,
চরণে চরণ ঠেকাইয়া।
ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি, কেহ কোথা নাহি দেখি,
মরি থাকি যেন মুরছিয়া॥
সখি! এ ছার জীবনে নাহি দায়।
তিল তুলসী দিয়া, সমর্পিণু মম হিয়া,
জনমের মত রাঙ্গাপায়॥
যোগিনী হইয়া যাব, শ্রবণে কুণ্ডল দিব
এ ছার সংসার পরিহরি।
কৃষ্ণনাম লব মুখে, জনম যাইবে সুখে,
যদু কহে এই বাঞ্ছা করি॥

সখি! কেন আমি বাঁশী শুনিলাম, কেন আমি শ্যামসুন্দরকে দেখিলাম,—দেখিলাম যদি তবে কেন ভুলিলাম? সখি! আমি ভুলিয়াছিলাম বলিয়াই ভজিলাম। হায় তাহাতেও তো ক্ষতি ছিল না—শেষে মজিলাম। কেন আমি তাঁহাকে ভালবাসিলাম? শুনিয়াছিলাম ভালবাসা স্বর্গীয় জিনিশ, তাই মনে করিলাম বুঝি এই স্বর্গীয় ভালবাসার দিকে আনন্দ বিরাজ করে। আরও শ্রীকৃষ্ণ আমার, আমি শ্রীকৃষ্ণের,—ইহার অন্তরায় হইয়াই বা লোকে আমায় কি করিবে? ইহা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই যে, আমাদের এই মধুর প্রেম, ব্রজবাসীরা পরকীয়া ভাবে গ্রহণ করিবে।

পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর,
নিরমিল তার জল।
(কিন্তু) দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন-জ্বালা, জলের শেওলা,
পড়শী জিয়ল মাছে।

ফুল পানিফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছানিয়া খাইনু যদি।
অন্তর বাহিরে, কুট্ কুট্ করে,
সুখে দুঃখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী,
সুখ দুঃখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তাঁর ঠাঁই ॥

ললিতা। প্রিয়সখি! যাহা হইবার হইয়াছিল, বিধির লেখা অখণ্ডনীয়। এরূপ পদস্খলন হওয়া অনেক কুলকামিনীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, তাই বল্‌ছি যখন একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমের এত অন্তরায়, তখন তাহা হইতে ফিরিয়া আসাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

শুন অনুরাগিণী, কি তোহে কহব বাণী,
সতত ভাবহ কালা কানু।
নিরবধি আঁখি ঝুরে, পুলকে শরীর ভরে,
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল তনু ॥
অব তুঁহু শুন মোর কথা।
সে কালা কানুর প্রেমে, সদা হ'বে সাবধানে,
তবে সে ঘুচিবে ক্রমে ব্যাথা ॥
একে তুঁহু কুলবতী তাহে দুরজন পতি,
জানিলে পড়িবে পরমাদ।
এ পাড়া পড়শী যত, বিপক্ষ আছয়ে কত,
জগতে ঘোষিবে পরিবাদ ॥
যব তাহে পড়ে মনে, চিত দিবে আন কামে,
যেন লোকে নহে উপহাস।
ধরিবে আমার কথা, না ভাবহ অন্যথা,
যতনে কহয়ে প্রেমদাস ॥

রাধিকা। ললিতে! সব বুঝিয়াছি। পরিণামে যাহা হইবে তাহাও জানিতে পরিতেছি, কিন্তু অনুপায়। আর আমার ফিরিবার সাধ্য নাই। কৃষ্ণরূপে আমার নয়ন ভরিয়া গিয়াছে, শরীর স্পর্শসুখ স্মরণে মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হইয়া উঠে। শ্রবণযুগল সুমধুর বংশীরবে পূর্ণ হইয়াছে। নাসিকা কৃষ্ণ-অঙ্গসৌরভে উন্মত্ত হইয়াছে, মুখ কৃষ্ণনাম ছাড়া অন্য নাম লইতে চাহে না, কৃষ্ণপ্রেমে আমায় দেহমন পরিপূরিত হইয়াছে। আমি কোন রূপেই আর মনকে ফিরাইতে পারিব না।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে হইতে সেখানে আরও পাঁচ ছয়জন সঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের নাম তুঙ্গবিদ্যা, সুদেবী, শ্রবণা, ফুলধনু ও রঙ্গদেবী।

(ক্রমশঃ)

(প্রাপ্ত)

মিলনে না মিশ্রণে।

সুখ কিসে? শান্তি কোথায়? দেখি সকলেই মিলিতে চায়। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী সকলেই সতত কি এক অপূর্ব্ব মিলন-প্রবাহে তরঙ্গায়িত। এমন কি, লতাও বৃক্ষের সনে মিলে, সৌদামিনী মেঘের কোলে মিলে, পশুপক্ষীরাও প্রিয়ের সনে মিলিতে ভালবাসে। কে না মিলে? সরসীতে হংস হংসীর সহিত না মিলিয়া ভাসিতে চায় না, পিপাসিত চাতকও নিদাঘের আকাশপতিত জলবিন্দু একা খেতে ভালবাসে না, চক্রবাকীর প্রিয় বিরহসূচক রব শুনিলে চক্রবাক স্থির থাকিতে পারে না, কোকিলও একা যেন কুহু কুহু রবে জগৎ-প্রাণে মাদকতা ঢালিতে চায় না, তটিনীও মিলিবার আশায় সবেগে মহাসমুদ্রে ছুটে, জীবনের আশা তুচ্ছ করিয়া জীবগণ গহন কাননে বা জলধিতলেও প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তথায় যে প্রিয়ের সনে মিলন হইবে। সকলেই সাথী খুঁজে, সকলেই মিলিতে চায়; মিলনে যে সুখ হয়, মিলনে যে আনন্দ জাগে, তাই জীব মিলন-প্রয়াসী। মিলনে যে "অবিদিত গতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ" কোথা হইতে রাত্রি চলিয়া গেল জানা যায় না, দিবসরজনী ক্ষণের ন্যায় অতি-

বাহিত হইয়া যায়; চন্দ্র উঠিল, অস্তমিত হইল কিছুই ঠিক নাই। মিলনানন্দের নিকট অনাহার—অনিদ্রাজন্য ক্লেশ অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

"ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে কি মা তার?
প্রাণে জাগে ধূর্জ্জটি যাহার"।

যেন প্রিয়ই সর্ব্বস্ব, প্রিয়ই জীবন। মিলনে অতি তুচ্ছ বস্তুও পরম রমণীয় হয়, যেন অতুল আনন্দ। জীবন ধন্য মনে হয়। তাই কবি গাহিয়াছিলেন—তবে কেন পবিত্রতাসতী পতিবিরহে নিরাভরণা আলুলায়িতকেশে ধূলিলুণ্ঠিতা? গন্ধামোদিনী সুহাস্যবদনা প্রফুল্ল-নলিনী যামিনীতে এখন কেন মলিনা? কেন বা আর গুঞ্জনমত্ত ভ্রমরমালাকে তেমন করে বক্ষে ধরে আদর করিতে চায় না? কুমুদিনী কেন বা তবে এখন প্রিয়বিরহে—বিরহিণী মনোমুগ্ধহাস্যে জগৎপ্রাণ সুশীতল করে না? চক্রবাক কেন বা আজ সুধাকর—কর বিরহে পাগল-প্রায়। যে জননী আজ পুত্রের মিলনে স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন, সন্তানের হাসিমাখা মুখখানি দেখিয়া যিনি আজ স্বর্গীয় সুখও তুচ্ছ করিতেছেন—কাল কেন পুত্রবিরহে তিনি পাগলিনী? সে সুখ, সে শান্তি আজ কোথায়? মিলন ত হইল, সকলেই ত একদিন মিলনানন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। কেহ পুত্রমিলনে, কেহ বন্ধুমিলনে, কেহ স্বামীমিলনে, কেহ বা ধনরত্নমিলনে, কেহ বা গুরুর সনে মিলে, কেহ বিদ্যানুশীলনে আনন্দস্রোতে ভাসিয়া রাত্রিকে অবিদিত গতযামা করিয়াছেন। কেন তবে আজ সকলেই ইঁহারা দুঃখসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন? শোকানল হৃদয়কে কেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে? কেন আজ এঁদের প্রাণ শেলসম মনে হইতেছে?

আনন্দ ত নিত্য, সে যে এলে আর যায় না; শাস্ত্রে যে তাঁকে—"এতদক্ষরং" "এতদমৃতং" বলিয়াছেন। শ্রুতি "আনন্দং ব্রহ্ম" রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী নহে, ইহা অমৃত; মৃত্যু বা বিনাশ ইহার নাই। তবে কেন একবার এসেই নষ্ট হয়? ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়া নিমিষের মধ্যেই কেন নিষ্প্রভ হইয়া যায়?

ঐ যে মহাত্মা গিরিকন্দরে অনশনে সতত চিন্ময়-ধ্যানে নিরত, নয়ন দুটীকে বাহ্য জগৎ হইতে সরাইয়া ভিতরে কি এক আনন্দরত্ন অন্বেষণে নিযুক্ত করিয়াছেন,—ইঁহার দেহটী তপঃক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ বা বল্মীকাচ্ছাদিত হইলেও, যেন

কি এক লাবণ্যমণ্ডিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল। মুখমণ্ডলে সততই যেন আনন্দধারা প্রবাহিত। কভুও ত আনন্দের অভাব নাই। তাই মনে হয় আনন্দ এলে আর যায় না; তবে বিষয়সনে বা প্রিয়মিলনে যে আনন্দ বা সুখ হয় উহা সুখের আভাস মাত্র; বস্তুতঃ সুখ নহে। একখণ্ড ঝিনুক দেখিলে হঠাৎ যেমন মনে হয় এটী রোপ্য, এবং রৌপ্য বোধ মাত্রেই যেমন আনন্দ হয়,—বিষয়সনে বা প্রিয়মিলনের আনন্দও ঠিক এইরূপ আভাস মাত্র। একটু প্রণিহিত মনে দেখিলেই, ঝিনুকে রৌপ্য বোধের ন্যায় বিষয়ে সুখবোধরূপ ভ্রম দূর হইয়া যায়।

মিলনে যদি বাস্তব সুখ না থাকে, শান্তি না হয়, তবে কেন গিরিরাজ-কন্যা অনশনে পঞ্চাগ্নিমধ্যে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ বিরহিণী রাধিকাই বা কেন শতবৎসর কভু অনশনে, কভু ভূমিশয্যায় আলুথালুকেশে দুঃখানলে ভস্মীভূত—প্রায় হইয়াছেন? তাহা কি প্রিয়ের সনে, বাঞ্ছিত ধনের সনে মিলিবার জন্য নহে? সুখের জন্য নহে? ইহাঁরা ত স্বয়ং ভগবতী।

সত্য, মিলিবার জন্য তাঁহারা কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু মিলিতে নহে, "মিশিবার" জন্য। তরঙ্গ বা বুদ্বুদ্ যেমন জলে মিশে, ঘটকাশ ঘটান্তে যেমন মহাকাশে মিশে, নদী যেমন মহাসমুদ্রে মিশে,—তদ্রূপ প্রিয়ের সনে, শক্তিমানের সনে মিশিবার জন্য, একীভূত হইবার জন্য, শক্তিস্বরূপিণী তাঁহারা কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। সাধনায় মিলন হইবে, মিলন হইলে মিশ্রণ হইবে। মিশিতে গেলেই প্রথম মিলন আবশ্যক। মিলন না হইলে যে মিশা যায় না, মিলন হইতে হইতে উহা দৃঢ়তর ঘনীভূত হইলেই দুইটী মিশিয়া যায়। গিরিরাজ-কন্যা শ্রীশ্রীভগবতী তপস্যায় মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত মিশিয়া শেষে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে জগৎকে দেখাইতেছেন,—দেখ জীব! মিশ্রণই সুখ, তাহাই আনন্দ। কিন্তু পূর্ব্বে মিলন আবশ্যক। মিলিত হইবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। যে মিলনে মিশ্রণ না হয়, তদাকারে পরিণতি না হয়, তাহা মিলনই নহে। উহাতে বাস্তব শান্তি অসম্ভব। প্রকৃত মিলনে চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণের ন্যায় জীবহৃদয় সবেগে আকৃষ্ট হয়; যেন মিশিতে চায়, পার্থক্য-টুকু ও সহ্য করিতে পারে না,—এইরূপে শেষে দুইটী মিশিয়া যায়। স্ত্রী—পুত্রাদি বিষয়সুখে মত্ত হইয়া যে মিলন হয়, তাহা অজ্ঞান হইতে জন্মে; উহা মিলনের আভাস মাত্র। জগতে অসংখ্য বহির্বস্তুর সনে মনের সংসর্গ হইয়া গিয়াছে, যেন

মিলনের ভাব হইয়াছে,—তাই দুঃখপূর্ণ, অশান্তিপূর্ণ বাহ্য জগৎ হইতে মনকে উঠাইয়া ফিরাইয়া আনিতে, কঠোর সাধনা বা দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্যরূপে কঠোর অভ্যাসের প্রয়োজন। মন উহাদিগকে আপন বলিয়া স্বীকার করতঃ সুখলোভে আশাবতী মরীচিকায় ঘুরিতেছে আর নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতেছে। তাই প্রথমতঃ মনকে উহাদের (বিষয়ের) দুঃখজনকত্বরূপ দোষ দেখাইয়া, নিত্য শান্তিময় চিদানন্দস্বরূপ ধ্যেয়বস্তু সনে প্রথম মিলিবার জন্য তাঁহার সাধন করিতে হইবে। সাধনা দৃঢ় হইলে মিলন হয়, মিলনও দৃঢ় হইলে আপনা হইতেই মিশ্রণ হইয়া যায়,—উহাই সুখ, উহাই চিরানন্দ।

কুন্তী।

৪

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পরদিন কুন্তীভোজ রাজ্যের ভাট ডাকাইয়া রাজ-সভায় জড় করিলেন এবং প্রত্যেককে যথেষ্ট পাথেয় দিয়া কুন্তীর স্বয়ংবর-বার্ত্তা প্রচারের জন্য দিকে দিকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা কবিতা রচনা করিয়া কেহ উত্তরে, কেহ দক্ষিণে, কেহ পশ্চিমে, কেহ ঈশান, কেহ নৈঋ্ত, কেহ অগ্নি, কেহ বায়ু কোণে কুন্তীদেবীর স্বয়ংবর-গাথা প্রচার করিয়া চলিল।

কত পাহাড়, পর্ব্বত, বন, গ্রাম, নদী, মাঠ ও সমুদ্র পার হইয়া ইহাদের মধ্যে যেখানে রাজ্য দেখিতে পাইল, তাহারা সেখানে দুই তিন দিন করিয়া থাকিয়া তথাকার রাজ-সভায় কুন্তীদেবীর স্বয়ংবর-গাথা গাহিল। পরে ভোজ নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, রাজ-ভাণ্ডার হইতে অনেক ধন রত্ন লইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে যে যাহার গৃহে ফিরিল।

এখন অবশিষ্ট একটি ভাটের ফিরিতে বড় বিলম্ব হইল। সে সকলের অপেক্ষা বিচক্ষণ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী ছিল। সে ঘুরিতে ঘুরিতে হস্তিনায় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ-সভায় উপস্থিত হইল।

পাঠকগণকে এইখানে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে, আমি একটু হস্তিনার ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলিব। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা। ধৃতরাষ্ট্র সকলের জ্যেষ্ঠ, মধ্যম তাঁহার নাম পাণ্ডু ও কনিষ্ঠ বিদুর।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে একটি রাজ-প্রথা প্রচলিত আছে যে, জ্যেষ্ঠ রাজ-পুত্রই রাজ্য-ভার পায়। কিন্তু দৈব-বশে, যদি সেই রাজ-পুত্র কোন অঙ্গ হীন হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন, অথবা করিবার পর যদি তাঁহার কোনরূপে অঙ্গ হীন হয় ত আর তাঁহার ভাগ্যে রাজ-সিংহাসন-প্রাপ্তি ঘটে না। তৎকনিষ্ঠকেই বর্ত্তায়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ; সুতরাং রাজ্যাভিষেকের সময় পাণ্ডুকেই সকলে রাজা করিবার জন্য ধরিল। পাণ্ডু বড় ভ্রাতৃ-ভক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে বঞ্চিত করিয়া, রাজা হইতে অনেক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। শেষে লোকের পাড়াপীড়িতে তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্বেও রাজা হইতে হইল। তিনি অনুরোধে পড়িয়া রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রাজা হইবার পর রাজকার্য্য একেবারে দেখিলেন না; কেবল বনে বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নয় মাসে ছয় মাসে কদাপি একবার ভ্রাতৃ-সন্দর্শনে রাজ্যে আসিতেন এবং দুই এক দিন থাকিয়া চকিতের ন্যায় আবার কোথায় অন্তর্দ্ধান হইতেন; কেহ তাঁহার সন্ধান পাইত না। কাযেই ধৃতরাষ্ট্রকে রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য সিংহাসনে বসিতে হইল এবং বসিতে বসিতে রাজ্যে তাঁহার অন্ধরাজ বলিয়া খ্যাতি জন্মিল। এই সময়ে জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্মদেব তাঁহার গান্ধার রাজ-কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। সাধ্বী, গান্ধারী-দেবী, বিবাহের রাত্রে ছাওনা-তলায় তাঁহার অন্ধ স্বামী হইয়াছে দেখিয়া মনে বড় বেদনা পাইলেন এবং "স্বামী যখন অন্ধ, তখন আমার এ চক্ষে কাজ কি?" বলিয়া স্বীয় নেত্রে সাত পুরু কাপড় বাঁধিয়া ভর্ত্তৃ-গৃহে আসিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া বিদুর সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কাছে থাকিতেন এবং কেহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বা কিছু জানাইতে চাহিলে, তিনি মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদের সহিত রাজার পরিচয় করাইয়া দিতেন। এইরূপে হস্তিনার রাজকার্য্য পরিচালিত হইতেছে এমন সময় ভোজ নগর হইতে ভাট আসিল।

বিদুর সিংহাসনের পার্শ্বের আসন হইতে ধীরে ধীরে উঠিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন—"মহারাজ, ভোজ নগর হইতে একজন ভাট অসিয়াছে, সে আপনাকে কিছু বলিতে চায়।"

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বিদুরের কথা শ্রবণ করিয়া ভাটকে বলিলেন—"তোমার কি বলিবার অভিপ্রায় আছে বল।"

সভার সভাসদগণ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে ভাটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মধ্যস্থলে করযোড়ে দণ্ডায়মান ভাট, গুন্ গুন্ স্বরে সুর ভাঁজিতে লাগিল। ক্রমে তাহার স্বর লহরী উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল। বাক্য সকল স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে লাগিল। ভাট প্রথমে হস্তিনারাজের যশোগাথা গাহিল। পরে কুন্তীভোজের ঐশ্বর্য্যের কথা, তাঁহার অসামান্যা রূপবতী কুন্তীদেবীর কথা মনোহর ছন্দে গাহিয়া, স্বয়ং বার্ত্তা-প্রচার শেষ করিল।

সুকণ্ঠ ভাটের স্বয়ংবর-গাথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোক মুগ্ধ হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রীত হইয়া তাহাকে প্রচুর অর্থ দানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ভাট প্রস্থান করিলে, জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম-দেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—"আমাদের পাণ্ডু অবিবাহিত আছে। তাহাকে কুন্তীর স্বয়ংবর-স্থলে লইয়া যাওয়া হউক। ছেলেটা আজীবন বনে বনে মৃগয়ায় কাল যাপন করিবে; কখন সংসারী হইবে না?" ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠের কথায় সায় দিলেন। তখন বনে বনে পাণ্ডুর অন্বেষণে লোক প্রেরিত হইল। ভাগ্য-ক্রমে পাণ্ডুর সন্ধান পাওয়া গেল। সকলে তাহাকে হস্তিনায় ধরিয়া আনিল। অতি ধুমধামে ভীষ্ম-দেব, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর পাণ্ডুকে লইয়া কুন্তীদেবীর স্বয়ংবর-স্থলে চলিলেন।

ক্রমশঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ।

কনিষ্ঠ—সত্যসাধনে দুঃখদায়ী ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে—ইহা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহাতে সুখের বোধটাও সরিয়া পড়ে কিরূপে?

জ্যেষ্ঠ—আমরা সংসারের জীব, যাহাকে সুখ বলি তাহা যে প্রকৃত পক্ষে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহা তোমাকে এইমাত্র বুঝাইয়া দিয়াছি। তোমার বোধে সৌকর্য্যার্থ আবার বলিতেছি। অভাব বোধের নামই দুঃখ। যখন কোন কিছুর প্রাপ্তিতে এই অভাব মিটিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, তখন যদি হঠাৎ কেহ সেই প্রাপ্ত দ্রব্যটী একেবারে সরাইয়া লয় তবে বড় দুঃখই উপস্থিত হয়। নয় কি? ইহাতে বুঝা গেল কোন অভীপ্সিত পদার্থের সংযোগের নাম সুখ এবং তাহার বিয়োগে অভাব বোধ করার নামই দুঃখ। তবেই দেখ সুখ থাকিলে

দুঃখ থাকিবেই। সুতরাং দুঃখের ধারণাটা একেবারে দূর করিতে হইলে, সুখের ধারণাটাকেও তাড়াইয়া দিতে হইবে। একটা বৃক্ষপত্রের এ-পিঠের সহিত ও-পিঠের যে সম্বন্ধ—পার্থিব সুখের সহিত দুঃখেরও সেই সম্বন্ধ। গাছের পাতার একটা পিঠ হাতে রাখিয়া যেমন অন্য পিঠ ফেলিয়া দেওয়া যায় না, তেমনি সুখটা হাতে রাখিয়া দুঃখটাকে বাদ দিয়া সরাইয়া দেওয়া যায় না। তাই গীতার উপদেষ্টা গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—যদি নিজের স্বরূপটুকু জানিয়া আনন্দ লাভ করিতে চাও, তবে "সমদুঃখসুখঃ" হও। আর এইরূপে "সমদুঃখসুখঃ" হইতে গেলেই সত্য-প্রতিষ্ঠিত আনন্দস্বরূপের মনন করিতেই হইবে—বলিতেই হইবে "বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, আবীরাবির্ম এধি" ভাবিতেই হইবে—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত" বাক্যে কি বুঝায়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। বুঝিলে?

কনিষ্ঠ—বুঝিলাম। এইবার 'অস্তেয়' সম্বন্ধে কিছু বল।

জ্যেষ্ঠ—"স্তেয়ং অশাস্ত্রপূর্ব্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপমস্তেয়মিতি"। অর্থাৎ অশাস্ত্র পূর্ব্বক (প্রতিগ্রহ ভিন্ন) পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় বা চৌর্য্য বলে। উহা না করার নাম অস্তেয় বা অচৌর্য্য। কেবল চুরি করা নহে—মন হইতে পরদ্রব্য গ্রহণের স্পৃহাটুকুও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কনিষ্ঠ—বৈদিক সন্ধ্যায় তোমার এই অস্তেয়-সাধন জন্য কোনও ব্যবস্থাই তো নাই।

জ্যেষ্ঠ—আছে বৈ কি। তুমি কখনও সেটার মর্ম্ম দেখিতে চেষ্টা কর নাই—তাই বলিতেছ সে ব্যবস্থা নাই।

কনিষ্ঠ—কৈ দেখাও তো দেখি?

জ্যেষ্ঠ—আচ্ছা মানুষ চুরি করা দোষাবহ জানিয়াও চুরি ডাকাতি করে কেন?

কনিষ্ঠ—অভাবে স্বভাব নষ্ট হইলে, দুর্দ্দমনীয় ভোগের স্পৃহা বর্ত্তমানে ভোগের বস্তুর অভাব ঘটিলে লোকে চুরি ডাকাতি করে—নতুবা চুরি করিবে কেন?

জ্যেষ্ঠ—তবেই হইল, দুর্দ্দম্য ভোগলালসাই চৌর্য্যের মূল কারণ। যদি নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা যায়, যদি ভোগস্পৃহার দমন করা যায়, তবে আর চৌর্য্যপাপে লিপ্ত হইতে না। কেমন, এই তো?

কনিষ্ঠ—সে তো ঠিক।

জ্যেষ্ঠ—আচ্ছা এইবার সন্ধ্যা প্রয়োগের এই মন্ত্রটীর অর্থ বিচার কর দেখি,—

—"ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চনঃ॥"

এই মন্ত্রের পূর্ব্বমন্ত্রে "শিবতম" রসের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখন এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—

আপঃ (হে জলদেবতাগণ) তস্মা (সেই জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শিবতম রসের জন্য) বঃ (তোমাদের) যস্য ক্ষয়ায় (যাহার ক্ষরণে অর্থাৎ তোমাদের যে কল্যাণ-ময় রসাভিসিঞ্চনে) জিন্বথ (তৃপ্ত করিতেছ, জগৎ তৃপ্ত করিতেছ, অনন্ত কোটী বিশ্ব পরিতৃপ্ত করিতেছ) অরং গমাম (আমরা যেন প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হই)।

এক কথায় হইল—হে জলদেবতাগণ, তোমরা তোমাদের যে কল্যাণবর্ষী শিবতম রসের অভিসিঞ্চনে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তিসাধন করিতেছ, আমাদের তৃপ্তির জন্য, আমাদের অভাব মোচনের জন্য, আমরাও যেন তোমাদের সেই সর্ব্বকল্যাণপ্রদ রসভাগকে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হই। আমাদের স্বকীয় অভাববোধ যেন কদাপি জাগ্রৎ না হয়।

"জনয়থা চ নঃ"—নঃ (আমাদিগকে), জনয়থা (সন্তানোৎপাদনে সমর্থ কর—আমাদিগকে উৎকৃষ্ট বীর্য্য প্রদান কর) 'জনয়থা' বলিতে এতটুকুই বুঝায় না, ইহারও বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানুষের মত হাত পা থাকিলেই যেমন মানুষ, মনুষ্যপদবাচ্য হয় না—মনুষ্যত্ব থাকিলেই মানুষ নামের যোগ্য হয়, তেমনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই সন্তানোৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। তাহাকে শুভ আহারদানে ও সুশিক্ষাদানে পুষ্ট ও সংযত করিবার পর সে যখন কল্যাণ পথে অগ্রসর হয় তখনই সন্তানোৎপত্তি যথার্থ ভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখনকার দিনে সকলেই একথাটী খুব ভাল রকমেই বুঝিতেন এবং সেইজন্য সন্তানকামী মাত্রেই সংযত ও সাধুব্যবহারপরায়ণ হইতেন। থাক্ সে কথা, এখন দেখ এই 'জনয়থা' বাক্যদ্বারা পুত্র সুতরাং কলত্র, সবই হিসাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে। তাই "জনয়থা চ নঃ" বলিলে, শুধুই উৎকৃষ্ট বীর্য্য প্রার্থনা বুঝায় না, বুঝায় আমরা যেন সাধুপুত্রার্থে তোমাদের কল্যাণাবহ রসভাগকে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হই—পুত্র কলত্রের পরিপোষণ জন্য সাংসারিক দৈন্য যেন কোনও ক্রমে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে লোভমোহাবিষ্ট পূর্ব্বক নিরয়কূপে নিক্ষেপ না করে।

তবেই হইল যদি (প্রার্থনা অনুসারে) স্বকীয় অভাববোধ বা সংসারিক অভাববোধ না থাকে, তবে মানুষ চুরি করিবে কেন? তাই বলিতেছিলাম, বৈদিক সন্ধ্যা প্রয়োগে এই অস্তেয়-সাধনের সুন্দর ব্যবস্থাই আছে। সন্তানকে যথার্থ সুসন্তান করিতে হইলে, মানুষকে যথার্থ সুখী ও আনন্দপ্রাণ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণসন্তানকে যথার্থ জ্ঞানী, সমাজশিক্ষক ও পরহিতব্রত করিতে হইলে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ব্যবস্থা হইতেই পারে না।

কনিষ্ঠ—কথাগুলি তো বলিলে ভাল। কিন্তু ঐ মন্ত্রের মধ্যে কি এত অর্থ সত্যই নিহিত আছে. না তুমি যা তা' করিয়া বাড়াইয়া একটা সামঞ্জস্য খাড়া করিয়া মন্ত্রের গৌরব প্রকাশের চেষ্টা করিতেছ?

ক্রমশঃ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থ নির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে" ॥

কোন্‌টি যৌক্তিক, কোন্‌টি অযৌক্তিক, তাহা অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন। এরূপ ক্ষেত্রে ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং ঋষিগণের পদানুসরণ ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে?

উপসংহারে, আর একটি কথার আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষ করিব। সম্প্রতি দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী বর্ণাশ্রমের ধূয়া ধরিয়াছেন। কায়স্থ সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর। তিলি, তাম্বূলী, বারুজীবী এবং কৈবর্ত্তগণ বৈশ্যত্বের ভীষণ কোলাহলে নিমজ্জিত। আচণ্ডাল সৎ শূদ্রের দাবী রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের হস্তে জলপ্রদানে কৃতসংকল্প।

এরূপ ক্ষেত্রে বিত্রস্ত হইবার বিশেষ কারণ নাই। সমাজের অধঃপতন অবস্থায় ঐরূপ একটা বিপর্যয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পরিণামে ইহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরিপোষক ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া অনুমিত হয় না। ন্যায়তঃ,

ধর্ম্মতঃ এবং শাস্ত্রানুমোদিত হিন্দুসমাজের স্ব স্ব দাবী রক্ষা করা সমাজ-নেতৃ ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তাহা না হয়, সমাজ উৎসন্ন যাইবে। সহস্র চেষ্টায়ও আর ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগিবে না।

মহাত্মা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপনে সমাজের মধ্যে একটা গণ্ডি দিয়া ভালই করিয়াছিলেন। যদি তাহা না হইত, তবে আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আলোচনাও বুঝি ঘটিয়া উঠিত না। দুর্গোৎসবের চণ্ডী-মণ্ডপের পরিবর্ত্তে প্রভু যীশুর ভজনালয়ে হয়তো পল্লীবক্ষঃ ছাইয়া যাইত।

বিদ্যা শিক্ষার্থী বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দু যদি স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া সদাচার রক্ষা করেন, তাঁহাকে সমাজে লইলে যে বিশেষ দোষ আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না। চণ্ডালের পকান্ন গ্রহণে যখন শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তখন এই সামান্য সংস্পর্শ দোষের কেন প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

"চণ্ডালান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ—
সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরা বা ইতি।"

প্রায়শ্চিত্তবিবেক-ধৃত বিষ্ণুসূত্র।

কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বিনা প্রায়শ্চিত্তে মাতৃভক্ত বিলাত-প্রত্যাগত সন্তানকে গ্রহণ করিতেছেন, অবশ্যই ইহা যথেচ্ছাচার। ব্রাহ্মণগণও ইহার বিরোধী না হইয়া কি করিবেন? সকলে একমত হইয়া বিলাত প্রত্যাগত মাতৃ-ভূমির সুসন্তানকে যাহাতে প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে স্থান দেওয়া যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, সমাজ সংগঠন নিতান্ত সুদূরপরাহত হইবে। পরন্তু, রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে, এবং চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে দেশ একাকার হইয়া যাইবে। জাতিভেদ বন্ধনের একগাছি সামান্য সূত্রও সে সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে। মাটির পুতুলের পরিবর্ত্তে দেশে মানুষ পুতুলের পূজা চলিবে। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

---

* রথ-যাত্রায় ঠাকুর-দর্শনে।

এই দিব্য দেহ-রথে, হেরি জগন্নাথে, ভক্তিভরা চিতে
চল চল মন।
হেরে নয়ন জুড়াবে, জনম না হ'বে, যাতায়াত ভবে
হবে নিবারণ ॥

পথ হেরি কেন কাতর ভয়েতে,
গুরু সাথী করি লওরে সঙ্গেতে—
তাঁর করুণায় ঘুচে যাবে ভয়, অন্তরে হেরিবে
সে ভব-তারণ ॥ (মন)

মূলাধার হ'তে গুরুপদান্তরে
মায়া কালাপাণী তর অকাতরে;
সুষুম্নার পথে প্রেমানন্দে যেতে, শ্বাস দাঁড় টেনে
চল অনুক্ষণ ॥

যদি শ্রান্ত হও পথ-পরিশ্রমে,
আছে পান্থ-ধাম অষ্টদল নামে—
সে বাসেতে যেও, বিশ্রাম করিও, ক্লান্তি দূর হ'বে
জন্মের মতন ॥

একাদশ ইন্দ্রিয়, ষড়্‌রিপুগণ
রণসাজ পরি আসিবে যখন—
চিন্ময়ে হেরিবে, ভয় দূরে যাবে চিদাকাশে চিত্ত
করিলে স্থাপন ॥

গুরুদত্ত রাম-নাম করি সার
ভবের কাঁটা তুলে কর পরিষ্কার;
চক্র ধরি ধরি উঠ ধীরি ধীরি, কু-চক্রেতে মন
প'ড়না কখন ॥

তাই বলি মন গুরুপদ স্মরি
জিহ্বা যেন মোর বলে হরি হরি;
সংজ্ঞাশূন্য হ'লে, অজপা ফুরালে, জীব-শিবে যেন
হয় হে মিলন ॥

(প্রাপ্ত) ৺পুরীধাম-

---

* যদি বাধা না থাকে যাঁহার এই লেখা তাঁহার একটু পরিচয় পাইলে ভাল হয়। এই গানের দুই এক স্থানে এমনই একটু কিছু আছে।

পরমব্রহ্মে যে স্পন্দনাত্মিকা শক্তি উঠার মত বোধ হয় সেই শক্তির দুই প্রকার কার্য্য। বিক্ষেপ ব্যাপারে যেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় আবার আবরণ ব্যাপারে দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের এবং ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির ভেদ জ্ঞানটি আবৃত হয়। তিনি তিনিই আছেন তথাপি মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা তিনিই যেন সৃষ্ট জগৎ হইতে অভিন্ন এইরূপ বোধ হইয়া যায়। তাই বলা হয় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টিতে আপনা হইতে উপজাত সঙ্কল্প সমূহকে "আমার সঙ্কল্প" এইরূপে অভিমান করিয়া আপনি সর্ব্বদা আপনার আপনি আপনি ভাবরূপ স্বস্বরূপে থাকিয়াও তিনি "অহং বহুস্যাম্" মত যেন হয়েন—বহুস্যাম্ সঙ্কল্পে তিনি বহু আকারে আকারিত হওয়ার মত হয়েন।

তিনি বহিরিন্দ্রিয় রূপ মায়া দ্বারা রূপ রসের আস্পদ স্বরূপ বহির্জ্জগৎ যেন হয়েন আবার অন্তরিন্দ্রিয় রূপ মায়া বশে মনের আস্পদ স্বরূপ অন্তর্জ্জগৎ হইয়া পুনঃ পুনঃ উদিত ও লয় হওয়ার মত যেন হয়েন। ফলে তিনিই তিনি আছেন আর কিছুই, সঙ্কল্প না থাকার মত বাস্তবিক নাই।

স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্প শক্তিই কি তাঁহাতে আছে বলিবার উপায় আছে? পরম শান্ত যে স্থিতি তাহাতে কোন প্রকার গতি কি থাকিতে পারে? যিনি স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ শূন্য তাঁহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন কিছু থাকিবে কিরূপে? "গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" ইহার মত তাঁহাতে তিনিই আছেন—তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন কিছুই তাঁহাতে থাকিতে পারে না। থাকাটা যুক্তি বিরুদ্ধ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং অনুভব বিরুদ্ধ। তথাপি এই নিঃসঙ্গ আত্মাকে জগৎ রূপেই দেখা যায়। "জগদত্র যথোৎপন্নং তত্তে বক্ষ্যামি রাঘব" এই পরমাত্মাতে জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হয় হে রাঘব! আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি। এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা এই সর্গের প্রথম হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

এতস্মাৎ পরমাচ্ছান্তাৎ পদাৎ পরম পাবনাৎ।
যথেদমুত্থিতং বিশ্বং তচ্ছৃণুত্তমযাধীয়া ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব সর্গে যে পরম পবিত্র পরম শান্ত পরমপদের কথা বলা হইল এই পরম পদ হইতে যে প্রকারে এই বিশ্ব উত্থিত হইল তাহা উত্তম বুদ্ধি দ্বারা শ্রবণ কর।

সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ।
সর্ব্বাত্মকঞ্চ তৎস্থানং তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু ॥ ২ ॥

যেমন সুষুপ্ত অবস্থা স্বপ্নবৎ—স্বপ্নই নহে কিন্তু স্বপ্নের মত প্রকাশ হয় সেইরূপ ব্রহ্মই সর্গবৎ সৃষ্টি—নহে কিন্তু সৃষ্টির মত প্রকাশ পান। কিরূপে ব্রহ্ম সৃষ্টিমত প্রকাশ পান? সমস্ত সুষুপ্ত পুরুষের সমষ্টি স্বরূপ এই ব্রহ্ম। তৎস্থানং সর্ব্বসুষুপ্ত সমষ্টি প্রলয়াবস্থং ব্রহ্ম।

রাম—কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বশিষ্ঠ—বল।

রাম—ব্রহ্মকে স্থানং বলা হইল কেন? 'তৎস্থানং' ইহার মধ্যে বিশ্ব কোথায় ছিল?

বশিষ্ঠ—বিশ্বটি ব্রহ্মের কোন ভাব অবলম্বন করিয়া ভাসিল। পরের শ্লোকে তাহা বলিতেছি। যে জন্য "স্থানং" বলা হইল তাহা শ্রুতি মত বলিতেছি শ্রবণ কর।

মাণ্ডুক্য শ্রুতি ব্রহ্মকে জাগরিত স্থানঃ স্বপ্নস্থানঃ সুষুপ্ত স্থানঃ বলিয়া বলিতেছেন। জাগরণ যাঁহার স্থান—কার্য্যভূমি তিনি জাগরিত স্থান। স্বপ্ন যাঁহার স্থান—কার্য্যভূমি তিনি স্বপ্ন স্থান এবং সুষুপ্তি যাঁহার স্থান—কার্য্যভূমি তিনি সুষুপ্ত স্থান।

জাগরিত স্থান হইতেছে দর্শনবৃত্তি; স্বপ্নস্থান হইতেছে অদর্শন বৃত্তি। সুষুপ্ত অবস্থায় যেমন তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ স্বপ্নের সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ জাগরিত স্থান ও স্বপ্ন স্থানেও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক স্বপ্ন ধর্ম্মটি জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই একরূপ। আত্মপুরুষ যখন সুষুপ্ত হয়েন তখন কি হয়?

শ্রুতি বলেন যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। যে স্থানে বা যে কালে সুপ্ত পুরুষ কোন কাম কামনা করেন না, কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না সেই সুষুপ্তাবস্থা যাঁহার স্থান তিনি সুষুপ্ত স্থান। সুষুপ্তি কালে জাগ্রত কালের ন্যায় বা স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অন্যথা দর্শনাত্মক স্বপ্ন দর্শন অথবা কোন প্রকার ভোগ স্পৃহা বর্ত্তমান থাকে না।

রাম—কি থাকে এই অবস্থায়?

বশিষ্ঠ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা ঘটে আত্ম-পুরুষ সেই বস্তুটি হইতে সরিয়া থাকেন। যদিও পৃথক্ হন কিন্তু সেই বস্তুটিও অতি সূক্ষ্ম ভাবে যেন তাঁহার সত্তাতে লাগিয়া থাকে। এই বিশ্ব অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় তাঁহার সত্তায় যেন থাকে। সুষুপ্তি ভঙ্গে আবার তাহা ব্যক্তাবস্থা লাভ করে। কোন্ ক্রমে অব্যক্ত বিশ্ব সত্তামাত্রাত্মক ব্রহ্ম হইতে প্রকট হয় তাহাই এখানে বলিব।

রাম – সুষুপ্তিতে পুরুষ কিরূপ ভাবে থাকে তাহা আবার বলুন।

বশিষ্ঠ—বিষয় ভোগের সমস্ত দ্বারগুলি সুষুপ্তিতে রুদ্ধ হইয়াছে। পুরুষের আর অন্য আবরণ নাই। কেবল অজ্ঞান আবরণটি মাত্র আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় স্বরূপানন্দের অতি ক্ষীণ স্ফুরণে সুপ্ত পুরুষ আনন্দভুক্। স্থূল সূক্ষ্ম কোন প্রকার চিত্ত স্পন্দন না থাকায় আয়াস শূন্য অবস্থা বা অনায়াস পদে স্থিত বলিয়া তিনি আনন্দময়। যদিও ক্ষণস্থায়ী এই আনন্দ তথাপি এই অবস্থায় সুপ্ত পুরুষ আনন্দময়। সুষুপ্তিতে কেবলমাত্র কুয়াসার মত একটা অজ্ঞান পুরুষকে ছাইয়া আছে আর সর্ব্বাত্মক এই বিশ্বছায়া ছায়ামত অজ্ঞানাবরণে ভাসিতেছে। সুষুপ্তির অজ্ঞানাবরণে ছায়া, ছায়ামত বিশ্ব, ক্রমে স্বপ্ন নগরের মত ভাসে। ক্রমে সেই স্বপ্ননগর, সেই সঙ্কল্প নগর আরও স্থূল হইয়া সৃষ্টিরূপে ভাসে।

সমস্ত জীবের সুষুপ্তি অবস্থার সমষ্টি যখন হয় তখন মহাপ্রলয়াবস্থা। সেই সুষুপ্তি স্থানই সাধনা প্রাথর্য্যে উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া সত্বর তুরীয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। এই সুষুপ্তাবস্থা হইতে নিম্নমুখে যে ক্রমে সৃষ্টি হয় তাহাই তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বাত্মকঞ্চ তৎস্থানং তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু ॥

রাম—বলুন।

বশিষ্ঠ—

তস্যানন্তপ্রকাশাত্ম-রূপস্যানন্তচিন্মণেঃ।
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ ॥৩॥
তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহং-মর্শনপূর্ব্বকম্ ॥৪॥
ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদুহিতরূপকম্।
আকাশাদণুশুদ্ধঞ্চ সর্ব্বস্মিন্ ভাতি বোধনম্ ॥৫॥

বেশ করিয়া ধারণা কর মহাপ্রলয় হইয়াগিয়াছে। সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তি সমস্ত জগৎ লয় করিয়া পরম শান্ত চলন রহিত পরম শিবকে স্পর্শ করিয়া নিজ সত্তা

হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর কিছুই নাই। দুই নাই। এক অনন্ত প্রকাশ অখণ্ড-ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তিনি অনন্ত চিৎ স্বরূপ মণি। অনন্ত প্রকাশই তাঁহার আত্মরূপ। চিন্মণি অনন্ত প্রকাশ স্বরূপ। মহা প্রলয়ে এই অনন্ত প্রকাশ স্বরূপ চিন্মণিই আছেন। আর এই বিশ্ব কোথায় গেল? যে বিশ্ব সেই অনন্ত প্রকাশা-ত্মক চিন্মণির সত্তামাত্রাত্মক—যে সত্তা হইতে বিশ্ব উঠিয়াছিল বিশ্ব লয় হইয়া গিয়াছে কেবল সেই সত্তাটি মাত্র আছে। সেই সত্তা হইতে আবার বিশ্ব উঠিতে পারে। যেহেতু এই বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তা মাত্র, যেহেতু সেই চিন্মণির পরমার্থ রূপটি মাত্রই এই বিশ্বের সত্তা, সেই হেতু মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ অজস্র উঠিতেছে ও লয় হইতেছে যে এই বিশ্ব, স্বভাবতঃ অবুদ্ধি পূর্ব্বক উঠায় চিন্মণির পরমার্থরূপ সেই সত্তা আপনাতে আপনি কিঞ্চিৎ চেত্যতা, কিঞ্চিৎ বহির্মুখতা, কিঞ্চিৎ সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়েন।

এই চেত্যতাটি কিন্তু সম্বিত দ্বারা বা চিৎ দ্বারা অহং স্পর্শ এখনও করে নাই। অর্থাৎ অহংস্পর্শ পূর্ব্বক বস্তু সকল যেরূপ নামরূপ গ্রহণ করে এই চেত্যতা এখনও তাহা করে নাই। ইহা অহং মর্শণ পূর্ব্বকং অগৃহীতাত্মকম্।

সেই চিন্মণির সত্তামাত্রটি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, শুদ্ধ বোধমাত্র। সেই শুদ্ধ বোধটি সমস্ত সৃজ্য বিষয়ের ভাবিনামরূপ অনুসন্ধান তৎপর। আবার ঐ ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপাভাস বিশিষ্ট হইয়াই সেই সত্তাটি চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন।

রাম—মণিতে ঝলক যেমন স্বভাবতঃ উঠে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত পরম শান্ত ব্রহ্মে অবুদ্ধিপূর্ব্বক স্পন্দনাত্মিকা মায়া সঙ্কল্প উঠে। যেহেতু বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তামাত্রাত্মক সেই হেতু সেই পরম শান্ত সত্তা চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন—এই সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম অহং বহুস্যাম্ এই ইচ্ছা করেন কেন তাহারই কারণ তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ। বিশেষ মনোযোগ কর। ভক্তিমার্গ আশ্রয়ে লোকে বলে যে যিনি স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া—কেবল সেই প্রভুকে স্বাধীন না বলিয়া কারণের অধীন করা মাত্র। এই ব্যাখ্যা ঠিক ব্যাখ্যা নহে। ইহাতে হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। বুদ্ধিও শান্ত হয় না। তবে উহার উত্তরে কিছু বলিতে না পারিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াই মানুষ চুপ্ করিয়া থাকে।

জ্ঞানমার্গেই চেত্যতার সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছার কারণ নির্দ্দেশ করা যায়।

সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ। মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ হয় সেইরূপ সত্তামাত্রাত্মক অজস্র বিশ্ব যেন উঠে। স্বভাবতঃ ঝলকের মত অবুদ্ধিপূর্ব্বক সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তি উঠে সেই জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। অবুদ্ধি পূর্ব্বক যাহা হয় তাহাতে যে চলন হয় তাহাই বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যাপারের মূলসূত্র। যেমন ভোজনের ইচ্ছা না থাকিলেও যদি কেহ জোর করিয়া ভোজন করায় তবে যেমন ভোজনের ইচ্ছার উদ্রেক হয়, সেইরূপ পরম শান্ত চলনরহিত ব্রহ্মে যখন স্বভাবতঃ ঝলক উঠে তখন সেই চলন উঠা জন্য অনিচ্ছারও ইচ্ছা জন্মে। সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছাই ইহা। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কিছু উঠাই বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি ইচ্ছার কারণ। এই সমস্তই কিন্তু "আর কিছুই নাই" এই অভাব বোধরূপ অজ্ঞান অবলম্বনে কল্পনা মাত্র।

রাম—অতি সুন্দর। এখন বলুন পূর্ণ সত্য স্বরূপ সত্তাটি সম্পূর্ণ অসত্যরূপ বিশ্ব হইয়া দাঁড়ায় কিরূপে? পূর্ব্বে বলিয়াছেন বিশ্ব কখন উৎপন্ন হয় নাই—বিশ্ব বলিয়াও কোন কিছু নাই। রজ্জুতে সর্প ভাসার মত ব্রহ্মেতে অজ্ঞান দ্বারা বিশ্ব ভাসে।

বশিষ্ঠ—বিশ্ব বলিয়া কিছুই নাই। মহাপ্রলয়ে বিশ্বটা ব্রহ্ম সত্তামাত্রে মাত্র অবশিষ্ট থাকে। মহাপ্রলয়ে স্ব প্রকাশ চিৎস্বরূপ শুদ্ধ বোধরূপ যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন বিশ্বটি তাঁহারই সত্তামাত্রাত্মক।

রাম—বলিতেছেন বিশ্বের কোন পৃথক সত্তা নাই। ইহার সত্তা যাহা তাহা ব্রহ্মেরই সত্তা। অস্তি ভাবকেই ত সত্তা বলিতেছেন?

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম ত অভাব পদার্থ নহেন আর শূন্যও নহেন। তিনি সৎচিৎ আনন্দ স্বরূপ। চিৎ ও আনন্দ সর্ব্বত্র ভাসে না কিন্তু সৎভাব বা অস্তি ভাব সর্ব্বদা ভাসে। অস্তি—আছে এই ভাবটি সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর সহিত সর্ব্বদা জড়িত। নাই—বা নাস্তি ইহা কোন সৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধে বলা যায় না। বিশ্ব যাহাই হউক ইহা ব্রহ্মের অস্তিভাব বা সত্তাভাব হইতে জন্মিয়াছে। ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন বিশ্বের কোন সত্তা নাই। ব্রহ্ম সত্তাই বিশ্বকে সত্তা দিয়া ইন্দ্রজাল মত ভাসাইয়াছে।

রাম—ব্রহ্মসত্তা বিশ্বকে সত্তাবান্ করেন কিরূপে?

বশিষ্ঠ। রজ্জু যেরূপ সর্পকে সত্তাবান্ করে সেইরূপে। শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন আপনি আপনি ভাবে থাকেন তখন বিশ্ব নাই। কিন্তু ব্রহ্মে স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্প শক্তিরূপা মায়া ভাসার মত হইলেই ব্রহ্মে বিচিত্র জগৎ ভাসার মত দেখায়। রজ্জুতে সর্প বোধটা যেমন ভ্রম কল্পিত মাত্র সেইরূপ চলন শূন্য ব্রহ্মে চলন-

পূর্ণ জগৎ বোধটাও ভ্রম কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" ব্রহ্ম আপন মহিমায় মায়ার কুহক সর্ব্বদা নিরস্ত করিয়া সত্যরূপে আপনি আপনি ভাবে নিরন্তর বিরাজমান। তাঁহার এই শুদ্ধ বোধরূপ অস্তি ভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই অঘটন ঘটনা পটীয়সী মায়া এই বিচিত্র বিশ্বরঙ্গ দেখাইতেছে। যত্রত্রিসর্গোঽমৃষা ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইয়াও মায়ার কৌশলে সত্যমত বোধ হয় মাত্র।

রাম—অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে। যিনি অতি নির্ম্মল, অপরিচ্ছিন্ন, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তিনিই এই স্থূল সমল পরিচ্ছন্ন জগৎরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য প্রহেলিকা আর কি হইতে পারে?

বশিষ্ঠ—অজ্ঞানের কার্য্য অতি বিচিত্র। যাহা আদৌ উৎপন্ন হয় নাই তাহাকে সত্যমত দেখান এবং যাহা সর্ব্বদা আছে তাহা যেন নাই মত দেখান, ইহাই মায়ার কার্য্য। সৃষ্টি-তত্ত্ব এই জন্য বিচিত্র।

আর একবার বলি শ্রবণ কর। সৃষ্টিতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। সৃষ্টিটাই অজ্ঞান। অজ্ঞানকে জানিলেই অজ্ঞান সরিয়া যায়। জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাই আছেন। কোথা হইতে একটা অজ্ঞান—না উঠিয়াই উঠার মত হইয়া ব্রহ্মকে সৃষ্টিরূপে দেখাইতেছে। অজ্ঞান আবরণটি সরাইয়া ফেলিলেই যিনি জ্ঞান স্বরূপ তিনিই আছেন। তাই সৃষ্টিতত্ত্ব অজ্ঞানীকে বুঝান আবশ্যক। শ্রবণ কর।

ব্রহ্মকে চিন্মণি বলা হইয়াছে। চিৎস্বরূপ মণি চিরদিন আপন স্বরূপে আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করিতেছেন। মণি হইতে স্বভাবতঃ যেমন ঝলক উঠে সেইরূপ এই অনন্ত অখণ্ড চিন্মণি হইতে অবুদ্ধি পূর্ব্বক যাহা উঠার মত বোধ হয় তাহা সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তি। তাহাই মায়া! অগাধ কোন কিছু থাকিলেই তাহাতে যেন স্পন্দন উঠে; বায়ু ও স্পন্দন, চন্দ্র ও চন্দ্রিকা যেমন অভিন্ন, ইহাও যেন তাই। মণিতে ঝলক যেন স্থিতি লাভ করে না—অপিচ ঝলকটা মণিতে আছেও বলা যায় না আবার নাইও বলা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মে মায়া আছেও বলা যায় না নাইও বলা যায় না। অথচ একটা ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ পদার্থ বা অপদার্থ ব্রহ্ম সত্তা অবলম্বনে যেন ভাসে। ইহাই মায়া। এই অব্যক্ত মায়া একীভূত সুষুপ্তির বিচিত্র স্বপ্নরূপে—বিচিত্ররূপেই ভাসে। ভাসিলে ব্রহ্মকে যেন বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসার মত দেখা যায়। মায়ার যে

গুণে ব্রহ্মকে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসায় তাহাকে মায়ার বিক্ষেপ শক্তি নাম দেওয়া যায়। আবার মায়ার যে গুণ, ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির যে ভেদ জ্ঞান তাহাকে আবরণ করিয়া রাখে, মায়ার যে গুণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদকে আবরণ করিয়া দ্রষ্টাকেই দৃশ্যরূপে দেখায়, ব্রহ্মকেই সৃষ্টিরূপে দেখায় তাহাকে মায়ার আবরণ শক্তি বলে। তাই বলা হয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আপন মায়া শক্তি আশ্রয়ে যেন বহুধা ভিন্ন হইয়া জগদাকার ধারণ করেন। এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও বিশ্বরূপে যেন বিস্তার লাভ করেন। যেন বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। "তনু বিস্তারে।" বিস্তারার্থক তন্ ধাতু হইতেই তৎপদ হইয়াছে। তৎ এর ভাব যাহা তাহাই তত্ত্ব। ব্রহ্ম তত্ত্বই তবে সৃষ্টি বা জগতের স্বরূপ, স্বভাব, আপনি আপনি ভাব। বিশ্বের যে কোন বস্তু লওনা কেন তাহার স্বরূপাবস্থায় পৌঁছিতে পারিলেই ব্রহ্মলাভ হইবেই। কোন বস্তুর স্বরূপ চিন্তাই তবে ব্রহ্ম চিন্তা।

রাম—এখন বলুন ঝলক জড়িত মণি—মায়া শবলিত ব্রহ্ম কোনক্রমে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসেন ?

বশিষ্ঠ—"তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু" ইহাতে সেই ক্রমের কথাই বলিতে যাইতেছি। সর্ব্বাত্মক সুষুপ্ত স্থানই ব্রহ্ম। তিনিই অখণ্ড অনন্ত চিৎ স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। তাহাই চিন্মণি। এই চিন্মণির পরমা সত্তাই বিশ্ব।

এই পরমা সত্তা চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন। সম্বিদা অহংমর্শন পূর্ব্বকম্, অগৃহীতাত্মকং, অহংকারাধ্যাসং বিনা—আকাশাৎ অণু শুদ্ধঞ্চ যৎ বোধনং তৎ সর্ব্বস্মিন্ সৃজ্যবিষয়ে ভাবিনামানুরূপানুসন্ধানৈঃ কিঞ্চিদুহিতানি রূপকানি যস্মিংস্তথাবিধং সৎ চেত্যতামিব গচ্ছতি।

ততঃ সা পরমা সত্তা সচেতশ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নাম যোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তথা ॥ ৬ ॥

সেই পরমা সত্তা যখন চেত্যতা লাভ করেন তখন সেই চেত্যতার মধ্যে ভাবি নামরূপের অনুসন্ধানরূপ বৃত্তি থাকে। ভাবিনামানুসন্ধানরূপ বৃত্তি দ্বারাই ঐ সত্তা, ঐ শুদ্ধ বোধ, কিঞ্চিৎ উহিতরূপ ধারণ করেন।

চিতের ঈক্ষণবৃত্তিরূপ যে চেত্যতা তাহা বিষয় উপাধি লাভে যেরূপে ঈশ্বর ভাব ও জীবভাব গ্রহণ করে এই শ্লোকে তাহা দেখান হইতেছে।

চেত ঈক্ষণাত্মিকা বৃত্তিস্তৎসহিতা চেতনা তদভিব্যক্তচৈতন্যং তদুন্মুখী তৎ-

প্রধানাসতী চেতয়তীতি চিৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্তন্নামযোগ্যেত্যর্থঃ। বাক্‌প্রবৃত্তিবিষয় ধর্ম্মবত্বেন বাগ্ব্যবহারলভ্যতয়া॥

রাম—"স ঐক্ষত লোকান্নুস্‌রজা"—শ্রুতিতে এই যে ঈক্ষণ কথা পাওয়া যায় তাহাকে আপনি বলিতেছেন সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা। স্বভাবতঃ ঝলক হইতে অনিচ্ছার ইচ্ছা কিরূপে জাগ্রত হয় তাহাও বলিয়াছেন। এখন—

বশিষ্ঠ—এখন বলিতেছি বহু হইবার ইচ্ছা যাঁহার হয় তিনি স্বরূপে ব্রহ্ম থাকিয়াও ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তা হইতে অভিন্ন যে পরমা সত্তা তাহাই চিন্নামযোগ্যা হয়েন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই সংজ্ঞার উপযুক্তা হয়েন।

রাম—মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আবার সৃষ্টি আরম্ভ হইলে তিনি সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও মায়া অবলম্বনে কিরূপে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হয়েন তাহা বলা হইল। এখন আর একবার বলুন এই জগতে মহা-প্রলয়ের অবস্থা কখন হয়। আর অজ্ঞানের দিক হইতে বলুন স্থূল লয় হইলে যখন সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে, সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতি-লীন সংস্কার হইতে কিরূপে আবার সৃষ্টি হয়।

বশিষ্ঠ—এই যে দেহ দেখিতেছ ইহা কর্ম্মের সমষ্টি। ভোগ দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হয়। প্রাণিগণের কর্ম্ম যখন উপভোগ দ্বারা ক্ষীণ হয় তখন প্রলয়াবস্থা। সেই সময়ে জগৎ স্থূল রূপ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে লীন হয়। ইহাতে আত্যন্তিক নাশ বুঝা যায় না। আবার প্রাদুর্ভাব হয়।

নিখিল প্রাণি কর্ম্ম প্রলয়ে কিছুকাল লীন থাকিয়া পরে আবার ফলোন্মুখ হয়। প্রাণিগণের সকাম ভাবে কৃতকর্ম্ম এইরূপে কালগতে ফলদানে উন্মুখ হয়। এই কথা সহজ করিয়া বলি শ্রবণ কর। মনে কর তুমি রাত্রি ৪ টার সময় উঠিতে ইচ্ছা করিয়া সন্ধ্যার সময় দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে যেন ৪ টায় উঠিতে পারি। তুমি পুনঃ পুনঃ এই সঙ্কল্প মাত্র করিয়া যাইতেছ। তোমার কর্ম্মটি সকাম। এই কামনা কাল পরিপক্ক হইলে ফল দিবেই।

এইরূপে জীবের সকাম কর্ম্ম যখন ফলদানে উন্মুখ হয় তখন মহা প্রলয়ে এক-মাত্র অবশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্ট মায়ার উদয় হয়। মায়ার উদয় কে স্বাভাবিক বলা হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিকই বটে। কিন্তু মায়া হইতে সৃষ্টি আবার সৃষ্টি লয়ে মায়া—এইভাবে মায়া ও সৃষ্টিলয় জড়িত করিতে করিতে লয়

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] ভাদ্র ১৩২১ সাল। [৫ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১০নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে"

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৷০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪৷৷০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷৷০, সিকি পৃষ্ঠা ১৷৷০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অত্রৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

তোমার আহ্বান

দেবতা তোমার বিশ্ব-বিজন-আলয়ে
আমারে ডেকেছ তুমি?
যত ছুটে যেতে চাই তত যে আগ্রহে
জড়ায়ে ধরেগো ভূমি।
সে যে স্নেহাকুল প্রাণে নীরবে তাকায়,
গাঁথি শত স্মৃতিহার কত কি জানায়।
আহা! ব্যথা দিতে তার মায়ের পরাণ
আঁখি ভরে আসে জলে;
দূর হ'তে দূরে পশে কাতর আহ্বান,
ফিরাবে কিসের ছলে।
তাই যাই যাই প্রিয়, থমকি দাঁড়াই,
কি বলে প্রবোধি তারে ভাষা নাহি পাই।
পুনঃ—বাঁশীতে করয়ে ত্বরিত আহ্বান
কেমনে দাঁড়ায়ে থাকি?

দেখি বরিষে করুণা—মধু হতে মধু,
তোমার উদার আঁখি।
তেমনি উজল স্নিগধ জ্যোতির ধারা,
নয়নে নেহারি একি পতি আঁখি-তারা ?
ওগো ? এখন তখন যদিও উজায়।
গিরি রোধে গতি তার,
তবু বেশীক্ষণ তারে ধ'রে রাখা ভার,
নদী চাহে পারাবার ॥

মৃঃ—

আত্মদর্শন

পথ চলিতে চলিতে চলন বন্ধ হইল। কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল পথি-পার্শ্বে পানের দোকান, তাহাতে একখানি অনতিবৃহৎ দর্পণ লম্বিত আছে—অন্যমনস্ক দৃষ্টি যেমনই অতর্কিত ভাবে উহার দিকে পতিত হইয়াছে, অমনি তাহাতে দেহাত্মবুদ্ধি চিত্ত আত্ম-দর্শন করিয়া চলন ভুলিয়া গিয়াছে। আহা, আত্মা এমনই মনোরম! কুরূপ হউক, সুরূপ হউক, সকলেই আদর্শ-তল-বিম্বিত আত্মদর্শনকালে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে—আত্ম-দর্শন কালের এই একাগ্রতা, এই আনন্দ দেখিলে মনে হয়, চিত্ত যদি বিনা দর্পণে সর্ব্বদা এইরূপ আত্ম-দর্শনে সমর্থ হইত, তবে বুঝি সে দৃশ্যদর্শন ভুলিয়া যাইত।

আহা চিত্ত! এত সাধ, তোমার আত্ম-দর্শনে, এত সুখী তুমি আত্ম-দর্শনে, কিন্তু চিরকাল এই মাংসপুত্তলিকাকেই আমি বলিয়া সুখের প্রতারণা ভোগ করিলে! আমার কোন দুঃখ নাই কিন্তু তোমার এই দুঃখ ভাবিলে আমিও দুঃখের সাগরে ডুবিয়া যাই, তাই তোমার কথা আমি প্রায় ভাবি না,—কিন্তু যখন মনে হইল, তখন এস তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করা যা'ক। ফলে তোমার এই আত্মদর্শনের রুচিটি আমার বড় ভাল লাগে, এই দুরবস্থায়ও এই একটী মাত্র শুভ লক্ষণ তোমার দেখিতে পাই।

তবে তুমি কি বল—দেহ আমার আত্মা নয়?

কিছুতেই না। কখন শ্মশানে শবদাহন করিয়াছ? যদি করিয়া থাক ভাল, নচেৎ কল্পনায় চিন্তা করিয়া আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর।

শ্মশানে যখন এই দেহ শায়িত হয় তখন হইা কি দেখিলে মনে হয়—দেহ আমার রমণীয়-দর্শন আত্মা হইতে পারে কি না? ইহার সেই কদর্য্য অবস্থায় যে ইহাতে তৈল মর্দ্দন করিয়াছে, ইহাকে স্নান করাইয়াছে, সে বুঝিয়াছে ইহা কত অশুচি। সে বুঝিয়াছে দেহ-চ্যুত বিষ্ঠাদি এবং আত্মার পরিত্যক্ত দেহ এ উভয়ই সমান অশুচি। আর আত্মা? যিনি অশুচিকেও পরম শুচিরূপে পরিণত করেন, কদর্য্যকেও অগ্নিস্পৃষ্ট অঙ্গারের মত স্বস্বরূপে পরিণত করেন—আহা, তিনি কত পবিত্র, কত রমণীয়, কত সুন্দর!

আহা চিত্ত! তুমি বিচার করিয়া দেখ, বুঝিবে, তুমি কত ভুল করিয়াছ।

তবে কে আমি? আমাকে কি এখন আমি দেখিতে পাইব? আমি যে বড় অপরাধী।

হাঁ তুমি অজ্ঞান-মোহে বড় ভুল করিয়াছ—এই জন্য বিনা দর্পণে তোমার আত্মদর্শনের অধিকার নাই; তবে দর্পণতলে তুমি আত্ম-দর্শন করিতে পার—তাহা অবসর মত পরে বলিব।

কবে আর তুমি বলিবে? তুমি এখনই বল, কোন্ দর্পণে আমি আত্ম-দর্শন করিতে পারিব?

তবে শুন বলিতেছি—এই যে তোমার দেহ, ইহারই মধ্যে হৃদয়াকাশে হৃদয়-পুণ্ডরীক, উহা অষ্টদল। ঐ দেখ তাহার কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণ-দর্পণ—ঐ দেখ উহা কেমন স্বচ্ছ, কেমন সুন্দর!

কই আমি দর্পণত দেখিতে পাইতেছি না কেবল অস্পষ্ট ভাব একটী পুরুষাকৃতি দেখিতে পাইতেছি।

তুমি দর্পণ দেখিতে পাইতেছ না? আচ্ছা বলদেখি তোমার পুরুষাকৃতি কিরূপ?

বলিতেছি এই এখন ঐ মূর্ত্তি আরও স্পষ্ট হইয়াছে। আহা কি মধুর মূর্ত্তি! ইহার চরণতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তই তেজোময়। ইহা হইতে মধুর জ্যোতির্ম্ময় ছটা নির্গত হইতেছে—হইয়া সমগ্র হৃদয়কমল আলোকিত করিয়াছে। ইহার আকর্ণ বিশ্রান্ত কমলদলনিভ সুধাবর্ষী নয়নদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা আমার সুন্দর বোধ হইতেছে। আহা, ইহাকে দেখিয়া আমার এরূপ অভূতপূর্ব্ব

আনন্দ বোধ হইতেছে কেন ? আর তোমার সে দর্পণ আমি দেখিতে চাই না, আমি তাহাতে আমাকেও আর দেখিতে চাই না।

দর্পণে আপনাকে দেখিতে পাইলে কি কেহ দর্পণ দেখিতে চায় ?

তবে কি এই জ্যোতিস্ময় মূর্ত্তিই আমার ? ইনিই কি সেই রমণীয় দর্শন ?

তাহাও আবার বলিতে হইবে ? না আমি বুঝিয়াছি, তবে কি তিনি এই জুগুপ্সিত দেহমধ্যে ?

তুমি যে দেহকূপে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছ—তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি—

না আমি আর তোমাকে বলিতে দিব না—তুমি কি বলিতেছ ? তিনি কে ! ইনিই ত আমি

আচ্ছা আজ এ পর্য্যন্তই ভাল, তুমি ইহাকেই আমি আমি করিতে করিতে ইনিই তুমি হইয়া যাও—অন্য কথা পরে বলিব।

সহঃ সম্পাদক

ভবপারের কাণ্ডারী

আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। এত লোকের এত মত, এত লোকের এত দল, সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির এত পার্থক্য—ইহাতে আমাদের রক্ষা পাইবার উপায় নাই—যদি তুমি রক্ষা না কর।

কি উপায়ে রক্ষা হইবে ? তোমার রক্ষার ক্রম কি ?

আগে বল দেখি তোমরা রক্ষার কি উপায় করিতেছ। পরে আমার উপায় আমি বলিয়া দিব।

সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির পার্থক্য যদি নিরন্তর হয়, তবে ব্যষ্টির রক্ষা হইতেই পারে না। ব্যষ্টি যাহাই কেন করুক না, আগে সমষ্টিকে ধরা চাই। তুমি ধরিতে পার—চাই না পার—সমষ্টি সর্ব্বদা একরূপ। সমষ্টি-পুরুষকে বলা হয় মহাজীব। ইনিই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ—ইনিই নারায়ণ—ইনিই সত্যসঙ্কল্প পুরুষ। ব্যষ্টি পুরুষগুলি সমষ্টি-পুরুষেরই অঙ্গ। একশত সংখ্যাটি যাহা, তাহা ১ হইতে ৯৯ সংখ্যা লইয়া। বন যাহা তাহা বৃক্ষগুলির সমষ্টি মাত্র। এক একটি পরিবার

কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। এক একটি সমাজ কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি। এক একটি জাতি আবার বহু সমাজের সমষ্টি। আবার সমস্ত প্রকারের জাতি লইয়া যিনি, স্থাবর জঙ্গমের জাতিসমূহ লইয়া যিনি, সমস্ত নরনারী-বিজড়িত যিনি—তিনিই বিরাট্ পুরুষ, তিনিই নারায়ণ, তিনিই মহাজীব।

তবে স্থূল বিষয়ের সমষ্টি ব্যষ্টির সহিত, সূক্ষ্ম বিষয়ের সমষ্টি ব্যষ্টির কিছু পার্থক্য আছে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—জড়বস্তু সমূহের সমষ্টি ব্যষ্টির সহিত চেতন জীবের ব্যষ্টি সমষ্টির কিছু পার্থক্য আছে।

একটি আমবাগান অনেকগুলি আম্রবৃক্ষের সমষ্টি। সমস্ত আম্রবৃক্ষগুলি যদি কাটিয়া ফেলা যায় তবে বাগানটি থাকে না। কিন্তু সমস্ত জীব না থাকিলেও নারায়ণ থাকেন। সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া গেলেও মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম থাকেন। প্রভেদটি এই। এই তত্ত্বটি ভাল করিয়া ধারণা করিয়া যদি পরিবার, সমাজ ও জাতি আপন আপন কর্ম্ম করে, তবে রক্ষার আর কোন ভয় থাকে না।

সমষ্টি পুরুষ যিনি তিনি সমকালেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত, অথচ তিনি আরও দশঅঙ্গুল ছাড়াইয়া।

ব্যক্তিমধ্যে যে সমষ্টিপুরুষ আছেন—যখন ব্যক্তিটি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তাঁহার ইচ্ছায় পড়িতে পারেন—তখনই ব্যক্তির উদ্ধার হয়। এইরূপ পরিবারের সমষ্টি পুরুষ, সমাজের সমষ্টি পুরুষ, জাতির সমষ্টি পুরুষ—ইঁহাদের ইচ্ছামত যখন ব্যষ্টিগুলি আপনাকে আপনাকে চালাইতে পারে, তখন সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলে।

সর্ব্বশাস্ত্রেই ঈশ্বরের ইচ্ছা যে কি তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহাদের অবসর নাই তাঁহারা যাঁহাদের অবসর আছে তাঁহাদের কাছে জানিয়া লইবার জন্য সৎসঙ্গের সমিতি করুন—ভাল জিনিষের মূল পত্তন হইবে। বেশী আড়ম্বর করিয়া লিখিয়া কি হইবে—সবাই সব জানে—এখন কার্য্যক্ষেত্র করাই সদনুষ্ঠান করা। অধিক কি—এখন যাহার যেমন ইচ্ছা। ইতি—

লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ

শুধু ভারতবর্ষেই যে কলিযুগ পড়িয়াছে, জগতের আর কোথায় পড়ে নাই তাহা কি বলা যায়? জগতের কোথাও আর কলিযুগ আছে কি না আছে—

সে বিচার জগতের বুদ্ধিমান্ লোকে করিবেন—আমরা ভারতের কথা বলিতেছি।

ভারতে কলিযুগ রাজত্ব করিতেছে; কারণ মানুষের ঈশ্বর-নির্ভরতা শিথিল হইয়া গিয়াছে। নির্ভরতা ত বড় কথা ঈশ্বর-বিশ্বাসই কমিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরকে মানুষের বড় একটা দরকার হইতেছে না। ঈশ্বর শূন্য হইলে মানুষ যাহা হয় ভারতবর্ষের মানুষ প্রায়শঃ সেইরূপ হইতেছে। শাস্ত্রে কলিগ্রস্ত মানুষের অবস্থার কথা অনেক স্থানে দেখা যায়, আর আমরা শাস্ত্রকথা জনে জনে ফলিয়া যাইতেও দেখিতেছি। অধ্যাত্ম-রামায়ণের প্রথমেই কলির মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ কলির জীবের দুরবস্থা ভাবনা করিয়া পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন—"এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ"। কিরূপে নষ্টবুদ্ধি কলির জীবের পরলোকে গতি হইবে—তিনি এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন "লঘুপায়েন কেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ"। কোন্ সহজ উপায়ে কলির জীব পরলোক-গতি লাভ করিতে পারে—আপনি কৃপা করিয়া তাহাই বলুন।

শ্রীমৎ ভাগবতের প্রথমেই শৌনকাদি ঋষি সূতকে এই প্রশ্নই করেন। শ্রীভাগবতের প্রথমে কলির জীবের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ঋষিগণ বলিতেছেন:—

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য! কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥ ১।১।১০॥

হে সভ্য! হে সূত! এই কলিযুগে প্রায় লোকেই অল্পায়ু। যদিও কেহ কেহ দীর্ঘায়ু হয় তাহারা কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে মন্দা, অলস, উৎসাহহীন। আবার যদিও কাহাকেও কথঞ্চিৎ উৎসাহশীল দেখা যায় কিন্তু তাহারা মন্দবুদ্ধি। মন্দবুদ্ধি এই জন্য যে, ইহারা শাস্ত্র দেখে, দেখিয়া "আমি ব্রহ্ম" নিশ্চয় করিয়া নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য মিথ্যাকে ভয় করে না; মন্দ আচার, মন্দ ব্যবহার, মন্দ আহার কিছুতেই ডরায় না; নানাপ্রকার বুদ্ধি কৌশলে ইহারা নিতান্ত ব্যভিচার করে।

আবার যদি কোথাও দীর্ঘায়ু, উৎসাহশীল অথচ সুবুদ্ধি মানুষ দেখা যায়, কিন্তু দেখা যায় তাহারা মন্দভাগ্য। কারণ ঈশ্বরপরায়ণ যিনি হইবেন তাঁহার সৎসঙ্গ নিতান্ত আবশ্যক। কলির প্রায় জীবের সৎসঙ্গ ত ঘুটেই না—

সৎসঙ্গের পরিবর্ত্তে ইহাদের ভিতরে বাহিরে অসৎসঙ্গ। আবার যদি কাহারও যথার্থ সৎসঙ্গ যুটে, কিন্তু এমনি দুর্দ্দৈব যে, এই সব লোক রোগশোক দ্বারা এরূপ উপদ্রুত যে, সৎসঙ্গলব্ধ সাধন ভজন করিবার অবসর ইহাদের মিলে না।

শ্রীভাগবতের এই কথা কত সত্য তাহা আমরা জনে জনে অনুভব করিতেছে।

এখানেও ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছেন—কলির জীব ত কোন দুরূহ সাধনা দ্বারা ঈশ্বরপরায়ণ হইতে পারিবে না। হে সূত! ইহারা শাস্ত্রে যে ভূরি ভূরি কর্ম্মের উপদেশ আছে তাহা ত জানিবে না, সে অবসরও ইহাদের নাই। ইহারা শাস্ত্রের সার মর্ম্ম ধরিতে পারিবে না। আপনি বলুন, কোন্ সহজ উপায়ে ইহারা জরামরণসঙ্কুল সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

শ্রীঅধ্যাত্ম-রামায়ণ এবং শ্রীমৎ ভাগবত দুইখানিই বড় উপাদেয় গ্রন্থ। দুইখানিই শ্রীব্যাসদেবের লেখা। দুইখানিতেই কলির জীবের জন্য একই প্রশ্ন এবং একই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীভগবানের যশোগুণ গানই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সহজ উপায়। হরিগুণ গানই সকল অধিকারীর জন্য লঘূপায়। শ্রীভাগবত এই জন্য, অধ্যাত্ম-রামায়ণ এই জন্য,বাল্মীকি রামায়ণ এই জন্য, শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় অংশ দেবীভাগবত এই জন্য, শ্রীচণ্ডীও এই জন্য।

যশোগুণ গানটি কি কখন কি আলোচনা করিয়াছ? কাহারও যশোগুণ কি গান করিয়াছ? যদি করিয়া থাক তবে কয় দিনের জন্য? একদিন যাহার যশোগান করিয়াছ আবার যখন তাহারই যশোগুণ আর গাহিতে পার না—ভাবিয়া দেখ কেন পার না? তোমার দোষে পার না, না যাহার যশোগুণ গাহিতে তার দোষে পার না, বা উভয়ের দোষে পার না?

পার আর না পার যদি শ্রীভগবানের যশোগান প্রবাহক্রমে রাখিতে পার—তবেই সহজ উপায়ে তুমি দুস্তর সংসার পার হইবে। অধিক লিখিয়া কি ফল—চেষ্টা কর হয় ভাল হইয়া গেলে—না হয়—কে বলিবে তাহাতে কি হইবে? ইতি—

সংসার ভ্রমণ

পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মশক মক্ষিকা: কত জীব দেখা যায়। ইহারা কত কষ্ট পায়। কষ্ট নিবারণ করিবার উপায়ও ইহাদের নাই। ভূতের অত্যাচার হইতে ইহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সবল জন্তুর হস্ত হইতেও ইহারা রক্ষা পায় না।

ইহাদের এরূপ গতি কেন হইল? তুমি কি চাও তোমার এরূপ গতি হউক? এই যে দেখ বাদলা হইল—বড় আনন্দে বাদলপোকা আকাশে উড়িল। অমনি কত শত পাখী তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তুমি কি এইরূপ চাও? এই যে কুকুরটি সর্ব্বাঙ্গে ঘা লইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে—কখন খাইতে পায়, কখন পায় না, কোথাও যদি যায় লোকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয় তুমি কি এইরূপ হইতে চাও? কখনই না। এই যে গাড়ীর গরু রাশীকৃত মৃত গরুর চামড়া বোঝাই লইয়া চলিতেছে, আর যেন গাড়ী টানিতে পারিতেছে না—আর গাড়োয়ান নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে—গরুর চক্ষের জল কত পড়িয়াছে—গরু কত কাঁদিয়াছে—চক্ষের কোল হইতে কাল দাগ পড়িয়া রহিয়াছে তুমি কি এইরূপ হইতে চাও? না তাহা চাও না।

কিন্তু না চাহিলে কি হইবে? তোমাকে ত ঐরূপ হইতে হইবে যদি তুমি এখনও সাবধান না হও। শুধু ইচ্ছায় ত আর কার্য্য হয় না। যদি তুমি সত্য সঙ্কল্প হইতে পারিতে তবে কার্য্য হইত বটে। তা যখন নও, তখন একটু দেখিতে হইবে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, মশক, মক্ষিকা ইহাদের এমন কষ্টকর গতি কেন হইল?

তুমি কি এই কষ্টকর গতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার? যদি না পার, তবে যাঁহারা ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা কেন না শ্রবণ কর? শ্রবণ করা উচিত। বিশ্বাসও করা উচিত।

জীবের সংসার ভ্রমণ সম্বন্ধে অন্যে ত কিছুই বলিতে পারে না। বেদপ্রমুখ শাস্ত্র এই গতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। তুমি যদি বিশ্বাস কর তাহাতে ত তোমার কোন ক্ষতি নাই। বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে থাক ক্রমে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। সুখ পাইবে। গতিও লাগিবে।

শাস্ত্র জীবের ত্রিবিধ গতি নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(১) অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি—ইহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে। ইহা ক্রমমুক্তি।.

(২) ধূমাদি মার্গে গতি—ইহাতে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি। ইহা হইতে অসার সংসারে পতন।

(৩) মার্গদ্বয় পরিভ্রষ্ট যাহারা তাহাদের কষ্ট অধোগতি—পশুপক্ষী, মশক-মক্ষিকার গতি।

এতদ্ভিন্ন এই জীবনেই যদি জ্ঞানলাভ করিতে পার, তবে এইজন্মেই পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ শুভাগতি হইবে। ইহা সদ্যোমুক্তি।

যাঁহারা উপাস্য বস্তুকে জানিয়া কর্ম্মদ্বারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের গতি হয় অর্চ্চিরাদি মার্গে। ইহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। ইঁহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। শেষে ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন।

যাঁহারা উপাস্যকে না জানিয়া শুধু বিশ্বাসে কর্ম্ম করেন তাঁহাদের গতি হয় ধূমমার্গে, ইহারা চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে ইহাদের আবার এই দুঃখময় সংসারে পতন হয়।

আর যাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপাসনাদি কোন কর্ম্ম করেন না—যাঁহারা আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি স্বাভাবিক কর্ম্ম লইয়া থাকেন—যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উভয় পথ ভ্রষ্ট হয়েন এবং মৃত্যুর পরে মশক মক্ষিকা, পশুপক্ষী বা কীট পতঙ্গ হয়েন। শাস্ত্র ইহা বলেন। সাবধান হওয়া ত উচিত।

সংসার-ভ্রমণ নিবৃত্তি

"সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্", "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্"। সৎব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক এবং অদ্বিতীয়। আত্মাই এই সমস্ত জগৎ। এইটি যদি নিশ্চয় ধারণা করিতে পার, তবে তুমি অদ্বৈত জ্ঞানী হইয়া এই জীবনেই পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিবে।

দেখ যতদিন একবারে নির্ভয় না হইতে পারিতেছ, ততদিন তোমার জ্ঞান—অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই। কেন জ্ঞান? যতদিন দুই দুই আছে, ততদিন ভয় থাকিবেই। দ্বিতীয় কিছু থাকিলেই দ্বিতীয় হইতেই ভয় জন্মে। শ্রুতি বলেন, "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি"।

সম্পূর্ণ সত্য এই যে, ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মই জগৎরূপে ভাসিয়াছেন। জগৎটা ব্রহ্ম সত্তামাত্রাত্মক। জগৎটা বহু, আর ব্রহ্ম এক। তবে ব্রহ্মই জগৎ কিরূপে ?

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ। মায়ার অপুর্ব্ব কৌশলে—মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা এক ব্রহ্মই যেন বহু আকার বিশিষ্ট জগৎরূপে ভাসেন। বাস্তবিক কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। জগৎ নাই। জগৎ ভাসেও না। রজ্জুকে যেমন সর্প মত দেখা হইয়া যায়, সেইরূপ মোহকরী মায়ার অপুর্ব্ব কৌশলে ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখা হইয়া যায়। মায়াটাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানটা দূর করিতে পারিলেই তুমি ব্রহ্মরূপেই যে সর্ব্বদা অবস্থিত তাহা জানিতে পারিবে। আর তোমার এই দেহটা—এটা অজ্ঞানে ব্রহ্মে ভাসিয়াছে—রজ্জুতে যেমন সর্প ভাসে সেইরূপ ?

শুধু শাস্ত্রে পড়িয়াই এই অবস্থা লাভ হয় না। প্রথমে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ চাই, বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ চাই। পরে প্রায়শ্চিত্ত চাই। পরে উপাসনা চাই। এতদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে। পরে নিত্যানিত্য বস্তুবিচার চাই; ইহামুত্রফল-ভোগ বিরাগ চাই, শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তি লাভ করা চাই। তবে মুমুক্ষুত্ব হইবে। তাহার পরে সর্ব্বদা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন চাই। পরে তত্ত্বমসী বা সোঽহং ইত্যাদি মহাবাক্য বিচার চাই। তবে অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিবে। অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিলে তবে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—বিচারকও সে, পুলিশও সে,—উকিল, ব্যারিষ্টার, কৌন্‌সুলিও সে—সাপও সে, বাঘও সে—শেষে আমিও সে হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন মুখের অভ্যাস—তাতেও কিছু হয়।

নিবৃত্তি কিসে হইবে ?

সহজ করিয়া বল সংসার-নিবৃত্তি, মৃত্যুভয়াদি-নিবৃত্তি, দেহ-কারাগারে ক্রীতদাসের মত অবস্থিতির নিবৃত্তি, মৃত্যুর পরে কোথায় যাইব এই চিন্তার নিবৃত্তি—এক কথায় অজ্ঞান-নিবৃত্তি কিসে হইবে? আরও সহজ করিয়া বলি—সংসারে গতাগতি-নিবৃত্তি কিসে হইবে? এক কথায় মুক্তি কিসে হইবে ?

সঙ্কল্প ত্যাগ কর,—হইবে। চিত্তত্যাগ কর—হইবে।

সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই যে মুক্তি হয়, সংসার-নিবৃত্তি হয়, সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি হয়—এটা কি, তাহা ত আগে বুঝাইয়া দাও। কারণ যাহা না বুঝি, তাহার জন্য চেষ্টা ত হইতে পারে না।

আচ্ছা তাহাই হউক। যখন তোমাতে কোন সঙ্কল্প না থাকে, বল দেখি তখন তুমি কি?

আমি বাহিরে জগৎ দেখিতেছি, আমার দেহকে আমি অনুভব করিতেছি, আমার মন আছে আমি বুঝিতেছি, আমার মধ্যে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প উঠিতেছে আমি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছি; আবার বুদ্ধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প উঠিতেছে তাহা অবলম্বনে কার্য্য করিতেছি, জগৎ, দেহ, মন, যাহা কিছু সকলই ত সঙ্কল্প। কেবল আমি, স্বরূপে যাহা তাহা সঙ্কল্প নহে। আমি আপনি আপনি যখন, তখন কোন সঙ্কল্প নাই। জগৎ নাই, দেহ নাই, মন নাই, কিছুই আর নাই যখন হয়—তখন আমি আপনি আপনি। ইহাই ত মুক্তি। ইহাই ত সর্ব্বসঙ্কল্প-নিবৃত্তি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই আপনি আপনি অবস্থায় থাকা কি প্রার্থনীয়?

এই আপনি আপনি ভাবে থাকাটা কিরূপ তুমি কি বুঝিয়াছ?

আপনি আপনি ভাবে থাকাই যদি ব্রহ্মভাবে থাকা হয়, তবে এ ভাবে থাকায় সুখ কি? আর কিছুই নাই আমি আপনি আপনি আছি—চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, দেখা শোনা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, শরীর নাই, জগৎ নাই, আর কিছুই নাই এমন অবস্থায় একা অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম কি তাহা ধারণা করাও যায় না। এ অবস্থা লাভ করিয়া কি হইবে? এই অবস্থায় না গেলে যদি সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি, সংসার-নিবৃত্তি না হয়, তবে ত দুঃখ থাকাই ভাল; সংসার থাকাই ভাল। কেননা দুঃখ যেমন আছে তেমনি সুখও পাওয়া যায়। ব্রহ্মভাবে থাকিয়া মুক্তি লাভ করিতে ত ইচ্ছা হয় না।

ব্রহ্মভাবে থাকিতে চাও বা না চাও তাহাতে বড় একটা আসিয়া যায় না। কিন্তু এইটি পূর্ণসত্য জানিও যে, আপনি আপনি ভাব বা ব্রহ্মভাবটিই সত্য, অন্য সমস্ত ব্যাপার মিথ্যা। দেহ, জগৎ, মন এ সমস্তই মায়ার রচনা।

ব্রহ্ম যিনি তিনি ইচ্ছা করিয়া জগৎ-ইন্দ্রজাল তুলিয়া রঙ্গ করিতেও পারেন, আবার ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিয়া আপনি আপনি থাকিতেও পারেন। ব্রহ্ম একটা জড়ের মতন পড়িয়া থাকেন না। কারণ তাঁহা হইতে স্বভাবতঃ যে মায়া উঠে

সেই মায়ার উদয়ে ইচ্ছা-শক্তি জাগাইবার স্পন্দন প্রাপ্তে আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়াও স্বপ্ন, জাগ্রং, সুষুপ্তি ভাবে খেলা করেন। আবার ঝলক যখন তাঁহাতেই লয় হইয়া যায়, তখন পরম শান্ত চলন রহিত সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থানও করেন। ইহাই ত ব্রহ্মাবস্থা। তুমি যদি আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ একবার করিতে পার, তবে তুমি অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া আপন স্বরূপে থাকিয়াও মায়া লইয়া স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি অবস্থাতে খেলা করিতে পারিবে কখন তুমি কাহারও অধীন হইবে না। এই দেহ যখন ইচ্ছা ধরিবে, আবার কাপড় ছাড়ার মত যখন ইচ্ছা ছাড়িবে—তুমি সর্ব্বদাই ইচ্ছাময় হইবে। ইচ্ছামাত্র জগৎ সৃষ্ট হইবে, আবার ইচ্ছামাত্র জগং লয় হইয়া যাইবে। এই অবস্থা লাভে ইচ্ছা হয় কি না ?

হয় বৈাক। এই ত বেশ। কিন্তু এই বদ্ধ জীব অবস্থা হইতে ঐ ব্রহ্মাবস্থা কিরূপে হইবে ?

সঙ্কল্প লইয়া থাক বদ্ধই থাকিবে। তবে তামস সঙ্কল্প লইয়া থাক, দেহান্তে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি হইবে।

রাজস সঙ্কল্প লইয়া থাক—পুনঃ পুনঃ মানুষ হইয়া বহু দুঃখ পাইবে।

সত্ত্ব-সঙ্কল্প লইয়া থাক, অদূরে তোমার মোক্ষ-সাম্রাজ্য। কারণ স্বত্ত্ব-সঙ্কল্প লইয়া থাকিতে থাকিতে সঙ্কল্প ত্যাগ হইয়া যাইবে। কোন সঙ্কল্প যখন নাই তখনই মোক্ষ। মোক্ষলাভ করিয়া যখন সমস্তই আয়ত্ত করিতে পারিবে, তখনই ব্রহ্মভাব।

যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তৎব্রহ্ম নিষ্কলমহং নচ ভূতসজ্যঃ ॥

নিজশক্তি

নিজশক্তি দর্শন—এমন আর কি হইতে পারে? প্রকৃত আনন্দ তখন যখন মানুষ নিজের শক্তি নিজে বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহার যত শক্তি আছে সকল শক্তির সমষ্টি যদি মূর্ত্তি ধারিয়া আইসে, তবে কি মানুষকে আনন্দে নাচাইয়া তুলে না ?

নিজশক্তির সহিত মিলনই মিলন। সে মিলন একবার হইলেই বুঝা যায়। সে মিলনের অনুরাগ কখন যায় না। দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কখন করে ন। সে মিলনে অবস্থার অপেক্ষা করে না। সে মিলনে বয়স অপেক্ষা করে না। সে মিলনে রূপ, অরূপ অপেক্ষা করে না। একবার চক্ষে চক্ষু পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কি সেই দৃষ্টি! কেমন সেই চাহুনি। নিজ শক্তির সহিত একটি সম্বন্ধ থাকে না। সকল সম্বন্ধ হইয়া যায়। নিজশক্তির দর্শন যেমন মুক্তিপ্রাপক এমন আর কিছুই নহে।

মানুষ কতবার এই দুঃখময় সংসারে গতাগতি করে, কতবার জীবনে ভুল করে, কতবার কত জনকে আপনার বলিয়া কত কি করিয়া ফেলে—কিন্তু কিছুতেই ইহার হৃদয় শান্ত হয় না, কিছুতেই মন আনন্দে ডুবিয়া যায় না—যতদিন না এই জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনীর সহিত মিলন হয়। কত জীবন ইহার অনুসন্ধানে কাটিয়া যায়। উভয়েই উভয়ের অনুসন্ধান করে। হয় ত কতবার দেখাও হয় বুঝিতেও পারে, কিন্তু ঠিক মিলনের মত মিলন হইতে দেয় না।

আবার এই মিলনে ভ্রমও আছে। প্রথমে ইচ্ছা নাই। কিন্তু নানা কৌশলে যখন প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক একটা চলন হয়, ক্রমে তাহা হইতেই ইচ্ছার উদয় হয়—ইহাকে অনিচ্ছার ইচ্ছা বলে—অনিচ্ছা ইচ্ছা হইতে ভ্রম হয়। কাহাকে কি বলিয়া ফেলে। শেষে ভুলও বুঝিতে পারে। কিন্তু যথার্থ জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনীর সহিত যদি মিলন হয়, তবে কখন বিরক্তি হয় না। কথা কহিয়া অতৃপ্তি আর কই! দেখিয়া অতৃপ্তি। আরও দেখি। সেবা করিয়া অতৃপ্তি আরও করি। সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। যদিই সঙ্গ ছাড়া হয়, তাহা হইলেও যথার্থ ছাড়া হয় না। স্থূলে ছাড়া হইলেও সূক্ষ্মে সর্ব্বদা মিলিয়া থাকে।

নিজশক্তির সহিত মিলন হইলে যেন অপূর্ণ আর কিছুই থাকে না। যেন অভাব আর কিছুই হয় না। যেন সব বৃত্তি ফুটিয়া উঠে। এমনটি আর কোথাও হয় না। তারে দেখ্‌লে প্রাণ জেগে উঠে। কোন বিষয়ে আলস্য অনিচ্ছা থাকে না। লয় বিক্ষেপ হয় না। কমলে ভ্রমরোপবেশনের মত যে স্থিতি, সে স্থিতি বড় পবিত্র। সুখ এখানে গ্লানিশূন্য।

যথার্থ নিজশক্তির সহিত মিলন হইল কি না ইহার পরীক্ষা এখানে ভোগের ইচ্ছা থাকিবে না। এখানে জড় দেহের কার্য্য হইবে না। উভয়ে উভয়কে সেই বরণীয় ভর্গের, সেই কল্পবৃক্ষমূলের মণ্ডপের সংবাদ দিতেই ব্যাকুল। উচ্চ-বিষয় লাভেই ইহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট।

শ্রীভগবানের ইচ্ছা ও মানুষের ইচ্ছা

অনেক সময়ে আমাদের মনে হয় আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি। আমাদিগকে এখানে কি করিতে হইবে? মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগকে কি কি কাজ সারিয়া লইতে হইবে। এই প্রশ্ন কোন না কোন সময়ে সকলের মনেই উঠে। কিন্তু ইহার মীমাংসা খুব কম লোকেই করেন। যাঁহারা একটা মীমাংসা করিয়া লন, তাঁহাদের জীবন একটা নিয়মের উপর চলিতে থাকে। আর যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহাদের জীবনে অথবা কার্য্যে কোন শৃঙ্খলা বা প্রণালী থাকে না। সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে উচিত। যত শীঘ্র ইহা করা যায় ততই ভাল; কারণ আমাদের সময় বড় অল্প এবং এই অল্প সময়টুকুও যে কখন ফুরাইয়া যাইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। আর শেষে যদিও কিছুদিন সময় বাকী থাকে, তখন হয়ত সামর্থ্য নাও থাকিতে পারে। অতএব কর্ত্তব্যটা যত শীঘ্র ঠিক করিয়া লওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছু মাত্র অবহেলা করা উচিত নয়।

এই বিষয়ে চিন্তা করিলে প্রথমেই একটা কথা মনে হয়,—আমার জীবনের উদ্দেশ্য যাহাকে বলিতেছি তাহা কি শুধু আমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য, না তাহার পশ্চাতে অপর কোন মহত্তর ব্যক্তির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যাহার দ্বারা আমরা পরিচালিত হইতেছি অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য আমি ঠিক করিয়া লইতে পারি, না কেহ ইতিঃপূর্ব্বে উহা ঠিক করিয়া আমার দ্বারা তাহা সাধিত করাইয়া লইতে চান। প্রভু দাসকে কোন কর্ম্ম করিতে বলিলে ঐ কর্ম্ম করা গৌণতঃ দাসের উদ্দেশ্য হইলেও বাস্তবিক উহা যেমন প্রভুরই উদ্দেশ্য, সেইরূপ এই জীবনে আমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা কাহারও আদেশ বা ইচ্ছা ক্রমে করিতে হইবে, না আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাই তাহার একমাত্র কারণ। যদি বলা যায় ভগবানের ইচ্ছাই আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একমাত্র কারণ, তিনি আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন তাঁহার ইচ্ছামত কতকগুলি কার্য্য করিবার জন্য,—তাহা হইলে একটা সন্দেহ উঠে যে, যদি ইহা ভগবানেরই ইচ্ছা, তাহা হইলে তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন তাঁহার ইচ্ছা অসাধিত থাকিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছা কেহ প্রতিহত করিতে পারে না। তিনি যেমন করিয়া হউক তাহা সম্পন্ন করাইয়া লইবেন। অতএব আমরা কষ্ট করিতে যাই

কেন? আমরা কিছু করি আর নাই করি, তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য হইবেই। কারণ ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প। তাঁহার ইচ্ছা কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না। অপর পক্ষে যদি বলা যায় আমার কোন প্রভু নাই, আমার কার্য্যের প্রভু একমাত্র আমিই, যাহাকে আমার উদ্দেশ্য বলিতেছি তাহার মূল কারণ একমাত্র আমারই ইচ্ছা, আমি আপনি ইহা নির্দ্ধারিত করিতে পারি এবং যে ভাবে নির্দ্ধারিত করিব সেই ভাবেই ইহা সম্পন্ন হইবে। ইহাতে আপাততঃ কোন দোষ না হইলেও, আমি কে, আমার শক্তি কতটুকু, কার্য্য সম্পন্ন হয় আমার ইচ্ছায়, না অপর কাহারও কৃপায়, ইত্যাদি এক অতি বিস্তীর্ণ বিচারের মধ্যে আমরা আসিয়া পড়ি, যাহার আলোচনা করিবার উপস্থিত কোন প্রয়োজন নাই। যে বিষয় বিচার করিবার জন্য আজ সঙ্কল্প করা গিয়াছে, সেই বিচারের মধ্যে আমরা দেখিব যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে।

সংসারের দিকে দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্যবহারতঃ সকলের উদ্দেশ্য এক নহে এবং এক ব্যক্তির জীবনেই সকল সময়ে সকল কার্য্যে সে এক উদ্দেশ্য লইয়া চলে না। জড়জগৎ এবং পশুজগৎ বাদ দিয়া কেবল মনুষ্য-জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নানা প্রকার লোক নানা প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিতেছে। কেহ ধর্ম্মকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছে, কেহ অর্থকে এবং কেহ বা কামকেই জীবনের যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছে। কেহ অধ্যয়ন লইয়া আছে, কেহ দান-দয়াদি লইয়া আছে, কেহ যাগযজ্ঞ লইয়া আছে। কেহ মনে করে, বিজ্ঞানের উন্নতিই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। আবার কেহ কেহ ভাবে যে, বাণিজ্যের উন্নতি, কৃষিকার্য্যের উন্নতি অথবা শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হয়। কেহ চায় কেবল ধনসঞ্চয় করিতে, কেহ পরিবার প্রতিপালন করিতে, কেহ বা স্বদেশ উদ্ধার করিতে। কেহ কামিনী লইয়া আছে, কেহ কাঞ্চন লইয়া আছে। কেহ তাহার জীবনটা প্রতিশোধের চেষ্টায় অতিবাহিত করিতেছে। কেহ বা উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপে কতলোকে কত প্রকার কার্য্য লইয়া ঘুরিতেছে। চেষ্টা ও যত্ন সফল হইলে আপনাদের জীবনটা সার্থক মনে করে, নচেৎ ভাবে জীবনটা বৃথা গেল।

জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। এই আছে, এই নাই। ইহার সময় কখন কখন

কিছু দীর্ঘ হইলেও অত্যন্ত পরিমিত। সুতরাং জীবনে যদি একটা বিশেষ কর্ত্তব্যই থাকে, তবে বাজে কাজে সময়টা অতিবাহিত না করিয়া যত শীঘ্র উহা আরম্ভ করা যায় ততই ভাল। সকল কার্য্যই আমরা শরীর সবল থাকিতে থাকিতে আরম্ভ করি, কারণ যাহা করিতে চাই, তাহা যথাশক্তি ভাল করিয়াই করিতে চাই। শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িলে আর কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং তাহার আশাও থাকে না। এই জন্য, বৃদ্ধ বয়সে কেহ নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চায় না। তখন নূতন বাসা বাঁধিয়া নূতন খেলা খেলিবার আর সময় থাকে না। কারণ টিকিটের মেয়াদ তখন ফুরাইয়া আসে। গাড়ী গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। তখন নূতন করিয়া আলাপ করা, কি নূতন একটি গল্প আরম্ভ করা চলে না। সেই জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহা বেলাবেলি আরম্ভ করা চাই এবং কর্ত্তব্যটি কি তাহা প্রথমেই স্থির করিয়া লওয়া চাই। কি করিয়া ইহা স্থির করা যায়। কোন্ বিচার ও যুক্তি দ্বারা এই অনন্ত কর্ত্তব্য-প্রবাহের মধ্যে সেই বিশিষ্ট কর্ম্মটিকে বাছিয়া লওয়া যায়। কোন কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে—এই অনন্ত কর্ম্মপুঞ্জের মধ্যে কোনটি আমার একমাত্র প্রয়োজনীয়। উত্তর—আপনার হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য কর। দেখ হৃদয় কি চায়। একবার বিচার কর, এই সংসারের বহুবিধ শোকতাপের মধ্যে হৃদয় কোন্ বস্তুর জন্য লালায়িত। ভাবিয়া দেখ, এখানে কি হইলে হৃদয় জুড়ায়! সংসারে যে যাহাই করুক না কেন, এখানে আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, শোক, সুখ, দুঃখ নানা প্রকার অভাব অশান্তি সকলেই ভোগ করিতে হয়। সকল সময়ে সকলের একটা না একটা দুঃখ আছেই। কেহ তাহাকে অপরের দুঃখ অপেক্ষা কম মনে করে না। বরং ভাবে তাহার তুল্য দুঃখী আর কেহ নাই। যাহার আপাততঃ কোন দুঃখ নাই, তাহারও জরা-ভয় আছে, মৃত্যু-ভয় আছে, বন্ধুবিয়োগের ভয় আছে। অতএব এই সমস্ত দুঃখ হৃদয়ে পুরিয়া মানুষ কোন্ কার্য্য নিশ্চিন্ত হইয়া করিতে পারে। সুস্থচিত্তে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কখন কখন হয়ত মানুষ মোহেতে ভুলিয়া কিছুকাল স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু কালের প্রবাহ তাহাকে এমন এক স্থানে আনিয়া উপস্থিত করে যেখানে মানুষ আর ধৈর্য্য রাখিতে পারে না। এ সময় আসিবেই। সকলেরই আসে। ইহা অনিবার্য্য। মানুষ তখন একবার ভাবিয়া দেখে—সারা জীবনটা ধরিয়া

কি করিলাম। তখন একবার দেনা পাওনা মিলাইয়া দেখে, কিন্তু হিসাব মিলাইতে গিয়া দেখে কারবারে ক্ষতি বই লাভ বড় বিশেষ করিতে পারে না। মূলধন সবই নষ্ট করিয়াছে। অধিকন্তু দেনা হইয়া পড়িয়াছে বিস্তর। তখন আর সামলাইবার উপায় নাই। Decre -holderএর করাল কবল হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সে সময়ে মানুষ একবার কর্ত্তব্য বিচার করিয়া দেখে। তখন কতক কতক বুঝিতে পারে—কারবারটা এ ভাবে না করিয়া আর একভাবে আরম্ভ করিলে ভাল হইত। কিন্তু তখন আর সময় নাই। আক্ষেপ করা বৃথা। হৃদয় তখন বেশ বুঝিতে পারে—যাহা করা হইয়াছে, সব ভূতের বেগার মাত্র। যাহা করিলে শেষে কাজে লাগিত, তাহার কিছুই করা হয় নাই। এই শেষে যে কি কাজে লাগে তাহা স্থির করিতে পারিলেই, আমাদের প্রশ্নের উত্তর কতকটা পাওয়া যাইতে পারে।

মানুষের অন্তিমকালে কি হয় তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। পঞ্চাশ বৎসর হইতে না হইতেই মানুষ বৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত হয়। ক্রমে যত বয়স হইতে থাকে ততই শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ নিস্তেজ হইয়া যায়। দন্তগুলি একটি একটি খসিয়া পড়ে। তাহার পর উদরের পীড়া আসিয়া যোটে, ভোগ সকল এক এক করিয়া বিদায় লয়। পিতা মাতা আগেই গত হন। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও একটি একটি করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে থাকে। প্রথম প্রথম যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহাদেরই মৃত্যু হয়। তাহার পর সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠেরাও পরলোক প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রত্যেকের মৃত্যুতে আপনার ভাবী মৃত্যুর কথা মনে পড়ে ও ভয়ে হৃৎকম্প হয়। না জানি কোথায় যাইতে হইবে, কে সেখানে সঙ্গে থাকিবে, কষ্টের সময়ে সেখানে কেহ সেবা শুশ্রূষা করিবে কি না, এখানেই ত এখন আর কেহ সেবা করে না, আর কেহ কাছে আসে না, কেহ নিকটে বসিয়া দুটা কথা কহে না, যদি কেহ বড় অনুগ্রহ করিয়া একবার নিকটে আসে, তবে দুই একটা কথা কহিয়া চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। মানুষ বৃদ্ধ হইলে শরীর যেমন দুর্ব্বল হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে কত প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া জীর্ণ শরীরকে আরও দগ্ধ করিতে থাকে। ক্রমে মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন এই সাধের সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মোহবশতঃ কত কষ্ট হয়। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে,

তাহার উপর আবার কতপ্রকার বিভীষিকা আসিয়া চিত্তকে আকুলিত করিতে থাকে। শরীরের প্রতি শিরায় শিরায় টান ধরিতে থাকে। শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। মস্তক ঘুরিতে থাকে। নড়িবার কিম্বা বলিবার সামর্থ পর্য্যন্ত থাকে না। চক্ষু কাতর ভাবে এদিক্ ওদিকে নিরীক্ষণ করে। প্রাণবায়ু ক্রমে কণ্ঠগত হইতে থাকে। সেই সময়ে জীবনের সমস্ত কর্ম্মসমূহ সংস্কার রূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। চিত্তে ইহাতে কত প্রকার ভীতির সঞ্চার হয়। তাহার পর অল্পে অল্পে মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করে: তখন প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, শরীরটা স্পন্দহীন হইয়া প্রস্তর কি কাষ্ঠ খণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। এই ঘটনাটি সকলের জীবনেই আসে। যে যতই কেননা সুখে থাকুক, যতই কেননা আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত থাকুক—ইহা হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। জীবনে এতবড় একটা বিপদ্ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন সকল কর্ম্ম ফেলিয়া ইহার প্রতিকার করা কি উচিত নহে? যদি ইহার কোন প্রতিকার থাকে, তবে সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

এই মৃত্যু একবার মাত্র হইবে এবং হইয়া গেলেই সব গোল মিটিয়া গেল এমন নহে। জীবের যতদিন না জ্ঞান হয়, ততদিন কতবার যে মরিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। আপনার মৃত্যুত আছেই। তাহা ছাড়া যাহাদিগকে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া মনে করি তাহাদিগকেও মরিতে হইবে। সকলকেই মরিতে হইবে। এই মৃত্যুর কার্য্য সংসারে প্রতিনিয়তই চলিতেছে। উপস্থিত সময়ের যুদ্ধে মানুষের মরার মত প্রতি মুহূর্ত্তে জগতে কতশত লোক যে মরিতেছে তাহা বলা যায় না। জীব যেমন জন্মিতেছে তেমনি আবার মরিতেছে। জন্মিয়া অবধি মরিতে আরম্ভ করিতেছে। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে মরিতেছে। অহরহঃ মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে অবসন্ন হইয়া ইহার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। মৃত্যু ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে জীবপুঞ্জকে নষ্ট করিতে চায়। জীব আহার দিয়া, জল দিয়া কিছুকাল তাহাকে স্থগিত রাখে। মৃত্যু জলবায়ুরূপে, শীতগ্রীষ্মাদিরূপে জীব-শরীর ধ্বংস করিতে চায়। জীব বস্ত্রাচ্ছাদনাদির দ্বারা মৃত্যুকে কিছুদিনের জন্য দূরে রাখে। মৃত্যু প্রত্যেক জীবের পশ্চাতে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর পশ্চাতে তাহার করালবদন বিস্তৃত করিয়া ছায়ার মত অনুসরণ করিতেছে। সময় পাইলেই গ্রাস করিবে বলিয়া। নদী সকল যেমন দ্রুতবেগে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, জীবপুঞ্জ সেইরূপ অবিশ্রান্ত

এই মৃত্যুর করাল মুখবিবরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কালস্বরূপ এই মৃত্যুর স্রোত সদাই প্রবহমাণ। যাবতীয় সৃষ্টি এই স্রোতে থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতেছে। সাগররূপী এই মৃত্যুসংসার দুস্তরণীয়। ইহা হইতে কি জীবের নিষ্কৃতি আছে? নিষ্কৃতির কোন উপায় থাকে, তবে সর্ব্বতোভাবে তাহা অবলম্বন করা উচিত। মৃত্যু-সংসারসাগর হইতে উদ্ধার লাভ করাই আমার বিবেচনায় মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা ব্যক্তিগতও বটে, ঈশ্বর-অনুমোদিতও বটে। ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য শীঘ্র সিদ্ধ হয়। যদি সেরূপ কোন চেষ্টা না থাকে, তবে প্রকৃতির কৃপায় কালে ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা ব্যক্তিগত এবং ঈশ্বর-অনুমোদিত উভয়ই।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক মৃত্যুসংসার হইতে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব কি না। কারণ যদি সম্ভব না হয়, তবে সে বিষয়ে চেষ্টা করাই বৃথা। অনেকের ধারণা ইহা অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক ইহা অসম্ভব নহে। তর্ক ও যুক্তি দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়াছে যে, অজ্ঞানই মৃত্যু এবং অজ্ঞান ব্যতীত অপর কোন মৃত্যু নাই। ইহাও ঠিক যে—মরে শরীরটা, বাস্তবিক জীবের কোন মৃত্যু নাই। জীব, শরীরে আত্মভাবের আরোপ করিয়াই, জন্মমৃত্যুরূপ ক্লেশ ভোগ করে। এই আরোপের নিবৃত্তি করিতে পারিলেই, এই অজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। ইহা বিচারের কথা। যদি এই বিচার ঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে একবার ভগবানের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে তিনি মদনমোহনবেশে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মধুর হাসিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন আর বলিতেছেন—

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি না চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥

ভগবান্ বলিতেছেন—মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ে আর সন্দেহ আসিতেই পারে না। তিনি আরও বলিয়া দিতেছেন কিরূপে ইহা হইতে পারে। তোমাকে অতি সহজ উপায় বলিয়া দিতেছেন। তোমাকে কোন কষ্ট করিতে হইবে না, কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি বসিয়া বসিয়া এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি আমাতে তোমার চিত্ত সমাধান কর, আমার দিকে চাহিয়া আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে এই মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দিব।

তুমি আমাতে আবিষ্টচিত্ত হও, মন্মনা হও, আর তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। আমি তোমার সকল দুঃখ দূর করিয়া দিব। আধি ব্যাধি তোমার নিকটে আসিতে পারিবে না, শোক তাপ তোমার নিকটে আসিতে পারিবে না, জন্ম, জরা, মৃত্যু হইতে তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না। আমি তোমার সব করিয়া দিব। তুমি মদ্গতচিত্ত হও। আমি তোমার অহংবোধ দূর করিয়া দিব, আমি তোমার অজ্ঞান রাশি সরাইয়া দিব, তোমাকে পরমতত্ত্ব উপদেশ দিয়া তোমাকে আমার করিয়া লইব, তোমাকে আমি আমার সহিত এক করিয়া লইব।

সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন এই কথা বলিতেছেন, তখন আর ভাবনা কি আছে? এস আমরা সকলে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই। তাঁহার নাম জপ, তাঁহার রূপ ধ্যান, তাঁহার কথা শ্রবণ—ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্ম্ম হউক। আমরা লৌকিক কর্ম্ম সকল এ ভাবে করি যাহাতে বলিতে পারি—

পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ
সঞ্চার পদয়োঃ প্রদক্ষিণ বিধি স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরোঃ
যদ্ যদ্ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো, তবারাধনং॥

কিছু না পার তাঁহার নামটি, আর তাঁহার রূপটি সার কর। সংসারের সমস্ত নাম রূপ ত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দময়ের নাম রূপ লইয়া থাক, তুমি সচ্চিদানন্দময় হইয়া যাইবে। রামপ্রসাদ যেমন বলিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ বলিতে শেখ—

আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি,
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
বিষয় বুদ্ধি হইল হত আমায় পাগল কেবল বলে সকলি,
আমায় যা বলে তা বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী।

তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইতি।

যমুনা-পুলিনে।

মরি মরি মরি! ছুটে কি উৎসব
আজি ব্যাপি' বৃন্দাবন!
শারদ-মল্লিকা সৌরভ লুটিয়া
মধুরে বহে পবন।
নিশানাথ যেন কতকাল পরে
আসি' বাসে আপনার,
সুষমা কুঙ্কুমে প্রেয়সী-বদন
সাজা'য়েছে চমৎকার!
হাসিতেছে চাঁদ, হাসি'ছে যামিনী,
হাসি'ছে যমুনা-তট,
সে হাসি-উৎসবে উৎসব ঢালিয়া
দাঁড়া'য়ে কে ওই নট?
চরণে নূপুর বাজে রুণু ঝুনু—
মধুর নর্ত্তন তালে,
সে তাল-লহরে সারা অঙ্গ যেন
হেলিয়ে দুলিয়ে খেলে।
সজল জলদ জিনি' অঙ্গ আভা
উজলি'ছে মনোহর,
পীত ধটী তায় কটিতট ঘেরি'
শোভে,—মরি কি সুন্দর!
সুভুজ যুগলে অঙ্গদ, বলয়,
বেড়িয়া তড়িৎ যেন,
বনফুল হার কণ্ঠ হ'তে নামি'
বক্ষে দুলি'ছে ঘন।
চাঁচর চিকুরে বেঁধেছে সুন্দর
চূড়াটি, হেলায়ে বামে,

তাহে শিখী-পাখা, লাজে লাজ দিয়া,—
যেন গো মোহিছে কামে।
বঙ্কিম নয়নে তারা দু'টী,—মরি,—
মাতোয়ারা করে প্রাণ,।
খেলিয়া খেলিয়া করে আকর্ষণ,
ভাসাইয়ে কুলমান।
ঘুমন্ত পিপাসা জাগা'য়ে—করে গো
চঞ্চল বহির অঙ্গ,
ও রঙ্গ হেরিয়া, সাধ—ছুটে যাই
পাইতে ও অঙ্গসঙ্গ।
প্রেমের লাবণ্য মাখি' দু'টী আঁখি
মুখখানি শোভা করে,
চখের পিপাসা করিবারে পান—
বদনে যে সুধা ক্ষরে।
এমন সুন্দর এ'জগতে আর
আছে কি গো কোন স্থান?—
রূপছটা নরে করে প্রকৃতিস্থ
নাশি' পুরুষাভিমান!
ভূতলে নামিতে ঘন ঘন কাঁপে
ওই গগনের চাঁদ,
মুগ্ধ বৃক্ষলতা চাহি রূপ পানে,
পেতেছে কি রূপ ফাঁদ!
এমন সৌন্দর্য্য কোথায় সম্ভব,—
প্রাকৃত জগত মাঝে?
নবীন মদন রূপ—রসময়,
তুলনা নাহিক সাজে।

(পদ্মপুকুর, বারুইপুর।)

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

অভিসার। *

এই দিনের পর আরও ২।৪ দিন অতীত হইয়াছে, আজ শ্রীমতী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। বৃন্দা আসিয়া শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা করিয়া কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা সঙ্গিনীগণ সকলেই আসিয়াছেন, সকলেই বৃন্দা-দেবীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

আজ যমুনাপুলিনের কোন একটী অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিবেন, এ বাঁশী সঙ্কেত-বাঁশী, এই বাঁশীর অনুসরণ করায় জন্যই বৃন্দা শ্রীমতীকে বলিয়া গিয়াছেন, তাই আজ শ্রীমতীর সখীগণ সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আপন আপন বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন, ললিতা শ্রীমতীর কেশ বন্ধন করিয়া এক্ষণে অলঙ্কার পরাইতে পরাইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা কহিতেছেন—

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে রে,
সো শ্যামের চিকণিয়া দেহা।
খঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, আঁখি নিরমিল রে,
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা॥
সো থেহা নিঙাড়ি কেবা, মুখ বানাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা, ওঠ গড়ায়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥

---

* যাঁহারা সাধক তাঁহারা বৃন্দাবন লীলার ভাব মাত্র গ্রহণ করিবেন। মহাপ্রভু, স্ত্রীলোক-সঙ্গ সম্বন্ধে এত কঠোর ছিলেন যে মাধবীর নিকট ভিক্ষা লওয়া হইয়াছিল বলিয়া হরিদাসের মুখদর্শন করেন নাই। হরিদাস সমুদ্র তীরে প্রাণত্যাগ করিলেন তথাপি মহাপ্রভুর দয়া হইল না। সাধককে কাষ্ঠের স্ত্রী মূর্ত্তি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে তিনি বলিতেন। আর যাঁহারা স্ত্রীলোক শিষ্যা করিয়া তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা অধিক রাখেন, অসংযত রসাকর্ষণে স্ত্রীলোককে গৃহধর্ম্ম স্বামীভক্তি ইত্যাদি হইতে দূরে লইয়া যান অথচ এই সব লম্পট পুরুষের নিকট বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারেন না তাঁহারা যে নিজেও নরকে গমন করেন ও শিষ্য শিষ্যাদিগকেও নরকের পথে টানিয়া লইয়া যান সে বিষয়ে উপস্থিত বিশৃঙ্খল সমাজই প্রমাণ।—সম্পাদক।

কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বানাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরত্র মথিয়া কেবা, সারত্র বানাইল রে,
ঐছন হেরি পীতাম্বর ॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বানাওল
এ হেন লাগয়ে বুকশোভা।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষমা ক'রেছে রে,
এমতি দেখি তনু আভা ॥
আদলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দরপণ বসাওল,
হেরে চণ্ডিদাস যুগ যুগ ॥

এইরূপে রমণীয় দর্শন শ্যামসুন্দরের রূপের কথা কহিতে কহিতে ললিতা শ্রীমতীর অঙ্গাভরণ পরাইতেছেন, ইতি মধ্যে—

অদুরে "বাঁশী গরজে গভীরে" বাঁশী বাজিল রাধা রাধা বলিয়া বাজিল, গোপাঙ্গনাগণ সকলেই চমকিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। ললিতা শ্রীমতীকে চন্দ্রহার পরাইতেছিলেন, শ্রীমতী দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর পারিলেন না, অবশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন।

হইতেছিল রূপের কথা সখী সঙ্গে বসি।
হেন কালে বন মাঝে বাজিল শ্যামের বাঁশী ॥

অবিরাম বংশীধ্বনি হইতেছে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সুরে বাজিতেছে, শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, কথা কহিতেও যেন ক্রমে কণ্ঠাবরোধ হইবার উপক্রম হইল। ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার হাত খানি ধরিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। আচ্ছা, কেন এমন হয়?

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও একদিন নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিয়াই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসায় "আমি আর যাইতে পারি না, ঠাকুর! তুমি আসিয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া যাও" বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

হইলেই আবার মায়ার উদয় হয় ইহাও বলা যায়। যখন মায়ার উদয় হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষেরও প্রাদুর্ভাব হয়। ইনি সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। পরে বুদ্ধিপূর্ব্বক ইচ্ছা ইহাঁর হয়। অবুদ্ধিপূর্ব্বক ইচ্ছাই বুদ্ধিপূর্ব্বক ইচ্ছার হেতু। আমি বহু হইব ইহাই সিসৃক্ষাত্মিকা মায়া-বৃত্তি।

অহং বহুস্যাম্ এই ইচ্ছার উদয় হইলে সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষ হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হয়।

বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত যাহা তাহাই শক্তির প্রথম অবস্থা।

এই যে বিন্দু বলা হইল ইহাই ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার দ্বার। ব্রহ্মের সহিত তুলনায় অবিদ্যাপাদে যে সৃষ্টিতরঙ্গ উঠে তাহা বিন্দুই বটে; অথবা অতি সূক্ষ্ম বলিয়াও ইহা বিন্দু।

বিন্দু একদিকে চিৎকে স্পর্শ করিয়া আছে, অন্যদিকে অচিৎকে স্পর্শ করিয়াছে। মধ্যে চিৎ ও অচিৎ মিশ্রাংশ।

বিন্দুর চিৎ-অচিৎ মিশ্রাংশকে নাদ বলে। আর অচিৎ অংশকে বীজ বলে। প্রণবের যে নাদ ও বিন্দু তাহার বিন্দুঅংশই জগৎ-বীজ, আর নাদ অংশ যাহা তাহা শব্দব্রহ্ম। অচিৎ অংশ বা বীজ যাহা, তাহা শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের সংস্কার-রূপ অবিদ্যা।

রাম—অচিৎ বা জড় ভাব কোথা হইতে আসিল?

বশিষ্ঠ—যেমন প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে জড় ভাব ধারণ করে তাহার ন্যায় সংবিৎ জড়ীভূতা হইয়া স্থাবর নাম ধারণ করে।

যেরূপ সুষুপ্তাত্মা জীব শত শত জগৎ কল্পনাদ্বারা স্বপ্ন-জাগ্রৎ ভাব প্রাপ্ত হয়েন সেইরূপ চিৎও জড়-স্থাবর ভাব হইতে জঙ্গমাত্মক চিত্ত অর্থাৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিতের স্থাবর ভাবের রূপ জঙ্গমভাবে অভিব্যক্তি হয়।

চিৎ ব্যুত্থান দশায় বিশ্বরূপ, কিন্তু সমাধি দশায় তিনিই পরব্রহ্মরূপ।

তন্ত্রে এই বিষয় যেরূপ আছে তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর।

মূলে যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নির্গুণব্রহ্ম তিনিই মায়া সাহায্যে সগুণব্রহ্ম পরমেশ্বর। "সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ"। সৎ চিৎ আনন্দই যাঁহার বিভব ঐশ্বর্য্য।

সেই কলা সহিত পরমেশ্বর হইতে শক্তি নাদ বিন্দু উৎপন্ন হয়।

কুব্জিকাতন্ত্রে আসিদ্বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা।

নাদরূপা মহেশাণী চিদ্রূপা পরমাকলা।

সারদাতিলকে ভিদ্যমানাৎ পরাৎ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।

শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগম বিশারদাঃ।

পরাৎ বিন্দো; শক্ত্যাবস্থারূপো যঃ প্রথমো বিন্দুঃ তস্মাৎ ভিদ্যমানাৎ অব্যক্তাত্মা বর্ণাদি বিশেষ রহিতোঽখণ্ডো নাদমাত্রমুৎপন্নম্। যে ধ্বনিতে অকারাদি বর্ণ বিশেষরূপে না প্রকাশ হয় সেই ধ্বনি অব্যক্ত।

সৃষ্ট্যুন্মুখ পরমশিব প্রথমোল্লাসমাত্রমখণ্ডোঽব্যক্তো নাদবিন্দুময় এব ব্যাপকো ব্রহ্মাত্মক শব্দঃ। শব্দ ব্রহ্মেতি হৃদয়ম্।

সারদাতিলকে চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতম্।

তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণীনাং দেহমধ্যগম্॥

বর্ণাত্মনাভির্ভবতি গদ্যপদ্যাদি ভেদতঃ॥

তদ্ভিদ্যমানবিন্দুরূপ চৈতন্যম্ কুণ্ডলীস্বরূপম্ প্রণবাকারম্ প্রাণীনাং দেহমধ্যতাং সর্ব্বাত্মনাভির্ভবতি প্রকাশত ইত্যন্বয়। কিং কৃত্বা? প্রাপ্য কণ্ঠাদি করণানি ইতি শেষঃ। তথাচ মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তার; পরাখ্য ইত্যাদি। বিন্দুকেই বলা হইল শক্তি বা শক্তির অব্যক্ত অবস্থা। নাদ বলে ধ্বনিকে। যে ধ্বনিতে অকারাদি বর্ণ এখনও প্রকাশ হয় নাই তাহাকেই অব্যক্ত ধ্বনি বলা হইল। বিন্দুর চিদচিৎ মিশ্রাংশকে নাদ বলা হইল। নাদই শব্দব্রহ্ম। সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ পরম শিবের প্রথম উল্লাস মাত্র অখণ্ড অব্যক্ত নাদবিন্দুময়ব্যাপক ব্রহ্মাত্মক শব্দ যাহা তাহাই শব্দব্রহ্ম। সর্ব্বভূতের যিনি চৈতন্য তিনিই শব্দব্রহ্ম। ইনিই প্রণব। ইনি প্রাণিদেহে কুণ্ডলিনীরূপ।

শব্দব্রহ্মের পরা পশ্যন্তি মধ্যমা বৈখরী এই যে চার অবস্থা তন্মধ্যে পরা যিনি তিনি মূলাধারে প্রথমে উদিত হয়েন। তৎপরে ইনি যখন নাভিদেশে আসেন তখন যোগিগণ ইঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। সেই জন্য ইনি পশ্যন্তি। হৃদয়ে আসিয়া ইনি মধ্যমা এবং মুখ দিয়া যখন বাহির হন তখন ইনি বৈখরী।

পূর্ব্বে বলা হইল সৃষ্টিসঙ্কল্প উদয়ে যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক অহং বহুস্যাম্ এই ইচ্ছার উদয় হয় তখনই সেই সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হয়।

অসৌবিন্দুঃ শিবময়ঃ শক্তিময়ঃ উভয়ময়শ্চেতি ত্রিবিধঃ। এই বিন্দু শিবময় শক্তিময় এবং শিবশক্তিময়।

বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্যা ভেদা সমীরিতাঃ
বিন্দু শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্ম্মিথঃ ॥
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগম বিশারদৈঃ ॥

বিন্দুর চিদচিদংশকেই নাদ বলা হইয়াছে। ক্রিয়াসারে দেখা যায়

বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতং।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদ স্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ।

বিন্দু চিৎরূপ শিব আর বীজ হইতেছে অচিৎরূপিণী শক্তি। আর যিনি নাদ তিনি হইতেছেন চিদচিদ্রূপিণী শিবশক্তি। এই নাদকেই শব্দব্রহ্ম বা চৈতন্য বলা যায়। নির্ব্বাণতন্ত্রে পাওয়া যায়—

সত্য লোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী।
মায়াবল্কলমুৎসৃজ্য দ্বিধ ভিন্না জগন্ময়ী।
শিবশক্তি বিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।

এখন বুঝিতেছ ব্রহ্মকে দ্বিবিধ বলা হইতেছে—পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম। প্রকৃতি-পুরুষ বা শিবশক্তি ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না।

কুলার্ণব খণ্ডে ১ উল্লাসেঃ—

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞান প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্। *

জ্ঞান দুই প্রকার। আগমজাত ও বিবেকজাত। আগমময় হইতেছে শব্দব্রহ্ম, কিন্তু পরব্রহ্মকে বিবেক বা বিচার ভিন্ন অনুভব করা যায় না।

পরব্রহ্ম মায়া অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর কিরূপে হইলেন তাহা বলা হইল। ক্রমে জীবভাব কিরূপে আইসে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

ঘন সম্বেদনা পশ্চাৎ ভাবী জীবাদি নামিকা
সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোজ্ঝতি পরং পদম্ ॥৭॥

পরমাসত্তা চিন্নামযোগ্যা হইবার পর "আমি বহু হইব" এই ঈক্ষণ-সম্বেদন রূপ যে সঙ্কল্প তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে। তাহাতে ঐ সঙ্কল্প ঘন বা দৃঢ়ীভূত হয়। তাহার পরে তাঁহাতে আত্তকলনা হয়। আত্তা গৃহীতা কলনা তদ্বিষয়ে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মভাবলক্ষণপরিচ্ছেদ কলনা যায়। অর্থাৎ আমি বহু হইব এই সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি হইলে তাহা হইতে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপে আত্ম-ভাবের পরিচ্ছেদ কল্পনা হয়। তখন আপনার অপরিচ্ছিন্ন ভূমাত্মভাবের বিস্মৃতি এবং আপনার পরমপদের পরিত্যাগ যেন ঘটে। ইহাতেই ভাবিপ্রাণধারণো-পাধিক জীব হিরণ্যগর্ভাদি নাম তিনি ধারণ করেন।

* এই শ্লোকটিই বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠাংশের পঞ্চম অধ্যায়ের ও ৬১ শ্লোক বিষ্ণুপুরাণে প্রচক্ষতে স্থানে তথোচ্যতে আছে।

সত্তৈব ভাবনামাত্রসারা সংসরোন্মুখী।
তদা বস্তুস্বভাবেন ত্বনুতিষ্ঠতি তামিমাম্॥ ৮॥

ব্রহ্মসত্তা তখনও ভাবনামাত্র সারা—তখনও বিকারাদি ক্রিয়া সারা হয় নাই। পরমাসত্তা তখন ভাবনা বিশেষ দ্বারাই সংসরোন্মুখী হয়েন। ইহাতে তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপের কোন বিকার উৎপন্ন হয় না।

তৎ কুতস্তত্রাহ বস্তুস্বভাবেন ইতি। কথং তর্হি জীবভাবস্তত্রাহ অন্বিতি। তামিমাং সত্তামেবানুস্থৃত্য রজ্জৌ সর্প ইব জীবভাব উত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ যিনি অবিকৃত স্বভাব—ভাবনা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। তবে জীবভাব কিরূপে উঠে? সেই পরমাসত্তার উপরে এই পরিচ্ছিন্ন ভাবনা, রজ্জুর উপরে সর্প ভাসার মত ভাসিয়া উঠে। ইহার নাম ব্রহ্মসত্তার উপরে জীবভাবের উত্থান।

সমনন্তরমেবাস্যাঃ খসত্তোদেতি শূন্যতা।
শব্দাদি গুণবীজং সা ভবিষ্যদভিধার্থদা॥ ৯॥

এই জীবসত্তা পরে ইতরভূতের অবকাশ প্রদান করে বলিয়া এক শূন্যপ্রায় খ সত্তার তখন উদয় হয়। অবকাশ প্রদান করে যাহা তাহাই আকাশ। আকাশ নাম কিন্তু প্রথমে থাকে না। প্রথমে ইহা শূন্যতা প্রায়—খ সত্তা। সূর্য্যাদি সৃষ্টির পরে আকাশ নাম হয়। আ=সমন্তাৎ কাশতে প্রকাশতে এই অর্থ তখন হয়।

রাম—পরম সত্তার জীবভাব গ্রহণ কিরূপে হয় তাহা বুঝিলাম। কিন্তু জীবভাবের পরে অসত্তা—শূন্যতা কিরূপে হয় বুঝিতেছি না।

বশিষ্ঠ—সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বহুবার বলিতে হইবে। এই পুস্তকে যত যত অগ্রসর হইবে তত ততই সমস্ত কঠিন তত্ত্ব পরিষ্কার হইবে। একবারে সব বুঝিয়া ফেলিব মনে করিয়া যে এই পুস্তক পড়িবে তাহার উন্নতি হইবে না।

খসত্তার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি শুনিয়া রাখ। পরে ভাল করিয়া ধারণা করিও।

মহাপ্রলয়ে পরমশান্ত সকলপ্রকার চলনরহিত পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই আছেন। তাঁহার স্বরূপের—আপনি আপনি ভাবের বিচ্যুতি কখন হয় না। মায়ার উদয়ে যেন স্বরূপের বিচ্যুতি হয়। দ্রষ্টাস্বরূপে যখন তিনি থাকেন তখন বাস্তবিক দ্রষ্টাভাব তাঁহাতে জাগে নাই। যাঁহাকে পরে দ্রষ্টা

বলা যাইবে তিনি যখন দ্রষ্টাস্বরূপে থাকেন তখন দৃশ্য নাই। স্বরূপাবস্থাটিই আছে। মায়ার উদয়মত হইলে মনে হয় যেন তিনি অন্য কিছু দেখিলেন। আপনিই আছেন যেন অন্য কিছু দেখিয়া অন্যরূপ হইলেন। ইহাই তাঁহার উল্লাস। স্বয়মন্যইবোল্লসন্। বাস্তবিক কোন কিছুর উদয়ও নাই, কোন কিছুর দেখাও হয় নাই, কোন কিছু হওয়াও হয় নাই, তথাপি যেন দ্রষ্টাভাব জাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা যিনি তিনি ভাবনাবলে দৃশ্য হইলেন। এই যে ভাবনাবলে অন্যরূপ হওয়া ইহা কি? ইহাই জীব-সত্ত্বার শূন্য ভাবনা করা। জীবের শূন্যতাস্বরূপিণী খ সত্তায় বিবর্ত্তিত হওয়াই ইহা। ঝলক, স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্পশক্তি ও জীবভাব জাগিয়াছিল মিথ্যা মায়া দ্বারা। জীবসত্তা আবার যখন বিবর্ত্তিত হইলেন—দ্রষ্টা হইয়াও দৃশ্য হইলেন—তখন খসত্তা—শূন্য সত্তা ভাসিল। কারণ দ্রষ্টার দৃশ্যরূপে স্থিতি সেটাও শূন্যভাবে স্থিতি মাত্র।

রাম—মিথ্যা মায়ার অবলম্বন ভিন্ন মিথ্যা সৃষ্টি উঠিতেই পারে না। এই মায়ার ব্যাখ্যাও যেন মায়িক ব্যাপার।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মসত্তার উপরে যে মায়া বা অজ্ঞান ভাসার মত হয়, হইয়া ব্রহ্ম-সত্তাকে আবরণ করিয়া পরিচ্ছিন্ন মত করে—তাহা সমস্তই শূন্য কল্পনা মাত্র। কিন্তু ইহা সত্য, যে আত্মজ্ঞানটি অজ্ঞানের বিনাশক। শূন্য কল্পনা ছাড়িয়া দিলেই, জীব এক মুহূর্ত্তেই আপনি আপনি ভাবে বা ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করেন। এই অজ্ঞান যে কি, তাহা আছে বা নাই, ইহার কিছুই বলা যায় না। আছে বলিলে ব্রহ্মে আছে বলিতে হয়, কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন তখন আর কিছুইত নাই। কিন্তু ব্রহ্মই পূর্ণজ্ঞান। তাঁহাতে কিছুতেই অজ্ঞান থাকিতে পারে না।

আবার নাই বলিলেও অজ্ঞানের কার্য্য যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের ঘট পট মঠ শকট ইত্যাদি বহু দেখার বিরোধ হয়। কাজেই নাই বলাও যায় না। যেমন দিবালোকের প্রকাশে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, কিন্তু সে অন্ধকারের তত্ত্ব জানা যায় না—সেইরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় ইহা দেখা যায়—কিন্তু অজ্ঞানের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

রাম— এখন বলুন খ সত্তার পরে আর কি হয়।

বশিষ্ঠ—খ সত্তা বা শূন্যতাই শব্দাদিগুণের বীজস্বরূপ।

রাম—শব্দ আবার কোথা হইতে আসিল?

বশিষ্ঠ—যেখানে চলন সেখানে শব্দ আছেই। বিন্দু প্রথমে, পরে নাদ, পরে বীজ। নাদকেই শব্দব্রহ্ম বলা হইয়াছে স্মরণ কর।

রাম—তার পর বলুন।

বশিষ্ঠ—জীবভাব উদয় হইলেই অহং অভিমান জাগে। অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি যখন হয়, তখন অনিচ্ছার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছার মূলে অবশ্য অহং থাকে। ইচ্ছা-প্রকট জীব-সত্তা হইতে অহংভাব জাগে। তাহার সহিত কালসত্তা বা কালের অস্তিত্বও বোধগম্য হয়। অহংটি সৃষ্টির বীজ। অহংটিই ভাবী সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ। এই অহংসমষ্টি জীব যে হিরণ্যগর্ভ তাহারই অহংকার। আর এই অহংকারই, সমষ্টি অহঙ্কার।

তস্যাঃ শক্তেঃ পরায়াস্তু স্বসম্বেদনমাত্রকম্।
এতজ্জালমসদ্রূপং সদিবোদেতি বিস্ফুরৎ ॥১১॥

শক্তিশব্দেনাত্র পরসত্ত্বৈবোচ্যতে। তস্যা অবিকৃতত্ব দ্যোতনায় স্বসম্বেদন মাত্রকমিতি।

সেই পরাশক্তির সঙ্কল্প মাত্রই এই প্রকাশমান অসৎরূপ জগৎ-জাল। ইহাই সৎরূপে ভাসিয়াছে। জীব যেমন যেমন ভাবনা করেন সেইরূপ সৃষ্টি হয়।

আকাশও অহংকার দ্বারা, আকাশপ্রায় আত্মাই যাহার স্বরূপ—তথাবিধ সম্বিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা অহংতত্ত্বাদি সম্বলিত সম্বিৎ—সঙ্কল্প বৃক্ষের বীজ। অতএব সেই অহংকারের ফল অর্থাৎ একদেশ হইতে—পরিচ্ছিন্ন শক্তির প্রাধান্যবশতঃ স্পন্দনধর্ম্মী বায়ুর উৎপত্তি হয়।

অহম্ভাব বিশিষ্ট আকাশ উপহিত যে পরমাসত্তা তাহাই সর্ব্বশব্দবীজভূত শব্দতন্মাত্রা। এ সমস্তই ভাবনা হইতে উৎপন্ন।

অতিসূক্ষ্ম আকাশ হইতে ঈষৎ ঘনীভূত শব্দতন্মাত্রা হয়—ইহা সাংখ্যদর্শনাদির মতের সহিত এক নহে। তন্মাত্রা হইতে ভূতোৎপত্তির কথা প্রসিদ্ধ বটে তথাপি "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতস্তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাশাদির সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাদানকত্ব শুনা যায়। "তদাথাহ্নদুভেহন্যমানস্য" ইত্যাদির মত শব্দসামান্যেরও বিশেষোপাদানত্ব শ্রবণ করা যায়। সেইজন্য, আকাশ হইতে শব্দসামান্যাত্মক তন্মাত্রোৎপত্তি বলায় কোন দোষ হয় না।

শব্দতন্মাত্রাই শব্দময়বৃক্ষস্বরূপ যে বেদ তাহার বীজ বা কারণ। সেই বীজ হইতে ভাবী নামার্থরূপ পদ, বাক্য ও প্রমাণযুক্ত বেদ সমস্ত জন্মিয়াছে।

সেই বেদভাবাপন্ন পরমাত্মা হইতে জগৎশ্রী উৎপন্ন হয়।

তস্মাদুদেষ্যত্যখিলা জগচ্ছ্রীঃ পরমাত্মনঃ ॥১৫॥

"সম্ভূরিতি ব্যাহরং সম্ভুবসসৃজৎ এত ইতি বৈ প্রজাপাতর্দ্দেবানসৃজত অসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৄন্" ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যর্থঃ।

চিদেবম্বরিবারাসা জীবশব্দেন কথ্যতে।

ভাবীশব্দার্থ জালেন বীজং রূপৌঘশাখিনঃ ॥১৬॥

বায়ু প্রভৃতি ভূতের কথা যাহা বলা হইল তদ্‌যুক্ত চিন্ময় ব্রহ্মই জীব নামে অভিহিত। এই জীব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদির কারণ। মহাপ্রবল বায়ু হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন, চারি প্রকার প্রাণী ও তৎসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন।

বায়ু-অভিমানী চৈতন্যের স্পন্দনে যে আকার প্রস্ফুরিত হয় তাহা স্পর্শ-তন্মাত্রা। স্পর্শতন্মাত্রারূপ বৃক্ষ হইতে ৪৯ বায়ুস্কন্ধ। উহাতে চৈতন্যের যে প্রকাশাত্মক ভাবনা বা সঙ্কল্প বিস্তৃত আছে তাহা দ্বারা তেজতন্মাত্রা হয়। উহাই হইল আলোকরূপ মহাবৃক্ষের বীজ বা কারণ।

ইহা হইতেই বিদ্যুৎ, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমা ইত্যাদি উৎপন্ন। ইহাদের রূপে সংসারের রূপ।

সেই তেজ-অভিমানী আত্মা "আমি জলময় হইব" এই ভাবনা করিয়া জলশরীরী হন। জলভাবাপন্ন আত্মাই রসতন্মাত্রা।

জলআত্মা ভাবনা বলেই গন্ধতন্মাত্রা। গন্ধতন্মাত্রা হইতেই স্থূলপৃথিবী। ইহাই মনুষ্যাদি আকৃতি-শাখীর বীজ।

চিতা বিভাব্যমানানি তন্মাত্রাণি পরস্পরম্।

স্বয়ং পরিণতান্যন্তরম্বুনীব নিরন্তরম্ ॥২৬॥

পূর্ব্বোক্ত ভূত অহংভাবাপন্ন চৈতন্যের ভাবনাবলে উৎপন্ন, সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্রা সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধরিতেছে। যেমন বুদ্‌বুদ নিচয় মিলিয়া জলই হয় সেইরূপ তন্মাত্রা সকল মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে।

কিছুকাল ইহারা মিলিত থাকে—পরে বিশ্লেষ হয়। মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা আবার বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ লাভ করিতে পারে না।

সংবিতি মাত্র রূপাণি স্থিতানি গগনোদরে।

ভবন্তি বটজালানি যথা বীজকণান্তরে ॥ ২৮॥

জগৎটা ছিল ঈশ্বরের সঙ্কল্পে। সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে যেমন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ জন্মে

সেইরূপ সূক্ষ্ম সঙ্কল্পই এই স্থূল জগৎ হইয়াছে। বলিতে পার তন্মাত্রাত অতি সূক্ষ্ম ইহাতে স্থূল জগৎ কিরূপে থাকে? ইহা বাস্তব দর্শন নহে। ইহা মায়িক প্রসবাদি দর্শন যেরূপ সেইরূপ।

ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টিতে যেমন এককক্ষণেই অঙ্কুরের উদ্গম, শতশাখাকারে প্রকাশ এবং ক্ষণমধ্যেই ফলবান্ বৃক্ষে পরিণতি দেখা যায়—জগৎসৃষ্টিতেও সেইরূপ দেখা যায়। স্বপ্নে সূক্ষ্মতম নাড়ীছিদ্রে বৃহৎ বস্তুর দর্শন যেরূপ ইহাও তাই।

প্রসবং পরিপশ্যন্তি শতশাখং স্ফুরন্তি চ।
পরমাণ্বন্তরে ভান্তি ক্ষণাৎ কল্পীভবন্তি চ ॥২৯॥
বিবর্ত্তমেব ধাবন্তি নির্ব্বিবর্ত্তানি সন্তি চ।
চিদ্বেধিতানি সর্ব্বাণি ক্ষণাৎ পিণ্ডীভবন্তি চ ॥৩০॥

সৃষ্টি যাহা দেখিতেছ তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া যেমন দধি হয় সেইরূপ ব্রহ্ম বিকার প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎ হইতেছেন না—কিন্তু রজ্জুকে যেমন ভ্রমে সর্প দেখা যায় সেইরূপ ব্রহ্মকে ভ্রমে জগৎরূপে দেখা হইতেছে। এই যে স্থূলতা দেখিতেছ তাহা বাস্তব নহে। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া এমন আশ্চর্য্য দেখাইতে পারেন যে, পরম চৈতন্যরূপ আধারে ইহা কখন রজ্জুর উপরে সর্প ভাসাইয়া ছুটাইতেছে, কখন বিবর্ত্তশূন্য হইতেছে, কখন চিদাধারে সূক্ষ্ম হইতেছে, কখন পিণ্ডিত হইয়া স্থূল হইতেছে।

মায়াজড়িত চৈতন্য সঙ্কল্পাত্মিকা চিৎশক্তি। পঞ্চতন্মাত্রাই মিলিত হইয়া এই দৃশ্যজগৎ। সঙ্কল্পাত্মিকা চিৎশক্তিই উক্ত প্রকার পঞ্চতন্মাত্রা মত হয়েন। তিনি কখন রেণুর আকার ধারণ করেন, কখন বা নিরাকার মত দেখান।

বীজং জগৎসু নন্নু পঞ্চকমাত্রমেব
বীজং পরা ব্যবহিত স্থিতিশক্তিরাদ্যা।
বীজং তদেব ভবতীতি সদানুভূতং
চিন্মাত্রমেবমজনাদ্যমতো জগচ্ছ্রীঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মই জগদাকার ধারণ করিতেছেন, ইহা এখানে দেখান হইল। তন্মাত্র-পঞ্চকই জগতের বীজ বা কারণ। আবার তন্মাত্র-পঞ্চকের কারণ পরা ব্যবহিত-স্থিতিশক্তিরাদ্যা—পরেণ পরমাত্মনা অব্যবহিতা সাক্ষাৎসম্বদ্ধা জগৎস্থিতিহেতু মায়াশক্তিরেব।—তন্মাত্র-পঞ্চকের কারণ, পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত এবং জগৎস্থিতির হেতু আদ্যাশক্তি। ইহাই মায়া।

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] আশ্বিন ১৩২১ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১।৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১০নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে"

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥০, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২॥০, সিকি পৃষ্ঠা ১॥০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

এস আমরা ধ্যান করি।

"এস আমরা ধ্যান করি"—কে কাহাকে ধ্যান করিতে বলিতেছে ? এই কথায় উত্তর শুনিবার পূর্ব্বে ধ্যানের ফলে কি হইবে শ্রবণ করা উচিত। তাহাতে ঐ প্রশ্নের কতক কতক উত্তর মিলিবে।

ধ্যান অর্থে চিন্তা। রূপের চিন্তাও চিন্তা, গুণের চিন্তাও চিন্তা। আবার স্বরূপের চিন্তাও চিন্তা। শেষোক্ত চিন্তাটিই প্রকৃত চিন্তা। স্বরূপের ধ্যান জন্যই রূপ গুণের ধ্যান অবলম্বন।

রূপের চিন্তা হয় ইন্দ্রিয় সাহায্যে। গুণের চিন্তা হয় মনের সাহায্যে, আর স্বরূপ চিন্তা হয় ধী বা উত্তম বুদ্ধি দ্বারা।

এই চিন্তা দ্বারা আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে ?

ধ্যান করিতে পারিলে তুমি আমাদের বুদ্ধিকে পরমপদে প্রেরণ করিবে। বুদ্ধি যখন পরমপদে প্রেরিত হয় তখনই আমাদের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রাপ্তি আর কি আছে ?

আমাদের বুদ্ধি পরমপদে প্রেরিত হইলেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

বুদ্ধিটি কোন বস্তু ? ইহা কোন্ কার্য্য করিতে সক্ষম ?

আমাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে। কোন শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে, কোন শক্তি সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি আমি আমার রূপ অভিমান করে ; কিন্তু বুদ্ধিশক্তি বিচার দ্বারা যাহা শ্রেয়ঃ তাহাই নিশ্চয় করে।

বুদ্ধিটি তবে কি ভাল, কি মন্দ তাহার নিশ্চয় করে। নিশ্চয় করে কিরূপে ?

বিচার দ্বারা।

বুদ্ধি বিচার করিয়া নিশ্চয় করে যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা গ্রহণ যোগ্য নহে। ক্ষণস্থায়ী যাহা তাহা গ্রহণ কর—ক্ষণিক যাহা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হও দুঃখ পাইবে। কিন্তু যাহা নিত্য, যাহা চিরদিন আছে, ছিল বা থাকিবে তাহার দিকে চল, অল্প ত্যাগ করিয়া অনন্তের জন্য প্রাণপণ কর অনন্ত সুখ পাইবে—ভূমাতে স্থিতি লাভ করিবে।

এস আমরা ভূমার ধ্যান করি।

এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি।

যে চৈতন্য মনের সহিত মিশিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, যে চৈতন্য দেহকে আমি মনে করিয়া দেহের দুঃখে নিরন্তর আপনাকে দুঃখী বোধ করেন, যে জীব চৈতন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, দেহে আসক্ত হইয়া, মনে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা হায় হায় করেন, সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত জীব চৈতন্যকে বলা হয় এস আমরা অখণ্ড চৈতন্যের ধ্যান করি।

যাহা বলিতেছ তাহাতে যে ব্যক্তি একাকী নির্জ্জনে ভগবান্‌কে ডাকিতেছে বা ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার পক্ষে এস আমরা ধান করি এই মন্ত্র প্রয়োগ করা যায় কিরূপে ?

বাহির ছাড়িয়া একটু ভিতরে ঢুকিলেই প্রয়োগ করা যায়।

কিরূপে ?

একটি দেহেই অনেক লোক। যত যত শক্তি এক দেহে তত খণ্ড চৈতন্য বা জীব এক দেহে। ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি, মনও শক্তি, চিত্তও শক্তি, অহঙ্কারও শক্তি, বিষয়াসক্ত বুদ্ধিও শক্তি। এই খণ্ড খণ্ড শক্তির কোলে কোলে খণ্ড খণ্ড চৈতন্য। হে ইন্দ্রিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিত্ত, হে বিষয়াসক্ত বুদ্ধি—ক্ষণস্থায়ী বিষয় চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ভীষণ যাতনায় কষ্ট পাও কেন—

এস এস সেই অখণ্ড, সেই ভূমা পুরুষকে ধ্যান করি, তিনিই আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়া দিবেন।

এইরূপ ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে কে?

সমষ্টি চৈতন্য আপনার অঙ্গীভূত ব্যষ্টি চৈতন্য সমূহকে বলিতেছেন, এস আমরা ধ্যান করি। আমি যে তোমরাই। সেই দেবতার বরণীয় ভর্গই আমি। আমিই সমষ্টি চৈতন্য। আমি তোমরাই। এস ধ্যান করি।

পূজা।

"এস আমরা ধ্যান করি" এইটি বড় আবশ্যকীয় তত্ত্ব। ইহাই যদি বিস্তার করিয়া বল?

(১)

আচ্ছা। পূজার প্রাণ হইতেছে ধ্যান। এইজন্য ধ্যানটি বিশেষরূপে আলোচনা করা আমরা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করি।

"এস আমরা ধ্যান করি" "ধীমহি"র এই অর্থ। আমি ধ্যান করি ইহা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে আমরা ধ্যান করি। এস আমরা ধ্যান করি—এইটি ভাল করিয়া বুঝি আইস, তবে পূজা হইবে। এই প্রবন্ধে ইহাই দেখান হইবে।

ধীমহির অর্থ বুঝিলে পূজা হইবে—এই কথা বুঝিবার পূর্ব্বে আমার অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বল।

ব্রাহ্মণের গায়ত্রী—শুধু তাই কেন ব্রাহ্মণেতর আর সকলের গায়ত্রীতেও এই ধীমহি কথার ব্যবহার আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি ধীমহিতে কে কাহাকে ধ্যান করিতে বলিতেছে?

সাধারণে মোটা অর্থই দেখে। স্থূল ভাবে ইহার অর্থ এই হয় যে যাঁহারা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই যেন নিম্নস্তরের লোকদিগকে বলিতেছেন এস আমরা ধ্যান করি।

. এই ত বেশ সরল অর্থ। এই অর্থ করার দোষ কি হয়? দোষ কিছু আছে। সবাই মিলে ধ্যান করি এস—এ ধ্যানটা বহিরঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তণের মত। কিন্তু যখন কেহ নির্জ্জনে তাঁহার ধ্যান করিবে তখন এস আমরা ধ্যান করি—ইহা কে কাহাকে বলিবে? যিনি উচ্চ সাধক তাঁহাকেও গায়ত্রী মন্ত্রে ডাকিতে হয়।

একথা ঠিক বটে। তবে তুমি কি অর্থ বুঝিয়াছ?

ধ্যানের অর্থ কি, ধ্যান করিলে কি হয়—এইগুলি বুঝিতে পারিলে কে কাহাকে ধ্যান করিতে ডাকিতেছে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বুঝাইয়া বল।

ধ্যান নামে চিন্তা। রূপের চিন্তাও চিন্তা, গুণের চিন্তাও চিন্তা আর স্বরূপের চিন্তা ও চিন্তা। রূপ গুণের ধ্যানে ক্রম মুক্তি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে কিন্তু, স্বরূপ ধ্যান করিতে পারিলে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। ইহৈব সমবলীয়ন্তে"। মরিবার সময় ইঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। ইঁহারা এইখানেই তাঁহার সহিত এক হইয়া যান।

এমন একটি দৃষ্টান্ত দাও যাহা সবাই বুঝিতে পারে। সবাই মানে তুমি বা তোমার মতন যাঁহারা এবং তিনি বা তাঁর মতন যাঁহারা।

তুমি আর তিনি ইঁহাদের উপযোগী করিয়া বলিতে হইলে তোমাদের মত লোকে যে চিন্তা বা ধ্যানে প্রায় পড়ে সেইরূপ দৃষ্টান্তই লইতে হয়।

কি জানি কি তুমি বলিবে—যাই বল ধ্যানটি বুঝান চাই।

আচ্ছা—আচ্ছা তাই হইবে। শ্রবণ কর।

হরিদ্বারের গঙ্গা বড়ই মনোহারিণী। সেই কুলকুল ধ্বনিতে—

এ দৃষ্টান্ত যাহারা কবি তাহাদের—

আচ্ছা—আচ্ছা—কিছু ধৈর্য্যওত থাকা উচিত। ধৈর্য্যধরিয়া অগ্রে শ্রবণ কর। পরে যাহা বলিবার থাকে বলিও।

বল।

সেই কুল কুল ধ্বনিতে চিত্ত একাগ্র করিলে এই শব্দরাশির ভিতরে যে

এক নিঃশব্দস্থান আছে সেই শান্ত পরম রমণীয় স্থানে চিত্ত যেন পৌঁছিয়া যায় তখন দেহ, মন, সংসার চিন্তা কিছুই থাকে না।

প্রকৃতির এই সুন্দর স্থানে এক যুবক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে গিয়াছে। বাঁধান বহু বিস্তৃত সিঁড়ি। দুই এক সিঁড়ির নীচেই উন্মাদিনী গঙ্গা কুল কুলধ্বনি করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়াছে। ঘাটের উপরে বড় বড় পিঠুলি গাছ নীচে ছায়া বিস্তার করিয়াছে। ঘাটে দুই একটি লোক স্নান করিতে আসিতেছে। যুবক সান বাঁধান পরিষ্কার স্থানে কাপড় জামা ইত্যাদি রাখিয়া স্নানার্থ জলে নামিবার আয়োজন করিতেছে। আর উপরের গাছে এক বানর ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে। ইচ্ছা বস্ত্রগুলি অপহরণ করে। যুবক কিছুই লক্ষ্য করে নাই। খরস্রোতার জলে একবারে নাবিতে পারিতেছেনা জল লইয়া খেলা করিতে করিতে অন্যমনস্ক একটু হইয়া গিয়াছে।

অকস্মাৎ বড় মধুর স্বরে কে বলিল "বান্দরকা উপরে ধ্যান দেনা। যুবক তৎক্ষণাৎ বাঁদর হইতে বস্ত্রগুলি প্রথমেই রক্ষা করিল। পরক্ষণেই নিকটে দেখিল এক পাঞ্জাবী কুমারী বা কিশোরী। পাঞ্জাবীরা প্রায়শঃ সুন্দরী। রূপ যেমন সুন্দর স্বর ও ততোধিক সুমিষ্ট। বালিকা অবিবাহিতা। বালিকা সাবধান করিয়া দিয়া স্মিতমুখে যুবকের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া ছিল। যুবার চক্ষে সেই রূপরাশি, সেই ভঙ্গী, সেই ঈষৎ হাস্যভরা মুখশ্রী বড়ই মধুর লাগিল। কৃতজ্ঞ যুবক কিছুই বলিলনা কিন্তু কিজানি কি ভাবভরা চক্ষে যেন কত কথাই কহিল। তার পরে স্নানাদি শেষে কে কোথায় চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ ঘটনাই কি সমস্ত ব্যাপারের সমাপ্তি? না। কতকি দেখিতেছে কিন্তু সেই মূর্ত্তিত ভুল হয় না। কোন চেষ্টা নাই, কোন প্রয়াস নাই তবে কেন সেই সুহাসিনী মিষ্টভাষিণী বালার মধুর মূর্ত্তি তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে মানস চক্ষে ভাসে?

বুঝিলে রূপের ধ্যান কাহাকে বলে? এই রূপের ধ্যানের সঙ্গে সুন্দর কথা কওয়া—সামান্য একটু গুণও যোগ দিয়াছে। কাজেই এই ধ্যান এই চিন্তা প্রথম 'প্রথম তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে হৃদয়ে ভাসিল। ক্রমে বিজাতীয় চিন্তা দ্বারা সুন্দরীর ধ্যান ভুল হইতে লাগিল। ভুল একবার হয় আবার একটু স্থির হইলেই আবার আসে। ক্রমে জলধারার ন্যায় বিচ্ছেদ পূর্ব্বক যাওয়া আসা করিতে লাগিল। জলধারার মত বিচ্ছেদ বিশিষ্ট অবস্থাটি ধ্যানের নীচের

অবস্থা। ক্রমে আরও দিন যাইতে লাগিল। যুবকের মনে হইতে লাগিল যেন সুন্দরীর ধ্যান সরিয়া গেল। কিন্তু চিত্ত ধ্যানে সুখ বুঝিয়াছে বলিয়া দুঃখের সময় ঐ চিন্তা চেষ্টা করিয়া আনিতে লাগিল। কখন বা সেই স্থানে সেই সময়ে সেইরূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এ দাঁড়ন সুন্দরীর অপেক্ষায়। যুবক যদি হৃদ্‌পদ্মে ধ্যানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ মূর্ত্তি ধারণা করিয়া হৃদয় বিহারিণীর সহিত মিলাইয়া সাধনা করিতে পারিত তাহা হইলে প্রথমে নূতন ভাবে ধারণা হইত ক্রমে বহুদিন অভ্যাসে আবার নূতন ভাবে ধ্যান ও আসিত।

এই যে রূপ ও গুণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল এ ধ্যান বহু আয়োজন করিলে তবে স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রায়ই রূপ ও গুণের ধ্যান বহুকাল স্থায়ী হয় না। ইহাতে একটা আরোপ আছে বলিয়া সকলে বুঝিতে পারিবে বলিয়া তোমার কথা মত একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্তু " এস আমরা ধ্যান করি " এখানে যে ধ্যান লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাই প্রকৃত ধ্যান।

প্রকৃত ধ্যান করাইবার জন্য মূর্ত্তি ধ্যানটি অবলম্বন মাত্র। ইহা বুঝাই প্রয়োজন।

আমাকে ইহা বুঝাইয়া দাও।

স্বরূপ চিন্তাই প্রকৃত ধ্যান। রূপের চিন্তা হয় প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় সাহায্যে। গুণের চিন্তা হয় প্রধানতঃ মনের সাহায্যে। কিন্তু স্বরূপ চিন্তা হয় ধী বা উত্তম বুদ্ধি সাহায্যে।

স্বরূপ চিন্তাতে আমাদের প্রাপ্তি কি হইবে ?

যাঁহার ধ্যান করা উচিত তাঁহাকে ধ্যানকরিতে পারিলে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে আপন স্বরূপের পরমপদে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বুদ্ধি যখন পরম পদে প্রেরিত হইয়া জীবকে আপন স্বরূপটি দেখাইয়া দেয় তখনই আমাদের সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ আর কিছুই নাই।

বুদ্ধি পরম পদে পৌঁছিলে জন্ম জরামরণ ইত্যাদির হস্ত হইতে অব্যাহতি হয়। তখন কি এক রমণীয় অবস্থা যে লাভ হয় তাহা কথায় বলা যায় না। আপনি আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ হওয়া যায়। সকল অবস্থাই

ইচ্ছাকৃত। যখন কেহ সত্যসঙ্কল্পভাব লাভ করেন তখন যখন ইচ্ছা তখন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি লইয়া খেলা করিয়াও আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকেন। ইচ্ছা হইলে কাপড়পরার মত স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ ধারণ করেন ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া ফেলেন। ইচ্ছা হইলেই সূর্য্যরূপে কিরণ প্রদান করেন, বায়ুরূপে বিচরণ করেন। কখন বিশ্বরূপে খেলা করেন, কখন আত্মরূপে সর্ব্বজীবে প্রবেশ করিয়া জগৎ ধারণ করেন কখনবা অবতার হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন অথচ তাঁহার আপনি আপনি ভাবটী সর্ব্বদাই থাকে। ইহা অপেক্ষা রমণীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বুদ্ধি পরম পদে প্রেরিত হইলে যখন এই অবস্থা লাভ হয় তখন কার না কর্ত্তব্য ঐ সাধনা করা?

নিশ্চয়ই। কিন্তু বুদ্ধিটি কোন্ বস্তু? ইহা কোন্ কার্য্য করিবার সামর্থ্য রাখে? ইহা পরম পদে প্রেরিত হয় কিরূপে?

আমাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্তি আছে। কোন শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে, কোন শক্তি অনুসন্ধান করে, কোন শক্তি অভিমান করে আর কোন শক্তি বিচার দ্বারা যাহা শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করে। যে শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করে তাহাকে বলে মন, যাহা অনুসন্ধানাত্মিকা তাহা চিত্ত, যাহা অভিমান করে তাহা অহঙ্কার, আর যাহা নিশ্চয় করে তাহা বুদ্ধি। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ইন্দ্রিয়শক্তি আছে।

তবেই দেখ বুদ্ধি যাহা তাহা কি ভাল, কি মন্দ বিচার করিয়া ভালটি নিশ্চয় করিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরে।

নিশ্চয় করে কিরূপে?

বলিতেছি ত—বিচার দ্বারা।

ভাল করিয়া বল।

বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখাইয়া দেয় যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। ক্ষণিক যাহা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হও দুঃখের সাগড়ে পড়িবে। যাহা নিত্য, যাহা চিরদিন আছে, ছিল বা থাকিবে তাহারদিকে চল, অল্প ত্যাগ করিয়া অনন্তের জন্য প্রাণপণ কর অনন্ত সুখ পাইবে; ভূমাতে স্থিতিলাভ করিবার প্রয়াস করিলে ক্ষুদ্র সুখ যাহা, তাহা তাঁহার অন্তর্ভূত বলিয়া কিছুতেই তুমি বঞ্চিত হইবে

না। কিন্তু ক্ষুদ্রকেই সর্ব্বস্ব কর তুমি সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত হইবে। তোমার জীবন দুঃখে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

এস আমরা ভূমার ধ্যান করি।

এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি।

চৈতন্য একটি। শক্তির স্ফুরণ যেখানে যেখানে হয় চৈতন্যও সেই শক্তি-আশ্রয়ে খণ্ডমত হয়েন। যেমন আকাশ একটি। কিন্তু আকাশে মেঘ উঠিয়া যখন শত খণ্ডে খণ্ডিত হয়, তখন প্রতিখণ্ড মেঘের তলে যেমন খণ্ড নীল আকাশ দেখা যায়—অথচ নীল আকাশ প্রকৃত পক্ষে খণ্ড হয় না—চৈতনের খণ্ড হওয়াও সেইরূপ।

যে চৈতন্য মনের সহিত মিশিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, যে চৈতন্য দেহকে আমি মনে করিয়া দেহের দুঃখে আপনাকে নিরন্তর দুঃখী বোধ করেন, যে জীবচৈতন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, দেহে আসক্ত হইয়া, মনে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা হায় হায় করেন, যিনি এক হইয়াও, স্বরূপে এক থাকিয়াও শক্তিসঙ্গে আপনাকে বহুখণ্ডে খণ্ডিত মনে করিয়া সর্ব্বদা দুঃখ করেন,—সেই বহু শক্তিখণ্ডে জড়িত হইয়া খণ্ডমত জীবচৈতন্যকে বলা হয় এস আমরা অখণ্ড চৈতন্যের ধ্যান করি।

যাহা বলিতেছ তাহাতে যে ব্যক্তি একাকী নির্জ্জনে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতেছে ডাকিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহার পক্ষে এস আমরা ধ্যান করি এই মন্ত্রের প্রয়োগ কিরূপে হইতেছে তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি; তথাপি আরও স্পষ্ট করিয়া বল।

বাহির ছাড়িয়া ভিতরে ঢুকিলেই প্রয়োগটি বেশ করিয়া বুঝিতে পারিবে।

তাহাই বুঝাইয়া দাও।

একটি দেহের মধ্যেই অনেক লোক। একথা রূপক নহে, ইহা কাল্পনিক নহে; ইহা সত্যই। সকলেই সাধনার সময় অনুভব করিতে পারেন; একজন মন্ত্র জপ করেন আর একজন বাজে কথা তুলেন। প্রতিশক্তি চৈতন্য লইয়া যখন উদয় হয়, তখনই তাহা একটি লোকরূপে পরিণত হয়। ইহা সত্য কথা। এজন্য শাস্ত্র বহু স্থানে—হে মন, হে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ভাবে ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ মানুষের মত সম্বোধন করিয়াছেন।

যত যত শক্তির স্ফুরণ এক দেহে হয় তত তত খণ্ড চৈতন্য জীব—এক জীব চৈতন্যের মধ্যেই প্রকাশ পায়। অথচ সমষ্টি জীবটি এক। ব্যষ্টি জীবগুলি তাঁহার অঙ্গ হইলেও তাঁহা হইতে পৃথক্ সত্ত্বা লাভ করিয়া সমষ্টি চৈতন্যের সহিত বিবাদ করে। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি, মনও শক্তি, চিত্তও শক্তি, অহংকারও শক্তি, বিষয়াসক্ত বুদ্ধিও শক্তি। আবার আদিত্যপথগামিনী বরণীয় ভর্গও শক্তি। খণ্ড খণ্ড শক্তির কোলে কোলে খণ্ড খণ্ড চৈতন্য। খণ্ড শক্তিগুলি যখন বিষয়াসক্ত হইয়া মরণের পানে ছুটে, তখন সমষ্টি চৈতন্য যিনি তিনি বলেন—হে ইন্দ্রিয়, হে মন, হে অহঙ্কার, হে চিত্ত, হে বিষয়াসক্ত বুদ্ধি—ক্ষণস্থায়ী বিষয়-চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের ভীষণ যাতনায় কেন আর কষ্ট পাও--এস এস সেই অখণ্ড, সেই ভূমা পুরুষকে ধ্যান করি।

বুঝিলে কে কাহাকে ধ্যান করিতে আহ্বান করিতেছে? একটি দেহে আবদ্ধ সমষ্টি চৈতন্য আপনার অঙ্গীভুত ব্যষ্টি চৈতন্য সমূহকে বলিতেছেন—এস এস আমরা পরমানন্দ প্রাপ্তি জন্য ধ্যান করি। তোমরা আমা হইতে পৃথক্ হইয়া ত দুঃখ পাইতেছ। আমি যে তোমরাই। হে আমার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি! এস আমরা একতা সূত্রে বদ্ধ হই—এস দেখি তোমরা সবাই হৃদয় আকাশে ত্রিকোণ স্থানে, সেই প্রদীপ্ত তেজোরাশিপূর্ণ স্থানে এক সঙ্গে মিশ দেখি—দেখিবে অন্তর্মুখী হইলে তোমরাই দেবতা—আর তোমরা এক সঙ্গে মিলিত হইলে তোমাদের শক্তির মিশ্রণে যে বরণীয় ভর্গের প্রকাশ হইবে, যে সর্ব্বজন-বরণীয় ভর্গ দেব আকার ধরিয়া হৃদয়-আকাশে দাঁড়াইবেন—তিনিই আমাদিগকে সেই নিত্যধামে লইয়া যাইবেন। তোমরা সকলে ঊর্দ্ধদিকে মিলিলেই দেখিবে আমি সমষ্টি চৈতন্যই সেই বরণীয় ভর্গ। আমিও তোমরাই। আমা হইতে পৃথক্ হইয়া আর দুর্দ্দশায় পড়িও না। এস আমরা ধ্যান করি। ধ্যান করিলেই তিনি আমাদের উত্তম বুদ্ধিকে বিচার দ্বারা দেখাইয়া দিবেন—বাস্তবিক যাহা দেখিতেছ, যাহা জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তিনিই। জগৎটা তাঁহারই বিবর্ত্ত। জগৎ সর্পরূপে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ব্রহ্মরজ্জুই। এই দেহ, এই মন, এই জগৎ এইগুলি ভ্রমে ভাসিয়াছে। ফলে তিনিই তিনি আছেন। ভ্রমে দেখাটা মিথ্যা। খণ্ড তিনি হন নাই—খণ্ড নাই—অখণ্ডই আছেন। বুদ্ধিকে তিনি প্রেরণ করিলে যখন ইহা তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখন যতদিন না অখণ্ডে স্থিতিলাভ হইতেছে ততদিন প্রত্যহ ইষ্টদেবতাকে গায়ত্রী অবলম্বনে ধ্যান

করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও রাখিতে হয়—হে আমার ইষ্ট—তুমিই বরেণ্যং ভর্গঃ—তুমিই জলে স্থলে, অম্বরতলে সর্ব্বত্র—প্রভু! তুমি কাহারও উপর অসন্তুষ্ট নও—তুমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট—আমি তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতেছি, তোমার প্রসন্নতাটি আমার অনুভব-সীমায় আনিয়া দাও। কর্ম্মের ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভবের দিকে চাহিয়া থাকিলেই—মূর্খ হইলেও সন্ধ্যাপূজা ঠিক ঠিক হয়। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি প্রসন্ন হও—আমি তোমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করি—ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান। ক্রমে উপাসনা দ্বারা যত যত পাপক্ষয় হইতে থাকিবে, তত তত হৃদয় নির্ম্মল হইতে থাকিবে। ক্রমে বুদ্ধি প্রকৃত ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তিনি বুদ্ধিকে আপনার নিকট লইয়া যাইবেন আমাদেরও উপাসনা শেষ হইবে। এই পূজায় ভক্তিও আছে এবং ভক্তির শেষস্থান জ্ঞান বা স্থিতিও আছে। এখন এই যে মা আসিতেছেন—এই মার আগমনকালে এস আমরা মাকে একটু ধ্যান করি।

বিজয়া।

মোর সুখের শর্ব্বরী নিমিষে পোহায়,
ওই নবমীর শশী মাগে যে বিদায়।
আমি সারাটী বরষ সাধিয়া কাঁদিয়া,
পেয়েছি যে নিধি ;—হৃদয় দলিয়া।
মোর প্রাণের উমায় নিতে চায় হরি,
এ'শূন্য আবাসে (র'ব) কেমনে পরাণ ধরি।
এ' তিন দিবস রাখি নয়নে নয়নে,
মোর তিলেকের সাধ মেটেনি'কো মনে।
আমি যে ভেবেছি মনে কত না যতনে,
তারে চিরদিন ধরি রাখিব গোপনে।
ওযে বিদায়ের বাণী মায়ের পরাণে,
তোরা কি বুঝিবি হায়? শেল সম হানে।

কত কাতর মিনতি আঁখিজল-ধারা,
'সকল উপেখি' করে আঁখি তারা-হারা।
আমি কাহারে বা কহি, কার হাতে ধরি,
ওগো! সকলে মিলিয়া বলো পায়ে ধরি।
তবু শুনিল না মানা কেমনে গো রাখি,
কোলাহল করি দেখায় অরুণ আঁখি॥

মৃঃ—

হৃদয়ের রাজা।

হায় ভুল। শতবার হারাইয়া যায়। শতবার ভুল হইয়া যায়। তোমার হৃদয়ে ধরিয়াও শতবার হায় হায় করা হইয়া যায়। তাই বলি একি ভুল। তাই বলি হায় ভুল।

কতকগুলি কার্য্য ত পারি। সর্ব্বদা মধুর বুলি এটাত পারি। কিন্তু ভুল হয় কেন? শত শত অন্যায় ত নিজে করি। তবুও অন্যের কিছু অন্যায় কার্য্যে যখন নিজের স্বার্থের অল্প মাত্র বিঘ্নও হয়—তখন মধুর বুলি কোথায় যায়? একবারে কি কদর্য্য ভাষা, কি কর্কশ ভাষা বাহির হয়? একটু মর্য্যাদার ত্রুটি হইলে একবারে এমন হইয়া যাই কেন? কেন, তখন কি শান্ত ভাবে দুষ্টব্যক্তিকে কিছু বলা যায় না? তা পার কৈ?

হায় বুঝিয়াছি হৃদয়ের রাজাকে তখন দেখিতে মনে থাকে না। নিজের মধ্যেও না, তার মধ্যে ও না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া যাহা করা যায়, তাহাই ত মধুর হয়। তাঁকে দেখা হয় না কেন?

হায়! সে ত হৃদয় মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় অষ্টদল পদ্মে সর্ব্বদা শয়ন করিয়া আছে। সকলের হৃদয়েই আছে। তাহাকে জগাইলেই ত সে উঠিয়া পদ্ম মধ্যেই উপবেশন করে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলেন তত্ত্বমসি। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা যায় অহং ব্রহ্মাস্মি। তাহাকেইত বলা হয় বরণীয় ভর্গ। তাহাকেই ত বলা যায়;—

রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনং।
ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্॥

তিনিই ত সমষ্টি পুরুষ, তিনিই ত অবতার, তিনিই আত্মা, তিনিই সগুণ বিশ্বরূপ, আবার তিনিই নিগুর্ণ দেব। এই ত সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

কেন তবে একথা স্মরণ থাকে না? কেন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা যায়? ভুলিয়া থাকিয়া এ ভোগ ভুগিতে হয় কেন? যে যাহা গায়, সে ত তার কথাই গায়। কালরূপে আলো সেই ত করে।

হায় কিরূপে এই হৃদয়-রাজ সর্ব্বদা মনে থাকিবেন? সর্ব্বদা শ্রবণ মনন, জপ, পূজা, ধ্যান সর্ব্বদাইত হয় যখন তারে মনে রাখা দায়।

বুঝি সৎসঙ্গ, সৎ আহার, সৎ ব্যবহার না হইলে ইহা হয় না। তবু যত দূর সম্ভব আহারে বিহারে শুচি থাকিয়া স্মরণ করা উচিত।

সর্ব্বদা স্মরণের জিনিষ এই হৃদয়ের রাজা। যাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট হইতে হৃদয়-দহর দেখিয়া লইয়াছেন, যাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট হইতে শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া জপ করা শিক্ষা করিয়াছেন এবং যাঁহারা শ্রীগুরুমুখ হইতে কুম্ভকে জপ করা কিরূপ তাহা জানিয়াছেন—তাঁহারা হৃদয়ের রাজাকে স্মরণ করিয়া ত্রিসন্ধ্যার নিত্যকর্ম্ম করিয়া যদি কুম্ভকে স্মরণ জপ অভ্যাস করেন তবে ইহাতে কিরূপ আনন্দ আপনিই বুঝিতে পারিবেন। ইতি।

রাবণ পরাজয়।

লঙ্কার ঈশ্বর আমি ভুবন-বিজয়ী,
একি দশা! চাই আমি পদে লুটাইতে,
চায় যদি একবার তরল কটাক্ষে,
এই সুধামুখী ঐ আঁখিপদ্ম তুলি
আমা প্রতি। কি জানি কি রত্ন যেন তবে,
হয় মোর হস্তগত, কি জানি কি জ্বালা,
ছুটে যায়; উঠে হৃদে ভরিত সুষমা।
একি ভুল! নাহি পারি, আমি লঙ্কাপতি;
সারাইতে ক্ষণতরে হৃদি হ'তে মোর,
ইহার সম্ভোগ আশা, বক্ষে বক্ষঃ ধরা,
এ মোর হৃদয়-লক্ষ্মী, পরাণ-প্রতিমা।

ধিক্ লঙ্কা, ধিক্ মোর অনন্ত বৈভব,
এই মানবীর কাছে; ধিক্ লঙ্কেশ্বরী,
ধিক্ সে দানবসুতা এ সীতার কাছে;
কত না অবজ্ঞা করে, কত দেয় গালি
কতই অভিসম্পাত, সকলি মধুর;
সকলই মধুর লাগে, যখন যা করে।
ধন্য সীতাপতি—যার তরে এই সতী
তুচ্ছ করে, এ লঙ্কার অপূর্ব্ব গৌরব।
ধন্য রঘুপতি! এ যারে হৃদয়ে ধরে,
শত সোহাগের ভরে—প্রণয়ে ভরিয়া!
ছার আমি! ছার মম লঙ্কা স্বর্ণময়ী;
চাহিনা, চাহিনা কিছু, নাহি প্রয়োজন
এ জীবনে; এ জীবন যদি, নাহি পারে
আনিবারে, হিয়ার ভিতরে, এ প্রেম-প্রতিমা
একি রূপরাশি! চক্ষু ঝলসিয়া যায়,
শত সাধ জেগে উঠে কম্পিত হিয়ায়;
তবুও দেখিনি এর সোহাগের হাসি,
লাবণ্যবারি-ভরিত নূতন যৌবন
মাখিয়া যখন ধায় প্রেমাস্পদ প্রতি।
এই দৃষ্টি! ইহা যবে সান্দ্র অনুরাগে
তরল হইয়া পশে পিয়ার নয়নে—
কি সুন্দর! কি সুন্দর! হয় তবে এই,
আলম্বি কুন্তল-ভরা বদন-চন্দ্রমা!
এই হস্ত! এই হস্ত যবে অতি ধীরে,
আদরে জড়ায়ে ধরে প্রিয়-গলদেশ,
চকোরে ঢালিয়া দিতে অমিয়ার রাশি।
এ চরণ, এ চরণ যবে ধীরে চলে
প্রিয়া গৃহে, নিশাকালে মিলনের তরে,
বরণ মঙ্গল দীপ জ্বালিয়া হৃদয়ে।

আমি লঙ্কেশ্বর ! আমি ত্রিদিব ঈশ্বর !
আমি ছার, অতি ছার, ইহার নিকটে।
কি আছে রাঘবে যাহা না মিলে রাবণে ?
বিজনে ভাবিয়া এরে আসি যবে ছুটে,
ঢেলে দিতে শ্রীচরণে পরাণ আমার ;
কে জানে, কে জানি যেন এ দুখিনীরে
রক্ষা করে। নিবে যায় রাক্ষস-কামনা,
অথবা ইহাই বুঝি সতীর মহিমা।
শত মন্দাকিনী-ধারা হেরিয়া নয়নে,
দীর্ঘশ্বাস বিজড়িত রাম রাম শুনি,
থেমে যায় হৃদয়ের কামের প্রতাপ ;
কি যেন কি হ'য়ে যাই না থাকি রাক্ষস।
সুশীতল দেবভাবে ভরে যাই আমি,
মনে হয় রাম-রাণী রাঘব-ঘরণী—
জগৎ জননী ইনি—আমারও জননী।
এ রাক্ষস-দেহ মোরে ডুবায়ে রেখেচে
কামকূপে ; ত্যাগ-যোগ্য ইহা সর্ব্বভাবে।
শতেক প্রার্থনা জাগে হৃদয়ে আমার,
বড় ভার বোধ হয় এ রাক্ষস কায়া ;
বড় ভার বোধ হয় রক্ষ মনো-মায়া।
যাক্, এইক্ষণে যাক্, এ রাক্ষস তনু,
সীতাপতি, এস প্রভু, করিতে বিনাশ,
মাতৃহারী-রক্ষবংশ যেখানে যা আছে।
মাতৃবুদ্ধে হরিয়াছি শ্রীরাম-রমণী,
শীঘ্র বিনাশহ প্রভু, আসিয়া আপনি।

———

ঈশাবাস্য

জগতে গতিশীল যাহা কিছু তাহাকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেল। তাহা হইলেই বিষয় ত্যাগ করিতে পারিবে। বিষয় ত্যাগ দ্বারা আত্মার—অহং অভিমানী আত্মার—উদ্ধার হইল। আর একটি বিষয় স্মরণ রাখিও। কাহারও ধন গ্রহণ করিও না। কারণ ত্যাগ করিয়া আবার যদি গ্রহণ কর, তবে আবার আত্মাকে—অভিমানে, অহংকারে এবং অহংকারের সৃজিত এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে হারাইয়া ফেলিবে। আবার তোমার আত্মাকে বিষয় আসিয়া আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে। বিষয়ের দ্বারা যখন আত্মা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, তখনই তোমার অজ্ঞান বিকার আসিয়া পড়িল! এই বিকারে তুমি অসত্যকে সত্য ভাবিবে, দুঃখকে সুখ ভাবিবে, রজ্জুকে সর্প মনে করিবে, মরীচিকাকে জল মনে করিবে; মৃত্যুর কার্য্যকে জীবন মনে করিবে। ইহাই তোমার সমস্ত সংসার-দুঃখের মূল।

আমি ভাল করিয়া আদত কথাটি বুঝিতে চাই।

বল কি বুঝিতে চাও।

ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছাদন করা কিরূপ? ঈশ্বরকে আমরা কিরূপেই বা পাই এবং পাইয়াই বা কিরূপে তাঁহা দ্বারা সকল বস্তুকে আচ্ছাদন করা যায়?

ঈশ্বরকে একভাবে সকলে পায় না। কেহ বা তাঁহাকে চৈতন্যরূপে পায়, কেহ বা পায় নামরূপে? কেহ বা পায় নির্গুণভাবে, কেহ বা পায় সগুণভাবে, কেহ বা পায় অবতার ভাবে, আবার কেহ বা পায় আত্মারূপে। আবার কেহ কেহ বা তাঁহাকে নির্গুণ সগুন অবতার ও আত্মা—সমকালে এই চারিভাবেই পায়। যে যেমন ভাবে, সেই ভাবেই সে তাঁহা দ্বারা এই জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলুক। তবেই সে জগতের সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পারিবে। সবই ঈশ্বর যখন, তখন আর বিষয় কৈ? কে আর তাহাকে বহির্ম্মুখীন্ করিবে?

যখন জীব অন্তর্মুখীন্ হয় তখনই সে আত্মদর্শন করিতে পারে। ইন্দ্রিয়-দ্বার

দিয়া সর্ব্বদাই শক্তিগুলি বাহিরে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। যদি শক্তিগুলির বাহিরে আসার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে অতসী পাথরে বিক্ষিপ্ত সূর্য্য-কিরণগুলি গুটাইয়া আনিলে একত্রিত সূর্য্যকিরণ সমূহের তেজে যেমন নিম্নস্থিত তুলা বা কাগজ পুড়িয়া যায়—সেইরূপ বিক্ষিপ্ত শক্তি সমূহ একাগ্র হইবার বস্তুতে প্রবেশ করে, করিয়া তোমাকে অন্তর্মুখে লইয়া যায় এবং ঐ বরণীয় ভর্গ দ্বারাই আত্মাকে প্রকাশ করে। এইখানে বরণীয় ও অবরণীয় ভর্গ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতে পার—সে সব কথা আমি আর বলিলাম না। যাহার যেমন গুরু বিশ্বাস সে সেইরূপে ধারণা করিয়া লউক।

চৈতন্যকে শক্তি জড়িত করিয়া চিন্তা করা যাহার অভ্যাস তিনি না হয় ঐরূপ করিলেন; কিন্তু ঈশ্বরকে যিনি অবতার ভাবে ভাবেন তিনি কি করিবেন?

ঈশ্বরকে যিনি চিৎশক্তিরূপে দেখেন, শক্তিজড়িত চৈতন্যভাবে দেখেন—তিনি কিরূপে উহা দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবেন তাহা তবে বুঝিয়াছ। যিনি ঈশ্বরকে নামরূপেই দেখিতে ভালবাসেন, তিনি জগৎকে নামরূপ আচ্ছাদন দ্বারাই আচ্ছন্ন করিবেন।

কিরূপে?

যখন ঈশ্বরের নাম ও রূপকে তুমি ঈশ্বর ভাবনা কর তখন তুমি কি পাও দেখ দেখি? নামটি একটি শব্দ মাত্র। রাম, কৃষ্ণ, কালী এই সমস্ত নামের কোন একটি উচ্চারণ করিলে একটি শব্দ মাত্র পাও। এই শব্দটির সঙ্গে একটি চলনও পাইতেছ। এই চলনটিকে শরীরের ভিতরে কোন এক স্থানে ধর যেন হৃৎপদ্মে বা ভ্রূমধ্যে যেখানে সুবিধা—সেইখানে ধারণা কর। করিয়া ঐখানে ঐ শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাক। এখন যেখানে চলন হয় সেইখানে প্রতি চলনের কার্য্যে রূপের রেখাপাত হইতে থাকে। শব্দের সহিত রূপ আছেই। যাঁহারা নাম জপ দ্বারা রূপে পৌঁছিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীভগবানের মূর্ত্তিও দেখেন। তুমি যে ইষ্টমন্ত্র হৃৎপদ্মে রাখিয়া জপ কর, সেইখানে শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত ভগবৎ রূপটি তোমার কর্ম্ম দ্বারা ফুটিবার পূর্ব্বেই না হয় সেই ইষ্টমন্ত্র সঙ্গে মিলিত কর। ইহাতে তোমার জপের সুবিধা হইবে। যখন জপ করিবে তখন তোমার চক্ষু ও কর্ণকে অন্তর্মুখীন্ কর। কর্ণে ভিতরের জপের শব্দ শুনিতে থাক আর চক্ষে জপের

সহিত জড়িত জ্যোতির মধ্যে ভগবৎ মূর্ত্তি দেখিতে থাক। এইরূপে তোমার মন হৃৎপদ্মে যখন একাগ্র হইবে তখনই আপনা হইতে তুমি সত্য সত্যই রূপ দেখিবে। যদি দেখিতে নাও পাও তথাপি ইষ্টমন্ত্রটিকেই তুমি তোমার সর্ব্বস্ব করিয়া ফেল।

বৃহৎ মৎস্য ধরিতে গেলে যেমন পুষ্করিণীতে বড় জাল নামাইতে হয়, সেইরূপ বিষয়-সাগরের বড় মৎস্য স্বরূপ তোমার মনকে ধরিবার জন্য ইষ্টমন্ত্রের জাল নামাও। মনটাও তোমার সূক্ষ্ম দেহ মাত্র। নাম দ্বারা এই মনটাকে আচ্ছাদন কর। তার পর দেহটা তোমার স্থুল দেহ মাত্র। এটার সর্ব্ব স্থানে নাম লিখিয়া লিখিয়া এটাকেও নামের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া ফেল। এইরূপে আকাশকে, চাঁদকে; বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সাগর নদীকে নামের আচ্ছাদনে এমন করিয়া আচ্ছাদন কর যাহাতে তাহাদের রূপ আর না দেখা যায়—যাহাতে নামের রূপটাই তোমার চক্ষে ভাসে। এই ভাবে যদি নামরূপ দিয়া জগৎটাকে ঢাকিয়া ফেলিতে পার, তবে কিছু দিন অভ্যাসের পরে দেখিবে জগতের সর্ব্বত্রই তোমার ইষ্টমন্ত্রের নামরূপ-স্বরূপ তোমার ইষ্ট দেবতাই দাঁড়াইয়া আছেন। আকাশ দেখিয়া তুমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইবে, বৃক্ষ দেখিয়াও স্থির হইয়া যাইবে, দুষ্ট মানুষ শান্ত মানুষ, পশু পক্ষী যাহা কিছু দেখিবে তাহাতেই তোমার ইষ্টকে দেখিতে ইচ্ছা হইবে। সকল বস্তুই নাম স্বরূপের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া যেন তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া দিবে। এই সকল করিয়া যখন দেখিবে তাঁহাকে একটু একটু ভাল বাসিতে শিখিতেছ তখন সেই তোমাকে ক্রমমুক্তি হইতে সদ্যোমুক্তির পথে পৌঁছিয়া দিবে।

কি শিখিলাম।

কি শিখিলাম, শিখিলাম অনেক। বলিবার কহিবার মত—বুকনি দিবার মত শিখিলাম বহুত। "বহুস্যাং প্রজায়েয়" হইতে আরম্ভ করিয়া কিম্বা ইহারও এক গাঁইট উপর হইতে ধরুন "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ং" হইতে আরম্ভ করিয়া—"ত্বয়া হৃষীকেশ" র ভিতর দিয়া—"সোঽহং" পর্য্যন্ত কাজচালান গোচের দশকর্ম্মের জন্য শিখিলাম অনেক।

শিখিলাম অনেক কিন্তু দয়াময় বুঝিলাম না কিছু। পরীক্ষা লউন শিখিলাম—বাতুল কিং তব নাস্তি নিয়ন্তা। চৈতন্য-নিরপেক্ষ অন্ধ জড়শক্তি এই সুশৃঙ্খলাপূর্ণ জগতের কারণ হইতে পারে না। জড়ের সঙ্কল্প-শক্তির অভাব—এ চির-প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর-প্রেরণা ব্যতীত আদ্যা-সৃষ্টি বিষমা হইতে পারে না।

শিখিলাম ঈশ্বর এক। কিন্তু বহু হইবার তাঁহার বাধা নাই। এই বহুর ভিতর একত্বই তিনি। পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বাদ্য-যন্ত্র যেমন একসুরে বাঁধিলে একটী মাত্র স্বর শুনা যায়, হাটের নানা রকমের গোলমাল দূর হইতে শুনিলে যেমন কানে একটা মাত্র জমাট শব্দ আইসে—সেইরূপ There is a unity in diversity.—

শিখিলাম তিনি বিন্দুও বটেন তিনি সিন্ধুও বটেন। ব্যষ্টিভাবে লইলে তিনি বিন্দু, সমষ্টিভাবে লইলে তিনি সিন্ধু। বিশেষ আকার নাই বলিয়া তিনি নিরাকার। দেশ কাল অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া অনন্ত। তিনি অনন্ত, সেইজন্য তাঁহার অংশও অনন্ত। তাঁহার শক্তি এক হিসাবে অনন্ত, না হইলেও অনাদি বটে।

শিখিলাম তিনি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের বস্তু। সত্য স্বরূপ তিনি। সত্যই শ্রদ্ধার আশ্রয়। নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার উৎপত্তির কারণ। ইন্দ্রিয়-সংযম নিষ্ঠার নিদান। সুখভোগাকাঙ্ক্ষার বিনিবৃত্তি না হইলে, অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে প্রবৃত্তি না জন্মিলে, দেবতা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে না।

আপ্তোপদেশ ব্যতীত দেবতা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের অন্য প্রমাণ নাই। ইহাতে যদি না হয়, তাহা হইলে জানিবে তোমার হইল না।

শিখিলাম ঈশ্বর দূরের বস্তু নয়। আকাশের উপরে স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া জীব জন্তু গড়িয়া নিম্নে ছাড়িয়া দিতেছেন না। তিনি আমার অন্তরের নিজের জন। এত নিজের যে তোমার আমি, তুমি আমার, আমিই তুমি বলিলেও দোষ আসে না।

শিখিলাম তাঁহার শক্তির নাম মায়া, অবিদ্যা, অজা, প্রধান, অব্যক্ত প্রকৃতি ইত্যাদি। অবস্থাভেদে প্রকৃতি স্থূল ও সূক্ষ্ম বা ব্যক্ত ও অব্যক্ত। পণ্ডিতি ভাষায় বলিতে গেলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিত সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতির সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থা বলে।

কিম্বা আর একটু অল্প দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বলিলে বলা হয় নির্গুণ ব্রহ্মে যখন অনীর্ব্বচনীয়া শক্তির সান্নিধ্য হয়, তখন সেই শক্তিকে বলে মূল প্রকৃতি। মণির ঝলকের ন্যায় অব্যয়, অক্ষয় পরমশান্ত ব্রহ্মের স্পন্দনাত্মিকা যে কল্পনা শক্তি তাহাই মূল প্রকৃতি। ইহা ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা। প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়া প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন রূপের সহিতই আমরা পরিচিত।

শিখিলাম মায়ার মারপ্যাচে তিনি সমকালে ব্রহ্ম ঈশ্বর ও জীব সাজিয়া বসিয়া আছেন। যখন ব্রহ্মে শক্তির প্রকাশ নাই—একটা কিম্ভূতকিমাকার ন যজৌ ন তস্থৌ গোছের অবস্থা—তখন তিনি নাকি খাঁটি নিগুণ ব্রহ্ম। উৎসবের সেই "আপনিই আপনি"। ঘরকন্না করিবার জন্য আবশ্যক হয় না।

যখন ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার মত শক্তি তাঁহাতে ঘর ঘর ক'রে খোরে—তখন তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য। ভেজান ব্রহ্ম হ'চ্চেন ঈশ্বর। কিন্তু এ ভেজানে ক্ষতি নাই, তিনি মায়াধীশ।

আবার যখন তিনি খানিক আকাশঢাকা খণ্ড মেঘের মত খণ্ডিত হইয়া আপনাকে মায়ার অধীন মনে করেন (যেহেতু তিনি স্বাধীন, তিনি সব মনে করিতে পারেন তোমার আমার সে বিষয়ে Question করা বেয়াদবি মাত্র। তখন তিনি আধ্‌কপালে পোড়া জীব হন। ভাল করিয়া বলি। মনে করুন যেন এক অসীম সমুদ্র। তার একপাদে একটি মহান্ বৃক্ষ। বৃক্ষের ছায়া সমুদ্রের একপাদে মাত্র পড়িয়াছে। এখন সমুদ্র হ'লেন যেন ব্রহ্ম। সমুদ্রের উপরে বৃক্ষের ছায়া হ'লেন মায়া। ছায়ার নিম্নস্থ জলরাশি ঈশ্বর, আর সেই জলরাশির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ হ'লেন এই ওঠা পড়া জীব।

শিখিলাম এই ব্রহ্ম (ওরফে ঈশ্বর ওরফে জীব) ছাড়া অন্য যে কিছু বাহ্য বস্তু যাহাকে জড় বলা হয় তাহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব আদৌ নাই বা ব্রহ্ম ব্যতীত তাহাদের অস্তিত্ব মিথ্যা কল্পনা মাত্র। তবে মিথ্যা হইলেও এ সত্যিকারের মিথ্যা। তাহা হইলে এক হিসাবে জড় বলিয়া কিছু নাই। থাকিয়াও নাই। সব লালে লাল। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে।

তবে গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি ব্রহ্মবিৎ জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারেন, কিন্তু যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায় নাই, অবিদ্যাপ্রসূত দ্বৈতজ্ঞানের যিনি অধীন, সুখদুঃখের সম্পূর্ণ পার্থক্য বোধ যাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক, ঈপ্সিতের লাভে হর্ষ এবং অপ্রাপ্তিতে যাঁহার দুঃখ উপস্থিত হয়, অন্তরে যাঁহার রাগদ্বেষ পূর্ণ—

শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিলেও উচ্ছাসিত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে।যনি প্রাকৃতিক নিয়মে অক্ষম তাঁহার কাছে জগৎ মিথ্যা নহে।

জগৎ মিথ্যা, দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত বা করুণার্দ্র হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক, পরদুঃখকাতর হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর অকর্ত্তব্য বা অসম্ভব ইত্যাদি কথা মুখের কথা মাত্র। অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়-প্ররূঢ় দ্বৈত বুদ্ধিকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করা কঠোর সাধনা-সাধ্য।

শিখিলাম জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ক ভেদাভেদ উভয়ই। ভালবাসি কেমন—না ভালবাস যেমন। আবার "হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিয়ে গেলে ভুলে যাইরে আমি আমার! ঘোমটা রাখা বা না রাখা ভাবের আবেগের উচ্ছ্বাস লইয়া। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বাদের বিবাদ অনেকটা কথার বিবাদ মাত্র। অধিকারী ভেদে ঈশ্বর-উপলব্ধির মাত্রার তারতম্য লইয়াই বাদাবাদ।

শিখিলাম কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টির বৈচিত্র্যের হেতু। জীব যে সকল কর্ম্ম করে শুভই হউক আর অশুভই হউক তাহাদের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সংস্কারই ভাবিষ্যৎ প্রপঞ্চের বীজভূত। প্রলয়কালে ইহারা প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন, প্রাণিদিগের অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া অবস্থান করে। এই সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃ প্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীবগণও সুপ্তোত্থিতের মত সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন।

শিখিলাম আত্মার জন্ম মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নাই বা হয় না। কোন ফলদানোন্মুখ সঞ্চিত কর্ম্ম ভোগ করাইবার জন্য এই দেহ। স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশই মরণ জীবন। কর্ম্মভোগ শেষ হইলেই সে দেহ রক্ষা অন্য দেহ গ্রহণ ইত্যাদি। আত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী বা হাউইএর মত ফস ক'রে দেহ ছেড়ে উড়িয়া যান না। যিনি পূর্ণ তাহার চলিবার স্থান কোথায়? আকারই বা কি? শুনি লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ বা জীবাত্মার ভোগের জন্য শরীরের উৎপত্তি। জীব সূক্ষ্ম শরীর যুক্ত হইয়াই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন; যাবৎ মুক্তি না হয় তাবৎ লিঙ্গ শরীরের সহিত পুরুষ বদ্ধ থাকেন।

শিখিলাম জীবের so called সুখ দুঃখ জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল। ইহা সূক্ষ্ম দেহেই ভোগ হইয়া থাকে। অভীষ্ট-বিষয় প্রাপ্তিতে সুখ হয় সত্য, কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে বিষয় সুখ দিতে পারে না। আত্মার স্বরূপ অবস্থাই সুখস্বরূপ। আত্মান্বেষণার্থ বহির্মুখ চিত্ত বিষয় পাইয়া যেমন অন্তর্মুখ হয়—নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া অন্তরে প্রবেশ করে—তখনি স্বাভিমুখদর্শনে মুখপ্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব যেন তাহাতে পতিত হয়—ইহাতেই অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য সুখ। আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বিষয়কে আত্মা মনে করিয়াই ঠকি। বরাবর ঠকিয়া আসিতেছি, কতদিন ঠকিতে হইবে কে জানে?

শিখিলাম ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটি জীবের পুরুষার্থ। এছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা জীবের হইতে পারে না, থাকিতেও পারে না। প্রথম তিনটি গৌণ শেষটি মুখ্য।

শিখিলাম সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ। অজ্ঞান সহিত জনন মরণাদিকে দুঃখ বলে। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইলেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়। দুঃখনিবৃত্তিই পরম প্রেমের বিষয়। আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই অভিমান ছাড়িয়া যে স্বরূপে স্থিতি তাহাই মোক্ষ। ইহাতেই এই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হইল। কেহ বলেন স্বর্গ বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি প্রাপ্তিও মোক্ষ নহে। আবার কেহ বলেন বৃন্দাবনের শৃগালত্বও এ মোক্ষ অপেক্ষা বন্দনীয়।

শিখিলাম ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত উপরি উক্ত মোক্ষ লাভ হয় না। ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ইহা চরম সাধনা সাপেক্ষ। প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন—ইহাই সাধনার চূড়ান্ত এবং বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত এ সাধনার অন্য পথ নাই।

শিখিলাম এত সরু লম্বা চওড়া কথার দরকার নাই। হরি হরি করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া যাইতে পারিলে এক রকম সেরে দেওয়া যায়—ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা।

দেখুন কত কথা শিখিয়াছি। আপনার প্রসাদাৎ অন্য অন্য শিক্ষাগুরুর প্রসাদাৎ কত বাঁধাবুলি বলিতে শিখিয়াছি। কিন্তু হ'ল কি? ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রকৃত বিশ্বাস কৈ? সংসারের ক্লেশে প্রিয় বিয়োগ জনিত বেদনায় ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচনায় এত ব্যথিত হই কেন? পরশ্রী দেখিলে প্রাণখুলে হুঁ দিতে পারি না কেন? নিজের স্বার্থে আঘাত লাগিলে এত বিকৃত হই কেন? আপনারটি যে

চোখে দেখি পরেরটি সে চোখে দেখিনা কেন? লোকের কথার কু অর্থ করি কেন? প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারি না কেন? ভাল বলিলে সুখ, মন্দ বলিলে মর্ম্ম বেদনা হয় কেন? বাক্যে ও কার্য্যে এত বিসদৃশ কেন? শুনিবার অপেক্ষা বলিবার ঝোঁক এত বেশী কেন? দেওয়ার চেয়ে নেওয়ার প্রকৃতি অধিক কেন? পাপ অপেক্ষা পাপীকে এত ঘৃণা কেন? শাস্ত্রচর্চ্চা অপেক্ষা পরচর্চ্চা এত ভাল লাগে কেন? দীনতা অপেক্ষা হীনতা কেন? অল্পেই দুঃখ কেন? স্বল্পেই সুখ কেন? ভোগে স্পৃহা কেন? রোগে অসহিষ্ণুতা কেন? তাই জিজ্ঞাসা করি হ'ল কি? আগে না হয় এত কথা জানিতাম না। শাস্ত্র কথা এখন ত অনেক জানিয়াছি কিন্তু কাজের বেলা কৈ সে উন্নতি? চরিত্রগত উন্নতি কোথায় হইল? ক্রোধের কারণ নাই তাই ক্রোধ হয় না। কামের নিমিত্ত আসে না তাই কাম জড় মত আছে। কিন্তু এসব প্রলোভন যদি আসে তাহা হইলে কি স্থির থাকিতে পারি? যাক্ শত দোষ আবার হইতে পারে—ক্ষেত্রে পড়িলে সবই যেন করিতে পারি। তাতেও ভীত নই। কেন নই? না তোমায় ডাকি প্রলোভনের হস্তে যেন আর তুমি পতিত না কর।

বলিতেছিলাম এ সকলেও তত ভীত নই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভগবানের ভাব লইয়া কতক্ষণ থাকি? কতক্ষণ থাকিতে পারি? কিছুই যে করি না তাও ত বলিতে পারি না। করি ত কিছু। কোনদিনই কিছুই হয় না তাও ত নয়। কিন্তু সেই একই ভাব। কত কি করিয়া—কত খাটিয়া, কত পড়িয়া, কত সাধুসঙ্গ করিয়া, না হয় কখন আপনি আপনি একটু ভগবৎ রস পাইলাম, তখন বেশ ভাল থাকিলাম, বেশ ভাল লাগিল কিন্তু যেমন সংসারে আসিলাম—যেমন "সুত মিত রমণী সমাজে" পড়িলাম অমনি সে ভাবটুকু "তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম" দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল। ভিতরে ভাব নাই বাহিরে কথা মাত্র কহিলাম। কৈ প্রবাহ থাকিল কৈ? রোজই যদি আসে, আবার রোজই যদি যায়, তার পর দিন আবার সেই লয় বিক্ষেপ ঠেলিয়া ভাব আনিতে হয়—তবে পরিণামে কি হইবে? শেষ সময়ে যদি লয় বিক্ষেপ আসিয়া পড়ে? যদি তোমায় স্মরণ না হয়? যদি "তোঁহে বিসরি মন—তাহে সমর্পিনু" হইয়া যায়—হায় তখন কি হইবে? এই সব চিন্তা করিয়া বলি "অব মঝু হব কোন কাজে" তাইত বলি আমার হইল কি? কি কাজ হইল? কি আমার হইবে?

তখন শ্রীভগবান্ ভিন্ন আর উপায় কি আছে? তখন কবির মত শতবার বলিতে ইচ্ছা করে "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা" হে দয়াময় আমি পরিণামে বড় নিরাশ হইতেছি। কিন্তু বহুবার দেখিয়াছি—নিরাশ হইলেই তোমায় আশায় আশান্বিত হই। তুমি যেন নিরাশ হইতে দাওনা। কত দয়া তোমার। এই তোমার করুণা মাত্রই আমার সম্বল। আমি সবই করিব সত্য। তোমার আজ্ঞা বলিয়া সন্ধ্যা পূজা তিন বেলা করিব। তোমার আজ্ঞা বলিয়া স্বাধ্যায় করিব। তোমার আজ্ঞা বলিয়া সৎসঙ্গ করিব। কিন্তু প্রভু আমি নিতান্ত দীন। নিতান্ত জড় বুদ্ধি। কিছুতেই আপনাকে তোমার চরণতলে ফেলিয়া রাখিতে পারি না। কিছুতেই আমার অহংটাকে তোমাতে ডুবাইয়া দিতে পারি না। কিছুতেই যেন অহং অভিমান দূর করিতে পারি না। কিছুতেই কর্ত্তা অভিমান যায় না। কেহ কিছু বলিলেই অমনি ঢাল তরোয়াল লইয়া যেন অহংকারে গর গর করি। হায় প্রভু, তুমি ভিন্ন আমার গতি হইবে না। তুমি না আমার দোষ ছাড়াইয়া দিলে আমি কিছুতেই আমাকে ভাল করিতে পারি না। প্রভু! যা করিলে আমি নিত্য তোমার শরণে আসিতে পারি তাই তুমি আমার উপর এই দীনের উপর, এই দুর্বৃত্তের উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়া করিয়া দাও। আমি তোমার নাম করি—আর তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও। তোমার করুণা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। তুমি সকলের ত্রাণকর্ত্তা। আমারও ত্রাণকর্ত্তা না হইলে আমার আর অন্য গতি নাই। ইতি—

শ্রীভোঃ—

ক্রম অনুসারে শক্তি বিকাশ।

আত্মার শরীর পরিগ্রহই দুঃখ। শাস্ত্র এই সিদ্ধান্ত করেন। শরীর আবার তিনটি—রক্ত মাংসের শরীরটী প্রথম, মনঃ শরীরটি দ্বিতীয় এবং মায়া বা অজ্ঞান শরীরটি তৃতীয়।

যিনি এই ত্রিবিধ শরীরকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ট সিদ্ধ পুরুষ। শরীর বা মন ইহাদের বিকার ত ইঁহাদের আসেই না। যদি কখন আইসে, তাহা হইলে ইঁহারা যেমন ইচ্ছা করেন ব্যাধি সারিয়া যাউক তৎক্ষণাৎ তাহা সারিয়া যায়। ইঁহারা সত্য সঙ্কল্প বলিয়াই ইহা হয়। নিজের পক্ষে যেমন হয়, অপরের পক্ষে ও তাই হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের শক্তির বিকাশ যাহা তাহাতে এই পর্য্যন্ত হয় যে, দেহ বা মনের বিকার হইয়াছে ইহাতে আমার কি? আমি ত চৈতন্য। দেহটা বা মনটা বা মায়াটা জড় মাত্র। জড়ের বিকারে আমার কি? বহুদিন বিচার করিতে করিতে দেহের ক্লেশটাও অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া যায়। ক্লেশ অনুভব হয় সত্য কিন্তু তাহাতে ব্যাকুল করায় না। মনে হয় আমি কর্ম্মের ত্রিভুজাকৃতি দুই বেগের ভিতরে পড়িয়াছি। কিন্তু ইহার ভিতরে আমি দীপ কলিকাকারে দীপ কলিকার মত ও যে দেখায় তাহাও দুই কাটাকাটি কর্ম্ম—ত্রিভুজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছ বলিয়া, যখন আমি কর্ম্ম দ্বারা নিম্নমুখ ত্রিভুজের নীচের দুই বাহু দিয়া প্রবৃত্তি মাঝে ছুটি, আবার উর্দ্ধমুখ ত্রিভুজের উপরের দুই ভুজ দিয়া নিবৃত্তি মার্গে যাই। কর্ম্মের বন্ধনে বাঁধা পড়িলেও আমি বিশেষরূপে ইহা জানি যে, দেহের সহিত বা মনের সহিত বা মায়া বা অজ্ঞান শরীরের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। এইটকু স্থির ধারণা হইলে দুঃখটাকে অগ্রাহ্য করা যায়। চিত্তের অসন্তোষ কিছুতেই হয় না। দুঃখের সঙ্গেও ফষ্টি নষ্টি করা যায়।

এই প্রকারের সাধক কখন দুঃখের প্রতীকার করেন, কখন বা করেন না। যাঁহারা প্রতীকার করেন তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর সাধক। যাঁহারা করেন না তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর। আবার কেহ কেহ নিজে কিছুই করেন না, বা করিতেও ইচ্ছা করেন না। যদি কেহ তাঁহাকে কিছু করিতে বলে তাহাতেও আপত্তি করেন না। কখন কখন ইচ্ছা করিয়া অন্যের উপর ভার দেন—বলেন যাহা হয় কর একটা। তাঁহারা জানেন এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে। ইহা তিনি সাধনা দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন বলিয়া এই সংসারটাকে ফুটবলের মত করিয়া থাকেন।

অধিক আর কি লেখা যাইবে। যে যেখানে আছেন বুঝিয়া লইলেই হয়। ইতি

পরমাত্মতত্ত্বটিই মায়া শক্তি দ্বারা জগৎ বীজরূপে ভাসেন অর্থাৎ মায়া দ্বারাই পরমাত্মা জগৎ রূপে ভাসেন। আবার মায়ার অপগমে আপনি আপনি স্বরূপেই যেমন স্থিতি করিতেছেন তেমনি থাকেন। তাই বলিতেছি জগৎলক্ষ্মী যাহা তাহা চিন্মাত্র, অজ, অনন্ত এবং ইহাই জ্ঞানী সর্ব্বদা অনুভব করেন।

---

১৩ সর্গঃ।

স্বয়ম্ভু উৎপত্তি বর্ণন—হিরণ্যগর্ভরূপী আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহধারী, সমষ্টি জীবের জন্ম।

রাম—জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই বলিতেছেন। তথাপি যে জগৎ দেখা যাইতেছে সেটা রজ্জুতে যেমন সর্প ভাসে সেইরূপে ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্ত হইয়াছেন মাত্র। আবার বলুন ব্রহ্মের জীবভাবে বিবর্ত্ত এবং অন্যান্য সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্ত কিরূপে হইতেছে।

বশিষ্ঠ—নভঃ তেজঃ তমঃ—এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তু উৎপন্নই হয় নাই তথাপি যে আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহার কারণ হইতেছে এই চিদাত্মা এই অধিষ্ঠান-চৈতন্য।

মহাপ্রলয়ে যখন পরমব্রহ্ম আপনি আপনি ভাবে থাকেন তখন তাঁহাতে অবুদ্ধি পূর্ব্বক মায়া ভাসে। সেই মায়াকাশে চিদাত্মা প্রস্ফুরিত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সঙ্কল্পের চলন হইলে ব্রহ্মে একটা ঈক্ষণ জাগে। অনিচ্ছার ইচ্ছা ইহাকেই বলে। ইহাই চেত্যবিষয়িণী কল্পনা অথবা ইহাই ব্রহ্মের সৃষ্টি-বিষয়ক ইচ্ছা বা আলোচনা। এই ইচ্ছার সহিত সংস্রব ঘটিলেই ব্রহ্ম আপন স্বরূপ হইতে বিচ্যুতমত হইয়া জীবভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন। ব্রহ্মের আপনা ভুলিয়া জীবভাব গ্রহণটিও মিথ্যা। ইহাও মায়ার সাহায্যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র। ব্রহ্ম-মায়া-ঈশ্বর বা চিদাত্মা—চেত্যতা প্রথম জীবভাব—এই হইল ক্রম।

প্রথম জীবে বা হিরণ্যগর্ভে আবার অহংকল্পনা। এই অহং ভাবটিই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ আমি মহান্ এই বুদ্ধির প্রকাশ হয়। বুদ্ধি হইতে মননধর্ম্মী মন হয়। মননধর্ম্মী মনের ভিতরে তন্মাত্রার সংস্কার থাকে অর্থাৎ আমি মহান্ এই ভাবের ভিতরে তন্মাত্রাবিশিষ্ট মন

থাকে। মন যখন ভাবনা করেন আমি শব্দতন্মাত্র রূপতন্মাত্র ইত্যাদি তখন ঐগুলি স্পষ্ট হয়; পঞ্চতন্মাত্রার মিলনে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হয়—তাহা হইতেই এই জগৎ।

দেখাগেল মনই ভাবনা বলে আপনাকে স্থূল দেহস্থ মনে করে ও জগৎ দেখে।

রাম—কিরূপে ইহা হয়?

বশিষ্ঠ—স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যেমন অনুৎপন্ন গ্রাম নগরাদি দেখে—অথচ মনই ঐরূপ ধারণ করে মাত্র চিদাত্মাও সেইরূপ মনের সহায়ে জগৎ দর্শন করে। তাই বলা হয় জগৎ স্বপ্নের ন্যায় চিদাকাশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ও লয় হইতেছে।

চিদাত্মাই জগৎ বৃক্ষের অনুপ্ত বীজ। এই বীজ কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা না করিয়াই অঙ্কুরিত হয়। বিশুদ্ধ চৈতন্য কিন্তু নিঃসঙ্গ, তিনি জগদঙ্কুর বর্জ্জিত।

স্থূল জগতের বীজ পঞ্চতন্মাত্রা। তন্মাত্রার বীজ চিৎ। বীজও যেমন কল্পনা ফলও তাই। যাহা বীজ তাহাই ফল। আবার কল্পনা ব্রহ্ম হইতেই যেন উঠিতেছে লয় হইতেছে। এ ভাবেও জগৎ ব্রহ্মময়। "যৎ বীজং তৎ ফলং বিদ্ধি তস্মাৎ ব্রহ্মময়ং জগৎ" ॥ ১০ ॥

মহাপ্রলয়ে চেত্যতাযুক্ত চিৎই শব্দতন্মাত্রা প্রভৃতি কল্পনা করেন, তজ্জন্য তন্মাত্রাসমূহও বাস্তব নহে। কল্পিত তন্মাত্রাই মিলিত হইয়া এই জগৎরূপে দাঁড়াইয়াছে। যাহা কল্পনা তাহা আবার সত্য কিরূপে? পঞ্চতন্মাত্রা যেমন ব্রহ্মে অধ্যাস মাত্র সেই তন্মাত্রা পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতসকলও ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত। সেই জন্য বলা হয় ব্রহ্মই এই জগৎ।

রাম—ব্রহ্মই তবে কারণ ও তিনিই কার্য্য?

বশিষ্ঠ—মায়াবী যেমন নিজেই নিজ মায়িক সৃষ্টি কারণ ও কার্য্য, স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নিজেই নিজ স্বপ্নে সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য সেইরূপ ব্রহ্মই জগৎ বিবর্ত্তের কারণ ও কার্য্য। মৃত্তিকা ও ঘট যেমন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে অভিন্ন ব্রহ্ম ও জগৎও সেইরূপ।

এবং ন জায়তে কিঞ্চিজ্জগজ্জাতং ন লক্ষ্যতে ॥ ১৫ ॥ এইজন্য বলা যায় জগৎনামে কোন কিছু জন্মে নাই, জন্মিতে দেখাও যায় নাই।

স্বপ্নে সঙ্কল্পনির্ম্মিত নগর যেমন সত্য সত্য নাই অথচ স্বপ্নদৃষ্টিকালে আছে সেইরূপ ব্রহ্মে জীবের বা সৃষ্টির অভাব হইলেও অজ্ঞদৃষ্টিতে আছে বলিয়া মনে হয়।

নির্ম্মল আত্মাই আকাশাত্মারূপে যখন উদিত হয়েন তাঁহাকে জীব বলা হয়। জীব যে প্রকারে আপনাকে দেহী বলিয়া মনে করে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ পরমেশ্বরে সমষ্টি জীবাকাশের কল্পনা হয়। সমষ্টি জীবাকাশে জীব সমষ্টিপূর্ণ আকারবিহীন পদার্থ। তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে আমি স্ফুলিঙ্গের মত অল্প—এইরূপ অসংখ্য ভাবনার উদয় হয়। ইহা হইতেই ব্যষ্টিজীবের জন্ম হয়। ক্রমে ঐরূপ ভাবনায় সমষ্টি মধ্যে ব্যষ্টির দর্শন ঘটে।

সেই দৃশ্যরূপী স্ফুলিঙ্গ আপনাকে তারকার ন্যায় অনুভব করেন। তাহাতেই তিনি কথঞ্চিৎ স্থূল হয়েন। তাহাই লিঙ্গদেহ। ক্রমে লিঙ্গদেহ জ্ঞানটি চিত্তকল্পনা-সাহায্যে স্থূলশরীর গ্রহণ করেন। জীব আবার স্থূলদেহে অহংভাবে ভাবিত হয়েন। তবেই হইল তারকার লিঙ্গভাব, কর চরণবিশিষ্ট লিঙ্গ-দেহের কারণ।

স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে আপনাকে পথিকভাবে দেখে, জীবও সেইরূপ আপনাকে শরীরী বলিয়া দেখেন। জীব সর্ব্বগামী হইলেও এই জনপরিচ্ছিন্ন মত।

পর্ব্বত যেমন বাহিরে থাকিয়াও দর্পণমধ্যে আছে বলিয়া মনে হয়, জীবও সেইরূপ সর্ব্বগামী হইয়াও তারকা কোটরে অহং অভিমান করেন বলিয়া শরীর মধ্যেই আছেন বোধ হয়।

স্বপ্নদর্শন যেমন মনের মধ্যেই হয় সেইরূপ স্ফুলিঙ্গতুল্য উপাধিতে অহং আরোপে জীব সেইরূপ ভাবে থাকেন এবং তথায় বাসনাময় দেহাদি অনুভব করেন।

প্রথমে জীব বাসনাময় দেহের ব্যবহার করেন ক্রমে বুদ্ধি মন, ইন্দ্রিয় প্রাণ, চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হয়েন।

"আমি দেখিব" এই ভাবনা হইলে জীবাকাশে ছিদ্রদ্বয় প্রকাশিত হয়। এই দুই ছিদ্রই চক্ষু। ইহাতেই তাঁহার দর্শন লালসা পূর্ণ হয়। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় হয়। যাহা স্পন্দন তাহা বায়ু। চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি তাহার কার্য্য। বাহ্যজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান এই ভাবে ব্রহ্মে অধ্যস্ত। সমস্তই চৈতন্যের

বিবর্ত্ত। এইভাবে ব্রহ্মই প্রথমে আতিবাহিক দেহী অথবা ভাবনাময় দেহধারী পরে স্থূলাকৃতি, পরে সকল স্থূল দর্শনকারী হয়েন।

ব্রহ্মই এইরূপে জীব সাজেন, সাজিয়া বুদ্ধিকল্পিত উপাধির অন্তঃস্থ হইয়া বুদ্ধিকল্পিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন।

আবার চিত্তের বিবর্ত্ত যে আদি জীব তিনি দেশ কাল ভাবনা করিয়া দেশ কাল দ্বারা বদ্ধ হয়েন। বাস্তবিক এ সমস্ত কল্পনা। সেই দেশকালাদিও মূলে অনুৎপন্ন।

সত্যই উৎপন্ন হন নাই তথাপি হিরণ্যগর্ভরূপী বিরাট দেহধারী আতিবাহিক দেহী বা ভাবনাময় দেহী আদ্য প্রজাপতি প্রভু স্বয়ম্ভু এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছেন বলা হয়। ইত্যনুৎপন্ন এবাসৌ স্বয়ম্ভুঃ স্বয়মুত্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ আতিবাহিক দেহাত্মা প্রভুরাদ্য প্রজাপতিঃ ॥ এতস্মিন্নপি সম্পন্নে ব্রহ্মাণ্ডাকারিণী ভ্রমে ॥ ৩৯ ॥

হে রাম! ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই, ইহার দৃশ্যতাও নাই। ন কিঞ্চিদপি সম্পন্নং ন চ জাতং ন দৃশ্যতে ॥ ৪০ ॥

অথচ দেখা যাইতেছে মনে হয়। ইহা সৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও সঙ্কল্প-নগরের ন্যায় অসৎ। ইহা কোন দ্রব্যের দ্বারা নির্ম্মিতও নহে, রঞ্জিতও নহে।

এক এক মহাকল্পে এক এক ব্রহ্মার মুক্তি হয়। পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী ব্রহ্মার সহিত ইঁহার কোন সংস্রব নাই। যে সমস্ত জীব পূর্ব্বকল্পে উপাসনা দ্বারা সিদ্ধ হয়েন, পরকল্পে সেই জীবই ব্রহ্মা হয়েন। পুরাণে দৃষ্ট হয় উপস্থিত কল্পের অবসানে শ্রীহনুমান্ ব্রহ্মা হইবেন।

এই জগৎ ব্রহ্মেরই সত্তামাত্রাত্মক। জগৎস্বপ্ন ভাঙ্গিলেই তিনি আপনি আপনি। তখন এসমস্ত দৃশ্য আর থাকে না।

স্বপ্ন ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন স্মৃতির আকারে অনুভূয়মান হয় সেইরূপ জগৎস্বপ্ন ভাঙ্গিলেও ব্রহ্মসত্তারও স্মৃতি আকারে জগৎ অনুভূয়মান হয়। ফলে তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ সৃষ্টিও পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই নহে।

ভাত্যেবং নাম ব্রহ্মাণ্ডং ব্যোমাত্মৈবাতিনির্ম্মলং।
দৃশ্যমেব মিদং শান্তং স্বাত্মনির্ম্মিত বিভ্রমম্ ॥ ৪৭ ॥

সৃষ্টি নির্ম্মল পরমাকাশে জন্মিয়াছে অথচ জন্মে নাই। এই জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা স্বাত্মনির্ম্মিত বিভ্রম মাত্র। সুতরাং বাস্তবিক জগৎ বলিয়া

কোন কিছুই নাই। যিনি আছেন তিনিই আছেন এখানে দৃশ্য দ্রষ্টাও কিছু নাই। ব্রহ্মা নাই ব্রহ্মাণ্ডও নাই বাদীগণের বিতণ্ডাও নাই।

পরমাকাশমাশূন্যমচ্ছমেব ব্যবস্থিতম্।
সর্ব্ব সংসারতা নাস্তি যদেব তদ্বদবস্থিতম্ ॥৪৯॥
নাধেয়ং তত্র না ধারো ন দৃশ্যং ন চ দ্রষ্টৃতা।
ব্রহ্মাণ্ডং নাস্তি ন ব্রহ্মা ন চ বৈতণ্ডিকা ক্বচিৎ ॥৫০॥
ন জগন্নাপি জগতী শান্তমেবাখিলং স্থিতম্।
ব্রহ্মৈব কচতি স্বচ্ছমিত্থমাত্মাত্মনাত্মনি ॥৫১॥

জলে যেমন আবর্ত্ত সেইরূপ ব্রহ্মেই ব্রহ্মের আবির্ভাব। তত্বজ্ঞান হইলে জগৎ-অন্ধকারের নাশ হয়, তখন আপনি আপনি যিনি আছেন তিনিই আছেন।

হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মার কিরূপে উৎপন্ন তাহা বলা হইল। ফলে হিরণ্যগর্ভও পরমাকাশ পরব্রহ্ম। সার এই জগৎ? পরমব্রহ্মে প্রজাপতি যিনি তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনি আকাশের মত শূন্য। পরমাত্মাই শূন্য প্রজাপতি হইয়া আপনাতে আপনি চমৎকাইতেছেন। এই জগৎ সেই ভাবনাময় শরীরী ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পে জাত; সুতরাং ইহা সঙ্কল্পসদৃশ। ইহা পাঞ্চভৌতিক নহে। সঙ্কল্পমাত্র রূপ তিনি তাই পৃথ্ব্যাদি সং নহে, সত্য নহে। ইহা বিবর্ত্ত মাত্র। ইহা রজ্জুতে সর্প ভাসার মত ভাসিয়াছে মাত্র। অজ্ঞানের নাশে এই অজ্ঞানের কার্য্যরূপ জগং নাশ হয়। তাই বলা হয় জগৎ জন্মে নাই। পৃথ্ব্যাদি তেন ন সদস্তি যথা ন জাতম্ ॥৫৪॥

---

১৪ সর্গঃ।

ব্রহ্ম প্রতিপাদন।

রাম—বরণীয় ভর্গ ব্রহ্মপথে প্রধাবিত হয়েন। ইঁহারই অন্য একটি অবস্থা আছে। সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছাযুক্ত হইয়া যখন ইহা নিম্নমুখে নৃত্য করেন, তখন ইঁহাকে বলে অবরণীয় ভর্গ। মহাপ্রলয়ে শক্তি যখন ঊর্দ্ধমুখে স্পন্দন করিতে করিতে পরমশান্ত চলনরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপুরুষকে স্পর্শ করেন, মহাকালী যখন মহাকালকে স্পর্শ করেন—তখন সকল স্পন্দন থামিয়া যায়।

ইহাই মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে যিনি অবশিষ্ট তিনিই সর্ব্বদা সমভাবে আছেন। জগৎটা সৃষ্ট হয় নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভাসে অজ্ঞানে, ভাসিয়া রজ্জুটাই সর্পরূপে বিবর্ত্ত হয় এই জগৎটা সেইরূপ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে। কারণ সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত যে ব্রহ্ম তাঁহার বিকার হইতেই পারে না।

ব্রহ্মকে জগৎরূপে বিবর্ত্ত করা মায়ার কার্য্য। মায়াই পরম শান্ত ব্রহ্মের উপরে যেন একটা বিচিত্র ইন্দ্রজাল তুলিয়া এই বিচিত্র সৃষ্টি ভাসাইয়াছে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে মায়া কি তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় "আপনি আপনি ভাবে স্থিতির নাম জ্ঞান"। "আপনি আপনিই আছি" এই জ্ঞানের সহিত "আর কিছুই নাই" এই "অভাব জ্ঞান" বা অজ্ঞানটাও যেন আছে। জ্ঞানের অভাব যাহা তাহাই না অজ্ঞান? "আপনি আপনিই আছি" ইহার অভাব ত কখন হয় না—তবে অজ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? সেই জন্যই ত বলা হয় অজ্ঞানটাও যেন আছে। "আর কিছুই নাই" এই যে অজ্ঞানমত একটা কিছু—ইহা না থাকিয়াও যেন আছে। তাই যখন জিজ্ঞাসা করা যায় অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? উত্তরে বলা হয় ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানং অনাদ্যং অনির্ব্বচনীয়ম্। অজ্ঞানাৎ অবিবেকো জায়তে। অবিবেকাৎ অভিমানো জায়তে। অভিমানাৎ রাগাদয়ো জায়ন্তে। রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। শরীরপরিগ্রহাৎ দুঃখং জায়তে। জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার শরীরপরিগ্রহই দুঃখ। আত্মার অজ্ঞানপরিগ্রহই কারণ শরীরপরিগ্রহ। তাহার পরে ভাবনাময়, সঙ্কল্পময়, আতিবাহিক শরীরপরিগ্রহই ইঁহার সূক্ষ্ম শরীরপরিগ্রহ। তাহার পরে স্থূল শরীর পরিগ্রহ করিয়া ইনি সমষ্টি-ভাবে বিরাট আর ব্যষ্টিভাবে দেহী জীব।

পূর্ব্বে বলা হইল "অন্য কিছুই নাই" রূপ-অজ্ঞানতা যেন জ্ঞানের সহিত জড়িত। "অন্য কিছুই নাই" এই অভাব জ্ঞানটার স্ফুরণ যখন হয়, যখন এইটাতে আত্মার দৃষ্টি যেন পড়ে তখন একটা উল্লাস হয়। স্বপ্রকাশ পূর্ণজ্যোতি দ্বারা এই অভাব জ্ঞানটাও যেন ভাবরূপে পরিণত হয়। তখন হয় "স্বয়মন্যইবোল্লসন্"। আপনি আপনিই আছি—আমি যেন আর কিছু এই উল্লাস। যিনি আছেন তিনিই আছেন। "আর কিছুই নাই" ইহাকে "আমিই আর কিছু" ভাবনা করাই অজ্ঞানের প্রথম পুষ্টি। "আমি আর কিছু" ভাবনায়

যে উল্লাস তাহা হইতেই শোভনাধ্যাস। "আপনি আপনি যাহা" তাহাই তত্ত্বতঃ সুন্দর। উহা ছাড়িয়া "আমি আর কিছু" ইহাকে সুন্দর দেখাই শোভনাধ্যাস। শোভনাধ্যাসটিই সঙ্কল্প। যাহা সুন্দর নহে তাহাকে সুন্দর ভাবনা করা—তাহাতে সুন্দর আরোপ করা—ইহার নাম শোভনাধ্যাস। "আমি আর কিছু," এই "আর কিছু" রূপ "আমিই" সুন্দর ইহাই শোভনাধ্যাস।

যাহা অননুভূত তাহার নাম সঙ্কল্প। আবার অনুভূতের স্মরণটিই স্মৃতি। "আমার ইহা হউক" এই ভাবে অনাত্মবিষয়ের প্রতি অনুধাবন যাহা তাহাই কল্পনা।

এই ভাবে আমি জ্ঞাতা এই অভিমান জন্মে। অভিমানবশে জ্ঞান, অহংকারে বিবর্ত্তিত হয়। এই অহংকার দুই প্রকার। বিশেষ ও সামান্য। জীব ভাবে—

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রামিত্রমরাতয়ো বসুবলং বিদ্যাসুহৃদ্বান্ধবাঃ।
চিত্তস্পন্দিত কল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি॥

অবিদ্যাময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আত্মার পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ যে স্বপ্ন ইহার নাম বিশেষ অভিমান—ব্যক্ত অভিমান। ইহাই ব্যষ্টি অহংকার। নির্ম্মল সুনীল ব্যোমসত্তাতে যখন বহুখণ্ডে খণ্ডিত মেঘ ভাসে তখন নীল আকাশ এক থাকিয়াও যেমন বহুরূপে ভাসে জীবও তাই। ইহা কিন্তু চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। যখন কোন সাধক এইগুলি লোপ করিতে পারেন তখন "আমার কেহ নাই" "আমিও কাহারও নই" এই ভাবে চিত্তস্পন্দন কল্পনা থামিয়া যায়। চিত্তস্পন্দন কল্পনা থামিয়া গেলে মেঘশূন্য ব্যোমের মত "আমি আছি" এইরূপ সামান্য অভিমান থাকে। "আমি আছি" রূপ যে সামান্য অভিমান তাহাকে বলে সমষ্টি অহংকার। বিশেষ ও সামান্য অহংকার গুটাইয়া লইলেও, অভিমানশূন্য স্পন্দনরহিত সীমাশূন্য যিনি ভাসেন তিনিই মহৎ। ইনিই হিরণ্যগর্ভ। ইনিই আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা। ইঁহাকেই আকাশজ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। ইনিই মহামন এই মহামনই প্রথমে বহির্বিষয় রূপে, পরে বহির্মনোরূপে, পরে বহির্বাগিন্দ্রিয় রূপে ব্যক্ত হয়েন। তাই শ্রুতি বলেনঃ—

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানং নিযচ্ছেন্মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্য হইতে মনে, মন হইতে জ্ঞান আত্মায় (বিচার বুদ্ধিতে) জ্ঞান-আত্মা হইতে মহতে মহৎ হইতে শান্ত আত্মায় গমন করিবেন। ইহার জন্য গবাদি পশুর ন্যায় বাঙ্‌নিরোধ প্রথমা ভূমিকা; বালক ও মুগ্ধের ন্যায় কিছুই মনে না রাখা দ্বিতীয়া ভূমিকা; তন্দ্রাকালে অহংকারশূন্য অবস্থার ন্যায় অহংকার রহিত ভাব তৃতীয়া ভূমিকা এবং সুষুপ্তিতে মহত্তত্ত্ব রহিত ভাব চতুর্থী ভূমিকা— ধীরে ধীরে এই চার ভূমিকা পার হইয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে হয়।

আমি কি ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছি ?

বশিষ্ঠ—তোমার ধারণা ঠিক। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর কি বলিবে বল ?

রাম—তাই বলিতেছিলাম সত্যসত্যই ব্রহ্ম-রজ্জুর উপরে জগৎ-সর্প ভাসে নাই। কিন্তু অজ্ঞান দেখাইতেছে যেন ভাসিয়াছে। কিরূপে ভাসিয়াছে এবং কিরূপে এই মিথ্যা জগৎ ব্রহ্মসত্তামাত্রাত্মক তাহা ১২ ও ১৩ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। এই উৎপত্তি প্রকরণের ১ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—

বাগ্‌ভাতির্ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভাতিস্বপ্ন ইবাত্মনি—
যদিদং তৎ স্বশব্দোথৈর্যো যৎ বেত্তি স বেত্তি তৎ ॥

জীব-ব্রহ্মই বাগ্‌ভাতির্মহাবাক্যজাখণ্ডাকারবৃত্তীদ্ধ স্বপ্রকাশৈর্ব্রহ্মবিৎ স্ব তত্ত্বং সাক্ষাৎকৃতবৎ সৎ ভাতি পারমার্থিক নিত্যমুক্তস্বরূপেণ প্রকাশতে। জীব-ব্রহ্মই বাগ্‌ভাতে—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজনিত অখণ্ডাকার বৃত্তি-প্রজ্বলিত সপ্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মবিৎ হইয়া—স্বতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া আপন পারমার্থিক নিত্য মুক্ত পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। যতো যদিদং বিয়দাদি চ দৃশ্যং ধঞ্জরূপং আত্মনি প্রত্যগাত্মভূতে ব্রহ্মণ্যেব স্বপ্ন ইবাবিভূর্তং ভবতি।

কারণ এই দেহ ইন্দ্রিয় আকাশাদি যে দৃশ্য প্রপঞ্চ তাহাই বন্ধন। এই দৃশ্য-বন্ধন স্বপ্নের ন্যায় আত্মাতে ভাসিয়াছে মাত্র।

তৎ ব্রহ্ম যোঽধিকারী স্বশব্দোত্থৈঃ শ্রবণাদ্যুপায়ৈর্যৎ যাদৃশং তত্ত্বতস্তথা বেত্তি অহমেব ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকরোতি স তৎপ্রাগুক্তং পূর্ণনিত্যমুক্ত ব্রহ্মভাবরূপং মোক্ষফলমপি বেত্তি জীবন্নেব সাক্ষাদনুভবতি।

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] কার্ত্তিক ১৩২১ সাল। [৭ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১০নং শম্ভু চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "নিউ আর্য্যমিশন যন্ত্রে"

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

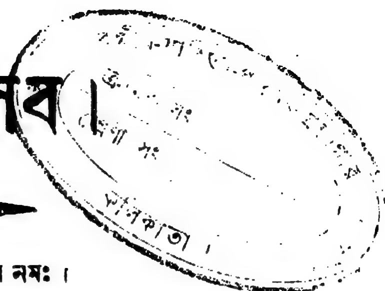
২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী এই নামে উৎসব আফিস, ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২॥০, সিকি পৃষ্ঠা ১॥০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

গায়ত্রী—পূজা—ধ্যান—প্রাপ্তি।

(১)

পূজার প্রাণ হইতেছে ধ্যান। ধ্যান করিতে পারিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

সবাই কি ধ্যান করিতে পারে?

পারে, যদি তাঁহাকে অন্ততঃ বিশ্বাসেও জানে। যদি বিশ্বাসেও 'বিগ্রহে' হয়।

ধ্যান করিতে গেলে তবে বিশ্বাসেও জানা চাই।

নিশ্চয়ই। নতুবা ধ্যান হইবে কার? যাহাকে বিশ্বাসেও জানি না তাহার ধ্যান হইতেই পারে না। পটের ছবি, ধাতু পাষাণের ঠাকুর—যদি ঠাকুর বলিয়া না জানা থাকে—তবে শুধুই পট, আর শুধুই ধাতু, শুধুই পাষাণ। ইহারাই ঠাকুর যাহারা ভাবে তাহারা গোখর—এ কথা শ্রীভাগবতের। কিন্তু যিনি ঠাকুর তিনিই ইনি, ইহাই ঠিক। এজন্য জানা চাই, তবে ধ্যান, পরে প্রাপ্তি। প্রকৃত জানাটি যাহা তাহা অনুভবে জানা; আর অনুভবে জানা

যেখানে না ও হয় সেখানে বিশ্বাসে জানাতেও হইতে পারে। বিশ্বাসে জানাটিই জানার শেষ অবস্থা নহে। বিশ্বাসের জানাটি যখন অনুভবের জানায় পৌঁছিয়া দেয়, বিশ্বাসটি যখন প্রত্যক্ষে পরিণত হয় তখন জানাটি ঠিক হয়।

(২)

এস এস আমরা ধ্যান করি। হে চক্ষু, হে কর্ণ, হে বাক্, হে পাণি, হে মন—এক কথায় হে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়, এস আমরা ধ্যান করি।

চক্ষু কর্ণ বাক্য ইহারা কি মানুষ যে বলা হইতেছে এস আমরা ধ্যান করি?

হাঁ—ইহারা মানুষ বৈ কি। ইহারা মানুষের ভিতর মানুষ। ইহারা ব্যষ্টি মানুষ। এই ব্যষ্টি মানুষগুলি লইয়াই তুমি আমি সমষ্টি মানুষ। শ্রুতি যে বলেন

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

ব্রহ্মা মরীচি ইত্যাদি দেবতা সেই সর্ব্বব্যাপী পরম-পদকে সর্ব্বদা দর্শন করেন—যে সমস্ত দেবতা ব্রহ্মাণ্ড দেহে সেই সমস্ত দেবতাই মানুষ দেহে অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে বিরাজিত। শ্রুতি সর্ব্বত্রই এই সমস্ত দেবতাদিগের কথা বলেন। জাগ্রৎকালে এই সমস্ত দেবতা আমাদের দেহে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাই শুনিতে পারি চলিতে ফিরিতে পারি। আবার স্বপ্নকালে এই সমস্ত দেবতা দেহ ছাড়িয়া যান বলিয়া কোন ইন্দ্রিয় তখন কার্য্য করিতে পারে না। ইঁহারা ছাড়িয়া যান কিন্তু প্রাণ দেবতার উপর দেহ রক্ষার ভার থাকে বলিয়া দেহটা মরিয়া যায় না। আবার মৃত্যুকালে যখন সমস্ত দেবতা দেহটা ত্যাগ করেন তখন জীবের বড় একটা দুঃসময় আইসে।

এই জীব কে?

সীমাশূন্য সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপুরুষে মায়া ভাসিলে যেমন তিনি আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও বিরাট বিশ্বরূপ পুরুষরূপে ভাসেন সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ বিরাট বিশ্বপুরুষে অবিদ্যা ভাসিলে তিনিই অনন্তজীবরূপে যেন পৃথক সত্তা লাভ করেন। অথচ বিরাটপুরুষ যিনি তিনি ব্রহ্মই।

সীমাশূন্য যিনি তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবরূপে ভাসেন। একটি সীমাশূন্য সুনীল আকাশের উপর বহু খণ্ডে খণ্ডিত মেঘ সমূহ ভাসিলে সেই খণ্ড খণ্ড মেঘ

সমুদ্রের তলে তলে খণ্ড খণ্ড সুনীল আকাশ যেমন ভাসে অথচ আকাশ যাহা তাহাই থাকে ইহাও সেইরূপ।

সূর্য্য এত বড় যে পৃথিবীর উপরে পড়িয়া গেলে পৃথিবীতে ইহার স্থান হয় না অথচ পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতেই এই এক সূর্য্যকে সকল দেশের সকল লোকে এক অতি ক্ষুদ্র তেজোময় গোলক মাত্র দেখে। ইহাও যেমন, পরিপূর্ণ সীমাশূন্য ব্রহ্মকে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি রূপ দুই কর্ত্তিত কর্ম্ম—ত্রিভুজ মধ্যে দেখিলে ইনিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ভাবে ভাসিয়া থাকেন।

এখন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বল।

ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি মাত্র। যেখানে শক্তির স্ফুরণ হয় সেই খানেই শক্তির কোলে কোলে যে চৈতন্য থাকেন তাহা পৃথক্ পৃথক্ সত্তা লাভ করেন। আবার ইহাও জানিও যে কোন ও শক্তি যন্ত্র না হইলে ব্যক্তাবস্থায় আসিতে পারে না। এই চক্ষুগোলক রূপ যন্ত্রে যখন চক্ষুশক্তি স্ফুরিত হয় তখন সেই শক্তির কোলে কোলে যে চৈতন্য থাকেন তিনিও পৃথক মানুষের মত একজন হয়েন। সকল শক্তিই এইরূপে এক একটী জীবন্ত জীবের মত হয়েন। এই ব্যষ্টি চৈতন্যগুলির সমষ্টি যিনি তিনিই এই দেহাধিষ্ঠাতৃ জীব অথচ তিনি ইহা অপেক্ষাও বেশী।

বুঝিলে কেন বলা হয় হে আমার চক্ষু, হে আমার ইন্দ্রিয়, এস আমরা ধ্যান করি?

ইন্দ্রিয় গুলিকে যিনি ধ্যানার্থ আহ্বান করেন তিনি কে?

যিনি সমষ্টি, তিনি, যাহাদের লইয়া সমষ্টি, সেই ব্যষ্টিগুলিকেই আহ্বান করিয়া বলেন এস আমরা ধ্যান করি।

কেহ কেহ যে বলেন নিবৃত্তিমন প্রবৃত্তি মনকে ডাকে ইহা কি?

শাস্ত্র চেতনকে লইয়া সব কথা কন। প্রবৃত্তিমন ও নিবৃত্তিমন ইহারা কিছুই নহে। ইহাদের তলার চৈতন্য ধরিলেই কোন গোল নাই। এখানে চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে।

যখন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া সন্ধ্যাপূজা করিতে যাও তখন প্রথমেই একবার বল দেখি এস আমরা ধ্যান করি। ভাল করিয়া তখন দেখ কাহাদের উপর লক্ষ্য পড়ে। যে মন, যে ইন্দ্রিয়, সতত চঞ্চল হইয়া বিষয় পথে ছুটিতেছে, যাহাদের অশান্ত ব্যবহারে তুমি ব্যথিত, যাহাদের পাপে তুমি সদা

তাপিত, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহের রাজা মনকে যখন তুমি আহ্বান কর, করিয়া বল এস আমরা ধ্যান করি তখন বেশ করিয়া লক্ষ্যকর ইন্দ্রিয় এবং মন ইহাদের কি অবস্থা হয়! তুমি ডাকিতেছ ধ্যান করিতে, সমষ্টি ডাকিতেছে ধ্যান করিতে অথচ মন যদি অসম্বদ্ধ প্রলাপ তুলিয়া সমষ্টির কথা না শুনিতে চায় তবে সমষ্টি সেই ব্যষ্টিকে নানাপ্রকার উপদেশ করিবেন; তাহাদ্বারা যে যে পাপ হইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবেন, যে যে তাপে তাহারা তাপিত তাহা চক্ষের সম্মুখে ধরিবেন, যত যত দুঃখ পাইয়াছে তাহা মনে করিয়া দিবেন, শ্মশান বহ্নির ভীষণ আলো মনের সম্মুখে জ্বালিয়া দিবেন, সংসারে কিছুই যে মনোহর নাই, সবই যে ক্ষণিক, সবই যে অনিত্য, সবই যে অল্প, অল্পেতে সুখ নাই; যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি—সমষ্টি পুরুষ যখন ব্যষ্টি সমূহকে এইরূপে মনে করাইয়া দেন তখন ব্যষ্টিগুলি কি আর সমষ্টির কথা না শুনিয়া থাকিতে পারে? তার পরে সমষ্টি যখন ভালবাসিয়া বলেন দেখ তোমাদের অস্তিত্ব যাহা তাহাত আমাকে লইয়াই। আমি যে তোমরাই। একতাই সুখ একতাই স্বর্গ। একতা না হইলেই দুঃখ। আমরা যখন সবাই মিলিয়া এক হইয়া থাকি তখন কি যে কি অপূর্ব্ব অবস্থা হয় তাহা পরে বলিতেছি কিন্তু তোমরা যখন আমার সঙ্গে "ভিন্ন" হও, তোমরা যখন আমার সংসার হইতে, সমষ্টি আমি হইতে পৃথক্ হইয়া আপন আপন পৃথক্ সত্তা স্থাপনে চেষ্টা কর তখন কি হয় জান? তখন সমষ্টিই ব্যষ্টির মৃত্যু কল্পনা করেন। ইচ্ছা না থাকিলেও মৃত্যু কল্পনা হইয়া যায়। শালভঞ্জিকাতে খোদিত কোটি কোটি পুতুল লইয়াই শালভঞ্জিকা। কিন্তু পুতুল গুলি যখন আপনাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ভাবনা করে তখন শালভঞ্জিকা দ্বারা তাহাদের মৃত্যু কল্পনা হইয়া যায়।

সমষ্টি এই ভাবে বুঝাইয়া দিলে মন আপনার পাপ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যথিত হয়, বড়ই কাতর হয় তখন মনের বৈরাগ্য আইসে। বৈরাগ্য আসিলেই মন ধ্যান করিবার উপযুক্ত হয়।

কখন বা সমষ্টি ব্যষ্টিকে তিরস্কার করেন পরে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ প্রদান করেন তবে মন ধ্যান করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তাই বলা হইতেছিল জানা আগে চাই তবে ধ্যানের পথে আসা যায়। বিগ্রহে অগ্রে না হইলে ধীবহি হইতেই পারে না।

বল বল আমরা প্রস্তুত ত হইয়াছি এখন কিরূপে ধ্যান করি ?

বাহিরের সূর্য্য যেমন সর্ব্বলোকলোচনের সর্ব্বদা ধ্যানে পাইবার বস্তু, সেইরূপ আমরা সকলে হৃদয় আকাশে মিলিলেই, সকল ইন্দ্রিয় গুলির মুখ মনের সহিত দহর আকাশের দিকে ঘুরাইয়া দিতে পারিলেই—সমস্ত দেবতার শক্তিগুলি মিলিত হইয়া এক মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশ হয়েন। তাহাই বরণীয় ভর্গের মূর্ত্তি। যতদিন সেই মূর্ত্তির দর্শন না পাও, যতদিন না বরণীয় ভর্গ, মূর্ত্তি ধরিয়া, হৃদয় কমলে শ্রীপদ স্থাপন করিয়া দাঁড়ান ততদিন আমাদের ঠিক ঠিক একতা হয় নাই জানিও।

কি করিয়া ইন্দ্রিয় শক্তি গুলি হৃদয় আকাশে মিলিবে ?

ব্যষ্টি থাকিও না। সমষ্টি হও। সকলে মিলিত হইলে তবে ত সমষ্টি হইবে। যতদিন যথার্থ মিলিন না হইতেছে ততদিন কৌশল করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম-কৌশলও যোগ বটে। অনুভবে না আসা পর্য্যন্ত বিশ্বাসে কার্য্য করিতে হইবে।

কিরূপ ?

ষট্চক্রের দ্বাদশদল পদ্ম যেখানে তাহার নীচেই অষ্টদল হৃদয়-পদ্ম। এই পদ্মের কর্ণিকায় উর্দ্ধনিম্নমুখে দুই ত্রিভুজ কাটাকাট ভাবে রহিয়াছে। সেই কাটাকাটিতে যে ষড়্ভুজ জন্মে তাহার মধ্যে ত্রিকোণমণ্ডল। সেই মণ্ডলের ভিতরে দৃষ্টি স্থাপন করিলে বাহিরের আকাশের সূর্য্যকে ভিতরের হৃদয় আকাশে দেখা যায়। এইটি হইতেছে ব্যষ্টিশক্তিগুলির মিলনের স্থান। সবাই ঐখানে সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা কর। ইহাই ধারণাভ্যাস। যতদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে না পার ততদিন বাহিরে সূর্য্য দেখিয়া ভাবনা কর যে হৃদয় আকাশেও সূর্য্য আছেন। এই সূর্য্যমণ্ডলটি হইতেছে উপাসনার পীঠ স্থান। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যেই বরণীয় ভর্গের মূর্ত্তি দেখা যাইবে। সেই মূর্ত্তিই তোমার ইষ্টদেবতা। যতদিন না প্রত্যক্ষ করিতেছ ততদিন ভিতরের সূর্য্যমণ্ডলে ইষ্টমন্ত্র স্থাপন কর।

চক্ষুশক্তিকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া সূর্য্যজ্যোতি মধ্যে নাম দেখাও আর কর্ণশক্তিকে ভিতর আকাশে সূর্য্যজ্যোতি মধ্যে, মুখে যে নাম উচ্চারণ করিতেছ ভিতরে তাহাই শ্রবণ করাও—নাসিকাশক্তিকে জ্যোতির্ম্মধ্যবর্ত্তী ইষ্টদেবতার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করাও। এইরূপে জিহ্বা, ত্বক্, ইত্যাদি শক্তিগুলিকে তাঁহার

ভুক্তরস আস্বাদন করাও, তাঁহার স্পর্শরস ভোগ করাও বাক্ পাণি, পাদ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়কে সেইখানে কর্ম্ম দিয়া দাও—ভক্তগণে সীতারামের লীলা চিন্তা বা রাধাকৃষ্ণের লীলা চিন্তা যে ভাবে করেন এইখানে সেই ভাব আন তবেই সকল ইন্দ্রিয়গুলি একসঙ্গে মিলিত হইল। ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরে আসিলেই ইহারা পৃথক সত্তা স্থাপন করে কিন্তু অন্তর্ম্মুখ হইলেই ইহারা একসঙ্গে মিলিত হয়। হইলেই বরণীয় ভর্গ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন।

এইরূপে আমাদের একতা হইলেই আমরা ধ্যানের বস্তু পাই। পুস্তকে পড়িয়া কোন কর্ম্ম করিতে নাই। এইজন্য গুরু চাই। শ্রীগুরুর নিকটে থাকিয়া শিক্ষা করা চাই, অভ্যাস করা চাই, তবে হয়।

এস এস আমরা ধ্যান করি। ধ্যান করিবে কাহাকে? যদি জিজ্ঞাসা কর বলিব, যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত সর্ব্বদা বিদ্যমান—সেই পুরুষের বরণীয় ভর্গকে। এই বরণীয় ভর্গই সকল সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা। কুলদেবতা, কুলমন্ত্র, কুলগুরু ঠিক থাকিলে সহজেই সাধনা হয়।

ধ্যান জন্য জানা চাই—এই জানার কথা ত কিছুই বলিলে না? প্রকৃত জানার জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম চাই তাহার আভাস দেওয়া হইল মাত্র। শত শত পুস্তক পাঠে প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ দর্শন অনুভূতি সাপেক্ষ।

লোকে যে বলে পুতুল পূজা করিলে কি হইবে, মেডিটেশন কর তবে হইবে।

পাগল আর কি? মেডিটেশন ফেডিটেশন যে বল, বল দেখি মেডিটেশন করে কে? মন তোমার শত বাসনায় সদা চঞ্চল। আগে বাপু চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম কর। এই কর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্মও বটে এবং অন্য সমস্ত লৌকিক কর্ম্মও বটে। আগে চিত্ত শুদ্ধ হউক—চিত্ত হইতে রাগদ্বেষাদি ময়লা কাটিয়া যাউক তবে ধ্যানের কথা মুখে আনিও। দেখিতেছ না কত লোক ত আজকালকার দিনে মেডিটেশন করে, কিন্তু একটু স্বার্থে আঘাত দিয়া দেখ দেখি—যাহাতে একটু অর্থের উপর আঘাত পড়ে এমন কিছু হউক দেখি একবারে সব মেডিটেশন, ফেডিটেশন হইয়া যাইবে। তখন কত রাগ আর কত মনে মনে অর্থনাশ চিন্তা। হায় রে! মেডিটেশন! এত ফলাকাঙ্খা, এত অহংকর্ত্তা অভিমান থাকিতে থাকিতে কি ধ্যান হয় বাপু! নিত্যকর্ম্মাদি না করিয়া যে মেডিটেশন কর তাহাতে কতকগুলা চিন্তা হয়। সে চিন্তায় তুমি বই লিখিতে পার—তুমি প্রবন্ধ লিখিতে পার, কবিতা লিখিতে পার কিন্তু

তাহা কতক্ষণ থাকে বল ? খুব মেডিটেশন করিয়া উঠিয়া আসিলে—আসিয়াই দেখিলে স্ত্রী একটা সামান্ত বিষয়ের জন্য—সামান্য দুই চারি আনার এদিক ওদিক্ জন্য বাড়ীর অন্য লোকের উপর চটিয়াছেন। তুমি উঠিবা মাত্র যখন তিনি ক্রোধোন্মত্তা হইয়া তোমাকে সব কথা "লাগাইলেন" তখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিও তোমার মেডিটেশনের জোর কতটুকু। কিন্তু অন্য পক্ষে প্রতিদিন বৈরাগ্য অভ্যাসে যখন মনকে কাতর করাও, করিয়া সংসার ক্ষণস্থায়ী ইহা বেশ করিয়া ধারণা কর, প্রতিকার্য্যে ইহা স্মরণ করিয়া নিত্যকর্ম্মগুলি কোন অঙ্গভঙ্গ না করিয়া কোন প্রকার ফাঁকি না দিয়া কর, তপস্যার প্রধান অঙ্গ যে প্রাণায়াম, কুম্ভক এইগুলিকে একবারে বাদ না দিয়া ঠিক শাস্ত্র মত, প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যামত প্রাণায়ামাদি করিয়া নিত্য কর্ম্ম শেষ কর, করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নিজের ইন্দ্রিয় গুলিকে হৃদয়ের রাজার দিকে ফিরাও—ফিরাইয়া সব শান্ত করিয়া পরে তুমি চেতন তুমি জড় নও, তুমি নিঃসঙ্গ পুরুষ কাহারও সঙ্গে তোমার সঙ্গ হয় না—তুমি সত্যই "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" এইগুলি চিন্তা কর—করিয়া দেখ বুঝিবে সংসারের শত কোলাহলেও তোমার মন অশান্ত হইবে না। অন্ততঃ বহুক্ষণ ধরিয়া তুমি তোমার সন্ধ্যাবন্দনাদির প্রবাহে ডুবিয়া থাকিতে পারিবে। তাই বলা হইতেছিল আগে চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম কর পরে ধ্যানের কথা মুখে আনিও।

আমি দেখিতেছি চিত্তশুদ্ধিই নিতান্ত আবশ্যক। নিশ্চয়ই। সেইজন্য কর্ম্ম আবশ্যক। রূপ আবশ্যক। গুণ আবশ্যক। স্বরূপ চিন্তা বা প্রকৃত ধ্যান তাহার পর।

তুমি কি বলিতে চাও কর্ম্ম দ্বারা ধ্যানের পথে যাওয়া যায়, পরে রূপ ও গুণের ধ্যান পরে স্বরূপ চিন্তা ?

হাঁ। সর্ব্ব প্রথমে কর্ম্ম যেরূপে করা উচিত তাহাই অভ্যাস কর। শাস্ত্র এই জন্য নিষ্কাম ভাবে বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম করিতেই প্রথম উপদেশ করেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এখন শিথিল হইয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাহা আছে তাহা দ্বারাও তোমার কার্য্য হইবে। পুরুষের সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম এবং লৌকিক কর্ম্ম সমস্ত, নিষ্কাম ভাবে হওয়া চাই। সধবা ও বিধবাদেরও তিন বেলা জপ পূজাদি এবং স্বামীভক্তি, স্বজন সেবা, দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথি সেবা এই সমস্তও নিষ্কাম ভাবে হওয়া চাও। কর্ম্মগুলি নিষ্কাম ভাবে করিবার জন্য

বিশ্বাসে যতটুকু জানা আবশ্যক তাহাই প্রথমে বিগ্রহের অন্তর্ভূত কর। পরে বিশ্বাসের জানা যখন অনুভব সীমায় আসিতে থাকিবে তখন রূপ ও গুণ ধ্যানে আইস। শেষে স্বরূপের ধীমহি কর। ঠিক হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতরে কি এই সমস্তের বীজ আছে? আছে। নিষ্কাম কর্ম্মের তিনটি অঙ্গ।

(১) বিশ্বাসে তোমাকে জানিয়া তোমার প্রসন্নতা অনুভব জন্য তোমার আজ্ঞা পালন রূপ কর্ম্ম।

(২) কোন কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখা নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বিতীয় অঙ্গ। তোমার প্রসন্নতা অনুভব জন্য তোমার আজ্ঞাপালন করি, ফল কি হইল না হইল তাহার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখি না। রস পাই বা না পাই তাহার জন্য আদৌ ব্যাকুল হই না। কর্ম্ম তোমার দিকে চাহিয়া করিতে পারিলেই চিত্ত প্রসন্ন হইবেই। এইরূপে নিজের চিত্তের প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তোমার প্রসন্নতার অনুভব হইতেছে। সঙ্কীর্ত্তনে নাম করিয়া আসিয়া অথবা সাধু সঙ্গ করিয়া আসিয়া একবার একান্তে বসিয়া নাম করিয়া দেখিতে হয় কতদূর কি হইতেছে। এইরূপ করিলে সাধুসঙ্গ লব্ধভাব বা সঙ্কীর্ত্তন লব্ধ ভাব নিজের আত্মায় প্রবেশ করিয়া আত্মার রমণীয় ভাবগুলিকে জাগাইবে এবং তাহাদিগকে প্রবল করিবে। সুন্দর গুণগুলির স্ফুরণ তখন হইবে এবং রাগ দ্বেষাদি মলগুলি অধোমুখ হইয়া যাইবে। নিত্য অভ্যাস করায় চিত্তশুদ্ধ হইয়া ভগবৎপ্রসন্নতা অনুভব দ্বারা হৃদয় ভগবৎ রসে পূর্ণ হইতে থাকিবে। ইহাতে যে গ্লানিশূন্য আনন্দ তাহাকেই জানিও ভগবানের স্পর্শ।

(৩) নিষ্কাম কর্ম্মের তৃতীয় অঙ্গ অহংকর্ত্তা অহং অভিমান শূন্য হইয়া নিত্যকর্ম্ম ও লৌকিক কর্ম্ম করা। এখানে যে বিচার আছে তাহাই সাধকের সর্ব্বস্ব। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায়, ভক্তির কার্য্যই কর বা যোগের কার্য্যই কর বা লোকহিতকর কর্ম্মই কর যখন বিচার করিতে পারিবে কর্ম্ম করেন প্রকৃতি, চেতন পুরুষ কিছুই করেন না, যখন বিচার করিতে পারিবে প্রকৃতির মধ্যে যে নিবৃত্ত মন আছেন তিনিই প্রবৃত্ত মনকে উপদেশ করেন এবং তিনিই কর্ম্ম করান, আত্মপুরুষ দ্রষ্টা মাত্র—তিনি কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না তিনি সদা শান্ত সদা আনন্দময়, তুমি প্রকৃতিতে অভিমান না করিয়া যখন চেতন পুরুষে অভিমান করিতে পারিবে যখন সর্ব্বদাই মনে করিতে পারিবে প্রকৃতি তুমি নও

কাজেই প্রকৃতির সুখ দুঃখ তোমাতে নাই, তুমি স্থূলদেহ নও, তোমার মন বা সূক্ষ্ম দেহও তুমি নও, অজ্ঞান দেহও তোমার নাই, তখন তুমি সর্ব্বদা আপন আনন্দ স্বরূপে থাকিতে পারিবে। মিথ্যাকে মিথ্যাজানিয়া ব্যবহারিককর্ম্ম করিতে পারিবে।

ইহার পরে তুমি বাসনা ত্যাগ করিবার পথে যাইতে পারিবে। দেখনা কেন বাসনাই ত প্রকৃত বন্ধন। তুমি জন্মিয়াছ, তুমি মরিবে, তুমি বালক ছিলে, তুমি যুবা হইয়াছ, তুমি যুবতী হইয়াছ—তোমার ছেলে মেয়ে সংসার এই সমস্তই বাসনা। চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ। স্বরূপ চিন্তায় যখন নিজে অসঙ্গ ইহা বুঝিবে তখন বাসনা ত্যাগ হইবে, তখন পরমানন্দে স্থিতিলাভ হইবে।

ধীমহির জন্য বিশ্বাসে যে জানা সেইটুকুই আমার ধরা কর্ত্তব্য। তুমি অতি সংক্ষেপে আমাকে এই জানাটুকুর কথা আবার বল।

যাহাকে ডাকিতে যাইতেছ প্রথমে তিনিই সমস্ত এইটি বিশ্বাস কর। হৃদয় পদ্মে যাঁহাকে দেখিতে চাও, সেই জন্য বিশ্বাসে যাঁহাকে হৃদ্‌পদ্মে সূর্য্যমণ্ডলে দাঁড় করাইতে চাও, তিনিই সমস্ত সাজিয়া রহিয়াছেন। এই যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে, ইহা তিনিই। শত্রু মিত্র, পশু পক্ষী, পর্ব্বত আকাশ, নদী সমুদ্র, দেহ মন সবই তিনি। এই যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে সবই তাঁহার কার্য্য। তিনি পৃথিবীর ভার লাঘব জন্য আপনার দুষ্টঅঙ্গ আপনি ছেদন করিতেছেন। পালাইবে কোথায়? তিনিই যে তোমায় তাড়া করিতেছেন। তিনি সর্ব্বেশ্বর তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার কোপ হইতে কোথায় পালাইবে? নিজের কর্ত্তব্য কর। যাহা তাঁহার ইচ্ছায় ভাল তাহাই হইবে।

সব তিনি ইহাই জানার প্রথম অংশ। ইহাই কিন্তু শেষ নহে। যতদিন সব বলিয়া কোন কিছু তোমার জ্ঞান আছে ততদিন সবই তিনি করিয়া ফেল। কিন্তু খাঁটি এই জানিও সব বলিয়া কিছুই নাই। তিনিই আছেন। তিনিই তিনি।

এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহা তাঁহারই বিবর্ত্তমাত্র। রজ্জুতে যেমন সর্পবোধ হয়, সেইরূপ তাঁহাকে ভ্রমজ্ঞানে জগৎরূপে বোধ করিতেছ। বাস্তবিক সর্প বলিয়া কিছুই নাই।

দেহ মন জগৎ ইহাদের বাস্তব সত্তা নাই। তিনিই মায়া সাহায্যে এইরূপে বিবর্ত্তিত। জগৎটা যে আছে বলা যায় তাহা সত্যস্বরূপ তিনি আছেন বলিয়া তাঁহার উপরে ইন্দ্রজাল মত একটা মিথ্যার আরোপ মাত্র।

এইটি শেষ কথা। যখন চিত্তশুদ্ধি হইবে তখন এই বিচারের সময়। এখন

মাত্র জানিয়া রাখ যতদিন সব আছে ততদিন তিনিই সব। যখন সব বলিয়া কিছু নাই তখন তিনিই তিনি আর কিছুই নাই।

ধীমহির মধ্যে যে স্বরূপ ধ্যানটি আছে তাহা এই দৃশ্যদর্শন মার্জ্জনে স্থিতি মাত্র।

(৫)

"ধীমহি" করিলে যে "প্রচোদয়াৎ" হয় তাহাতে ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি জীব কোন পথে চলিবে তাহা কি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ?

হাঁ। জীব বা জীবসঙ্ঘের স্বাভাবিক গন্তব্য পথ সেইটি যে পথে, বিকার কাটিলে, মানুষ না চলিয়া থাকিতে পারে না। যথার্থ বিকার কাটা যাহার নাম, তাহা একটি মানুষেরও যদি সত্য সত্য হয়, তবে তিনি সকল জীবের গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন। পূর্ব্বে বিকারের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আবার বলি তুমি জন্মিয়াছ, তোমার জন্মস্থান অমুক দেশের অমুক গ্রাম, তোমার পিতা মাতা ভাই ভগ্নী ছিল বা আছে, তুমি বালক ছিলে যুবা হইয়াছ, বৃদ্ধ হইবে, তুমি বিবাহ করিয়া সংসার করিবার জন্য কত কি করিয়াছ করিতেছ, তোমার স্ত্রী পুত্র মরিবে, তুমিও মরিবে এইগুলি তোমার বিকার। বহু জন্ম ধরিয়া এই বিকারের মধ্যে তুমি পড়িয়াছ। এইগুলি তোমার স্বপ্ন। আর যে বিকারের কথা বলিতেছি—তাহাও তোমার স্বপ্নে বিকার মাত্র। শাস্ত্র ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলেন—

জাতোহহং জনকো মমৈব জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রামিত্রমরাতয়ো বসুবলং বিদ্যাসুহৃদ্বান্ধবাঃ।
চিত্তস্পন্দিত কল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি ॥

এক পুরুষ আছেন। তিনি চির-জাগ্রৎ। মিছামিছি একটা স্বপ্ন যেন তিনি দেখিতেছেন। তাহাতে কল্পনা করিলেন যেন তিনি জন্মিলেন, এই তাঁর জনক জননী, এই তাঁর ঘর বাড়ী, এই তাঁর স্ত্রী, এই তাঁর কুল, এই পুত্র, এই মিত্র, এই অরাতি, এই ধন, এই বিদ্যা, এই সুহৃৎ বন্ধু বান্ধব। অবিদ্যাময়ী মায়াকে মিছামিছি আপনার মধ্যে তুলিয়া—অথচ সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও তিনি চিত্তস্পন্দন কল্পনা অনুভব করিয়া কি যেন কি করেন। যেন নিদ্রা একটা তুলিয়া এই রকম বহুবিধ স্বপ্ন তিনি দেখেন। ফলে তাঁর নিদ্রাও নাই। স্বপ্নও নাই। তথাপি একটা স্বপ্ন ইন্দ্রজাল যেন হয় আর তাহাতে বন্ধনও

যেন হয়। এই হইল বিকার। মরণ মূর্চ্ছার পরে এই বিকার ঘটে। এই জন্মের সকল কর্ম্ম তখন ভুল হইয়া গেল। তবে যাহাতে প্রারব্ধ আসক্তি ছিল তাহাই নূতন জন্মের বাসনার মূল কারণরূপে রহিল।

এখন বিকারটি কাটিলেই যিনি বদ্ধ ছিলেন তিনিই দেখেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" ইত্যাদি। আমি জন্মাই নাই, আমার মৃত্যুও হইবে না। আমি নিঃসঙ্গ আর কিছুই নাই। আপনি আপনিই আছি। এতদ্ভিন্ন যাহা দেখা যাইতেছে তাহা আমিই কল্পনা তুলিয়া এইরূপে বহু হইয়াছি। বাসনা ত্যাগ কর বিকার কাটিবে।

অহো! বিচিত্র এই স্বাপ্নবন্ধন। বল কিরূপে ইহা ছুটিবে?

তাইত বলিতেছি—বিদ্মহে কর ধীমহি কর তবে মুক্তি পথে ছুটিবে।

মুক্তিপথে যে মানুষ যাইবে তাহা কি এক দণ্ডেই হইতে পারে—না ক্রম অনুসারে হইবে? অনেকে ত বলে এই ত শাস্ত্রে পড়িলাম সকলই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, মন মিথ্যা—ই হাই ত জানা। যখন জানিলাম সব মিথ্যা, তখনই ত আমি মুক্ত হইয়া গেলাম।

পুস্তকে পড়িলাম বা সাধুমুখে শুনিলাম সব মিথ্যা অমনি কি সব মিথ্যা হইয়া যায়? তা হয় না। সত্যসত্যই জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, মন বলিয়া কোন কিছুই অনুভূত হইবে না। ইহা মুখের কথা নহে। সত্য সত্যই হইবে। তোমার কি ইহা হইয়াছে? তুমি কি জগৎ বলিয়া কিছু দেখ না? মন বলিয়া কিছু অনুভব কর না? দেহ বলিয়া কিছু আছে বোধ কর না? তোমার সবই আছে তবু যদি তুমি বল তুমি সোঽহং—তবে বলদেখি কিসের সোঽহং তুমি? কেমন সোঽহং তুমি? এসব আত্মপ্রতারণার সোঽহং। এ সকল লোক—প্রতারণার সোঽহং। তুমি চিড়িয়ার বুলির মত সোঽহং বুলি মুখস্থ করিয়াছ মাত্র। এ সমস্ত আসুরিক বৃত্তি ছাড়িয়া ক্রম অনুসারে সাধনা কর, তবে সর্ব্ব বাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে। ঠিক পথে চল তবে হইবে। এক জন্মেই যে হইবে তাহা কে বলিল? তোমার ত একক্ষণেই হইতেছে—কিন্তু শাস্ত্র বলেন—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বহু জন্ম অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে পায়।

বল্ বল্ ঠিক পথ কোন্‌টি?

"প্রচোদয়াৎ" এই কথাটির মধ্যে সমস্ত পথটির কথা বলা হইয়াছে।

বিগ্রহে করিয়া ধীমহি করিলে তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পথে প্রেরণ করেন।

ধর্ম্ম বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটি নিষ্কামভাবে করিতে প্রাণপণ কর। কেমন করিয়া নিষ্কামভাবে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করিতে করিতে যে অর্থ লাভ হয় তাহা তোমার লৌকিক অর্থ নহে। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কি কখন করিয়াছ? সব না পার—

ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ঈশ্বর প্রীতি জন্য কর্ম্ম কি কখন করিয়াছ? যদি একদিনও করিয়া থাক, তবে বুঝিবে ইহাতে চিত্ত-তৃপ্তিরূপ অর্থলাভ হয়। ইহাকেই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা বলিয়া জানিও। চিত্ত প্রসন্ন হইলে একটি অলৌকিক কামের উদয় হয়। বিষয়ভোগের কাম ইহা নহে—ঈশ্বরপ্রাপ্তির কাম ইহা। শ্রীগীতা ইহাকে বলেন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভজনা। ইহাই যুক্ততম অবস্থা। কাম ইহা তথাপি কর্ম্মটি নিষ্কাম। শ্রুতি বলেন অকামো বিষ্ণুকামো বা। বিষ্ণুপ্রীতি-জন্য কামনা, নিষ্কাম। এই অলৌকিক কাম যখন হৃদয়ে জাগিবে—যখন আর জগতের কিছুই ভাল লাগিবে না—তাহাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকা যাইবে না, চিত্তাকাশে তাঁহার সেবা ভিন্ন আর কিছুই স্ফূরণ হইবে না তখন জ্ঞান সাধনার প্রকৃত সময়। তখনই বুঝিতে পারা যাইবে ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। তখন বুঝা যাইবে আমি নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গভাব অনুভূত হইলেই—সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে স্থিতি লাভ হইবে। ইহাই মোক্ষ। সর্ব্বলোক জননীকে ধ্যান করিতে পারিলে তিনি কোলে করিয়া সেই অবস্থায় পৌঁছিয়া দিবেন। তখন স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি লইয়া খেলা কর বা না কর তুমি তুমিই থাকিবে। আর পতন নাই। ইতি—

অধ্যবসায় ও অনির্ব্বিণ্ন চিত্তত্ব।

শাস্ত্র জরামরণ নিবৃত্তিরূপ সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির বহু উপায় বলিয়াছেন। যিনি শ্রীগুরুর নিকট যে সাধনা পাইয়াছেন তাহাতেই তাঁহার হইবে এইটির দৃঢ়নিশ্চয় হওয়াই অধ্যবসায়। "গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ সত্য, কখনই মিথ্যা হইতে পারে

না। ইহার বিরুদ্ধে যে যাহাই বলুক, গুরুবাক্য ও বেদবাক্য অভ্রান্ত—এইটির দৃঢ় নিশ্চয় হওয়াই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় থাকাই সাধকের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। মনে করা হউক অধ্যাত্মরামায়ণে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন—রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজাভুবি। তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥ যে সকল সাধক সর্ব্বদা রাম রাম জপ করেন, তাঁহাদের কোন ভয় থাকে না। এমন কি তাঁহাদের মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত থাকেনা। বেদবাক্য ভিন্ন ভগবান্ ব্যাসদেব কখনই অন্য উপদেশ দেন নাই। শ্রীগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যিনি রাম মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সদ্গতি হইবে—এইটির দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। মনে করা হউক অনেক দিন ধরিয়া জপ করা হইতেছে—তথাপি ঠিক ঠিক বুঝা যাইতেছে না, কি হইবে—কি না হইবে। শাস্ত্র বলেন ইহাতেও হতাশ হইবার কিছুই নাই। জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত অপরাধ সমূহই উপদ্রবরূপে আসিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু তথাপি নাম ছাড়িতে নাই। নাম দ্বারাই উপদ্রব দূর হইবে। লয় বিক্ষেপ দূর হইবেই। এ জন্মেও যদি না হয় পরজন্মেও হইবে। এ জন্ম ঐ উপদ্রব কাটিতেই না হয় গেল। তাহাতেও বিচলিত হইবার কিছুই নাই। কিছুতেই নাম ছাড়িব না। নাম লইয়া—কেহ বা শ্বাসের সঙ্গে নাম জপ করেন, কেহবা কুম্ভকে নাম জপ করেন, কেহবা দ্রষ্টাভাবে থাকিয়া নাম জপ করেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। গুরু একজন। কিন্তু উপগুরুর নিকট হইতে বহু কৌশল শিক্ষা করা যায়।

কিন্তু গুরু ও বেদবাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার কিছুতেই হইবে না। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে যাহার সংশয় রহিয়া যায়, সে ব্যক্তি কোটিকল্প ধরিয়াও যদি শাস্ত্র লইয়া থাকে, তথাপি তাহার হইবে না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা আগমন করিতেছেন—এইভাব যে দৃঢ়রূপে ধারণা করে নাই, সে ব্যক্তি কোটিকল্প গঙ্গাজলে ডুবিয়া থাকিলেও তাহার ইষ্টলাভ হয় না। বস্তুশক্তিতে যাহা হয় তাহাতেও তাহার দৃষ্টি পড়ে না। সেইরূপ যে সাধনা শ্রীগুরু আমাকে দিয়াছেন, যে নামকে বেদপ্রমুখ শাস্ত্র মোক্ষপ্রাপক বলিতেছেন, সেই সাধনা, সেই নাম নিশ্চয়ই আমাকে ভবসাগর হইতে নিত্যধামে লইয়া যাইবে—যাহার এই বিশ্বাস না থাকে তাহার কিছুই হয় না। এইজন্য অধ্যবসায়টি প্রথমেই অবলম্বন কর।

অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তত্ব থাকা উচিত। উপরে ইহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে।

এতদিন সাধনা করিলাম—কৈ কিছুইত হইল না। কত কষ্ট করিলাম, আরও কত কষ্ট আছে, কত কষ্ট আর করিব—বুঝি আমার কিছুই হইল না—এইরূপ হতাশ ভাবকে নির্ব্বেদ বলে। সাধকের চিত্ত কিন্তু নির্ব্বেদশূন্য হওয়া চাই। যে নাম অবলম্বন করিয়াছি, যে স্বাধ্যায় ধরিয়াছি তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই লাভ করিব—এই জন্মেই হউক বা শত জন্মেই হউক; ব্যস্ত হইবার কারণ নাই, হতাশ হইবারও কারণ নাই। শাস্ত্রবাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ অনেক আছে বলিয়া শীঘ্র হইতেছে না। তথাপি শ্রীভগবানের করুণার অন্ত নাই। আমি সাধনা দ্বারা নির্ম্মল হইলেই তিনি, সংসার-সাগর পার করিয়া দিবেন। হউক সমুদ্র—আমি ইহা শোষণ করিবই। অণ্ডাপহরণ করায় ক্ষুদ্রপক্ষী যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যে দৃঢ় অধ্যাবসায়ে পক্ষী সেই মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে করিয়া বিন্দু বিন্দু জল, অগাধ সমুদ্র হইতে তুলিয়া তীরে ফেলিতে লাগিল; সকলে নিবারণ করিল—ক্ষুদ্র পক্ষী কাহারও কথা গ্রাহ্য করিল না—নিজ প্রতিজ্ঞাও ত্যাগ করিল না—শেষে ভগবান্ নারদ কৃপা করিয়া যেমন ভগবান্ গরুড়কে তাঁহার জ্ঞাতিসাহায্যে প্রেরণ করিলেন—আর সমুদ্রও তখন ভয়ে ক্ষুদ্র পক্ষীর অণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন—এইরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়ে কার্য্য করিতে হইবে। আলস্য অনিচ্ছা কিছুতেই গ্রাহ্য করা চাই না। কিছুতেই সঙ্কল্প শিথিল করা চাই না। দেহত যাইবেই—না হয় তোমার নাম করিতে করিতেই যাক্—যে উপায়ে পার আলস্য অনিচ্ছা ত্যাগ করিয়া কার্য্য করা চাই—এই দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া যিনি সাধনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করেন। শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। ইহা তাঁহার নিজের কথা। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি। আমি শ্রীভগবান্‌কেই চাই—আর কিছুই চাই না; কারণ অন্য সমস্তই নশ্বর, অন্য সমস্তের অন্ত আছে, অন্য সমস্তই আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। একমাত্র শ্রীভগবানই পাইবার বস্তু। তিনি ভিন্ন কোথাও জুড়াইবার স্থান নাই। এইটী নিশ্চয় করিয়া যিনি শ্রীভগবানের নাম আশ্রয় করিয়া সাধনা করেন, গুরু যে নাম দিয়াছেন তাহার দ্বারাই আমার হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে তিনি অবহেলে ভগবৎ কৃপায় মৃত্যু সংসার পার হইয়া যাইবেন।

বর্ষায় আভাষে।

ওগো ! জীবনে আমার নূতন করিয়া
এলকি প্রেমের বরষা ?
ওই ঘন আবাহনে শ্যাম-সমারোহে
জাগায়ে বিপুল ভরসা।

তার আসার আশায় গে'ছে কতকাল
মিলন স্বপন স্মরিয়া,
মোরে আকুল পরাণ কত কি সুধায়,
কি বলি পাইনি' ভাবিয়া!

ওই পল্লব-মর্ম্মরে কি গাথা শুনায়
উতলা-পবন মাতিয়া,
কত উছলিত সুখে তটিনীর বুকে
প্রচারে মহিমা গাহিয়া।

ওগো সারা বরষের সঞ্চিত মধু কি—
সহসা পড়িল ঝরিয়া ?
একি পলকে পুলকে হৃদয় ভরিয়া
কে নিল বেদনা হরিয়া!

আজি কায়া ধরি মোর আসে কি দয়িত,
আসে কি গগন ছাইয়া ?
আমি হাসিব কাঁদিব নাচিব গাহিব
রব কি চরণে লুটিয়া ?

আমি কি কথা কহিব কেমনে পূজিব
সকলি যেতেছি ভুলিয়া,
মোর জীবনের সাধ মিটাইবে যদি
নিওনা চেতনা হরিয়া॥

মৃঃ—

গীতার শক্তি।

এক জন লোক বলিতেছিল আজ কদিন হইল যেন কি হইয়া আছি। ঠিক-মত কোন কিছুই চলে না।

প্রাতে যথা সময়ে সন্ধ্যা হয় না। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মনকে ঠিক করিবার জন্য গীতার যথাপ্রাপ্ত স্থান বাহির করিলাম। লেখা আছে শুধু তোমার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করি, কি ফল হইবে—না হইবে ভাবিনা—এই বলিলেই যে হইবে তাহা ভাবিও না। সঙ্গে সঙ্গে আমি কর্ম্মের কর্ত্তা নহি ইহাও বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা কর কর্ত্তা নহি এই অহংকার বর্জ্জিত অবস্থায় কর্ম্ম ত হইবে না—ইহার উত্তর এই যে কে কর্ম্ম করে ইহা যদি ঠিক বুঝিয়া থাক, তবে আমি কর্ত্তা নহি ইহা ভাবনা করিয়া তোমার মধ্যে কোন দুইকে বেশ করিয়া কর্ম্ম-করাইয়া লইতে পার।

বাস্তবিক আমি বলিতে যাহাকে বুঝায় তিনি কোন কর্ম্ম করেন না। তিনি অহংকার বিমূঢ় হইয়াই মনে করেন—কর্ম্মের কর্ত্তা তিনি। এই অহংকার শূন্য তিনি যখন হন, তখনও নিবৃত্তি মন, প্রবৃত্তি মনকে বেশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লইতে পারে। অহংকার বিমূঢ় না হইলেই তিনি আপনি আপনি, তিনি আপন স্বরূপে থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে বিচরণ করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থাতে যে চিত্তের প্রসন্নতা অনুভূত হয় তাহাই শ্রীভগবানের প্রসন্নতার অনুভব।

একদিন এই হইল। আর একদিন ঐরূপ অবস্থায় গীতার পাতা উলটা-ইতেই আসিল :—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। ইত্যাদি। আমি সকলের বুদ্ধিতে সন্নিবিষ্ট এই জন্য আমা হইতে সর্ব্বপ্রাণীর স্মৃতিজ্ঞান বা জ্ঞানস্মৃতি এবং তাহার অপগমনও ঘটে।

তুমি হৃদয়ে আছ। পুণ্যকর্ম্ম যাঁহারা করেন তাঁহাদের জ্ঞানস্মৃতি তোমা হইতেই হয়, আবার যাহারা পাপী তাহাদের জ্ঞানস্মৃতির লোপও হয় তোমা হইতে।

নিত্য কর্ম্মের পরে এই শ্রুত বিষয়ের মনন কর, বড় নিকটে পাইবে। অধিক কি?

কর্ম্ম করেন একজন আর কর্ত্তা অভিমান করেন আর একজন। কর্ম্ম যিনি করেন তিনি করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়াও কর্ত্তা অভিমান করেন তিনি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিলেই এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেই সর্ব্বস্য চাহং ইহা বেশ ধারণা করিতে পারিবেন। ইতি।

ভিন্ন হওয়া।

ব্যষ্টি যখন আপনাকে সমষ্টি হইতে ভিন্ন মনে করে তখনই সমষ্টি তাহার মৃত্যু-সঙ্কল্প করেন। ব্যষ্টিই নিজ কর্ম্ম দ্বারা সমষ্টিকে তাহার মৃত্যু কামনা করিতে প্রেরণ করেন। এক্ষেত্রে সমষ্টির দোষ আদৌ নাই। ব্যষ্টির দোষেই ইহা হয়। জীবের মৃত্যুর কারণই এই।

যে জীব চৈতন্যকে আমরা ব্যষ্টি বলিতেছি, যাহাকে খণ্ড বলিতেছি তাহা, আকাশের উপরে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসিলে যেমন আকাশের খণ্ড হয় সেইরূপ ভাবে দেহ দ্বারা খণ্ড মত বোধ হইতেছে। সর্ব্বদা চৈতন্যটি অখণ্ড অবস্থাতে থাকিয়াও দেহের উপর অভিমান করে বলিয়াই খণ্ড চৈতন্য বা ব্যষ্টি চৈতন্য নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য, দেহে আত্মাভিমান স্থাপন করিয়াই আপনাকে সমষ্টি হইতে পৃথক এই অভিমান করে। খণ্ড হওয়াই মৃত্যু। খণ্ড হওয়াই ভয়। খণ্ড হওয়াই যাতনা। আর সমষ্টি থাকাই জীবন। এক থাকাই জীবন।

সংসারে অনন্তকোটি জীবপুঞ্জের অনন্তকোটি দেহ। অনন্তকোটি দেহের অনন্তকোটি নামরূপ। জগতে কত প্রকারের যে আকার কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সমুদ্র বল, নদী বল, পর্ব্বত বল, বৃক্ষ লতা বল, পশু পক্ষী বল, কীট পতঙ্গ বল, নর-নারী বল—এই আকারগুলি কোন এক অদ্ভুত কৌশলে একটি মাত্র সীমাশূন্য আত্মার উপর, জলের উপর পানা ভাসার মত ভাসিয়াছে; ভাসিয়া সেই চৈতন্য দ্বারা দীপ্ত হইয়া ঐ দেহগুলিকে যেন জীবন্ত মত করিয়াছে আর অপূর্ব্ব অধ্যাস বশে একই যেন বহু হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। বাস্তবিক এক যিনি তিনি একই আছেন। তাঁহার খণ্ড না হইয়াও যেন খণ্ড হইয়াছে। এই খণ্ড চৈতন্যগুলির সমষ্টি যিনি তিনি সগুণ ঈশ্বর। সগুণ ঈশ্বরের যে আকার নাই তাহা বলা যায় না। তিনি নিরাকার হইয়াও একভাবে সাকার। কারণ এই সগুণ ঈশ্বর তাঁহার সঙ্কল্প-শক্তি লইয়াই সগুণ। এই শক্তি তিনি তুলিতেও পারেন আর নাও তুলিতে পারেন। যখন তুলেন তখন তিনি নিরাকার হইয়াও সঙ্কল্পের দেহ ধারণ করেন। এই সঙ্কল্পদেহকে ভাবনাময় দেহ বলে। ইহারই নাম আতিবাহিক দেহ আতিবাহিক দেহধারী পরম পুরুষ যিনি তিনিই হিরণ্যগর্ভ। শুধু সঙ্কল্পশক্তিটি মাত্র যে তাঁহার আছে তাহা নহে। তিনি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ। তিনি স্বাধীন পুরুষ। সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তিনি যখন যে সঙ্কল্প তুলেন তাহাই তাঁহার

সঙ্কল্প শক্তির কৌশলে—ক্রমে ক্রমে স্থূল অবয়ব ধারণ করে; অব্যক্ত হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল অবয়ব ধারণ করে। সেই সমস্ত স্থূল দেহের সমষ্টি স্বরূপ যে পুরুষ তিনিই বিরাট।

আবার ঐ যে বলা হইতেছিল তিনি স্বাধীন পুরুষ—ইহা বলার অর্থ এই যে তিনি সঙ্কল্প তুলিতেও পারেন আবার সঙ্কল্প শূন্য হইয়াও থাকিতে পারেন। নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় যখন থাকেন তখন তিনি নির্গুণব্রহ্ম। এইজন্য বলা হয় চৈতন্য সর্ব্বকালে এক থাকিয়াও সঙ্কল্প বলে সমকালে সগুণ হিরণ্যগর্ভ হয়েন, বিরাটপুরুষ হয়েন আবার জীব ভাবও ধারণ করেন। আবার এই পুরুষই আত্মমায়ায়, আত্মসঙ্কল্পে যখন অবতার হয়েন তখন তিনিই নিগুণ সগুণ অবতার ও আত্মা সমকালে।

এইটি যখন তত্ত্ব কথা তখন নির্গুণটিই সত্য সগুণটি মিথ্যা কিরূপে হইবে? অবতারটি হয় নাই ইহাই বা কিরূপে হইবে? জীবাত্মা চিরদিনই শ্রীভগবানের নিত্যদাস ইহাই বা কি কথা? তাই বলা হয় যতদিন অজ্ঞান আছে, যতদিন অবিদ্যা আছে, যতদিন এককে আর দেখা আছে ততদিন নিত্যদাস ভাবটি সত্য। কিন্তু যখন এ ভ্রমটি গেল, যখন দেহেতে আত্মাভিমান না করিয়া চৈতন্যে অভিমান করা হইল তখন জীবই অবতার হইল, সগুণব্রহ্ম হইল, নির্গুণ-ব্রহ্ম হইল।

এখন প্রশ্ন হইবে মানুষ চেতন, মানুষটা দেহ নহে। মানুষ দেহ ভাবটা ভুলিতে পারে না কেন? মানুষ আপন চৈতন্যমূর্ত্তিকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপে দেখিতে পারে না কেন? মানুষ কি অখণ্ডভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারে? যদি পারে তবে সে পারার কৌশল কি? কি উপায়ে পারিবে?

সাধনা ত ইহাই। সাধনা একটা কৌশল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই কৌশল দ্বারা মানুষ দেহঅভিমান ত্যাগ করিয়া আপনাকে চেতন বলিয়া দেখে। এই সাধনা কৌশলে মানুষ আপনাকে খণ্ড চৈতন্য না দেখিয়া অখণ্ড চৈতন্য ভাবে দেখিয়া দেখিয়া পরমানন্দ-প্রাপ্তি সহ আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারে। যে সাধনার যিনি অধিকারী তিনি শ্রীগুরুর নিকটে তাহা জানি-বেন। তবে ত্রিসন্ধ্যা করার অভ্যাস প্রথমেই পূর্ণ মাত্রায় আবশ্যক।

মায়ের যোড়শোপচারে পূজা।

পূজা প্রথমে মানসিক ব্যাপার পরে বাহিরে। যে ইষ্ট বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে তাহার আর বাহ্য পূজার প্রয়োজন হয় না। সে ইষ্টবস্তুকে, হৃদ্‌পদ্মে বসাইয়া পুষ্প-চন্দন দিয়া কত রকমে সাজায়, কত স্তবস্তুতি বন্দনা করে, কখন বা নির্নিমেষে ইষ্ট বস্তুর প্রতি চাহিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। যেন জাগতিক সব বন্ধন তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে, যেন সে এ রাজ্য হইতে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সে যে আপনার বলিতে যাহা কিছু তৎসমস্তই ইষ্টচরণে উৎসর্গ করিয়াছে, তাহার যে আর আপনার বলিতে কিছুই নাই। তার দেহ, মন সব গিয়াছে, আছে কেবল সীমাশূন্য ভালবাসার অনুভব এবং তাহাতেই অপরিসীম আনন্দ। মানুষের এ অবস্থা কি সহজে ঘটে? এ যে অনেক সাধনার ফল। অনেক কঠোর তপস্যা করিলে তবে মন ঠিক হয়, মন ঠিক হইলে তবে মানসিক পূজা সম্ভব। মানুষ শৌর্য্যেবীর্য্যে বিশ্ববিজয়ী হইতে পারে তবু মন জয় করিতে পারে না। বিচার বুদ্ধিদ্বারা মন জয় কর তবে ত মানসিক পূজার অধিকারী হইবে। যতদিন না মন তোমার বশে আসিবে ততদিন তুমি তোমার উৎশৃঙ্খল মন লইয়া পূজায় বসিলেই দেখিবে যে মন তোমাকে ফাঁকিদিয়া মনে মনে বিষয় ভোগ করিতেছে। তুমি দৃঢ়ব্রত হও, মনের ফাঁকি ধরিয়া দাও, মন আর তোমাকে ফাঁকি দিবে না। বিবেকী পুরুষের মন তাহার ভৃত্য, তাহার সৎকার্য্যের সহায় স্বরূপ তাহার মন্ত্রী, কুক্রিয়া হইতে তাহার রক্ষা-কর্ত্তা, তাহার হৃদয়ের রাজা, তাহার অনুমত কার্য্য করে, ও সখ্যভাবে তাহার সহিত একত্র অবস্থান করে।

বাষ্প যেমন ঘনীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হয় সেই রকম আমাদের ঘনীভূত ভাব সমষ্টি হইতেই দেহ ও মনের উৎপত্তি। স্থূল হইতে আমাদিগকে সূক্ষ্মে পৌঁছিতে হইবে। নিম্ন সাধনায় আগে বাহ্য পূজা, তারপর মানসিক পূজা। পুষ্প, চন্দন, ধূপ দীপ, নৈবিদ্য নানা প্রকার পূজার আয়োজন, হোম, জপ, স্তব শুভ মুহূর্ত্ত, শুভক্ষণে অশেষ প্রকার অনুষ্ঠান এই সকল আগে চাই। সকল অনুষ্ঠানই মৃন্ময়ী কে চিন্ময়ী কল্পনা করিবার জন্য, সকল অনুষ্ঠানই মন নিবৃত্তির জন্য, সকল অনুষ্ঠানই আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য, আপনাকে চিনিবার জন্য। আপনাকে

চিনিবার জন্য ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন। পূজার কোন অঙ্গহানি হইলে তোমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। অথচ তুমি প্রসন্ন হও, আমি মূর্খ, আমি ঠিক ঠিক কিছুই যে পারি না এই ভাবে শরণাপন্ন হইয়া কার্য্য করিলে তিনি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দেন। সকলে এক ভাবে পূজা করে না—কাহার পূজা সাত্বিকভাবে, কাহারও বা রাজসিকভাবে, কেহবা তামসিক ভাবে পূজা করে। চিত্তে যাদৃশী বিষয়স্ফুর্ত্তী হয়, চিত্ত সেই ভাবে স্পন্দিত হয়, শরীর চেষ্টাও তথাবিধ হইয়া থাকে, ফলভোগও তদনুরূপ ঘটে। এই যে শারদীয় মহাপূজা—ইহা যে মহাযজ্ঞ। অকাল বোধন করিয়া যে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কয়জন লোকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ইহার বিহিত অনুষ্ঠান করিতে পারে? পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীরাম চন্দ্রকে ব্রহ্মময়ীর উপাসনা করিতে হইয়াছিল। অনন্তশক্তি আত্ম-শক্তির উদ্বোধন করিতেছেন। অকালে বোধন বসাইতে হইয়াছে। কতযত্ন কত একাগ্রতা। পাছে মহাযজ্ঞের কোন ত্রুটি হয়। রাবণ বধের জন্য এই মহাশক্তির আবাহন। শ্রীরামচন্দ্র যে, মায়ামানুষ সাজিয়াছেন তাঁহাকে যে আজ ঠিক ঠিক সেইমত অভিনয় করিতে হইবে। তিনি যে আজ আত্মশক্তিতে কল্পনায় সন্দিহান, তাই তাঁর শক্তি পূজার আয়োজন। তাঁর এই শক্তি পূজার কোন খুঁত থাকিয়া না যায় সেইজন্য তিনি আজ জগৎকে বুঝাইবেন যে সাধনায় সিদ্ধি, সাধনায় কোন দোষ থাকিলে, যজ্ঞের বিহিত অনুষ্ঠান না হইলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয় না। যে কর্ম্মী সে দেখে যে, জগতে কেবল পৌরুষই বিদ্যমান, দৈবের প্রভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যিনি দৃঢ়ব্রত তিনি অভীষ্টলাভ করেন। শ্রীরামচন্দ্র আজ রাবণ বধে দৃঢ় সঙ্কল্প। রাবণও দুর্দ্ধর্ষ, দৈববলে বলীয়ান্। সে মহাতপস্যা করিয়া একপ্রকার অমরত্বলাভ করিয়াছে। সে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ কাহারও হাতে মরিবে না। তাই ভগবানকে তাহার যথার্থ মানুষ সাজিতে হইয়াছে। সেই অজেয়কে জয় করিবার জন্য শ্রীভগবানের আজ এই মানুষ লীলা, এইমানুষ লীলার অভিনয়। যথোচিত শক্তি সঞ্চয় না হইলে যে রাবণ বধ সম্ভব হইবে না। রাবণ যে শ্রীভগবানের হাতে মরিয়া প্রকৃত অমরত্ব লাভ করিবে বলিয়া অহরহঃ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু বিনা যুদ্ধে সে মরিতে রাজি নহে। সম্মুখ সমরে রামের হাতে মরিবে এই তার হৃদয়ের বাসনা। এক লক্ষ পুত্র এবং সওয়া লক্ষ নাতি সে সমর তরঙ্গে জলাঞ্জলি দিয়াছে তথাপি তাহার সমর স্পৃহা মিটেনাই। শেষে নিজে আসিয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত। জীবের অভিনয় করিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রমাদ গণিলেন, আত্ম শক্তিতে সন্দেহ হইতেছে দেখাইলেন, বুঝিবা রাবণ বধ না হয়। বুঝিবা

দেবতার শত্রু, ঋষিগণের তপোবিঘ্নকারীর বিনাশ না হয়। রাবণ যে মায়ের অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া রণে নামিয়াছে। মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান নিজ শক্তি প্রবুদ্ধ করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি আজ দেবী মূর্ত্তী ধরিয়া দেবীর পূজা করিতেছেন। পূজার সব আয়োজন ঠিক ঠিক হইয়াছে। কোন কিছুরই অভাব নাই। তথাপি অতর্কিত ভাবে একটি খুঁত থাকিয়া গিয়াছে, একটি নীল পদ্মের অভাব হইয়াছে। পূজা, বিধি পূর্ব্বক করিতে হইবে, নতুবা অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। তিনি জগতকে দেখাইবেন যে, দৃঢ় সঙ্কল্প পুরুষ কি প্রকারে তাঁহাব অভীষ্ট লাভ করে। আজ পবননন্দন হনুমান একিটি নীল পদ্ম সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিল না। তখন তিনি শর সংযোগে তাঁর আঁখিপদ্ম উৎপাটন করিয়া মায়ের পাদপদ্মে দিবার উদ্যোগ করিলেন। মহামায়া এই লীলা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাবণও যে মায়ের ভক্ত পরমপুরুষের আহ্বানে ভক্তিরও আসন টলিল। মায়ের কোলে থাকিতে কে রাবণকে বিনাশ করিতে পারে? রাবণ মায়ের অঙ্কচ্যুত হইয়াছে, ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া হাহাকার করিতেছে, দেখিতেছে মহাশক্তি পরম পুরুষে মিশিয়াছে, স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল বিঘূর্ণিত হইতেছে, উচ্চচূড় পর্ব্বতমালা চূর্ণিত হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে। তার সব শক্তি হৃত হইতেছে। এ মহাবিপ্লবে তার রক্ষা নাই। রাবণ তখন শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতেছে, আর সজল নয়নে ভগবানের হাতে মরণ যাচঞা করিতেছে। ভক্তিতে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীরামচন্দ্র কি এমতাবস্থায় রাবণ শরীর বাণে বিদ্ধ করিতে পারেন? তিনি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর্ত্তের বধ যে ক্ষত্রধর্ম্ম নিষিদ্ধ।

রাবণ ক্ষণে জ্ঞানলাভ করিতেছে, ক্ষণে জ্ঞান হারাইতেছে। আবার অবিদ্যা রাবণকে আশ্রয় করিল। ধূলিশয্যাত্যাগ করিয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের-ন্যায় রাবণ গর্জ্জিয়া উঠিল, রামের প্রতি পৌরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। অহঙ্কার আসিয়া চৈতন্য সূর্য্যকে গ্রাস করিল। শিশুচক্ষে বৃথা কল্পিত ভূত প্রেতাদিবৎ রাবণ চক্ষে শ্রীরামচন্দ্র আবার অরিবৎ প্রতিভাত হইলেন। শ্রীভগবান্ একটু হাসিলেন। অরিদমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। মহাশক্তি রামবাহুতে শক্তিসঞ্চার করিলেন, রাবণ হত হইয়া ভূপতিত হইল। মহাপূজার রহা ফললাভ হইল। তিনি সত্যসঙ্কল্প তাই তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল।

কিন্তু মানুষের মধ্যে কয়জন সত্য সঙ্কল্প, মানুষের মধ্যে কয়জন দৃঢ়ব্রত, মানুষের মধ্যে কয়জন অবিচলিত চিত্তে মরণান্ত পণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে শিখিয়াছে? নিজের মাথা কাটিয়া রক্তদান করিতে না পারিলে বুঝি ব্রত উদ্যাপন হয় না, তাই সঙ্কল্পে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে হয়। কয়জন বল এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া মহা পূজার অনুষ্ঠান করে? যাহারা করে তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবেই হইবে। যে ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া মহাপূজার আয়োজন করিবে তাহার ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে। যে বলবীর্য্য কামনা করিবে সে কার্ত্তিকের মত বীর্য্য সম্পন্ন হইবে। যে বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে চায় মায়ের কৃপায় তাহার প্রতিভায় জগত উদ্ভাসিত হইবে। মা যে কল্পতরু, যে যাহা চায়, মা'র নিকট হইতে সে তাই পায়। মা'যে সব ঘটে আছেন, মা'র ভাল মন্দ বিচার নাই, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আছেন আবার রাবণের নিকটও আছেন, সর্ব্বত্র মা'র অধিষ্ঠান। তবে মূল মন্ত্র এই যে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এবার মহাপূজায় মা বুঝি এ অধমকে তাই শিখাইতে আসিয়াছিলেন। মনে হইল মহাপূজায় মহা অনুষ্ঠান বিধিপূর্ব্বক কোথাও হয় না, সুতরাং মায়ের অধিষ্ঠানও কোনখানেই হয় না। কোথা'ও দেখিলাম যে ব্রতী ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না, পূজায় উপকরণাদির বিধিমত যোগাড় নাই, কতক্রুট, কত অভাব। মনে হয় যেন আন্তরিকতারও অভাব, কেবল বালকেরা নব বস্ত্র পরিধান করিয়া তাথেই তাথেই নাচিতেছে এবং তাহাদের অট্টহাসিতে দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। কিন্তু যেখানে এত সরল প্রাণের এতখানি উচ্ছ্বাস, যেখানে সরল প্রাণের এত প্রাণমাতান সরল হাসি, সেখানে মা কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? মায়ের মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, বোধ হয় যে, মা আনন্দময়ী করুণা ছল ছল নেত্রে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, এবং শিশুগণের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। কোথাও দেখিলাম শিক্ষাব্রতধারী সদাচারী অদ্যভক্ষ্য ব্রাহ্মণ মহাপূজায় কৃতমানস। তাহার উদ্যোগ আয়োজন কিছুই নাই, আয়োজনের সামর্থ্য বা অর্থও নাই অথচ মায়ের পূজায় দৃঢ় মন। কল্পারম্ভ হইল ব্রাহ্মণের গৃহে মায়ের ভোগ দিবার মত তণ্ডুলকণাও নাই। পূজায় ব্রাহ্মণ স্বয়ং ব্রতী, ত্রিসন্ধ্যা ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হৃদয়ে কেবল মাকে ডাকিতেছে যে, মা তুমি এস, আমার বড় সাধ, তুমি এস,তুমি না আসিলে আমার জীবন বৃথা হইয়া যাইবে,তুমি না আসিলে বোধকরি

আমার জীবন থাকিবে না। মা তুমি এস। মা তোমাকে দিবার আমার কিছুই নাই, তথাপি তুমি এস। ব্রাহ্মণ দিবাসন্ধ্যা কাঁদে, আবার হাসে এবং যখনই বাহিরে আসে উন্মত্তবৎ সকলকে বলে তোমারা আমার গৃহে এস, মা আসিবেন তোমরা সব এসে আনন্দ কর। ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি মা'র পায়ে পড়িয়াছে। মা অচঞ্চলা চঞ্চলা হইলেন। আপনার পূজার যোগাড় আপনি করিয়া লইলেন। নিরানন্দ ব্রাহ্মণধাম আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। মন এত দেখিয়াও ক্ষান্ত হইল না, দশমীর বিজয়া বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইল। মন টানিয়া লইয়া চলিল দেবী-পিঠ শ্রীকালীঘাটে শ্যামা দরশনে। সেখানে যাইয়া জীবনে এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম। মায়ের মন্দিরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, কেবল স্ত্রীলোকের গতিবিধি। মায়ের আজ রমণী লইয়া রঙ্গ। আজ মা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির উপ-সংহার করিয়াছেন। লালশাটী পরিয়া, লাল শাঁখা, লাল রুলী পরিয়া মা এয়ো সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সকলে তার বিশাল ললাটে সিন্দুর লেপন করিতেছে এবং সেই সিন্দুর লইয়া কুলললনারা মহোল্লাসে নিজ কপালে দিতেছে এবং যে যাহাকে পাইতেছে তাহারই কপালে সিন্দুর লেপন করিতেছে। মা'কে দেখিতে পাইলাম না বটে কিন্তু তাহাতে মর্ম্মাহত হইলাম না। যাহা দেখিলাম তাহা অপূর্ণ। সদ্যস্নাতা আলুলায়িত কুন্তলা, প্রফুল্ল বদনা, সীমন্তিনীগণ কি যেন প্রাণভরা আনন্দে প্রশস্ত রাজপথ জুড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের ললাট হইতে কপোল দেশ পর্য্যন্ত সিন্দুর ছটায় রক্তিম। আজ আপামর সাধারণকে দেখা দিবার জন্য সহস্র মূর্ত্তিতে সর্ব্ব সমক্ষে মা আবির্ভূতা। মা আজ তাহাদের দুঃখভার কিছুক্ষণের জন্য হরণ করিয়াছেন, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় তিরোহিত করিয়া-ছেন। তাহাদের সাজে আপনি সাজিয়া সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া রাজপথ বহিয়া চলিয়াছেন। মা চলিয়াছেন ঘরে ঘরে আনন্দ বিলাইতে, এক দিনের জন্যও শোক তাপ দগ্ধ, দুঃখ দারিদ্র নিষ্পেষিত জীব হৃদয়ে আনন্দের উৎসব ছুটাইতে।

মন এততেও কি তোমার চৈতন্য হইবে না? বিবেক ও বিচার বুদ্ধিদ্বারা তোমার অহঙ্কার নাশ কর। তোমার ক্ষুদ্রজ্ঞান তোমায় মোহে নিমজ্জিত করিতেছে। কেবল মাত্র সম্যক জ্ঞান দ্বারাই অহঙ্কার নাশ সম্ভব। নিঃসঙ্গ হইয়া সাধনা কর বালকের মত অকপট চিত্তে মা মা বলিয়া ডাক, মা আসিয়া দেখা দিবেন। শ্রীকা।

বর্ণাশ্রম বা অভয় ব্যবস্থা।

জীব সুখ নিয়া জন্ম গ্রহণ করুক কি দুঃখ নিয়া জন্ম গ্রহণ করুক তাহাকে দুইটী ভয়ে সকল সময়েই ভীত থাকিতে হয়। একটী উদরপূরণের ভয় আর একটী মৃত্যু ভয়। জীব বুঝুক বা না বুঝুক তাহাকে এই দুই ভয়ের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেই হইবে। সেই অন্তিম দিনে সকলকেই চক্ষুর জল ছাড়িয়া দিয়া অনিচ্ছাকৃতে সকলের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। সেই শেষ দিনের শেষ শয্যার দৃশ্য বড়ই বৈরাগ্যোদ্দীপক। সেই অ-চিনা অ-জানা দেশের যাত্রার পক্ষে বড়ই ভীতিসঙ্কুল সে যাত্রা। এই পৃথিবীতে একা চলিতে কত কষ্ট! যে স্থানের প্রতি পদার্থ প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি সেই স্থানে সেই জানা পৃথিবীতে সেই বিশেষ পরিচিত পৃথিবীতে অন্ধকারে নহে আলোক সঙ্গে করিয়া একাকী চলিতে কত কষ্ট হয়, কত ভয় হয়! তার পর যে দেশের কিছুই দেখা যায় নাই, যে বিদেশে যাইয়া কেহ ফিরিয়া আসিয়া সে দেশের সংবাদ দেয় নাই তেমন দেশে একাকী যাইতে হইবে; ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এই স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সাথী-সঙ্গতি বিনা একাকী যাইতে হইবে। সে অজ্ঞাত বিদেশে প্রয়াণ কত ভীতিকর! এই নিতান্ত জানা দেশটাতে একাকী চলা কষ্ট-কর বলিয়া সাথী সম্বল জুটাইয়া এক সংসার পাতা হয়। মনকে ফাঁকি দিয়া অসহায় সহায় যোগাড় করা হয় স্বপ্নজীবনের মুহূর্ত্ত কয়টা কাটিবার জন্য। ইহা যেমন একজনের তেমন সকলের। তাইত মানুষ আজি কালি বড় গর্ব্ব দেখাইয়া জাঁকাইয়া সংসার পাতে। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া শানাই-সঙ্খ বাজাইয়া নাগারা-টিকারা পিটিয়া, কত নাচ-গান দিয়া, কত বাজি-বন্দুক ছাড়িয়া, কত কি করিয়া, মহাসমারোহে দশজনকে জানাইয়া এক বৃহৎ সংসার পাতিয়া বসে। কে বলিবে ইহা মিথ্যা! কে বলিবে ইহা ক্ষুদ্র! সংসারী যেন বড় নিশ্চিন্ত! মানুষ তুমি ত দেখি বড় নিশ্চিন্ত! মানব, তুমি ত বড় ঠসক দেখাইলে! তুমি ত বিজয়-দর্পের বড় ভাণ করিলে! আর্য্য ঋষি তুমি ত বড় কারসাজি, বড় বুদ্ধিমত্তা দেখাইলে! তুমি কি বাস্তবিকই জগদেক স্বামীর সেই বিশ্বনিয়ন্তার অভয়-বাণী শুনিয়াছ? হাঁ, হাঁ, শুনিয়াছ বটে। তুমি ত নাচিকেতার জন্মদাতা, তুমি ত মার্কণ্ডেয়ের পিতা, তোমার গৃহেই ত সাবিত্রী-সত্যবান্ খেলা করিয়াছিল। তোমার ক্রোড়েই ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়াছে। তুমিই ত বলিয়াছ, শুধু

ক্রমশঃ শ্রীশ্রী

অধিকারী হইয়া যিনি সেই ব্রহ্মকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বতঃ জানিবেন অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম বলিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, তিনি জীব হইয়াও পূর্ণ নিত্যমুক্ত ব্রহ্মভাব রূপ মোক্ষফল সাক্ষাৎ অনুভব করিবেন।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশে ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন কিরূপে ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তথাপি আপনার বিচার কৌশল এত সুন্দর যে, যাহারা ইহা শ্রবণ করিবে তাহারাই ধারণা করিতে পারিবে বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কিছুই নাই; সর্ব্বত্র এক অখণ্ড ব্রহ্মই বিরাজিত। এই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত শ্রবণ মননাদি কখন দৃঢ়তা লাভ করিবে না। জীবের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কাররূপ অজ্ঞান সরাইবার জন্য আপনি আবার এই সমস্তই বলুন।

বশিষ্ঠ—শ্রবণ কর।

ইত্থং জগদহন্তাদি দৃশ্যজাতং ন কিঞ্চন।
অজাতত্বাচ্চ নাস্ত্যেব যচ্চাস্তি পরমেব তৎ॥ ১॥

এই জগৎ, অহং ইত্যাদি দৃশ্যজাত, ইহারা কিছুই নহে। ইহারা জন্মে নাই বলিয়াই ইহাদের বিদ্যমানতাও নাই। যাহা আছে তাহা সেই পরম পদই।

পরমাকাশমেবাদৌ জীবতাং চেততি স্বয়ম্।
নিষ্পন্দাম্ভোধি কুহরে সলিলং স্পন্দতামিব॥ ২॥

পরমাকাশ পরব্রহ্মই প্রথমে স্বয়ং জীবভাবে বিবর্ত্ত হইয়া বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হয়েন। নিস্পন্দ সাগরগর্ভে যেমন সলিলের স্পন্দতা—তরঙ্গের ভাসাভাসা, সেইরূপ। স্থির নীলাম্বুরাশিই কোন এক অপূর্ব্ব কৌশলে যেমন তরঙ্গরূপেই দেখা যায়, সেইরূপ পরমশান্ত ব্রহ্মই, মায়ার কৌশলে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপী সমষ্টি জীবভাবে যেন ভাসেন।

আকাশরূপমজহৎ এবং বেত্তীব বদ্যতাম্।
স্বপ্ন সঙ্কল্প শৈলাদাবিব চিৎবৃত্তিরান্তরী ॥ ৩॥

ব্রহ্ম আপনার পরমাকাশ রূপ ত্যাগ না করিয়াই আপন আন্তরী সঙ্কল্পাত্মিকা চিৎবৃত্তি দেখিয়া তাহাকে বিরাট্ পুরুষ মনে করিয়া—ইহাই আমি এই ভ্রান্তি দ্বারা তাহাকেই পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া যেন মনে করেন। আপন স্বপ্ন সঙ্কল্পে শৈলাদি দেখিয়া মানুষ যেমন উল্লাসে আত্মহারা হয় সেইরূপ। স্মরণ রাখ,

অজ্ঞান উপহিত চিৎকে প্রকৃতি বলা হয়। অবার চিৎ ও চিৎপ্রভা ইহাদের একত্রাবস্থানই প্রকৃতি পুরুষের একত্রাবস্থান।

পৃথ্যাদিরহিতো দেহো যো বিরাড়াত্মকো মহান্।
আতিবাহিক এবাসৌ চিন্মাত্রাচ্ছ নভোময়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম বিরাড়াত্মক যে মহান্ দেহ দেখেন তাহা পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি আকাশ ইত্যাদি রহিত। সেটা ভাবনাময় দেহ। তাহা চিন্মাত্রস্বরূপ নভোময়।

স্বপ্নে নগর দেখাটা যদি স্থির ভাব ধারণ করে অথবা চিত্রকর যদি তন্ময় হইয়া যুদ্ধোদ্যত সৈন্যদলের চিত্র কল্পনা করে তবে তাহার চিত্তস্থ ভাবনার সৈন্যদল যেরূপ, ব্রহ্মের মায়াস্বপ্নে ভাবনাময় জীবঘন বিরাট্ দেহ ধারণও সেইরূপ।

আত্মাতে যে সঙ্কল্প উঠে তদ্দৃষ্টে আমি মহান্ এই যে ভাবনা এই ভাবনাময় দেহ যাঁহার তিনিই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বা ব্রহ্মা। পরে সঙ্কল্প যখন বহু হয় তখন হিরণ্যগর্ভ পুরুষ আপনাকে সমষ্টি জীবরূপে দর্শন করেন। ক্রমে স্থূল দেহ ধারণে তিনিই বিরাট্ পুরুষ।

হিরণ্যগর্ভরূপ মহাস্তম্ভে বহুজীবরূপ অনুৎকীর্ণ ছবি বিশিষ্ট এই বিরাট্ পুরুষ। ইনি আদ্য প্রজাপতি। ইনি দর্পণপ্রতিবিম্বিত দেওয়ালের ন্যায়। ইনি দৃশ্য হইয়াও অদৃশ্য। তিনি দৃশ্যও নহেন, দ্রষ্টাও নহেন, স্রষ্টাও নহেন অথচ সবই তিনি। এক দীপ হইতে বহুদীপের উৎপত্তি যেমন, হিরণ্যগর্ভ হইতে জীবসঙ্ঘের উৎপত্তিও সেইরূপ। যেরূপ সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পান্তরের সৃষ্টি হয়, স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরের সৃষ্টি হয়—সেইরূপ বিরাট্ পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি।

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার প্রতিস্পন্দ হইতে জীব সমূহের বিস্তার হইতেছে। সমষ্টিতে যেমন ব্যষ্টি থাকে সেইরূপ তাঁহাতে এই জীবসঙ্ঘ।

ব্রহ্মৈবাদ্যো বিরাড়াত্মা বিরাড়াত্মৈব সর্গতা।
জীবাকাশঃ স এবেত্থং স্থিতঃ পৃথ্যাদ্যসদ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

আদি ব্রহ্মাই বিরাট্; তিনিই জীবাকাশ। পৃথ্যাদি সৃষ্টি তাঁহা হইতেই।

রাম—

কিং স্যাৎ পরিমিতো জীবো রাশিরাহো অনন্তকঃ।
আহো স্বিদত্যনন্তাত্মা জীবপিণ্ডোঽচলোপমঃ ॥ ১৫ ॥

জীব কি পরিমিত বা অপরিমিত? অসংখ্য বা সংখ্যা বিশিষ্ট? তবে

লৌহ পিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব কি উৎপন্ন হইতেছে? ফলে জীব আসিতেছে কোথা হইতে? জীবতত্ত্ব কিরূপে জানা যায়?

বশিষ্ঠ—শ্রুতি বলিতেছেন—ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি।

জীব—কল্পনা মাত্র। জীব নাই। মায়া অবলম্বনে ব্রহ্ম যখন সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, তখন তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা কৌশল থাকে।

এক এব ন জীবোঽস্তি রাশীনাং সম্ভবঃ কুতঃ।
শশশৃঙ্গং সমুড্ডীয় প্রয়াতীব হিতে বচঃ॥ ১৮॥
ন জীবোঽস্তি ন জীবানাং রাশয়ঃ সন্তি রাঘবঃ।
ন চৈকঃ পর্ব্বত প্রখ্যো জীবপিণ্ডোঽস্তি কশ্চন॥ ১৯॥

একটি জীবও নাই—জীবরাশি আবার কোথায়? শশশৃঙ্গ উড়িয়া পলাইতেছে এইরূপ তোমার বাক্য; জীবও নাই, জীবরাশিও নাই। পর্ব্বতের ন্যায় জীবপিণ্ডও নাই। জীব ও কল্পনা, সমস্তই কল্পনা। একমাত্র শুদ্ধ চিৎস্বরূপ, অমল, সর্ব্বগ ব্রহ্মই আছেন। মায়াযুক্ত হইয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাই তাঁহাতে সমস্ত কল্পনা কৌশল আছে।

লোকে যেমন চিত্রপটে ফুল্লিতা লতা দর্শন করে, সেইরূপ ব্রহ্মও চিদাভাস-দীপ্ত আপন সঙ্কল্পে অনুপ্রবেশ করিয়া আপনাকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভাবে দর্শন করেন।

সেই ব্রহ্মই, স্বসত্তাতে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া, স্পন্দ, মন, দ্বিত্ব ও একত্ব ইত্যাদি প্রকারে "বেদনে নিয়োজয়তি" বিবরী করোতি। ব্রহ্ম এক থাকিয়াও স্বসত্তাকে বহু ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। অবিদ্যার সাহায্যেই তিনি ঐরূপ করেন। অবিদ্যা অপগমে তিনি আপনিই আপনি। কোথাও কিছু নাই।

যথান্ধকারো দীপেন প্রেক্ষ্যমাণঃ প্রণশ্যতি।
ন চাস্য জ্ঞায়তে তত্ত্বমবোধস্তৈবমেব হি॥ ২৫॥

যেমন প্রদীপ লইয়া অন্ধকারকে দেখিতে গেলে অন্ধকার নষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানের আলোক যখন জ্বলিয়া উঠে তখন অজ্ঞান অন্ধকার লুকাইয়া যায়। অন্ধকারটা দূর হয় ইহা মাত্র জানা যায় কিন্তু অন্ধকারের তত্ত্ব যেমন জানা যায় না—সেইরূপ অজ্ঞানটা পলায়ন করে মাত্র কিন্তু ইহার তত্ত্ব জানা যায় না।

এবং ব্রহ্মৈব জীবাত্মা নির্ব্বিভাগো নিরন্তরঃ।
সর্ব্বশক্তিরনাদ্যন্তো মহাচিৎসার রূপবান্॥ ২৬॥

এইরূপে যিনি ব্রহ্ম তিনিই জীবাত্মা। ইঁহার কখন কোন বিভাগ হয় না। ইনি সর্ব্বশক্তি, অনাদি, অনন্ত। চিৎই ইঁহার সারবস্তু। চিৎ দ্বারা ইনি পরমার্থরূপে রূপবান্।

সর্ব্বানণুতয়া যস্য ন কচিদ্ভেদকল্পনা।

বিদ্যতে যা হি কলনা সা তদেবানুভূতিতঃ॥ ২৭॥

সর্ব্বতোপ্যনণুতয়া অপরিচ্ছিন্নতয়া বিষয় ভেদাপগমে তৎকলনভেদো বনোচ্ছেদে বনাতপভেদ ইব অপগত ইতি ব্রহ্মমাত্র পরিশেষ ইত্যাহ বিদ্যত ইতি।

তিনি নিতান্ত অপরিচ্ছিন্ন। সকলকেই তিনি ব্যাপিয়া আছেন। সেইজন্য তাঁহার কোন রূপে অংশ হয় না, তাঁহার কোন ভেদ কল্পনা হইতে পারে না। বন কাটিলে বনব্যাপী আতপ যেমন অপগত হয় সেইরূপ বিষয়ভেদের অপগমে তাঁহার বহুরূপ হওয়াটা অপগত হয়। বিষয় ভেদটাই তাঁহাকে যেন বহুরূপে দেখায়। এই যে বহুরূপে তাঁহার প্রকাশ সেটা যেন তাঁহারই অনুভূতি। ইহা তাঁহারই কল্পনামাত্র।

রাম—হিরণ্যগর্ভ যিনি তিনিই সমষ্টি জীব। তিনিই মহাজীব। সমস্ত জীবের সমষ্টি তিনি। মহাজীবের সহিত সমস্ত জীবের সমষ্টির একতা। যদি ইহাই হইল তবে মহাজীবের ইচ্ছাই অখিল জগজ্জীবের ইচ্ছা না হয় কেন? আর সমষ্টি জীব যিনি তিনি সত্যসঙ্কল্প আর ব্যষ্টি জীবগণ কিজন্য ব্যর্থ সঙ্কল্প?

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ যে স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্প শক্তিরূপা মায়া উঠার মত হয় তাহা প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বকই উঠে। পরে অবুদ্ধিপূর্ব্বক ইচ্ছাই, বুদ্ধি পূর্ব্বক ইচ্ছা হয়। এই সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছাযুক্ত যে পুরুষ তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই। কারণ তখনও পঞ্চতন্মাত্রারও সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহার দেহ আতিবাহিক বা ভাবনাময় বা মনোময়। এই পুরুষই আদি জীব। এই পুরুষই মহাজীব। ইহাঁতেই সর্ব্বসঙ্কল্পশক্তি আছে বলিয়া ইনি সর্ব্বশক্তিময়। কারণ ইনি সত্যসংকল্প। সঙ্কল্প মাত্রেই যখন ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তখন তিনি সর্ব্বশক্তিময় ভিন্ন আর কি?

ব্রহ্ম প্রথমং সত্যসঙ্কল্পসমষ্টি জীবভাবাপন্নং সৎ স্বসংকল্পাধীনবৃত্তি ব্যষ্টি জীবভাবমাপদ্যতে। তত্র পূর্ব্বসঙ্কল্প বিরুদ্ধেহর্থে ন ব্যষ্টীনাং সত্যসঙ্কল্পতাসিদ্ধিরিতি।

ব্রহ্ম প্রথমে সত্যসঙ্কল্প সমষ্টি জীবভাবাপন্ন হয়েন। তাহার পরে সেই সত্যসঙ্কল্পতা বলে ব্যষ্টিজীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। ব্যষ্টি জীব কিন্তু সেই সত্যসঙ্কল্প

পুরুষের সঙ্কল্পাধীন বৃত্তি বিশিষ্ট। কাজেই ব্যষ্টিজীবে মহাজীবের সত্যসঙ্কল্পতা থাকিতে পারে না।

ব্যষ্টি বিভাগের পূর্ব্বে মহাজীব সত্যসঙ্কল্পই থাকেন। সেই সত্যসঙ্কল্পতা বশে তিনি দ্বিত্ব ভাব অর্থাৎ ব্যষ্টিবিভাগ প্রাপ্ত হয়েন। সঙ্কল্পে যে ব্যষ্টিভাব প্রাপ্তি তাহার সহিত স্থূল দেহধারী জীবরূপে স্থিতির পার্থক্য আছে।

কারণ সঙ্কল্প মাত্রে যে সৃষ্টি তাহা কিন্তু কুম্ভকার যেমন দণ্ড, চক্র, চক্র-ভ্রমণাদি ক্রিয়া ক্রমে সৃষ্টি করে সেরূপ নহে।

রাম—হিরণ্যগর্ভ পুরুষই সত্যসঙ্কল্প। ব্যষ্টি জীব সত্যসঙ্কল্প নহে বলিতেছেন। ব্যষ্টি জীব ক্রমিক ক্রিয়া অনুসারে কুম্ভকার যে ভাবে ঘট প্রস্তুত করে সেইভাবে কার্য্য করে। কিন্তু ঋষিগণ ক্রিয়া ক্রম ভিন্ন সঙ্কল্প দ্বারাই যে কার্য্য করেন ইহাও ত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

বশিষ্ঠ—ঋষিগণ সেই মহাপুরুষের ইচ্ছা দ্বারাই কার্য্য করেন। তাঁহারা ব্যষ্টি জীব হইয়াও সাধনা দ্বারা নিজের ইচ্ছাকে মহাজীবের ইচ্ছার সহিত মিলন করাইতে পারেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষি।

শক্ত্যা হ্যজাতয়া ব্রাহ্ম্যা নিয়মোঽয়ং প্রকল্পিতঃ ॥৭২॥

"ইহার এই ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক" প্রধান পুরুষের এই ইচ্ছা দ্বারাই ঋষিগণ ব্যষ্টিজীব হইয়াও সঙ্কল্প দ্বারা কার্য্য করিতে পারেন।

রাম। ব্যষ্টিজীবগণ সাধনা দ্বারা নিজ নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করিতে যখন সমর্থ হন তখনই তাঁহারা সমষ্টি জীবের ইচ্ছা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন।

ব্যষ্টি জীব অল্পশক্তিমান্ হইলেও সেই অল্পশক্তিও মহাজীবের সমষ্টিশক্তির অংশই বটে। কাজেই মহাশক্তির নিয়মন ব্যতীত জীবের ক্ষুদ্র শক্তিতে কোন কিছুই হয় না। মহাশক্তির অনুগ্রহ দ্বারা ব্যষ্টি জীবের ইচ্ছার কার্য্য হয় নতুবা হয় না। এই ভাবে মহাজীব ব্রহ্মাই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। ব্যষ্টিজীব যখন সেই মহাজীব হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবনা করে, করিয়া আপন আপন ক্ষুদ্র দেহে অভিমান করে—দেহই আমি এইরূপ বোধ করিয়া ফেলে তখনই সমষ্টি তাহার মৃত্যু সঙ্কল্প করেন। ব্যষ্টির কার্য্য দ্বারা সমষ্টির এই সঙ্কল্প। সে তখন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াই কালযাপন করে। সে মৃতই থাকে তবে কুম্ভকারের চক্র যেমন আদি-দত্ত শক্তির ক্ষয় হইলে থামিয়া যায় সেইরূপ বেগ শেষ হইলেই ইহার দেহ পতিত হয়।

রাম—ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত জীবের ইচ্ছার মিলন কিরূপে হয়? আরও ঈশ্বরের ইচ্ছাই বা কোন্‌টি জীবের ইচ্ছাই বা কোন্‌টি? জীবের সকল ইচ্ছা ত পূর্ণ হয় না? জীবের যে সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয় তাহাই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা আর যাহা পূর্ণ হয় না তাহাই কি জীবের ইচ্ছা? ইচ্ছার উৎপত্তি কোথা হইতে হয়? ইচ্ছা তত্ত্বতঃ আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে।

বশিষ্ঠ—ক্ষুদ্র দেহে আমি অভিমান করিলে জীবের যে সমস্ত ইচ্ছা জাগে সে সমস্ত ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। কিন্তু ক্ষুদ্র দেহে অভিমানবশতঃ যে সমস্ত ইচ্ছা জীবের হয় জীব যখন ঐ সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় তখন সে ঈশ্বর ইচ্ছার কার্য্য করে। অহং অভিমান ত্যাগ করিবার সাধনা যে যত করে সে তত বলিতে পারে—তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি। "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"; "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ—অর্থাৎ রাগদ্বেষের বশে যাইও না" সর্ব্বশাস্ত্রে এইরূপ ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ইচ্ছামত কার্য্য করিতে করিতে জীবের ক্ষুদ্র ইচ্ছা ত্যাগ হইয়া যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন চিত্ত পূর্ণ হয়, তখন জীবদেহে অহং অভিমান জনিত ইচ্ছার কার্য্য আর থাকে না। স্বাধ্যায় করাও ঈশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্য করা। এই ইচ্ছার কার্য্যেও ব্যষ্টির ইচ্ছা ত্যাগ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে গেলে যখন তাহা সম্পন্ন হয় না, তখন জানা উচিত ব্যষ্টিভাবে ইচ্ছা করিয়া করিয়া এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ঐ সঞ্চিত সংস্কার প্রাক্তন কর্ম্মরূপে বাধা দেয়। প্রাক্তন ক্ষয় হইলেই, সত্য সঙ্কল্প ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই কার্য্য হয়।

ব্যবহারিক জগতেও জীবের কখন কখন যে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহার মূলে পূর্ব্বসঞ্চিত ঐরূপ কর্ম্মসংস্কারের একটি শক্তি থাকে। সেই শক্তি দ্বারা মানুষ যখন চেষ্টা করে, তখন তাহার কু ইচ্ছাও সময়ে সময়ে ফল প্রদান করে। পরম পুরুষের ইচ্ছামত চলার চেষ্টাটাই পুরুষকার। কিন্তু অন্ত চেষ্টাও যাহা, তাহাতেও ঐ চেষ্টার অনুরূপ একটা বল থাকে। দেবতা অসুর উভয়েই এই শরীরে সংগ্রাম করে। কখন দেবতা জয় লাভ করেন, কখন অসুরও করে। যিনি এই উভয়ের তত্ত্ব জানিয়া সেই পরম শান্ত পরমপুরুষে স্থিতিলাভ করিতে পারেন, তিনিই এই সংসার-দুঃখ অতিক্রম করেন। স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণাপাণরূপী মুখ্য প্রাণকে প্রণব ভাবিয়া উপাসনা করিলে অসুরেরা জীবকে পাপবিদ্ধ করিতে পারে না।

রাম—এখন বলুন ব্যষ্টি জীব, সমষ্টিজীব বা মহাজীবের উপাসনায় কোন্ গতি লাভ করে?

বশিষ্ঠ—চেত্যসম্বেদনাজ্জীবো ভবত্যায়াতি সংসৃতিম্।
তদসম্বেদনাদ্রূপং সমায়াতি সমং পুনঃ॥ ৩৬॥

চিৎশক্তিই বহির্ম্মুখ হইলেই জীবভাব প্রাপ্ত হয় এবং সংসার অনুভব করে। আবার সেই চিৎশক্তি যখন বিষয় অনুভব বর্জ্জিত হয়, তখনই ব্রহ্ম হইয়া যায়।

চিত্তকে চিৎস্বরূপ রসের অনুভব করান এবং চিৎএ তন্ময় ভাব প্রাপ্ত করানই সাধনা বা উপাসনা। চিত্তটা আবার চিৎ হইতে প্রস্ফুরিত। আবার ঐ চিত্তে সমস্ত জগৎ প্রতিবিম্বিত।

চিতের যে স্বাভাবিক চমৎকারিতা অর্থাৎ অদ্ভুত সৃষ্টি-সামর্থ্য তাহাই চিৎশক্তি। চিৎ যদিও অক্ষয়, অব্যয়, নিত্য নির্ব্বিকার ও সর্ব্বদা একরূপ—তথাপি উঁহার বিচিত্র শক্তিতে সেই চিৎই বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন।

চিতের শক্তি আকাশ অপেক্ষাও দুর্লক্ষ্য। সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় চিৎশক্তিই অহং দেখাইতেছে। জলে যেমন জলতরঙ্গ প্রস্ফুরিত ও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেই আত্মাদ্বারা এই যে জগৎ তাহা অহং দর্শনের সীমা। অহং ভ্রমই জগদ্ভ্রমের মূল।

চমৎকারকরী চারু যচ্চমৎকুরুতে চিতিঃ।
স্বয়ং স্বাত্মনি তস্যৈব জগন্নাম কৃতং ততঃ॥ ৪৫॥

চিৎচমৎকারিতাই জগৎ—চিৎএর যে শক্তি তাহা চমৎকারিণী।

চমৎকারকারিণী এই শক্তির যে চমৎকারকরণ ব্যাপার, তাহাই এই জগৎ। আপন আত্মাতেই সেই শক্তি জগৎ তুলিতেছে।

আবার চিতের যে প্রথম চেত্য—প্রথম বহির্ম্মুখতা তাহাই অহং। সেই অহংতাটি আবার কল্পনা মাত্র। অহংটি জগতের বীজ। যাহার বীজ কল্পিত, তাহার ফলও কল্পিত মাত্র।

এই বিচারেও জগৎ কল্পিত। কল্পনার আবার দ্বিত্ব একত্ব বিচার কি?

সৎ অসৎ সত্যমিথ্যা এই সমস্ত কল্পনার মধ্যে তুমি আমি রূপ চেতন পরিচ্ছেদ কল্পনা নিতান্ত দুস্ত্যজ্য। যদি ত্যাগ করিতে পার তবে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে আর কোন বিকল্প থাকে না বলিয়া তাহা সৎমাত্র।

রাম—আবার বলুন জীবভাব ত্যাগ করিয়া আপনি আপনি ভাবে থাকা যায় কিরূপে ?

জীব হেত্বাদি সন্ত্যাগে স্বকাহংকেতি সন্ত্যজ।
শেষঃ সদসতোর্মধ্যে ভবত্যর্থাত্মকো ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

বশিষ্ঠ—জীবভাবের প্রতি যাহা হেতু তাহার নাম বাসনা কর্ম্ম ইত্যাদি। এইটি ত্যাগ করিতে হইলে সৎ ও অসতের মধ্যে যে তুমি আমি মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে, সেই তুমি আমি রূপ তুচ্ছ কল্পনা ত্যাগ করিতে হয়। তুমি আমি রূপ কল্পনা ত্যাগ হইয়া গেলে যে নির্ব্বিকল্প অবস্থা মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই আপনি আপনি ভাব।

রাম—কল্পনা ত্যাগ করিতে পারিলে আত্মভাবে স্থিতিলাভ করা যায় এই যে বলিতেছেন—ইহা কিরূপে হয় ?

চিতা যথাদৌ কলিতা স্বসত্তা সা তথোদিতা।
অভিন্না দৃশ্যতে ব্যোম্নঃ সত্তাসত্তে ন বিদ্যহে ॥ ৪৮ ॥

চিৎ যাহা তাহাই সত্তা। চিৎশক্তি যেটি সেটি সঙ্কল্প। সেটি অসত্তা। সত্তা ও অসত্তা এমন ভাবে জড়িত থাকে যাহাতে ইহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। যেমন নির্ম্মল ব্যোম সত্তায় মেঘ ভাসিয়া মেঘ ও ব্যোম সত্তা অভিন্ন মত দেখায় সেইরূপ। তাই বলা হইতেছে চিৎ বা জ্ঞানের দ্বারা যেমন যেমন সঙ্কল্প সেই চিত্তের উপরে ভাসে—তেমন তেমন সেই সঙ্কল্পগুলিই চিৎদীপ্ত হইয়া চিৎরূপেই প্রতীত হয়। যেখানে সঙ্কল্প তাহার মূলেই অধিষ্ঠান চৈতন্য, কাজেই সঙ্কল্প না জাগিলে আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদাই স্থিতিলাভ করা যায়। সকলই শূন্য, সাকার জগৎও শূন্য। চিৎচমৎকারিতাই সকলকে আকার দিয়াছে।

রাম—চিৎই তবে জগৎকে রূপ দিয়াছে ?

বশিষ্ঠ—চিতি আপনি আপনি যিনি তাঁহার নামরূপ নাই। তিনি সর্ব্বসাক্ষিণী। নামরূপ রহিত যে স্বরূপ তাহাই জগতের তাত্ত্বিকরূপ। আর চিতির নামরূপাদি যে নিকৃষ্ট ভাব তাহাই চেত্য। চেত্য হইতেই জগৎ স্ফুরিত হইতেছে। অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন চিৎ স্বরূপ হইতে জগতের নামরূপ ইত্যাদি কল্পিত মাত্র। চিৎই জগৎ রচনা করিতেছে এবং চিৎই জগৎ স্থিতির কারণ।

জগৎটা চিৎ হইতে জাত চিত্তের কল্পনামাত্র। চিৎ-ব্রহ্মের যে বিষয়-দর্শনশক্তি তাহাই জগদাকারে অবস্থান করিতেছে।

চিৎ হইতে চিত্তের স্ফুরণ হয়, চিত্ত হইতে আবার অহংএর স্ফুরণ হয়। সেই স্ফুরণ স্পন্দনক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণের যোগে জীবের উৎপত্তি করে। চিৎ হইতে চিত্ত জাগিলে তাহার বিকার যে অহংভাব তাহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে তবে জীবভাবের জন্ম হয়।

বাস্তবিক জীবভাবও যেমন কল্পিত জগৎও সেইরূপ অবাস্তব।

তুচ্ছতর কার্য্য কারণাদি নিয়ম বিশিষ্ট এই জগৎ চিৎপ্রকাশচ্ছটা মাত্র। ইহা চিৎপ্রকাশের প্রান্তভাগস্থ এক প্রকার প্রকাশ মাত্র। এই প্রকাশটা চিৎ-আশ্রিত মায়ার বিলাস। আবার যাহার যাহা বিলাস তাহা প্রকৃত পক্ষে সেই বস্তু। এই জন্য জগৎটাও মায়া। এই মায়ার উপশমে চিৎটিই পরমাত্মা।

মায়া-নিবৃত্তি ভিন্ন ব্রহ্ম-দর্শন নাই। আবার ব্রহ্মদর্শন ভিন্ন অনর্থ-নিবৃত্তিও হইতে পারে না।

অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে অনুভূত হয়:—

অচ্ছেদ্যোঽহমদাহ্যোঽহমক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽহমিতি স্থিতম্॥ ৬০॥

আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল এবং এক ভাবে অবস্থিত। মূর্খেরা ইহা না জানিয়া বিবাদ করে। অজ্ঞানাই দ্বৈত দেখে জ্ঞানী অদ্বৈতে স্থিতিলাভ করেন।

ফলে চিৎ পদার্থই সমস্ত সাজিয়াছেন। চিতির অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তির বিলাস যাহা তাহাই পুষ্পিত কাননের বসন্ত কান্তি। চিৎই ব্রহ্মাণ্ড, চিৎই বায়ু, চিৎই সূত্রাত্মা। ইহাই স্বর্ণরজতাদি রূপী, ইহা হইতেই দেবতা, অসুর, মনুষ্যাদির দেহ নির্ম্মিত। ইনিই বিচিত্র ওষধীর প্রকাশক জ্যোৎস্না; ইনি স্বয়ং প্রকাশ। দৃশ্যবস্তু যখন না থাকে তখন ইনি আপনি আপনি ভাবে থাকেন। জড়ভাব ধরিয়া ইনিই স্থাবরাদি জড় বস্তুতে, সুষুপ্ত-ভাব প্রাপ্ত হয়েন। ইনি অবিচারপরায়ণ হইয়া স্বকল্পিত স্পন্দস্বভাব প্রাণাদিতে আত্মাভাব কল্পনা করিয়া সংসারী হন। বিচারপরায়ণ হইয়া ইনিই অজ্ঞান আবরণ দূর করিয়া আপনি আপনি ভাবে থাকেন। ইনিই বিচারবলে দেখান—জগৎ নাই; অবিচারে দেখান জগৎ আছে। ইনিই অন্ধকার, ইনিই আলোক, ইনিই সব।

চিদগ্নেরৌষ্ণ্যং জগল্লেখা জগৎচিচ্ছঙ্খশুক্লতা—এই জগল্লেখা চিৎরূপ অগ্নির উষ্ণতা। এই জগৎ চিৎরূপ শঙ্খের ধবলতা। এই জগৎ চিৎ শৈলের জঠর। জগৎটা চিজ্জলের দ্রবতা। জগৎটা চিৎ ইক্ষুর মাধুর্য্য। জগৎ চিৎ ক্ষীরের স্নিগ্ধতা। জগৎ চিৎ হিমের শীতলতা। জগৎ চিজ্জালার জ্বলন। জগৎ চিৎ সর্ষপের স্নেহ, চিৎ সরিতের বীচি, চিৎ মধুর মাধুর্য্য, চিৎ কনকের অঙ্গদ। এই জগৎ চিৎপুষ্পের সৌগন্ধ। চিল্লতাগ্রফলং জগৎ। এই জগৎ চিৎলতার অগ্রফল।

চিৎসত্তৈব জগৎসত্তা জগৎসত্তৈব চিদ্বপুঃ ॥ ৭৫

চিৎসত্তাই জগৎসত্তা। জগতের সত্তা—জগতের অস্তিতাই হইতেছে চিতির শরীর।

ধত্তেন্তরখিলং শান্তং সন্নিবেশং যথা শিলা।
পদার্থনিকরাকাশে স্বয়মাকাশজো মলঃ ॥৮০॥

যেমন স্ফটিকশিলা পর্ব্বতনদ্যাদির প্রতিবিম্ব সন্নিবেশ অন্তরে ধারণ করে, সেইরূপ নির্ম্মল চিৎ এই অসৎ জগতের প্রতিভাস মাত্র ধারণ করে। বলিতেছি চেত্য নাই—ইহাতে মনে করিও না যে আমি চিৎও নাই বলিতেছি। চিৎ বা জ্ঞান যে আছে ইহা স্বানুভবসিদ্ধ। আমি দ্রষ্টা একথা সকলেই অনুভব করে।

দৃশ্য নাই ইহা যদি প্রথম প্রথম ধারণা করিতে না পার এবং দৃশ্যসত্তা বজায় রাখিতে যদি মহা আগ্রহ থাকে তবে দৃশ্য জগতের সহিত পরমাত্মার যে ভেদ তাহা দূর কর। সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সেইরূপ জগৎও পরমাত্মার বিবর্ত্ত ইহা সর্ব্বদা ভাবনা কর। করিয়া সমস্ত দৃশ্য জগৎকে পরমপদময় জানিয়া, চিৎ আছে বলিয়া দৃশ্যজগৎ আছে ভাবনা করিয়া, জগতের অস্তিত্ব স্বীকার কর। শ্রুতিও এই জন্য বলিতেছেন ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। ইত্যাদি।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসো জগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিতো জগাম।
স্নাতুং সভাকৃত নমস্করণা জগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥৮৬॥

ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে দিন ফুরাইয়া গেল। সায়ন্তন বিধি নির্ব্বাহ জন্য সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। সভাসদেরা নমস্কার করিয়া স্নান জন্য প্রস্থান করিলেন। আবার শ্যামাক্ষয়ে তাঁহারা রবি কিরণের সহিত সভাতে আগমন করিলেন।

মণ্ডপোপাখ্যান একখানি উপন্যাস। আমরা এই পুস্তক পৃথক্ ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য উৎপত্তি প্রকরণের ১৫সর্গ হইতে ৫৯ সর্গ পর্য্যন্ত পৃথক পত্রাঙ্ক দিয়া মুদ্রিত করিলাম। প্রতি পত্রের নিম্নে যোগবাশিষ্ঠের পত্রাঙ্ক থাকিবে। মণ্ডপোপাখ্যানের নাম করণ করা হইল লীলা উপন্যাস। ইতি।

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল। [৮ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

৭০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীপ্রমথনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৷০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সাল বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমনীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, অগ্রহায়ণ। ৮ম সংখ্যা।

শ্রুতিবাক্য—সন্ন্যাস সম্বন্ধে।

কর্ম্মত্যাগান্ন সংন্যাসো ন প্রেষোচ্চারণে নতু।
সন্ধৌ জীবাত্মনোরৈক্যং সন্ন্যাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বমনাহারবৎ যস্য ভাতি সর্ব্বেষণাদিষু।
তস্যাধিকার সন্ন্যাসে ত্যক্তদেহাভিমানিনঃ॥
যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্ব্বেষু বস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেৎ বিদ্বান্ অন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
দ্রব্যার্থং অন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা।
সংন্যসেৎ উভয়ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্তুমর্হতি॥

* * * *

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত শাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ॥

* * * *

অদ্বৈতভাবনা ভৈক্ষং অভক্ষ্যং দ্বৈতভাবনম্।
গুরুশাস্ত্রোক্তভাবেন ভিক্ষোর্ভৈক্ষং বিধীয়তে

বিদ্বান্ স্বদেশমুৎস্রজ্য সংন্যাসানন্তরং স্বতঃ।
কারাগার বিনির্ম্মুক্ত চোরবৎ দূরতো বসেৎ ॥
অহঙ্কারসুতং বিত্ত ভ্রাতরং মোহমন্দিরম্।
আশাপত্নীং ত্যজেৎ যাবৎ তাবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥
মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।
সূতকদ্বয় সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥
হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি নচোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥
একামেবাদ্বিতীয়ং যৎ গুরোর্ব্বাক্যেন নিশ্চিতম্।
এতদেকান্তমিত্যুক্তং ন মঠো ন বনান্তরম্ ॥
অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াবিষ্ট চেতসাম্।
ন মুক্তির্জন্ম জন্মান্তে তস্মাৎ বিশ্বাসমাপ্নুয়াৎ ॥

যাহারা উচ্চ অধিকারী।

প্রথম কার্য্য ঃ—শয্যাকৃত্য, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃস্নানাদি শেষ করিয়া যথাকালে প্রাতঃসন্ধ্যা করা। যদি অন্য কিছু করা অভ্যাস থাকে তাহাও করা।

দ্বিতীয় কার্য্য ঃ—একান্তে সুখাসনে উপবেশন কর। বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যক্ আত্মায় প্রবাহিত কর। প্রত্যক্ আত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিলে মন তাহাতেই লগ্ন হইবে। আত্মার সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করিতে হইবে তাহা এই ঃ—

(১) আত্মা চেতন জড় নহেন। আত্মাই আমি। আমি চেতন আমি জড় নই। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে যতদূর পার মৌন থাকিতে অভ্যাস কর।

(২) আমি জন্মি নাই আমার মরণও নাই। দেহ নষ্ট হইলেও আমি যাহা তাহাই আছি, তাহাই থাকিব। দুঃখ বলিয়া কোন কিছুই আমার নাই।

(৩) আমি দ্রষ্টা, আমি সাক্ষী; আর দৃশ্য যাহা তাহাই জড়। দ্রষ্টা যিনি তিনি মৌনই। মৌন হইয়া যতক্ষণ পার থাক।

(৪) দেহ, মন, মনের সঙ্কল্প বিকল্প সমস্তই জড়। ইহারা বাস্তবিক নাই। রজ্জু যখন সর্প মত দেখা যায় তখন যেমন সর্পটা সত্য সত্যই নাই রজ্জুই আছে, তেমনি একমাত্র সত্য বস্তু যে আত্মা তাহার উপর ভ্রমজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানে দেহ মন জগৎ ইত্যাদি ভাসিয়াছে। আমি জন্মিয়াছি, আমার জন্মভূমি অমুক দেশ, আমার দেহ, আমার মন, আমি বালক ছিলাম, যুবা হইয়াছি, বৃদ্ধ হইব, আমি মরিব, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, ভয় মৈথুন আছে, আহার নিদ্রা আছে; যে জন্মে নাই তাহার এ সব কি? এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে ইন্দ্রজাল উঠিয়াছে মাত্র।

এই সমস্ত চিন্তা দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি মিথ্যা বিষয় ছাড়িয়া প্রত্যক্ আত্মার দিকে ছুটিবে।

তৃতীয় কার্য্য :—পরে বিচার কর আমি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা করা যায় সবই প্রকৃতি। আর যতদিন ভ্রমজ্ঞানে এই প্রকৃতি দেখা যায় ততদিন আমি তাহার দ্রষ্টা। কিন্তু ভ্রমজ্ঞান দূর হইলেই দেখি দৃশ্য দর্শন বলিয়া কিছুই নাই। আমিই আমি। এই আপনি, আপনি ভাবে স্থিতিই জ্ঞান। ইহাই অদ্বৈতাবস্থা। ইহাই মুক্তি।

৪র্থ কার্য্য :—যতদিন এই জ্ঞানে স্থিতি না হইতেছে, যতদিন এই অবস্থায় মনকে বসাইতে না পারিতেছ ততদিন ঐ চেষ্টার পরে হৃদয়কমলে অষ্টদশ জ্যোতির পদ্মে নামিয়া আসিয়া তাহার উপরে রমণীয় দর্শনকে উপবেশন করাও। চরণ-কমল হইতে মুখ-কমল পর্য্যন্ত রমণীয় মূর্ত্তিটি মনে মনে আনিতে থাক। সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত মূর্ত্তিটির যখন যে অঙ্গে মন আটকাইয়া যায় তাহা লইয়াই যতক্ষণ পার থাক। তার পরে প্রকৃতির সহিত এই পরমপুরুষের বিহার লীলা ভাবনা কর। কখন বা ঘোরা প্রকৃতির সহিত এই পরম পুরুষের সংগ্রাম-লীলা ভাবনা কর। কখন বা ভক্তের সহিত ইহার শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবনা কর। ফলে সংসারটা পার হইয়া গিয়া সূর্য্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধরশ্মি দিয়া কাটাকাটি ত্রিভুজের ভিতরে ত্রিকোন মণ্ডলে আসিয়া সুধা সমুদ্রের তীরে আগমন কর। পদ্ম ভাসুক। তাহার উপর উপবেশন করিয়া মণিদ্বীপে আইস। সেখানে সে হস্তে ধরিয়া নিজস্থানে লইতেছে, ভাবনা কর। সেখানে কখন একা, কখন বহু হইয়া খেলা কর। শেষে আবার স্থিতিতে আইস।

প্রিয়-সম্ভাষণ।

ব্যাকুল হিয়ার নিবেদন যত—
ওগো! তোমারে বুঝাব কত?
অন্তর্যামী তুমি হৃদয়ের ভাষা—
আছ সকলি ত অবগত।
তবু কেন প্রিয়? চাহ মুখপানে—
ইঙ্গিতে কি জানাও আভাষ!
ইচ্ছাময়ে আছে কোন ভাবাভাব,—
তোমাতে কি জাগে অভিলাষ?
আমি যত চাহি—লুকাতে তোমারে—
তুমি চাহ আমার প্রকাশ—
ভক্তাধীন, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ তরে—
গলে পর বন্ধনের ফাঁস।
এত শুধু তব বন্ধন স্বীকার—
চিত্ত পরে মিথ্যা অভিমান,
নহে নিত্যমুক্তে কে বাঁধিতে পারে—
অন্তর্যামী, জান কত ভান।

মৃঃ......

স্বামী স্ত্রীর কথা।

স্ত্রী। তোমায় বলিতে আমার বাধা হইবে? আর আমার কে আছে?

স্বামী। আচ্ছা সকল কথা সরলভাবে খুলিয়া বল। ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা যাহা শিখিয়াছ নিঃসঙ্কোচে বলিতে হইবে। কেন হইবে না নিশ্চয়ই হইবে। আমি প্রাণপণ করিব। যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ চেষ্টা করিবই।

স্ত্রী। দেখ তোমার মতন এমন গুরু, এমন সখা, আর আমার কে? আমার সবই তুমি। তুমি আমার আছ তথাপি আমার দুঃখ গেল না। আমি সকল কথা খুলিয়া বলিব।

স্বামী। বল! নিশ্চয়ই আমি তোমার দুঃখ দূর করিব।

স্ত্রী। আমি বলিতেছি। শোন! দেখ কতদিন—কতদিন সংসার লইয়া রহিলাম। কৈ ঠিক হইলাম? শোক তাপও ত কত পাইলাম, কৈ ভাল হইলাম কৈ? সেই কখন ভাল, কখন মন্দ। সেই কোন দিন হওয়া কোন দিন না হওয়া। কৈ স্থায়ী কোন কিছু লইয়া থাকিতে পারিতেছি কৈ?

বল আমার কি হইবে? কত কি ত করিয়াছি। মরণ মূর্চ্ছায় কোন্ বাসনা জাগিবে কি করিয়া বলিব? হায়! আবার কোথায় যাইতে হইবে কি করিয়া বলিব?

লোকে নিশ্চিন্ত হইতে বলে। কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? লোকহিতকর কার্য্য কিছু কিছু করিয়া লোকে ভাবে তোমার প্রিয়কার্য্য করা হইল! এই জন্যই আসিয়াছি। ইহা করিলেই সব করা হইল?

তোমার আজ্ঞা ত ইহা নয়। শত লোক লোকহিতকর কার্য্য করে কিন্তু "অহঃরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" তোমার এ আজ্ঞা যদি লংঘন করা হয় তবে লোকহিতকর কার্য্যে কি হইবে? সামান্য একটু পুণ্যসঞ্চয় হইবে মাত্র। তাহাতে যম যাতনা ছুটিবে কিরূপে? তাহাতে মৃত্যু সংসার সাগর অতিক্রম করা যাইবে কিরূপে? তাহাতে আবার এই দুঃখময় অজ্ঞান সংসারে পতিত হওয়া বন্ধ হইবে কিরূপে?

এখন আমার উপায় কি? কৈ আমার প্রাণ শান্ত হইল কৈ? আমার পূর্ব্ব-কালিমা মুছিয়া গেল কৈ? কৈ আমার অসম্বন্ধ প্রলাপ ছুটিল কৈ? কৈ আমার ভাগ্যে নিত্য তোমা সঙ্গ ঘুটিল কৈ? আমার দুঃখের অন্ত হইল কৈ? কৈ সংসারে কাহাকেও পাইয়া অনুরাগ, কাহাকেও পাইয়া বিরাগ গেল কৈ? কৈ রাগ দ্বেষ ছুটিল কৈ? তবে কি হইল?

তবে কি রাগ দ্বেষ কখন যায় না? তবে কি চিত্তশুদ্ধি চিরতরে হয় না?

না না, তা কি হইতে পারে? তুমি যে বলিয়াছ রাগ দ্বেষ যায়! তুমি যে বলিয়াছ চিত্তশুদ্ধি হয়! ইহার জন্য তেমন যত্ন কৈ হইল? সম্যক যত্ন করিলে সবই যে সিদ্ধ হয়।

তোমায় লইয়া থাকিলে, নিরন্তর লইয়া থাকিলে—মৃত্যু সংসারসাগর ত থাকে না; বিষয় সাগর ত শুখাইয়া যায়। তোমায় লইয়া থাকিলে বিষয় ত গলিয়া যায়। সর্ব্বত্রই

তুমি দেখা হইয়া যায়! তাহা হইল কৈ? সর্ব্বত্রই যদি দেখা হইত তবে ত ভাবনা ছিল না। সংসার ত তখন দুঃখের হইত না। সংসার তোমার উপরে ভাসিয়াছে ইহা যদি দেখা হইত তখন সংসার যাহা দেখাক না কেন তাহার ভিতরে তোমাকে দেখিয়া কোন কিছুই ভয় ত থাকিত না। তাহা ত হইল না। আর কবে হইবে? তবেই ত সব অজ্ঞান রহিয়া গেল। স্মৃতিতে ত সব রহিয়াছে? কোনটি ভুলিয়াছি? যত যত অন্যায় হইয়া গিয়াছে স্মরণ করিলেই ত সব আসে? স্মরণও করিতে হয় না। সংসারে সেইরূপ কিছু দেখিলেই ত আপনা হইতে স্মরণে আইসে। কৈ তবে তোমায় লইয়া থাকা হইল? কৈ তবে তেমন করিয়া নিরন্তর তোমায় লইয়া থাকিলাম যাহাতে আর সব ভুল হইয়া গেল? তবে আমার উপায় কি? কেমন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব?

আর জ্ঞান! তুমি বলিতেছ সব মিথ্যা। একমাত্র তুমিই আছ ইহাই খাঁটি সত্য। স্থানুকে মানুষ দেখার মত তোমাকে জগৎ ভাবে দেখা বা সংসার ভাবে দেখা ইহাই সত্য। স্থানুই আছে মানুষটা সত্য সত্যই নাই। আমার এই দেহটা ও এই মনটা রজ্জুর সর্পভাসার মত অজ্ঞানে ভাসিয়াছে মাত্র সর্প কোথাও নাই ইহারাও নাই। ইহা ত বুঝিলাম ইহা ত বিশ্বাস করিলাম তোমার কথা বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু এই মানিয়া লওয়াই কি জ্ঞান? হায়! সংসারের সকল দুঃখ, সকল রাগ দ্বেষ, সকল আধি ব্যাধি, সকল ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা বিশ্রাম রহিল অথচ আমার জ্ঞান হইল ইহা কি জ্ঞান? না না ইহা ত আত্ম প্রতারণা মাত্র।

মিথ্যা সংসার, মিথ্যা জগৎ মুখে বলিতেছি মাত্র। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের কথা মানিয়া লইতেছি মাত্র কিন্তু সর্প দেখিয়া ভয়ও হইতেছে, পলায়নও করিতেছি, সর্পকে বিনাশ করিবার জন্য কৌশলও করিতেছি। কৈ তবে ইহাকে মিথ্যা বোধ হইল?

ব্যাখ্যা ত করিতে শিখিলাম অনেক। লোককে ত বুঝাইতে শিখিলাম অনেক। কিন্তু সত্য তুমি—তুমিই মাত্র আছ; সাপ, বাঘ, কর্কশ বাক্য, নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার, নিতান্ত কঠিন ব্যবহার, দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা, রোগের আকুলি ব্যাকুলি কৈ এই সব মিথ্যা বোধ হইল কিরূপে? তবে আমার অজ্ঞান দূর হইল কৈ?

আমি আত্মা—আমার জন্ম হয় নাই মরণও নাই ইহা স্থির ধারণা হইল কৈ? আমার কাম ক্রোধ নাই, লোভ মোহ নাই, জনম মরণ নাই—এ সমস্ত মিথ্যা। ইহা হইল কৈ?

ভ্রম জ্ঞানে—রজ্জুতে সর্প ভাসার মত দেহটা মনটা কল্পনায় ভাসিয়াছে, বাস্তবিক এগুলা সত্য নহে, কল্পনা; পুনঃ পুনঃ কল্পনা করায় ইহারা সত্যমত হইয়া গিয়াছে, এ সব তোমার কথা মানিয়া লইয়াছি মাত্র। কিন্তু কবে স্থির ধারণা হইল যে আমি জন্মিয়াছি, আমার জন্মস্থান আছে, আমার বালিকা অবস্থা ছিল, যুবতী অবস্থা আসিয়াছে, বৃদ্ধাবস্থা আসিবে, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব আছে—এ সমস্ত ভুল কথা। কৈ ভুলকে ত্যাগ করিলাম? ভুলকে ভুলিলাম না, ভুলের কার্য্যও ত্যাগ হইল না তবে আমার কোন জ্ঞান হইল?

হায়, একি আত্ম প্রতারণা! জীবন থাকিতে থাকিতে একবারও তোমাতে স্থিতি হইল না। মরিলেই তবে তোমাতে স্থিতি হইবে এ কথা বলি কিরূপে?

একটু আশা হয় সত্য। মনে করি যতদিন দেহটা আছে ততদিন এইগুলি যাইবে না। কারণ জীবন মুক্তির জন্য তোমাকে নিরন্তর লইয়া থাকিবার সাধনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু বাসনা ত কোন প্রকার নাই। সবই ত অস্থায়ী, সবই ত ক্ষণস্থায়ী ইহা ত প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি। কোন কিছু ভোগের ইচ্ছা ত নাই। ভোগ কিছু আসিয়া পড়িলে ক্ষণিক আসক্তি আসে বটে সেটা এই দেহ আছে বলিয়া। দেহ না থাকিলে আসক্তি আর কিসের হইবে? এই দেহ ছুটিয়া গেলেই আমি মুক্ত হইব, এই এক আশা হয়। কিন্তু ইহা কি নিশ্চিন্ত অবস্থা? কৈ তেমন বৈরাগ্য? আর কিছু দেখিব না, আর কিছু করিব না, আর কোথাও যাইব না, আর কোন বাসনা নাই ইহাও কি ঠিক হইয়াছে? যদি বিন্দু মাত্র আসক্তিও থাকে সেই আসক্তি পুষ্ট হইয়া আবার এইবারের মরণ মূর্চ্ছায় কি জাগাইবে তাহা জানিব কিরূপে?

কাহাকেও কিছু বলিতে ইচ্ছা নাই; কিন্তু লোকে ধরিলে বলি। আবার এই অভ্যাস প্রবল হইয়া গেলে মনে হয় আহা! ইহাতে দশের উপকার হয় করা উচিত বলিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াও ত করিয়া ফেলি? ইহাও ত আসক্তি ইহাও ত তোমাকে ভুলিয়া থাকা। তোমাকে মনে রাখিয়া যদি সব করিতে পারিতাম তবে বুঝিতাম সব করিয়াও কিছুই করিতেছি না। যদি তোমার ভুল না হইত তবে ত সবই হইত। তাহা কি হয়? তবে আমার উপায় কি বল?

মনকে না হয় ফাঁকা করিয়া রাখিলাম। না হয় কোন কিছু দেখার সাধ নাই, কোথাও যাইবার সাধ নাই, কোন কিছু ভোগের বাসনা নাই। ইহা হইল। যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে না হয় স্পন্দিত হইলাম। যেন অন্যের দ্বারা

প্রেরিত হইয়া অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করার মত কিছু করিলাম। না হয় বৈরাগ্য বেশ করিয়া অভ্যাস করিলাম। কিন্তু মনকে শুধু ফাঁকা করিয়া রাখিলেই ত তোমায় লইয়া থাকা হইল না। আপনি আপনি ভাবে থাকা ত সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। ইহা হইলে ত দেহ আছে বা নাই ইহার কিছুই বোধ হইবে না! যখন একান্তে চুপ করিয়া থাকি তখন সব ভুলিয়া তোমায় লইয়া অথবা আপনি আপনিভাবে থাকি কৈ? তোমায় লইয়া থাকাটি ভক্তি মার্গ। আবার তোমায় লইয়া থাকিতে থাকিতে যখন আপনি আপনি ভাবে থাকা হইয়া যায় সেইটি জ্ঞানমার্গ এই দুয়ের কোনটিই ত হইল না। বল এখন কি করিব? তোমার শরণাপন্ন হইয়া সব করিলে তুমি হাত ধরিয়া মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দাও। সত্যই ইহা বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার শরণাপন্ন যে হইয়াছি তাহা ত সকল সময়ে মনে রাখিতে পারি না।

আমার দুঃখের কথা বলিলাম। এখন তুমি ভিন্ন ত আর গতি নাই।

স্বামী। সবই ত শুনিলাম। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্।

অদ্য এই অবস্থা লইয়া তুমি এখুনি তোমার নিত্যকর্ম্ম করিতে যাও। করিয়া দেখ কিরূপ হয়। পরে কাল আবার আরম্ভ করিব।

স্ত্রী তখন স্বামীকে প্রণাম করিল। স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্ত্রী আপন গৃহে গেল। স্বামীও নিজ কার্য্যে মনোযোগ করিলেন।

বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র নন্দন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৈষ্ণবচূড়ামণি ভক্তাগ্রগণ্য নরোত্তমদাস ঠাকুরও তাঁহার প্রার্থনায় "কৃপা কর আগেসরি, লহ মোর কেশে ধরি," আবার অন্যত্র "পুনঃ যদি দয়া করি এ জনার কেশে ধরি টানিয়া তুলহ ব্রজধামে"। ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, তাই বলিতেছিলাম কেন এমন হয়?

যে বংশীধ্বনি প্রতীক্ষায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, সে বংশীধ্বনিতে এমন হইল কেন?

এলাইল নীবিবন্ধ খসিল কবরী।
ললিতার করে ধ'রে বলে হরি হরি ॥

আহা! আজ বড় আশা করিয়াই সকলে একত্র হইয়াছেন, বড় আশা করিয়া ললিতা শ্রীরাধিকার বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন সকলেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনা-শায় আনন্দিত হইয়াছেন, সকলেই ভাবিতেছেন কখন বাঁশী বাজিবে, আজ যে শ্যামসুন্দরের সঙ্কেত বাঁশী।

বাঁশী তো বাজিল, বাজিল যদি তবে একবার বাজিয়া চুপ করিল না কেন? এরূপ অবিরাম বাজিলে, আর তো শ্রীরাধিকা অভিসারে যাইতে পারিবেন না, এত সাধের অভিসারবেশ সব যে বিফল হইবে।

ক্রমে শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল, তিনি ললিতার গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন। বুঝি আর একটী মাত্র কথা কহিবারও সাধ্য নাই, তাই বড়ই কাতর হইয়া বংশী প্রতি কহিতেছেন।

বেহাগ।

ওরে বাঁশী ধীরং।
ধীরং ধীরং ধীরং ধীরং ॥ ধ্রু ॥
তুমি সকল গোপীর নাম জান।
তবে রাধা নামে ডাক কেন?
যে শ্যামের বাঁশী তুমি, সেই শ্যামের দাসী আমি,
(তুমি আমা হ'তে প্রিয়তর)
(তুমি সদা কৃষ্ণমুখের সুধা খাও)
তবে বল বাঁশী?
তুমি কৃষ্ণমুখের সুধা খাও।
তবে এত অনল কোথা পাও?

বাঁশী! তুমি ধীরে বাজ, এমন ক'রে বাজলে যে আর যাইতে পারিব না। বাশী! তুমি কি জান না যে আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসী, তুমি সর্ব্বক্ষণই শ্যাম সঙ্গে বাস কর, অহরহ তাঁহার অধরামৃত পান কর, কিন্তু, তথাপি তোমার এ বিপরীত—দেখি কেন? অমৃত পান ক'রে গরল উগ্দার তো কৈ কখনও শুনি নাই বাঁশী।

লাজ-ভয় হেমাগার, গুরু-গৌরব সিংহদ্বার,
ধর্ম্মের কপাট ছিল তায়।
কিন্তু কালবরণ মেঘ হ'তে, ঐরূপ রাধা রবে
বংশীধ্বনি বজ্রাঘাৎ, প'ড়েছিল অকস্মাৎ,
সমভূমি করিলা আমার ॥

তাই বলছি, বাঁশী! আমার সবই ছিল, কিন্তু এখন আর কিছুই নাই, আমার বলিতে এক প্রাণ ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই, এই প্রাণ মাত্র লইয়া সেই কালবরণের নিকট গমন করিব বলিয়া এই গভীর অন্ধকারকেও উপেক্ষা করিয়া অভিসার করিতেছি, এ সময়ে শ্যামদাসী বলিয়া, কোথায় তুমি আমার সাহায্য করিবে, তা না ক'রে কিনা তুমিই আমার অন্তরায় হইতেছ? বাঁশী তোমার পায়ে ধরি তুমি ধীরে বাজ, আমাকে যাইতে দেও, দোহাই তোমার, তুমি ধীরে বাজ।

শ্রীমতীর কাতর প্রার্থনা বুঝি বাঁশীর কর্ণে পৌঁছিল, বাঁশী নীরব হইল, বাঁশী নীরব হইল বটে, কিন্তু শ্রীমতীর সে অবসন্নতা এখনও যায় নাই, তাই—

পরোজ।

চল চল সখি, কি আর বিলম্ব,
ললিতার লহ ব'লে।
শ্রীহরি বলিয়া, উঠল ধ্বনি,
ধরি সখী ভুজ মূলে ॥
মণি দরপণ, জল ভাজন,
গুণমঞ্জরী মেল।
সম্পূট করি, তাম্বুল ভরি,
গুণ চুরহি দেল ॥

ললিতার স্কন্ধে ভর দিয়া শ্রীমতী দাঁড়াইলেন, ললিতা তখন চন্দ্রহার ও চরণের নুপুরাদি অলঙ্কারগুলি পরাইয়া দিলেন।

বেহাগ।

সাজল ধনি, চন্দ্র বদনী, শ্যাম দরশন আশে।
সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিনী সবে, ঘেরল চারি পাশে ॥

তরুণারুণ, চরণ যুগল, মঞ্জীর তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলী, পুঞ্জপুঞ্জ, গুঞ্জরে মধু লোভে॥
কুম্ভে কুম্ভ, জিনি নিতম্ব, কেশরী ক্ষীণ মাঝে।
নীলাম্বর, পট্টাম্বর, কিংকিনী তঁহি বাজে॥
বাহুযুগল, থির বিজরী, করিশাবক শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ, মণিকঙ্কন, নখরে শশীখণ্ডে॥
সমাচল, কুচমণ্ডল কাঁচলি তঁহি শোভে।
চন্দ্রকান্ত, ধবাং দমন, কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জাম্বুনদ, হেমযুত, মুকুতা ফল পাঁতি।
ফণী মণিযুত, দাম সহিত, দামিনী সম ভাতি॥
বিম্বফল, নিন্দি অধর, দাড়িম বীজ দশনা।
বেশর তঁহি, দোলকে ঝলকে, মন্দ মন্দ হসনা॥
নাসাতিল, ফুলতুল, কবরী করবী ছাঁদে।
মদনমোহন, মোহনী ধনি, সাজলি তঁহি রাধে॥
নব যৌবনী, চন্দ্রবদনী, বৃন্দাবন বাটে।
মাধবেন্দ্র পুরি, রচিত ভাষ, বর্ণি পূর্ণি পাটে॥

সঙ্গিনী সকলে পরিবৃতা হইয়া শ্রীমতী রাধিকা এইবার যাবট হইতে বাহির হইলেন, সকলেরই সমান বয়স এবং সকলেই যুবতী। এই নবযৌবনী গোপাঙ্গনারা সকলেই উপযুক্ত বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া শ্রীমতীকে মাঝে লইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতেছেন, বড় সুন্দর দেখাইতেছে।

বেহাগ।

জয় জয় বৃষভানু সুকুমারী।
মুঞ্জ বিকচ কুসুমপুঞ্জ, মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ,
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন, মঞ্জুল কুলনারী॥
ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ, মালতীফুল মালে রঞ্জ,
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নি, খঞ্জন গতি হারি।
কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ,
কিঙ্কিনী কর কঙ্কন মৃদু, ঝঙ্কিত মনোহারী॥

নাচত যুগভুরু ভুজঙ্গ, কালীয় দমন দমন রঙ্গ,
সঙ্গিনী সব সঙ্গে পহিরে, রঙ্গিম নীল শাড়ী।
দশন কুন্দ কুসুম নিন্দ, বদন জিতল শারদ ইন্দু,
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে, প্রেমসিন্ধু প্যারি॥
ললিতাধরে মিলিত হাস, দেহ দীপত তিমির নাশ,
নিরখি রূপ রসিক ভূপ, ভুলল গিরিধারী।
অমরাবতী যুবতী বৃন্দ, হেরি হেরি পড়ল ধন্দ,
মন্দ মন্দ হসনানন্দ নন্দন সুখকারি।
মণি মাণিক নথ বিরাজ, কনক নুপুর মধুর বাজ,
জগদানন্দ স্থল জল রুহ, চরণক বলিহারি॥

শ্রীনিঃ –

সম্বল।

করেছি সম্বল যাহা জীবনের তরে।
পার হ'তে মরুভূমি খর দিবাকরে।
সে কেবল অশ্রুবিন্দু মরমের সার।
দিবাদগ্ধ সায়াহ্নের প্রীতি উপহার।
হৃদয়ের গুপ্তধন, জননীর পদরজ,
দেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল।
তাই যদি শিরে পড়ে,——
অসহায়ে এক দিন ;
বিশ্বে তার নাহি কিছু ভুল।

শ্রীহঃ——

বর্ণাশ্রম বা অভয় ব্যবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বলিয়াছ কেন! তুমিই ত উচ্চতম আদর্শের শীর্ষে আরোহণ করিয়া বজ্রনিনাদে বলিয়াছ "মা ভৈঃ!! আর ভয় নাই। আমি পথ দেখাইতেছি চলিয়া আইস— 'অমৃতের সন্তান তোমরা, তোমাদের মরণের ভয় কি! তোমাদের চমৎকার অন্নচিন্তারই বা কি ভয়!' বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে প্রবেশ কর, পথ সুগম হইবে, শত অনর্থের মূল ঐ ঈর্ষ্যামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে না, অন্নচিন্তাও থাকিবে না, মৃত্যুভয়ও থাকিবে না। শ্রম বিভাগের নিত্য নূতন ব্যবস্থার জন্য মাথা ঘামাইতে হইবে না, ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার জন্য শ্রমবিভাগের নিত্য অভিনব স্বতন্ত্রতা করিয়া কাহাকেও ধনী বা কাহাকেও গরীব করা হইবে না। তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি? তোমার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্যই তুমি সংসার বাঁধ। গডডলিকার মত ধাইও না। চলিয়াছই ত। একটু দাঁড়াও, একটু চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি কোথায় ছিলে এখন কোথায় নামিয়াছ! কোথায় তোমার অতীত অভয়স্থান আর কোথায় এখন তোমার ভয়াকুল অবস্থান!"

বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণ তপস্যা, অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান, ও যজন দ্বারা পারলৌকিক সম্বল যোগাড় করেন, প্রতিগ্রহ ও যাজন দ্বারা অন্নের সংস্থান করেন। ক্ষত্রিয়, অধ্যয়ন, যজন ও রাজধর্ম্ম পালন দ্বারা পরকালের কাজ করেন রাজ্য দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বৈশ্য অধ্যয়ন ও যজন দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন এবং কৃষি বাণিজ্য ও গোপালন দ্বারা অন্নের সংস্থান করেন। শূদ্র দ্বিজাতি সেবা ও শিল্প কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম ও খাদ্য সংগ্রহ করেন। কেমন সুন্দর ব্যবস্থা। মানুষ উত্তরোত্তর কর্ম্মের অধিকারী হইবার জন্য দশটী সংস্কারের মধ্য দিয়া আইসে। প্রতি সংস্কারেই বিভিন্ন বর্ণের কিনু কিছু প্রাপ্তিযোগ উপস্থিত হয়। মরিলেও মানুষ পরের অন্ন যোগাইতে বিরত হয় না। বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি দান কার্য্যের হেতুভূত হইয়াও শ্রাদ্ধাদির বিষয়ীভূত বা হেতুভূত হইয়া মরিয়াও মানুষ অপরের খাদ্য যোগাইতে ক্ষম। এ ব্যবস্থা বর্ণাশ্রমদের। হিন্দুর সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা আরও পরিষ্কার হইবে।

হিন্দুর সংসার একটী মহাযজ্ঞের স্থান। আজকাল হিন্দু-গৃহে যে সংসার দেখা যায়, তাহা প্রকৃত সংসার নহে। হিন্দুর সংসারে নিয়ত যজ্ঞ হইতেছে। এখানে যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং বিশ্ববাসী বিরাটপুরুষ ভগবান্; যজ্ঞের পুরোহিত গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিনী; যজ্ঞের হোতা অর্থাৎ হোমকর্ত্তা কুলবধূ; হোতা এবং হোম-কর্ত্তা না বলিয়া হোত্রী এবং হোমকর্ত্রী বলিলেই ঠিক হয়। এই সংসারের যজ্ঞ নিষ্কাম যজ্ঞ; ইহা কামনা শূন্য অথচ ইহাতে সর্ব্বপ্রাণী তর্পণরূপ মহা-তর্পণ সাধিত হয়। হিন্দুর যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহা এইস্থানে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অপেক্ষা এ যজ্ঞ সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ। সে যজ্ঞে অন্নপূর্ণা স্বয়ং পাচিকার কার্য্য করিয়াছিলেন, এ যজ্ঞে তিনি কুলবধূরূপে হোত্রীর কার্য্য করিতেছেন।

এই গেল সংসারের একদিক। অন্যদিকে হিন্দুর সংসার বারটী মাসে তেরটী পর্ব্বের, তেরটী পুণ্যাহের অবতরণ ক্ষেত্র। এই তেরটী পর্ব্ব হিন্দুগৃহস্থের সংযমশিক্ষাদাতা, ভগবানের নাম স্মরণ কারক। প্রতি পর্ব্বে বিশ্বতোমুখী অনন্ত পুরুষের এক একটী বিভূতির পূজা হয়। এ পূজার সঙ্গে যথাসাধ্য প্রাণী ভোজনও সম্পন্ন হয়। সুতরাং দেখিতে গেলে এটীও নৈমিত্তিক যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান; এ যজ্ঞের মূলেও মহাতর্পণের বীজ রোপিত।

সংসার অর্থাৎ জগৎ বিনাশের একটী মহাক্ষেত্র, এখানে প্রতিনিয়ত সংহার চলিতেছে। আমাদের সংসারও এই জগৎ-সংসারের প্রতিচ্ছায়া। সুতরাং এখানেও জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে প্রাণীহিংসা চলিতেছে। কিন্তু অহিংসা, সর্ব্বজীবে দয়া, সৃষ্ট-পদার্থনিচয়ের তর্পণ যাহাদের জীবনের একটী প্রধান অবলম্বন, তাঁহারা কি এই অবাধ সংহারতন্ত্রের পোষক হইতে পারেন। তাই তাঁহারা বিনষ্ট প্রাণীর আত্মার তৃপ্তির জন্য পঞ্চযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। প্রতি হিন্দু-পরিবারের এই পঞ্চযজ্ঞ প্রত্যহ কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং জ্ঞানানুশীলন—ব্রহ্মযজ্ঞ; পিতৃপুরুষদিগের প্রীতি উদ্দেশ্যে তর্পণ দানাদি—পিতৃযজ্ঞ; দেবপূজা—দেবযজ্ঞ; পিপীলিকা প্রভৃতি ক্রীমি কীট ও পশুপক্ষ্যাদির জন্য অন্নদান—ভূতযজ্ঞ; মনুষ্যদিগকে ও অতিথিকে তৃপ্তি মত ভোজন করান—মনুষ্যযজ্ঞ। ধার্ম্মিক গৃহী অর্থাৎ নিষ্ঠ হিন্দু সংসারী প্রত্যহ এই পাঁচটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এই পঞ্চযজ্ঞ লইয়াই হিন্দুর সংসার। যেখানে এই পঞ্চযজ্ঞ নাই সে সংসার হিন্দুর সংসার নহে। তাহা

স্ব স্ব উদর পূর্ত্তির পন্থা স্বরূপ, তাহা পশুবৃত্তির ক্ষেত্র স্বরূপ। এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন না হইলে হিন্দু সংসারের গৃহস্বামী কি গৃহস্বামিনী কদাপি ভোজন করিবেন না। দেখুন দেখি, ইহা কি সংযমশিক্ষার ক্ষেত্র নয়, এই হিন্দুর সংসার কি নিষ্কাম ধর্ম্মের আবাসভূমি নয়?

সংসারের নিত্যকর্ম্মের কথা গেল। এখন নৈমিত্তিক কর্ম্মের দিক দিয়া হিন্দুর সংসারকে অবলোকন করুন দেখি। দেখিবেন এমন সার্ব্বজনীন প্রেম-আধার, এমন মহাতর্পণ-ভূমি, এমন নিষ্কাম ধর্ম্মক্ষেত্র জগতে আর কুত্রাপি নাই। এখানে স্বার্থান্ধ মনুষ্যের চক্ষু প্রীতি হয়, এখানে নীচতা দূরীভূত হয়, উদারতার প্রসূতি আমাদের হিন্দু সংসার। এখানে একা সুখভোগ হয় না, এখানে একা মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কেহ করে না; এখানে কেহ আশীর্ব্বাদ একা গ্রহণ করে না। যাহা কিছু করা হয় সকলে, সকল শ্রেণীর, সকল জাতির লোক সমবেত হইয়া পরস্পর সুখ, মঙ্গল এবং আশীর্ব্বাদ ভোগ কি গ্রহণ করে।

হিন্দু সংসার সর্ব্বাশ্রমের এবং চারি প্রধান জাতির অন্ন সংস্থানক্ষেত্র; সঙ্কর ও অন্ত্য জাতিরও জীবিকা উপার্জ্জনের ক্ষেত্র হিন্দুর সংসার! এখানে ব্রাহ্মণ, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, কাংস্য বণিক্, শাঙ্খ বণিক্, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, গোপ (whose profession is clerical) সূত, মালাকর, তাম্বুলী, তৈলিক (whose profession is to sell betel nuts) রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, নট, জালিক, প্রত্যেকের উপার্জ্জন ক্ষেত্র এই সংসার।

একজনে একটী কাজ করিবেন, আর প্রত্যেকে সেই কর্ম্মোপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ পাইবে এবং তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। সকলকে না নিয়া তিনি কিছু করিতে পারিবেন না; তাহাতে তাহার আর কিছু না হইলে সামাজিক নিন্দাও ত হইবে। সুতরাং তাহার ইচ্ছা থাকুক কি নাই থাকুক, তাহার কাযের সঙ্গে অন্যের সুখ দুঃখ জড়িত থাকিবেই। তাহার অভিরুচি হউক কি না হউক উদারতার ছায়াও তাহাকে দেখাইতে হইবে। যদি এইরূপ উদারতা বিধায়ক কার্য্য মানুষকে ঘন ঘন করিতে হয়, তবে কি মনুষ্যের সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন লোকের ইচ্ছা থাকুক কি নাই থাকুক, তাহার প্রতি কার্য্যে অন্যের সুখ দুঃখ মঙ্গলামঙ্গল বিজড়িত; সুতরাং তাহাকে অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্ম্মাবরণে প্রবৃত্ত করে, আমাদের এই অমূল্য হিন্দু সংসার

হিন্দুর সংসারে একটী সন্তান জন্মিল। গ্রামবাসী একদিন সকলে একত্র হইয়া ভোজন করার সুবিধা পাইল। গ্রামবাসী আনন্দিত হইল; সে আনন্দে জাতকের এবং জাতকের সংসারের উপর আশীর্ব্বাদ পতিত হয়। ব্রাহ্মণ দশ সংস্কারেই যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া থাকেন। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ঠিকুজী, কুষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া কিছু পায়েন। জাতকের নামকরণ ও অন্নারম্ভ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, তন্তুবায়, নরসুন্দর, গ্রামনী, মোদক, সূত, মালাকর, তাম্বুলী, তৈলিক, আভীর, ধীবর, নট, জালিক প্রত্যেকেই কিছু পাইয়া থাকে। জাতকের উপনয়ন কি বিবাহ উপলক্ষে আন্যান্যে যেমন পায়, গোপ, রজক, স্বর্ণকার, তৈলকারকও তেমনি কিছু পায়। এইরূপ প্রত্যেকেই কিছু কিছু পাইয়া থাকে এই হিন্দু সংসারে জন্মেও যেমন প্রত্যেক জাতির লভ্য; মৃত্যুতেও তেমনি প্রত্যেকের লভ্য। মৃত্যুতে যে দেশে বৃষোৎসর্গের মত ব্যবস্থা, সে দেশে কি অন্ন চিন্তা আছে? হিন্দু অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মূলে পরলোকের ভয় ও অন্ন চিন্তার ভয় দূর করা।

হিন্দুর সংসার সংযম বিদ্যালয়। ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য দমন করিবার পন্থা সংসারাশ্রম ধর্ম্ম পালন। হিন্দুর সংসারে একান্নতা একটী প্রধান ধর্ম্মাবলম্বন যন্ত্র স্বরূপ। এইরূপ হিন্দুসংসারে প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষকেই কালে গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিনী হইতে হয়। গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য অধীন ব্যক্তিবর্গের উপর সমদৃষ্টি রাখা, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। এ গুরুকার্য্যে কি আত্ম-সুখান্বেষণ চিন্তা থাকিতে পারে? আবার অধীন ব্যক্তিদিগেরও অবনত মস্তকে গৃহস্বামীর আজ্ঞা সকল সময়েই পালন করিতে হইবে। তাহাতে নিজের সুখ দুঃখ বিচার নাই। এখানে পরস্পরের লক্ষ্য, পরস্পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান। সুতরাং আত্মসুখ, অভিমান, পদমর্য্যাদা একবারে ভুলিয়া যাইতে হয়। আবার ক্রোধকে প্রশমিত ও দমিত করিয়া সংযত ভাবে ব্যবহার করিতে হয়। এ হেন সংসারে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য। নিজের জন্য কেহ নহে। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভিন্ন রূপে (in different capacities) বিভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইবে। এখানে প্রত্যেককেই পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, পিতৃত্ব, শ্বশুরত্ব, স্বামীত্ব, স্ত্রীত্ব, প্রভুত্ব, দাসীত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধমান গুণের (capacity) আধার হইতে হইবে। এখন দেখুন দেখি এ অবস্থায় ষড়রিপু প্রশ্রয় পায়, না দমিত হয়? হিন্দু সব দিন সব দ্রব্য আহার করিতে পারে না, সব দিন সব বিষয় ভোগ করিতে পারে না। তাহাকে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়া থাকিতে

হইবে। এ শিক্ষা হিন্দুর সংসারেই আছে, অন্য কোথাও নাই। এমন প্রকৃষ্ট সংযম শিক্ষা পন্থা আর কোন্ সংসার শিক্ষা দিতে পারে? স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের উভয়ের ঐ ব্রত নিয়মাদি আছে—এবং সেই ব্রত নিয়মাদি সংযম শিক্ষারই পোষকতা করে। মনুষ্যত্ব হিন্দু সংসারের লক্ষ্য, মেরুদণ্ড এবং জীবন।

ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংসারের অবসান হয় না। স্নেহ ও ভক্তি বন্ধন যেমন জীবনকে সুখী করে, ইহা তেমনই মৃত্যুকেও অতিক্রম করে। সংসার আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। এ সংসার বিস্তার-ধর্ম্মশীল। মৃত তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ট থাকে। কোন লোক মরিয়া গেলেও চতুর্থ পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকিবে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই ব্যক্তি সংসারী জীবদিগকে যৎ কিঞ্চিৎ অন্নদান করিতে পারিবে। যে সংসারের সঙ্গে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত সম্পর্ক সে সংসার আমাদের কত আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত দেখুন দেখি; সে সংসার কি অবহেলার, তুচ্ছ তাচ্ছীল্য প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র? কাশীধাম বলুন, শ্রীক্ষেত্র বলুন, হরিদ্বার বলুন, কুরুক্ষেত্র বলুন, সকল তীর্থ অপেক্ষা এই সংসার শ্রেষ্ঠ। কত প্রাণীর অন্ন-সংস্থান ভার, সুখ বিধান ভার, মঙ্গল বিধান ভার, গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর উপর বলুন ত! আর কোথায় মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে এত প্রাণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারে বলুন? সংসার স্বর্গের প্রশস্ত দ্বার। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনের সঙ্গে সঙ্গেই ত অন্ন-সংস্থান হয়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়।

সংসারের নিত্য গৃহস্থালীর কার্য্য দেখিলে কার না হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়? কুলবধূ গোময় জলসিঞ্চনে গৃহপ্রাঙ্গণ কি সমস্তটা বাড়ী পবিত্র করিয়া কুলকন্যাদের সঙ্গে প্রভাতকালীন মৃদু অনিলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুষ্পচয়ন করেন, সে দৃশ্য কি আনন্দ দায়ক নহে! আবার গৃহাদি পরিষ্কার পূর্ব্বক কুলবধূ যখন অম্লান-বদনে সরল স্নিগ্ধ হাস্যের মূর্ত্তি কুলকন্যাদের সঙ্গে ভৃত্যোচিত কার্য্য করিয়া স্নান করেন এবং কুলকন্যাগণ স্থাপিত দেব দেবীর পূজোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, অপরদিকে কুলবধূ রন্ধনরূপ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সে দৃশ্য কি প্রীতিপ্রদ, সুখদায়ক নহে? কুলবধূ অনশনে বাড়ীর সকলকে পরিবেশন করিতেছেন এ দৃশ্যই কি মহতী শিক্ষা নহে! এমন ত্যাগ স্বীকার আর কোথায় দেখি; এমন ত্যাগ শিক্ষা আর কোথায় পাই? সকলের পান ভোজন শেষ করাইয়া কুলকন্যা কি অন্যান্য কুলবধূর সঙ্গে যখন আমাদের কুলবধূ ভোজনে বসেন, এবং মিষ্ট আলাপনে প্রীতি

প্রফুল্লচিত্তে সকলের সঙ্গে আচমন করিয়া আসিয়া একটু সময় বিশ্রম্ভ আলাপ করিয়া শারীরিক ক্লান্তি দূর করেন, আহা, সে দৃশ্য কতই সুন্দর। সন্ধ্যার আগে আবার ঘর দরজা পরিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা প্রদীপে ঘর উজ্জ্বল করেন এবং ধূপ ধূনা পোড়ান, মাঙ্গল্য শঙ্খনিনাদে গৃহের অমঙ্গল দূর করিয়া আবার মহা যজ্ঞে ব্যস্ত হয়েন; সে দৃশ্য কি মনোহর নহে? এ দিকে কুলকন্যাগণ কিম্বা গৃহস্বামিনী ভোরবেলা বালকদিগকে যত্নপূর্ব্বক পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন এবং সন্ধ্যাবেলা তাহাদের সঙ্গে ভগবানের নাম গান করিয়া বালকদিগকে পড়া তৈয়ারী করাইয়া দেন, সে দৃশ্য কি সুন্দর নহে! বাস্তবিক সংসারে এই দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজ দেখিলেও মনে একান্তই প্রীতির সঞ্চার হয়। এটীই ক্ষুদ্র সংসার। গৃহস্থালীর কাজ ও আশ্রম ধর্ম্ম একত্র করিলে যাহা হয় তাহাই সংসার। এমন সংসারে মৃত্যুর জন্য ভয় বা কোথায়, অন্ন চিন্তা বা কোথায়!

শ্রীকান্ত——

অশ্বল ব্রাহ্মণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সম্পাদক, তন্মধ্যে ব্রহ্মা যজ্ঞের অন্যতর সম্পাদক স্বরূপ মনের সংস্কার করেন, আর হোতা অধ্বর্য্যু উদ্গাতা বাক্যরূপ অন্যতর সম্পাদকের সংস্কার করেন। মন ও বাক্যের সংস্কার অর্থে মন ও বাক্যস্থিত মলাপসারণ। ব্রহ্মা যজ্ঞ-সম্পাদক মনের ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি মল অপসারণ করেন। এই জন্য বলা হইয়াছে ব্রহ্মা (অথর্ব্ব বেদজ্ঞ ঋত্বিক্) মনরূপ একমাত্র দেবতার সাহায্যে যজ্ঞ রক্ষা করেন।

এই মন বৃত্তিভেদে অনন্ত, এবং এই অনন্ত মনের অভিমানী দেবতাও অনন্ত, এই অনন্ততা-সাম্যে যজমান (সম্পদ্ বলে) অনন্ত লোক জয় করেন।

অশ্বল] যাজ্ঞবল্ক্য! উদ্গাতা এই যজ্ঞে কতটি স্তোত্রিয় (ঋক্ ও সাম মন্ত্র সমষ্টি) দ্বারা স্তব করেন।

যাজ্ঞ] তিনটী দ্বারা।

অশ্বল] কি সেই তিনটী?

যাজ্ঞবল্ক্য] পুরোহনুবাক্যা যাজ্যা ও শস্যা।

অশ্বল] আধ্যাত্মিক ভাবে উহা কি?

যাজ্ঞবল্ক্য] প্রাণই পুরোঽনুবাক্যা। প্রাণ এবং পুরোঽনুবাক্যা এই দুই শব্দই পকারাদি বলিয়া এই দুই শব্দের সাম্য আছে এই জন্য প্রাণকে পুরোঽনুবাক্যা বলা হইল। আপনিই যাজ্যা, অধিয়জ্ঞে দেবতাগণ যেমন যাজ্যা মন্ত্রের উপহৃত আহুতি গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত হয়েন, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-দেবতাগণও অপানোপহৃত স্ব স্ব বিষয়রূপ আহুতি গ্রহণে তৃপ্তি লাভ করেন। এই সাম্য লইয়া অপানকেই যাজ্যা বলা হইয়াছে। অপিচ ব্যানই শস্যা, কারণ শস্যা প্রাণ ও অপান সাহায্যে উচ্চারিত হয় না। ব্যান দ্বারাই শস্যারূপ ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারিত এই জন্য ব্যানকে শস্যা বলা হইয়াছে।

অশ্বল ! যাজ্ঞবল্ক্য ! এই তিন স্তোত্রিয় সাহায্যে যজমান কোন্ কোন্ স্থান জয় করেন ?

যাজ্ঞ] পুরোঽনুবাক্যা প্রথম, এই জন্য ইহা দ্বারা যজমান প্রথম পৃথিবী লোক জয় করেন। যাজ্যা মধ্যম এই জন্য এতদ্বারা যজমান তৎসদৃশ মধ্যম অন্তরীক্ষ লোক জয় করেন শস্যা সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত এই জন্য যজমান শস্যা দ্বারা সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বলোক জয় করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সকল প্রশ্নেরই এই যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন দেখিয়া অশ্বল মনে করিলেন অহো যাজ্ঞবল্ক্য তোমার জ্ঞান জলধির তলস্পর্শ আমার অসাধ্য অতএব অশ্বল অপর প্রশ্ন উত্থাপনে বিরত হইলেন।

আচার্য্য] বৎস! এই আমি তোমার নিকট অশ্বল ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন করিলাম এখন তোমার যদি কোন সংশয় থাকে বল আমি পুনরায় তোমাকে উপদেশ করিতেছি।

ব্রহ্ম] ভগবন্। আমি প্রণিহিত মনে ইহার মনন করিবার পরে কোন সংশয় আছে কি না বুঝিতে পারিব সুতরাং পরে আমি তৎসমুদয় নিবেদন করিব।

সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জ্যেষ্ঠ—মন্ত্র সকল স্বল্পাক্ষর এবং বহু অর্থবিশিষ্ট। এই জন্য এক একটী মন্ত্রের ছোট ছোট দু'একটী শব্দের মধ্যেই রাশি রাশি ভাব, রাশি রাশি উপদেশ

নিহিত থাকে—সমগ্র মন্ত্র ত দূরের কথা। শুধু কথার মানে ধরিলে যদি মন্ত্রের অর্থ অবগত হওয়া যাইত তাহা হইলে নাটক নভেলের উপদেশে ও মন্ত্রে বড় বেশী তফাৎ থাকিত না। যাহারা অসংযত, শিশ্নোদর পরায়ণ, অধার্ম্মিক অতএব মূর্খ তাহারাই মন্ত্রস্থ শব্দের মাত্র একটী প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়া মন্ত্র কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। ইহাতে মন্ত্রের কিছুই আসে যায় না, পরন্তু যাহারা এইরূপে আত্ম পরিচয় প্রকাশ করে সংযমাভাবে নানাবিধ অশান্তির নিষ্পেশনে এই জগতেই বহু নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। শ্রীভগবানের নিকট নিত্য প্রার্থনা কর, এই সকল হতভাগ্যের সুমতি হউক।

কনিষ্ঠ—"আমি মন্ত্র অবিশ্বাস করি" এমন কথা ত বলি নাই। তবুও তুমি খুব দু'কথা শুনাইয়া দিলে। বেশ করিয়াছ; আচ্ছা এবারে আর গীতার দোহাই দিলে না যে?

জ্যেষ্ঠ—এখনও ত কথা শেষ হয় নাই যে, তাল ফস্কাইয়া গেল বলিয়া ধরিয়া লইবে? কেন গীতার এই শ্লোকে কি দেখিতে পাও?

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মেঃ প্রিয়॥

তুমি যদি কাহারও বাড়ী চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উৎপাত লাগাইয়া দাও তাহা হইলে কি সেই গৃহস্থ তোমাদ্বারা উদ্বিগ্ন, ভীত, ও দুঃখিত হয় না? না, তোমার গৃহে ঐরূপ বিপৎপাত হইলে তুমি উদ্বিগ্ন ভীভ ও দুঃখিত হও না? আবার এই উৎপাত না থাকিলেই সবাই হৃষ্ঠ হয়। তাই গীতাকার বলিয়াছেন, যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি অপর কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হয়েন না, যিনি হর্ষ, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিই আমার প্রিয়। অস্তেয় সাধনে আর কিছু না হউক এই পাপ উদ্বেগের হাত হইতে যে অনেকটা অব্যাহতি লাভ করা যায়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখনিবৃত্তির জন্য অস্তেয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলে?

কনিষ্ঠ—বুঝিলাম। চরিত্র গঠনের এমন সরল সুন্দর পন্থা থাকিতে আমরা কিনা ডুবাল প্রভৃতির গল্প প্রচার করিয়া শিক্ষার আদর্শ খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছি।

আঘাত মাত্রেরই যে প্রতিঘাত আছে, ক্রিয়া মাত্রেরই যে প্রতিক্রিয়া আছে তাহা ইতিপূর্ব্বে এমন সুন্দর ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। এখন

দেখিতেছি এই প্রতিক্রিয়ার উদ্বেগ ও দুঃখের হাত হইতে জগতের নরনারীকে বাঁচাইবার জন্য মনস্তত্ত্বের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,—

হিংসা করিও না, করিলে প্রতিহিংসা সহ্য করিতে হইবে।
মিথ্যা কহিও না, কহিলে তুমিও মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইবে।
চুরি করিও না, করিলে তোমারও একদিন সব যাইবে।

কেমন এই উদ্বেগের ও অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করার জন্যই অহিংসা, সত্য ও অস্তেয় সাধন ?

জ্যেষ্ঠ—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখ। পরে দেখিবে তোমার সাধনার গুণে তোমার কাছে যে সব হিংসাবৃত্তি পরায়ণ ব্যক্তি আসিবে তাহারও ক্রমে হিংসা ত্যাগ করিবে, যে সব মিথ্যাবাদী আসিবে তাহারও সত্য কহিবে, আর যে সব চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ-ব্যক্তি আসিবে তাহারাও তাহাদের স্বভাব ত্যাগ করিয়া তোমার মত হইতে আকাঙ্খা করিবে। এইরূপে তোমার একার সাধন গুণে অন্ততঃ দু'দশটা জীবেরও মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে। আর যদি প্রতি ব্রাহ্মণ গৃহে আবার এই সাধন প্রণালী আচরিত হয় তবে তাহাদিগের সংস্পর্শে এই অধঃপতিত সমাজ কি আবার আপনার পূর্ব্ব পবিত্র আসন গ্রহণ করিতে পারে না ? নিজের প্রাণপাত সাধনা দ্বারা এইরূপে সমকালে আপনার নিঃশ্রেয়স্ বা দুঃখ নিবৃত্তি ও জগতের অভ্যুদয় বা উন্নতির জন্য নিযুক্ত থাকাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব ও দেবত্ব। নতুবা ব্রাহ্মণবংশজাত শাস্ত্র বিরোধী ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তিতে ও রামা বাগ্দীতে তফাৎ কি ?

কনিষ্ঠ—তোমার কথাগুলার মধ্যে ভাবিবার জিনিষ বিস্তর আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাভিচারের যুগে তোমার একথা কি সকলের মিষ্ট লাগিবে ? যাক্, এবার ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় বলিবে কি ?

জ্যেষ্ঠ—"ব্রহ্মচর্য্য" সমস্ত সাধনা হারের মধ্যমণি। ব্রহ্মচারী না হইলে এই সুমহৎ সাধনা তত্ত্বের কথা কেহই বলিতে সক্ষম হন না। ভূগোলে ইউরোপের বিষয় পড়িয়া বা ম্যাপে ইউরোপ দেখিয়া তাহার নগরাদির শোভার কীর্ত্তন করা যে জিনিষ আর ব্রহ্মচারী না হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাও ঠিক তদ্রূপ। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক মত আচরিত না হইলে কোনও সাধনাই সিদ্ধি আনিয়া দিতে পারে না। এ বিষয়ে যদি কেহ প্রতিবাদ করে তবে তাহাকে মূঢ়বুদ্ধি প্রতারক বলিয়া জানিও।

ব্রহ্মলাভ করিবার জন্য যে কিছু আচরণ অনুষ্ঠিত হয় তাহার সমষ্টির নাম ব্রহ্মচর্য্য। সত্বগুণেই জগতের প্রকাশ—প্রকাশ করাটা সত্বগুণের ধর্ম্ম। সুতরাং এই সত্বগুণ ভিন্ন আর কোন কিছুই জীবনের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে না। যে কার্য্য করিলে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশক সত্বগুণের উদ্ভবও বৃদ্ধি হয় তাহার অনুষ্ঠানের নাম ব্রহ্মচর্য্য। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে বীর্য্যধারণের মত এমন আয়ুঃসত্ব বলবর্দ্ধক হিতকর অনুষ্ঠান আর কিছুই নাই। এই জন্য বীর্য্যধারণকে বিশেষভাবে ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়—"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যং"। এই বীর্য্যধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে মৈথুন প্রসঙ্গের সমস্ত ব্যাপার হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিতে হয়। কাম দমন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য সাধনই ধর্ম্মসাধনেরও সর্ব্ব প্রথম সর্ব্বপ্রধান সাধন, ইহা সকল তপস্যার মধ্যে উত্তম তপস্যা। ইহাতে শরীর সুস্থ, মন প্রফুল্ল ও বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়—সিদ্ধি হস্তামলকের মত অনায়াস লভ্য হইয়া পড়ে।

কনিষ্ঠ—বীর্য্যধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে মৈথুন প্রসঙ্গের সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করা প্রয়োজন, ইহা বলিলে বটে—কিন্তু সে প্রসঙ্গগুলি কি কি এবং গৃহীর পক্ষে সে গুলি ত্যাগ করা কতদূর সম্ভব তাহা ত বলিতে হয়।

জ্যেষ্ঠ—বলিতেছি। দক্ষ সংহিতাকার মৈথুন ব্যাপারকে আট ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

কাম-প্রবৃত্তি-সহকারে স্ত্রীলোকের রূপাদির চিন্তা করা ঐ সকল বিষয় লইয়া বাচিক আলোচনা করা, স্ত্রীলোকের সহিত তাস ইত্যাদি খেলা করা, লুব্ধ ভাবে স্ত্রীলোকের রূপ দর্শন করা, স্ত্রীলোকের সহিত গোপনে নির্জ্জনে বাক্যালাপ করা, মৈথুন বিষয়ে মনে মনে সংকল্প করা, এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করা, এবং এই চেষ্টা দ্বারা সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করা—এই আটটী ব্যাপার মৈথুন বলিয়া পরিগণিত। অর্থাৎ এই আটটী ব্যাপার দ্বারাই বীর্য্য স্থানভ্রষ্ট ও বিকৃত হইয়া থাকে—

বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

এই সকলের বিপরীত আচরণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে, যাহা দুঃখ-পরিহার-কামী ব্যক্তিকে আচরণ করিতে হয়।

সংসারের দুঃখের হাত হইতে যিনি পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে এই সব নিয়মের প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নতুবা তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে। ক্রমশঃ—

বিবিধ সংবাদ।

(১)

স্বরূপ স্মরণ] রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় শ্রীসীতাদেবী স্বয়ং অগ্নি গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া, অপহরণের জন্য আপন ছায়া-মূর্ত্তি পর্ণ-কুটীরে রাখিয়াছিলেন। পরে যথা সময়ে রাবণ-বিনাশের পর ছায়া সীতা পরীক্ষাচ্ছলে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়, এবং অগ্নি হইতে প্রকৃত সীতার উদ্ধার হইয়াছিল।

ইহা অধ্যাত্ম-রামায়ণের কথা। অধ্যাত্ম-রামায়ণ কি জান? অধিষ্ঠাতা আত্মরামের কথাকেই অধ্যাত্ম-রামায়ণ বলে। তোমার আত্মরূপী রামের আজ্ঞায় তুমি তোমাকে ছায়াময়ী করিয়া কামরূপ রাবণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ; আর প্রকৃত তুমি প্রকৃত নিষ্কাম প্রকৃতি আত্মরামের চিরসঙ্গিনী। জ্যোতিরভ্যন্তরে যেখানে আত্মরাম সর্ব্বদা বিহার করেন সেইখানেই প্রকৃত তুমি রহিয়াছ। তাই বলি সর্ব্বদা মনে রাখিবে এই দেহরূপ আকাশ-কানন তোমার সুখের নহে, কেবল রাম ভুলাইবার উপকরণ মাত্র। ইহা বুঝিয়া প্রতিদিন জ্যোতিরভ্যন্তরে উপস্থিত হইবার জন্য এই ছায়া-মূর্ত্তি ভূত-শুদ্ধির বহ্নি-যোগ দগ্ধ কর চিত্তশুদ্ধিময় বিশুদ্ধ বেশ ধারণ কর, দেখিবে তোমার আত্মরাম সর্ব্বদা তোমাকে ওতপ্রোত ভাবে আলিঙ্গন করিয়াই আছেন, তাহারই কোলে ঘুমাইয়া তুমি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলে, স্বপ্নভঙ্গে স্বামিক্রোড়-সুপ্তা সতীর মত তোমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে।

(২)

নূতন পৃথিবী।

উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর বহু নূতন স্থান আবিষ্কৃত হইতেছে। ঐ সমস্ত স্থান নিরন্তর তুষারে আচ্ছন্ন থাকে। সে দেশে এস্কিমো জাতি বাস করে। এখানকার লোকে বলেন—ঐ পৃথিবীর শেষ। প্রাচীনেরা বলেন শেষ ওখানে নহে আরও আছে। বর্ণনা এইরূপ :—

মারুত দেখিলেন পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্রের পরে লোকালোক পর্ব্বতরূপ মেখলায় মণ্ডিত, জলশূন্য বিপুল কাঞ্চন ভূমি, তাহার পরে সমুদ্র বলয়ে বেষ্টিত স্বাদুসলিলা মণিময় ভূমি। উহাদের মধ্যে পুষ্কর দ্বীপমণ্ডল তাহার মধ্যে গিরিমণ্ডল। তাহার পর মদিরা সমুদ্রে বেষ্টিত জলচর প্রাণীসঙ্কুল গোমেদক দ্বীপ। পরে ইক্ষুসমুদ্রে বেষ্টিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ ভূভাগ। তাহার পরে ক্ষীরসমুদ্রে বেষ্টিত শ্বেতদ্বীপ মণ্ডল। তাহার পরে ঘৃতসমুদ্রে বেষ্টিত কুশদ্বীপ। পরে দধিসমুদ্রে বেষ্টিত শাকদ্বীপ ভূভাগ। তাহার পরে লবণ সমুদ্রে বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ। এখানে মহাসুমেরু পর্ব্বত। এই জম্বুদ্বীপে হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বোচ্চ। ইয়ুরোপীয়েরা যদি সমস্ত সমুদ্র ও সমস্ত দেশ আবিষ্কার করেন তবে ত বড় ভাল হয়।

(৩)

রোগ।

উপস্থিত সময়ে ডাক্তারেরা বলেন ১ হাজার ১০০ শত প্রকার ব্যাধি মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে। শুধু মানুষের চক্ষু নষ্ট করিতে ৪০ প্রকার রোগ ঘুরিতেছে। মানুষকে রক্ষা কে করে?

(৪)

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

পূর্ব্বে সমাচার দর্পণে লিখা গিয়াছে যে, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে লোকবসতি ছিল, এমত অনুমান হয়। এইক্ষণে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে দেখা গেল যে, গঙ্গাসাগরে চন্দ্রবংশীয় সুসেণ নামে রাজা রাজধানী করিয়াছিলেন। তাহাতে দিব্যন্তী নাম্নী নগরীর গুণাকর রাজার কন্যা সুলোচনা দায়গ্রস্তা হইয়া ঐ রাজার আশ্রয়ে পুরুষ-বেশে কালক্ষেপণ করিয়াছিল। পরে ভালধ্বজ নগরের রাজা বিক্রমের পুত্র মাধব পূর্ব্বসূত্র ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া সুলোচনাকে বিবাহ করিয়া এবং ঐ চন্দ্রবংশীয় সুসেণ রাজার এক কন্যাকে পরিণয়পূর্ব্বক রাজ্যের অর্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ঐ গঙ্গাসাগরে রাজধানী করিলেন ও অনেক কাল পর্য্যন্ত বসতি করিয়া, পরে পুত্রাদি রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

(৫)

কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্য্য অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। এখানে পীড়িতদিগের সেবা জন্য আরও কতক স্থান গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যে আমাদের দেশের ধনবান লোকদিগের দৃষ্টি পড়িলে দেশের পরম উপকার সাধিত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড।

আর্ত্তভাগ ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মচারী] ভগবান্! শ্রুতি নির্দ্দেশ বড়ই আশ্চর্য্যজনক মনে হইতেছে, আমি এ পর্য্যন্ত যাহাদিগকে জীবনধারণের বৃত্ত স্বরূপ মনে করিতেছিলাম, শ্রুতি তাহাদিগকেই মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমার মত প্রাকৃত জীব, ইন্দ্রিয় বা গ্রহসমূহ দ্বারা বিষয় বা অতিগ্রহরাশি গ্রহণ যোগ্য সুসময়-কেই আয়ু বা জীবিতকাল বলিয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি নির্দ্দেশে বুঝিতে হইতেছে ইহাই মৃত্যু। এই আশ্চর্য্যময় উপদেশটি আমার হৃদয়ঙ্গম হইবার জন্য কথাটি আরও একটু পরিস্ফুট করিয়া বলুন, আমার বুঝিবার সুবিধার জন্য আমি দুইটি প্রশ্ন করিতেছি—(১) এই যে গ্রহ-অতিগ্রহরূপধারী মৃত্যু-সাগর, ইহার পার কোথায়? (২) সকলই যদি গ্রহ-অতিগ্রহ তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মৃত্যু-গ্রাসে-পতিত; জীবের জীবন বলিতে কি বুঝিতে হইবে?

আচার্য্য] বৎস! আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ মৃত্যু পরিব্যাপ্ত, এ বিষয়ে শ্রুতি স্বয়ং আর্ত্তভাগ মুখে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, তুমি আপাততঃ তাহাই শ্রবণ কর, তৎপর তোমার উপলব্ধির জন্য কথাগুলি আবার ভাল করিয়া বলিব।

আর্ত্তভাগ বলিতেছেন—

আর্ত্ত] যাজ্ঞবল্ক্য! এই যে গ্রহ অতিগ্রহ ব্যাপ্ত সচরাচর জগৎ, এতৎ-সমস্তই মৃত্যুর অন্ন, মৃত্যুর মুখের গ্রাস, কে সেই মহাদেব, এই সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুও যাহার অন্ন? (প্রশ্নের অভিপ্রায় এই, যদি এই জগৎ কেবল ভক্ষ্য-ভক্ষকে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে অনন্ত আলোচনায় ও ইহার পার পাওয়া যাইবে না, সুতরাং এবিষয়ে আলোচনা অনর্থক; আর যদি গ্রহ-অতিগ্রহরূপ মৃত্যুর বিনাশক বা মৃত্যু না থাকে, তাহা হইলে গ্রহ-অতিগ্রহ-গ্রাস হইতে মুক্তি অসম্ভব।)

যাজ্ঞ] মুনিবর! গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুরও মৃত্যু আছে, কারণ, জগতে বিনাশক বস্তু মাত্রেরই বিনাশক দেখা যায়। যেমন অগ্নি সর্ব্বগ্রাসী, কিন্তু

এই সর্ব্বভুক্ অগ্নি আবার জলের অন্ন,—জল অগ্নির বিনাশক! সুতরাং সর্ব্ব-গ্রাসী গ্রহাতিগ্রহ নামক মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। প্রশ্ন হইতে পারে—তাহা হইলে তাহারও অন্য মৃত্যু কল্পনা করা যাইতে পারে, তদুত্তরে বক্তব্য এই—যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পালয়িতা ও বিনাশক, তিনি স্বয়ং অনাদি অজ ও অদ্বিতীয়, সুতরাং তাহার বিনাশকের অভাব নিবন্ধন বিনাশও অসম্ভব। এই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ-সংহারকারী শ্রীভগবান্ আত্মদেব শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রসঙ্গে প্রসন্ন হইয়া আপন ব্যাপক গ্রাসে পরিচ্ছিন্ন অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধি-ভূতরূপী গ্রহাতিগ্রহ-নিচয় গ্রাস করিয়া যখন আবির্ভূত হয়েন, তখন জীব স্বরূপ-লাভে মুক্ত হয়। যে মুখ্যাধিকারী এই শুভ অবসর প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয় না।

আচার্য্য] বৎস! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অবিদ্যা ও মায়া এই সমস্তই জড়। যাহা জড়, তাহারই অপর নাম মৃত, আর যিনি অবিদ্যার কুহকে ছায়ামাত্র বুদ্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও এবং সমষ্টি বুদ্ধি হইতে ব্যষ্টিদেহ পর্য্যন্ত চেতনায়-মান করিয়া ও স্বয়ং জড় সঙ্গে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন, যিনি আকাশের মত ব্যাপক স্বরূপে অবস্থিত আছেন, তাঁহাকেই অমৃত বলা হয়। এই মৃত বা মর জগৎ আপনি দুর্লক্ষ্য গতিতে মৃত্যুমুখে ছুটিয়াছে, আর যাহারা ইহার দ্রষ্টা ইহার আশ্রিত, তাহাদিগকেও নিত্য নব পরিণামতরঙ্গে নাচাইতে নাচাইতে মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতেছে। নদী যেমন আপনি অনন্ত-সাগর-পানে প্রধাবিত হয়, এবং আপন প্রবাহ-পতিত তৃণ-খণ্ডকেও তরঙ্গ কল্লোলময় সমুদ্রে লইয়া যায়, সেইরূপ। আর অধিষ্ঠান-চৈতন্য শ্রীগুরুরূপে আপন বরেণ্য ভর্গদ্বারা অবিদ্যা প্রবাহিত জীবকে আকর্ষণ করিয়া আপন পদমূলে লইয়া আইসেন। তুমি মৃত সঙ্গ কর ফল মৃত্যু, অমৃত সঙ্গ কর ফল অমরত্ব। এই জন্যই ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি। বলিতেছেন—তুমি জনন মরণ যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া অমৃতধামে যাইতে ব্যাকুল হইয়াছ? এই আমি তোমায় উপায় বলিয়া দিতেছি—তুমি ব্রহ্মসঙ্গ কর নামরূপ ময় জগৎতরঙ্গে না ভাসিয়া সুধাসমুদ্রের অন্তস্তলে নিলীন অমৃতময় আত্মসত্তায় উপনীত হও অমৃত পদ লাভ করিবে। ভগবতী স্মৃতিও তোমায় সেই উপদেশই দিতেছেন। বলিতেছেন—

গচ্ছতস্তিষ্ঠতশ্চৈব শ্বপতো জাগ্রতোঽপিবা।
ন বিচার পরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥

বলিতেছেন—গমনে, অবস্থানে, স্বপনে; জাগরণে,—সর্ব্বাবস্থায় যে জাগ্রত—যাহার চিত্ত বিচার-পরায়ণ, যে আত্মানুসন্ধান প্রণিহিত কেবল এইরূপ ভাগ্যবান্ অধিকারীই অমৃত ; তদ্ভিন্ন হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টিদেহ হইতে ব্যষ্টিদেহ পর্য্যন্ত অনাত্ম বস্তু দর্শনে যাহার চিত্ত ব্যাকুল তাহাকেই মৃত বলা যায়।

বৎস! এই যে তোমার দৃষ্টির সমক্ষে সংসাররূপ অশ্বত্থতরু দণ্ডায়মান,—অমৃতময় শ্রীভগবান্ আত্মা যাহার মূল; সমষ্টি লিঙ্গদেহধারী, কর্ম্মজ্ঞানময় ভাগদ্বয় সমন্বিত হিরণ্যগর্ভ যাহার দ্বিপত্র, প্রাণিগণের লিঙ্গদেহ সমূহ যাহার স্কন্ধদেশ, জীবগণের বাসনা জলসেকে যাহা সতত পরিবর্দ্ধিত, শ্রুতি (কর্ম্মকাণ্ডীয়) স্মৃতি, ন্যায় বিদ্যা প্রভৃতির সদুপদেশ সমূহ, পত্র স্থানীয় হইয়া যাহাকে ছায়াময় ও আশ্রয়নীয় করিয়া রাখিয়াছে, যজ্ঞ, দান তপস্যারূপ ক্রিয়াসমূহ যাহার পুষ্প রূপে বিরাজমান ; সুর, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূত, প্রেত, বেতাল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি মানস জরায়ুজ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ বহুবিধ জীবসমূহ যাহার দিগন্ত প্রসারিত শাখা প্রশাখায় কুলায় রচনা করিয়া রহিয়াছে, বিভিন্নমুখী শাখা প্রশাখায় বসিয়া যাহার সুখ দুঃখরূপ ফল ভোগ করিতেছে, যাহার কোন শাখায় ক্ষণিক উল্লাসের 'হা হা হী হী' কোথাও 'আঃ উঃ' কোথাও বিরহ-বেদনার চীৎকার, কোথাও মিলনের অট্টহাস্য, কোথাও নৃত্য গীত বাদ্য, কোথাও 'রক্ষ রক্ষ মুঞ্চ মুঞ্চ' কোথাও 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্', কোথাও 'রাম নাম সত্য হ্যায়' 'হরি হরি বল' এইরূপ 'তুমুল কোলাহলে যাহা নিত্য মুখরিত,—ভগবতী শ্রুতি আপন অনুবীক্ষণী শক্তি দ্বারা তোমায় দেখাইয়া দিতেছেন—এই যে তোমার স্বহস্ত রোপিত অশ্বত্থতরু, ইহা মৃত। তুমি মৃত বৃক্ষ ছেদন কর, 'মরা গাছের মমতায় আপন অমঙ্গল করিও না। কথনও স্মৃতিরূপে ধাত্রী সাজিয়া তিনিই বলিতেছেন—অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা, ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যম্। বলিতেছেন—তুমি পুনঃ পুনঃ অসঙ্গ (বৈরাগ্য) রূপ খড়্গের আঘাতে ইহাকে—এই মৃত বৃক্ষকে ছেদন কর, তৎপর ইহার পদ অর্থাৎ মূল অনুসন্ধান কর, ইহার মূল অমৃতময় আত্মা, তুমি সতত তাহার সঙ্গে অবস্থান কর ব্রহ্মসংস্থ হও' তুমিও অমৃতময় হইয়া যাইবে।

বৎস! এই তোমায় জিজ্ঞাসিত গ্রহাতিগ্রহ পরিব্যাপ্ত মৃত্যুসংসার সাগরের স্বরূপ, তাহার পার ও পারে যাইবার উপায় তোমাকে বলিলাম, এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর।

বৎস! এই অমৃতময় পুরুষই সংসার সাগরের পর পার বিলাসী কল্পতরুস্বরূপ, ইঁহারই সুশীতল ছায়ায় আসিয়া অনন্ত জন্ম মরণ পরিশ্রান্ত জীব আপন সর্ব্বস্ব জীবত্ব তাহার পদমূলে সমর্পণ করিয়া ইঁহারই আনন্দময় ক্রোড়ে চির বিশ্রান্তি লাভ করে। অপিচ এই অমৃতময় পুরুষই জীবের জীবন এই জন্যই শ্রুতি বলেন—

ন প্রাণেন না পানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥

প্রাণাপানের গতাগতিতে জীবের জীবন সূচিত হয় না, পরন্তু যে অমৃত ময় আত্মদেবের ক্রোড়ে, সাগরে লহরীর মত, প্রাণাপানতরঙ্গ খেলিতেছে, উহাই তাহার জীবন। এই জন্যই উপনিষদ্দেবী বলিয়াছেন 'স উ প্রাণস্য প্রাণঃ, তিনিই প্রাণেরও প্রাণ। অর্থাৎ জড়দেহ যেমন সর্ব্বাবয়ব প্রবিষ্ট প্রাণ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া চেতনায়মান হয় এবং ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ জড়-প্রাণ আবার আত্মজ্যোতি সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হইয়া দেহ পরিচালনা-শক্তি লাভ করে, সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিলে প্রাণ তোমার জীবন নহে, সেই অমৃতময় পুরুষই তোমার জীবন, তোমার স্বরূপ। তদ্ভিন্ন প্রাণাপানাদি যে গ্রহাতি-গ্রহ বা মৃত্যুর কারণ তাহা তুমি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় বুঝিতে পারিয়াছ।

বৎস! মৃত্যুর পরিচয় প্রসঙ্গে অনেক রহস্যই তুমি শুনিলে এখন আত্ম কর্ত্তব্যের সুবিধার জন্য আরও দু' একটা কথা শুনিয়া রাখ,—এখন তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই যখন স্বয়ং মৃত, অপরের মৃত্যু স্বরূপ, তখন তোমার বলিতে যাহারা—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু বান্ধব সকলেই স্বয়ং মৃত্যুমুখে ছুটিয়াছে এবং মমতালুব্ধ তোমার দেহ-ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধিকে সহযাত্রী করিয়া মৃত্যু দ্বারে লইয়া চলিয়াছে, তুমি যতই উন্মত্ত চেষ্টা কর না কেন, ইহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না! সন্তরণে অনভ্যস্ত বালক যেমন জলমগ্ন অন্য বালকের রক্ষার নিমিত্ত আকুলতা প্রকাশ করিয়া সহচরের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্রূপ তুমিও মুমূর্ষু বন্ধু বান্ধবের বা মুমূর্ষু দেহেন্দ্রিয়াদির রক্ষার জন্য যদৃচ্ছাচার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইওনা দুর্লভ অবসর নষ্ট করিওনা; বরং অবিদ্যাজলে নিমজ্জমান নিজেকে ও বন্ধু-বান্ধবগণকে রক্ষার জন্য আপন অবস্থামত কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান সাহায্যে

অকূলের কাণ্ডারী যিনি, ভবসাগরের কর্ণধার যিনি, তাঁহাকে ডাক, তোমার কল্যাণ হইবে। কিন্তু মনে রাখিও যতদিন দেহ ইন্দ্রিয় মনপ্রাণাদি তোমার আধার, আর তুমি তাহাদের আধেয়, ততদিন তোমার উদ্ধার নাই; ততদিন তুমি দেহাদি বেশধারী মৃত্যুর মুখেই রহিয়াছ। সুতরাং নিত্য সাধনায় তুমি যে দেহ মধ্যে রহিয়াছ উহাকে ও তদন্তর্গত পাপ পুরুষকে ভস্মীভূত কর দেবদেহ রচনা কর, মুহূর্ত্তের জন্য তাহাতে বিশ্রাম কর তৎপর বিলোম-মাতৃকার সহায়তায় কূলে পৌছিয়া তীরতরুর চরণে শরণাপন্ন হও। এইরূপ কর্ম্ম উপাসনার বিবিধ কৌশলের অনুশীলন করিতে করিতেই ব্রহ্ম-সাম্রাজ্যের দূত বিচার তোমার নিকটে উপস্থিত হইবেন, তুমি তখন এই বিচারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও ব্রহ্মলোকে সেই অমৃতময় স্থানে গমন করিতে পারিবে।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আমার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া আপনার কথায় বাধা দিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি দেহাদি-রক্ষা ও পরিজন রক্ষায় উদাসীন হইয়া আত্ম-কল্যাণে অভিনিবিষ্ট হইতে বলিলেন। আমি ও বিচার করিয়া দেখিলাম—আপনার উপদেশ অতি সমীচীন। বস্তুতঃই অবশ্যম্ভাবি-মৃত্যুর প্রতীকার নাই, অথচ এই প্রতীকার-চেষ্টা আমার আত্ম-উদ্ধার পথে বাধা জন্মাইতেছে, সুতরাং আপনি যদি অনুমতি করেন—আমি স্ব জঠর ভরণের ও স্বজন ভরণের ব্যাকুলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট হইয়া আত্ম উদ্ধারের জন্য অভিনিবিষ্ট হইব।

আচার্য্য] বৎস! যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টি সন্ন্যাসের অবস্থা। কর্ম্ম উপাসনা ও পরোক্ষ জ্ঞানের যথারীতি অনুশীলন করিতে করিতে চিত্ত যখন বীতমল হয়, তখন মেঘমুক্ত আকাশে নিত্যোদিত সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় সন্ন্যাসের অবস্থা সমাহিত হৃদয়ে উদিত হয়। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা নহে, তুমি এখন ব্রহ্মচর্য্যের কর্ত্তব্যে উদাসীন না হইয়া এই অবস্থার কর্ম্ম অনুশীলন করিতে করিতে যতটুকু সন্তোষ রাখিতে পার, তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমার উপদেশ-জাত সাময়িক সন্ন্যাসের স্বপ্নদর্শনে স্থায়ি-অধিকার লাভ ঘটেনা। যাহা হউক, আপাততঃ তোমাকে মহর্ষি আর্ত্তভাগ কৃত অপর প্রশ্ন ও ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যকৃত তদুত্তর বলিতেছি; মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

মিত্রংহুবে পূতদক্ষং বরুণঞ্চ রিশাদসম্।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৭

পদানুসরণী] অহমস্মিন্ কর্ম্মণি হবিঃ প্রদানায় পূতদক্ষং পবিত্রবলং মিত্রং হুবে। তথা রিশাদসম্ রিশানাং হিংসকানামদসম্ অত্তারম্ বরুণঞ্চ হুবে আহ্বয়ামি। কীদৃশৌ মিত্রাবরুণৌ? ধৃতাচীং ধিয়ং সাধন্তৌ ঘৃতমুদকমঞ্চতি ভূমিং প্রাপয়তি যাধীবর্ষণ-কর্ম্ম, তাং ধ্বতাচীং ধিয়ম্ সাধন্তা সাধয়ন্তৌ কুর্ব্বন্তৌ। যৌ দেবৌ অস্মদ্ হিংসকানাং বিনাশকৌ যৌ চ বর্ষণকর্ম্মসম্পাদকৌ, তাবহং দেবৌ মিত্রাবরুণৌ পবিত্রবলৌ হবিঃপ্রদানায় অস্মিন্ কর্ম্মণি আহ্বয়ামীতি নিকৃষ্টঃ।

পদ-নিষ্যন্দিনী] মিত্রং (মিত্রদেবকে) হুবে (আহ্বান করিতেছি) পূতদক্ষম্ (পবিত্রবলসম্পন্ন) বরুণঞ্চ (বরুণকেও) রিশাদসম্ (হিংস্র রাক্ষসগণের বিনাশকারী) ধিয়ম্ (কর্ম্ম) ঘৃতাচীম্ (বর্ষণ-রূপ) সাধন্তা (সম্পাদক)।

বঙ্গানুবাদ] আমি (এই যজ্ঞকার্য্য হবিঃ প্রদানের জন্য) পবিত্র বল-সম্পন্ন মিত্র নামক দেবতাকে ও হিংস্র স্বভাব রাক্ষসগণের বিনাশক বরুণ-দেবকে আহ্বান করিতেছি। ইহারা উভয়ে জল বর্ষণকারী।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্ম] ভগবন্! 'পূতদক্ষং' 'রিশাদসং' ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' এই বিশেষণ-ত্রয়ের সার্থকতা কি?

আচার্য্য] বৎস! বৈদিক শব্দনিচয়ের সার্থকতা বিচার কিরূপ প্রণালীতে করিতে হইবে, তাহা পরে তোমায় বিস্তৃত ভাবে বলিব, আপাততঃ, সংক্ষেপে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

বৎস! যে শব্দ যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ উচ্চারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতেই সেই শব্দের সার্থকতা। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির উদ্দেশ্য যজ্ঞ নিষ্পাদন দ্বারা কর্ম্মাধিকারী যাজ্ঞিকের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধি-সম্পাদনে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা দ্বারাই কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রুতির সার্থকতা বুঝিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বহু কথা আলোচিত হইয়াছে তাহা দ্বারাই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—রজস্তমোময় অজ্ঞাবরণ বিগলিত হইলে পর চিত্তের যে স্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্ববেশ-স্ফুরণ উহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। যাজ্ঞিক রজস্তমোময় লয়-বিক্ষেপ বা পাপরাশি প্রক্ষা-

লন পূর্ব্বক এই সত্বস্ফুরণের জন্য সতত চেষ্টিত। যাজ্ঞিক এই জন্যই মন্ত্রের শরণাপন্ন। লৌকিক শব্দ-সমূহে যেমন লৌকিক-ভাব-সমূহে নিহিত থাকে, বৈদিক শব্দ সমূহেও সেইরূপ অলৌকিক ভাব-সমূহ নিহিত রহিয়াছে। বেদমন্ত্র সমূহ কর্ম্মাধিকারীর হৃদয়ে আপন ভাব-রাশি ঢালিয়া উহা প্রক্ষালন করেন।

মানব হৃদয় সম্বন্ধ লোলুপ। বিনা সম্বন্ধে মানব ভজিতে মজিতে অনভ্যস্ত। বিনাস্বার্থেও মানব এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায় না, তাই শ্রুতি লয় বিক্ষেপ-সঙ্গ-পরিশ্রান্ত জীবের লয়বিক্ষেপ খণ্ডন-যোগ্য বিশেষণগুলি দ্বারা আপন অঙ্গ সুশোভিত করিয়া পাপ-প্রক্ষালন-ব্যস্ত অধিকারীকে আকর্ষণ করিতেছেন। আলোচ্য মন্ত্রের 'পূতদক্ষম্' 'রিশাদসম্' 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' সেইরূপ বিশেষণ। অধিকারী পাপময় অপবিত্র-বলের প্রেরণায় বহু পাপ করিয়া কোষকারের মত আপন বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে সুতরাং দেবতার বিশেষণ,—'পূতদক্ষম্' মিত্রদেব পবিত্রবল সম্পন্ন। শ্রুতি ইঙ্গিত করিতেছেন,—এই পবিত্রবল-সম্পন্ন মিত্রদেব, তোমার বলের পবিত্রতা-সম্পাদন দ্বারা তোমার লয় বিক্ষেপ খণ্ডন করিয়া দিবেন, তুমি এই পাপহারী দেবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দাসভাবে ইহাঁকে ভজিতে এবং ইহাঁরই ভাবে মজিতে অভ্যস্ত হও। 'রিশাদসম্' বিশেষণ ও এইরূপ অর্থবিশেষই প্রকাশ করিতেছে—'রিশাদসম্' অর্থে হিংস্রস্বভাব রাক্ষসগণের বিনাশক। বাহিরের রাক্ষস তুমি না দেখিতে পার, কিন্তু মানস রাক্ষসের উপদ্রব ত সর্ব্বদাই তোমার লাগিয়া আছে, তুমি বরুণ দেবের শরণাপন্ন হও ইনি তোমার প্রতি হিংসা-পরায়ণ রাক্ষসকুলের সংহার করিয়া দিবেন। শ্রীবিশ্বামিত্র যেমন যজ্ঞ ব্যাপারে রাক্ষস সমূহ কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও শ্রীরামরূপী যজ্ঞেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া যজ্ঞেশ্বরের রাক্ষস বিনাশিনী বরুণায় নিরাপদ হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ বরুণদেবের শরণাপন্ন হও, নিরাপদ হইবে, এবং নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।

অপিচ ইহাঁরা উভয়ে 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' ইহারা জলবর্ষণকারী। অন্নের জন্যই জগতে যত দুশ্চিন্তা, যত অসংবদ্ধ প্রলাপ, যত লয়বিক্ষেপ, জীব 'পেটের ক্ষুধায়, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায়, মনের ক্ষুধায়, নানারূপ অন্নের অন্বেষণে বিবিধ অন্নের চিন্তায় নিয়তই ব্যাপৃত রহিয়াছে, যাবৎ জীব লিঙ্গদেহে অহং অভিমান করিয়া অন্নময়দেহ চিন্তা হইতে অপসারণ করিতে না পারিতেছে, তাবৎ অন্নাভাব নিবারণ ভিন্ন ইহা দ্বারা সাধনা অসম্ভব, তাই শ্রুতি বহুস্থানে

আপন আধিভৌতিক ব্যাথামুখে দেবগণের নিকট অন্নকষ্ট কাতর আপন সন্তানের জন্য অন্ন প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানেও এই জন্যই বিশেষণ 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' মিত্রও বরুণ জলবর্ষণকারী, পার্থিব শস্য সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৃথিবীকে 'শস্যশ্যামলা' করিবার জন্য যে সুবৃষ্টি আবশ্যক, মিত্র ও বরুণ সেই সুবৃষ্টি সম্পাদন করেন তুমি ইঁহাদের শরণাপন্ন হও, ইঁহারাই জলবর্ষণ দ্বারা তোমার অন্নাভাব দূর করিবেন।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধা বৃতস্পৃশা।
ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮

পদানুসরণী] হে মিত্রাবরুণৌ! যুবাম্ ক্রতুং প্রবর্ত্তমানমিমং সোমযাগম্ আশাথে আনশাথে ব্যাপ্তবন্তাবিতি যাবং। কেন নিমেত্তেন ঋতেন অবশ্যম্ভাবিতয়া সত্যেন ফলেন। অস্মভ্যং ফলংদাতুমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ যুবাম্? ঋতাবৃধৌ ঋতমিত্যুদকনাম সত্যং বা—যজ্ঞোবেতি যাস্কঃ। উদকাদীনা মন্যতমস্য বর্দ্ধয়িতারৌ। অতএব ঋতস্পশা উদকাদীনামন্যতমং স্পৃশন্তৌ। কীদৃশং ক্রতুম্? বৃহন্তম্ অঙ্গেরুপাঙ্গে শ্চাতিপ্রৌঢ়ম্॥ হে মিত্রোবরুণৌ দেবৌ! উদকস্য সত্যস্য যজ্ঞস্যবা বর্দ্ধয়িতারৌ যুবা মুদকাদীনামন্যতমং স্পৃশন্তৌ অবশ্যম্ভাবি সত্যং ফলমস্মভ্যং দাতুম্ অঙ্গেরূপাঙ্গৈশ্চাতি সমৃদ্ধমিমং সোমযাগ পরিব্যাপ্তবন্তাবিতিপিণ্ডিতোঽর্থঃ।

পদ-নিবান্দিনী] ঋতেন (অবশ্যম্ভাবী অবিতথ ফল আমাদিগকে দান করিতে) মিত্রাবরুণা (হে মিত্রাবরুণদেব!) ঋতাবৃধা (জল, সত্য বা যজ্ঞের পরিবর্দ্ধক) ঋতস্পৃশা (জল সত্য বা যজ্ঞ স্পর্শকরত) ক্রতুম্ এই অচির প্রবৃত্ত সোমযাগকে) বৃহন্তম্ (অতিসমৃদ্ধ) আশাথে (পরিব্যাপ্ত হইয়াছ)।

বঙ্গানুবাদ] হে দেব মিত্রাবরুণ! তোমরা জল যজ্ঞ বা সত্যের পরিবর্দ্ধক। তোমরা জল যজ্ঞ বা সত্য স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল দান করিবার জন্য এই অঙ্গ ও উপাঙ্গে সমৃদ্ধ সোমযাগের চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছ ॥ ৮

ক্রমশঃ—

লীলা-উপন্যাস

বিজ্ঞপ্তি।

লীলা বশিষ্ঠদেব রচিত উপন্যাস। তখন কিন্তু উপন্যাস নাম ছিল না—নাম ছিল উপাখ্যান। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই উপন্যাসের নাম দিয়াছেন মণ্ডপোপাখ্যান। আমরা এই উপন্যাসের নামকরণ করিলাম লীলা।

আজকাল উপন্যাসপ্লাবিত জগতে কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক উপন্যাস লিখিতেছেন, কিন্তু ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ? পদ্মও ফুল আর শিমুলও ফুল, কিন্তু প্রভেদ কত?

প্রিয়জনের মৃত্যুতে যখন আর থাকা যায় না, তখন বিয়োগবিধুরা কত স্ত্রীলোক, শোকদগ্ধ কত মূঢ় পুরুষ দুঃখ করে; বলে মৃত ব্যক্তি কোথায় আছে তাহা কি কেহ দেখাইয়া দিতে পারে?

বশিষ্ঠদেব এই উপন্যাসে দেখাইতেছেন—পারে—যদি কেহ লীলার মত কার্য্য করিতে পারে। লীলা, মৃত স্বামীকে মৃত্যুর পরে দেখিয়াছিলেন। যেখানে মৃত প্রিয়জন থাকেন সেইখানে যাইবার আগ্রহ যথার্থ ভাবে যদি জাগে এবং সেই জন্য প্রাণপণ চেষ্টা যদি হয়, তবে মৃত্যুর পরেও প্রিয়জনকে দেখা যায়।

এই গ্রন্থ সেই তত্ত্ব দেখাইবার জন্য।

শুধু চিত্ত বিনোদনের জন্য ঋষিগণ গল্প বানাইতেন না। ইঁহারা ভাব-রাজ্যের রাজা। উপাখ্যান রচনা করিতেন জীবনের নিতান্ত আবশ্যকীয় ভাব বিস্তার জন্য। এখনকার লোকের ভাব—জীবনের দুরূহ প্রশ্ন মীমাংসা করিতে পারে না—দুই একটি কোকিলের ডাক, দুই একটি ভ্রমর-গুঞ্জন আর দুই চারিটি ঘোমটার আড়াল হইতে স্মিতমুখে হাঁসি আর দুই একটি চাঁদের জ্যোৎস্না গল্পে এইসব থাকাই চাই। তার সঙ্গে কিছু নৌকাডুবী বা দুই চারিটা খুনখারাপী, অথবা সংসারে নিষিদ্ধ স্থানে কাম রাখিবার প্রয়াস-বিফলতায় নায়ক নায়িকার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা চিরবিচ্ছেদ অবস্থা, এইরূপ বর্ণনা লইয়া ক্ষণিক চিত্ত আবেগ তুলিবার জন্য পুস্তক রচনা। এ সব স্থানে কি শিক্ষা কিছুই থাকে না? থাকে। কিন্তু সেই শিক্ষাতে জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না। নভেল নাটক পড়িয়া বা থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া স্থায়ী ভাবে চরিত্র গঠিত হয় না। কিন্তু

ঋষিগণের লেখায় ভাল হইবার জন্য যেরূপ সাধনা আবশ্যক, ধারণাভ্যাসী হইবার জন্য যেরূপভাবে ধ্যান আবশ্যক এবং বিচারবান্ বা বিচারবতী হইবার জন্য যাহা প্রতিনিয়ত বিচার করিতে হইবে—সেই সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে থাকে।

তার পর ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি? এ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির তুলনা নাই। কালিদাসের গ্রন্থের বহু মাধুর্য্য ঋষিদিগের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা। এমন সুন্দর ভাষায়, এমন সুন্দর ভাব বর্ণনা আর কোথাও বুঝি পাওয়া যায় না।

লোকের ধারণা ঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। দুই চারি জনের মুখে শুনাও যায়—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে স্ত্রীলোকের নিন্দা বড়ই করা হইয়াছে।

কথা আদৌ সত্য নহে। ঋষিগণ লম্পটের মুখে স্ত্রীজাতির রূপ গুণ বর্ণনা শুনিতে পারিতেন না। সন্ন্যাসীর সহিত স্ত্রীলোকের সম্পর্ক থাকিতে দেখিলে নিতান্ত ব্যথিত হইতেন। এ সম্পর্কে সন্ন্যাসী ব্রহ্মভ্রষ্ট ও কর্ম্মভ্রষ্ট হয় বলিয়া শ্রুতি স্বয়ং লম্পট সন্ন্যাসীকে "নমস্তভ্যং" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। সতীত্বের ব্যভিচার যাহাতে না হইতে পারে সেইজন্য ঋষিগণ লম্পটের মুখে স্ত্রীজনের সুখ্যাতিকে এরূপ উপহাস করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে কামুক পুরুষও কামুকী স্ত্রীলোক আপন আপন কদর্য্য ব্যভিচার দেখিয়া একবারে সমস্ত কামের ব্যাপার ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

স্কন্দপুরাণ বলেন "সর্ব্ব জন্মের দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও কোন কোন মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া এই মানব জন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া ফেলে। ঐ মূঢ়দিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য তোমাদের জন্ম কিসের জন্য?

নারী হইতে জীব-জগতের উৎপত্তি। সুতরাং আমরা তাহাদের নিন্দা করি না। কিন্তু যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্লজ্জভাবে আসক্ত হয়, তাহাদিগকে আমরা নিন্দা করি"। স্কন্দপুরাণ আরও বলেন লম্পটেরা "ওষধীদ্রোহী, আত্মদ্রোহী পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী। সুদীর্ঘকালের জন্য তাহাদের অধোগতি অনিবার্য্য।"

কিন্তু সতী স্ত্রীলোকের রূপগুণ বর্ণনা ঋষিগণ যেরূপ ভাবে করিয়াছেন সেরূপ বুঝি জগতে আর কোথাও নাই। লীলা, চূড়ালা ইঁহারা কুলবধূ;

ইঁহারা সতী, ইঁহারা পতিগতপ্রাণা। ইঁহাদের প্রশংসা এই গ্রন্থে যাহা দেখা যায় তেমন সুখ্যাতি আর কোথায় পাই? লীলার রূপগুণ বর্ণনা, চূড়ালার স্বভাব বর্ণনাকালে, মনে হয়, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যেন শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেছেন।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ আমরা বুঝিয়া পাঠ করি, যতটুকু আমাদের সাধ্যে কুলায়—ইহাই আমাদের চেষ্টা। এই নিতান্ত রমণীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা লীলার উপাখ্যানে আসিয়াছি। তাই লীলার উপাখ্যান একটু আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিবার প্রয়াস করা হইয়াছে মাত্র। কাজের কথা আমরা কোথাও সংক্ষেপ করি নাই।

যদি সময় হয় আমরা অসতী অহল্যা ও সতী চূড়ালার উপাখ্যানও এইরূপ ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীভগবানের প্রসন্নতাই আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান কালের প্রার্থনা। আধুনিক লেখকগণের কেহ কেহ যদি এই গ্রন্থের চরিত্র লইয়া উপন্যাস লেখেন তবে বোধ হয় সমাজের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারে।

শেষে ইহাও বলা এখানে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে শ্রীমতী আনিবসন্তের ডেথ এণ্ড আফটার ইত্যাদি গ্রন্থের ভাব এই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আছে এবং অনেক বেশী ভাবও আছে। ইতি

কলিকাতা,
সন ১৩২১ সাল।
শকাব্দা ১৮৩৬,
১লা কার্ত্তিক।

গ্রন্থকার।

লীলা-উপন্যাস।

সূচনা

(১)

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উৎপত্তি প্রকরণের ১৫ সর্গ হইতে ৫৯ সর্গ পর্য্যন্ত মণ্ডপোপাখ্যান। যে কথা বুঝাইবার জন্য এই উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে আমরা সূচনায় তাহার কতক আভাস দিব। একটি কথা বলা আবশ্যক—সূচনায় বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। উৎপত্তি প্রকরণের ১২ শ, ১৩ শ, ১৪শ সর্গ অত্যন্ত কঠিন। এই তিন সর্গে ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব সৃষ্টি কোন্ বস্তু, প্রকৃত পক্ষে জগৎ কি তাহাই দেখাইয়াছেন। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিবার জন্যই মণ্ডপোপাখ্যান। এই উপাখ্যানের নায়িকা রাজ্ঞী লীলা। লীলাতে উপন্যাসের সমস্তই দৃষ্ট হয়। আজকাল উপন্যাসের গল্পটি একবার পড়িলেই যেমন পুস্তকটির আর প্রয়োজন হয় না—ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের উপন্যাস সেরূপ নহে। যতদিন না লীলার অবস্থা লাভ হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই পুস্তকের প্রয়োজন। যাহা সত্য, তাহার প্রয়োজন, সত্য উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত থাকিবেই। যাহা অসত্য তাহার ক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তাহাতে আর প্রয়োজন থাকে না।

(২)

আমরা মণ্ডপোপাখ্যানের ১৫ সর্গের ভাবটি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই সূচনাতে সন্নিবেশিত করিতেছি। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে যাঁহাদের রুচি নাই তাঁহারা এই অংশ প্রথমে পরিত্যাগ করিতেও পারেন। লীলার ১ম অধ্যায় হইতে পাঠ করিলেই তাঁহারা উপন্যাসের রস কতক কতক অনুভব করিতে পারিবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুচিন্তা করিবার বিষয়ও পাইবেন। আমরা লীলা উপন্যাসের সূত্রাংশ আরম্ভ করিতেছি। যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকও ইহাতে থাকিবে। আদর্শ

অবিকৃত রাখিয়া লোকের রুচি উৎপাদন করাকেই আমারা গ্রন্থকারের প্রকৃত কর্ত্তব্য মনে করি। ঔষধ খাওয়াতেই হইবে, নতুবা বিকার কাটিবে না। সেই জন্য অনুপানে কিছু মধুর মিশ্রণ থাকা আবশ্যক; নতুবা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি ঔষধ না খাইয়া ফেলিয়া দিতে পারে। লীলাতে অনুপানের মত কিছু দিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব ভবরোগের প্রকৃত ঔষধ দিতেছেন।

লীলাকে উপন্যাস আকারে আনিবার প্রয়াস শুধু অনুপানকে আধুনিক রুচি মত মুখরোচক করিবার জন্য। কিন্তু ঔষধের পরিবর্ত্তন কিছুই করা হয় নাই। কারণ ঐরূপ করিলে কোন ফল হইবে না; বরং রোগ বাড়িয়াই যাইবে।

(৩)

চিত্তে বিশ্রান্তি আসিল কৈ ?

এত ভ্রম দর্শনে কি চিত্ত বিশ্রাম লাভ করিতে পারে? ক্ষণিক চিত্তবিনোদনে ভ্রমটাই মনোহর মনে হইয়া যায়; ইহাতে ভ্রমই দৃঢ় হয়। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এই জগৎ—ইহা কেবল অজ্ঞচিত্তকে ভ্রমে মাতাইয়া রাখিবার জন্য।

এসকল করে কে? কেন করে?

কেহই করে নাই। কেহই করে নাই বলিয়া তৎপ্রতি কোন কারণও নাই। বিশ্বনর্ত্তকীও কেহ নাই। নাচও হইতেছে না। যিনি আছেন তিনিই আছেন।

তথাপি যে এই জগৎ-নাট্যশালে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত অভিনয় দেখা যাইতেছে।

ভ্রম ভ্রম—মিথ্যা মিথ্যা। জগৎদর্শনটা মহাভ্রম।

তস্মান্ন কিঞ্চিদুৎপন্নং জগদাদীহ দৃশ্যকম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যথাস্থিতমবস্থিতম্॥ উ।১৫।১৪।

জগদাদি দৃশ্য কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। ন কিঞ্চিৎ উৎপন্নং। ইহার কোন নামও নাই, কোন অভিব্যক্তিও নাই। যাহা ছিল তাহাই আছে। মায়াকাশে স্থিত এই জগৎ অভিত্তিমৎ। ইহার ভিত্তি পর্য্যন্ত নাই। যাহা দেখা যাইতেছে তাহা নিরাবরণ চিদাকাশ—তাহা আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী চিৎমাত্র, জ্ঞানমাত্র।

এই পরিদৃশ্যমান্ কল্পিত জগৎ সেই অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপকে অণুমাত্রও আবরণ করিতে পারে নাই। অঙ্গুলী আড়াল দিলে কি সূর্য্য ঢাকা পড়ে? না তরঙ্গ উঠিলে সমুদ্র ঢাকা যায়? অথবা বাসনা উঠিলে দ্রষ্টা থাকেন না?

আকাশরূপমেবাচ্ছং পিণ্ডগ্রহ বিবর্জ্জিতম্।
ব্যোম্নি ব্যোমময়ং চিত্রং সঙ্কল্পপুরবৎ স্থিতম্॥ উ।১৫।১৬

এই কল্পিত পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল—আকাশের মত শূন্য, ইহা পিণ্ডগ্রহ বিবর্জ্জিত—কোন প্রকার মূর্ত্তি ইহার নাই। শূন্যে শূন্যময় চিত্র সঙ্কল্পনগরবৎ অবস্থিত।

জগৎটা শূন্য, জগতের কোন আকার নাই। ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। সর্প আদৌ নাই রজ্জুই আছে। জগৎ আদৌ নাই। যাহা দেখা যায় মত বোধ হয় তাহা জগৎ নহে ব্রহ্মই। ব্রহ্মই আছেন। জগৎ নাই। তবুও যে দেখা যায় মত লাগে তাহা ব্রহ্মই জগৎ মত দেখা যাইতেছে। কি এই প্রহেলিকা?

বর্জ্জয়িত্বাজ্ঞবিজ্ঞানং জগচ্ছব্দার্থ ভাজনম্।
জগৎ ব্রহ্ম স্বশব্দানামর্থে নাস্ত্যেব ভিন্নতা॥ উ।১৫।১০

অবিবেকীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি শব্দের অর্থ ও জগৎ শব্দের অর্থ ইহাদের একটা ভেদ প্রতীতি হয়। কিন্তু যথার্থদর্শীর নহে। ব্রহ্ম ও জগতের কোন ভেদ নাই।

যাহারা অবিবেকী তাহারাই ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে জগৎশব্দ ব্যবহার করে। বিবেকী জগৎকে অদ্বয়ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অনুসরণ করিও না। জান যে ব্রহ্ম, জগৎ, আমি, তুমি, ইত্যাদির অর্থে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই।

ইদং স্বচেত্যচিন্মাত্রং ভানোর্ভাতং নভঃ প্রতি।
তথা সূক্ষ্মং যথা মেঘং প্রতি সঙ্কল্পবারিদঃ॥ উ।১৫।১১
যথা স্বপ্নপুরং স্বচ্ছং জাগ্রৎপুরবয়ং প্রতি।
তথা জগদিদং স্বচ্ছং সাঙ্কল্পিক জগৎপ্রতি॥ ঐ ১২।
তস্মাদচেত্যচিদ্রূপং জগদ্ব্যোমৈব কেবলম্।
শূন্যৌ ব্যোম জগচ্ছব্দৌ পর্য্যায়ৌ বিদ্ধি চিন্ময়ৌ॥ ঐ ১৩।

তত্ত্বজ্ঞানী এই জগৎকে জগৎ দেখেন না। দেখেন চেত্যতারহিত চিৎ। শূন্য

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

মূল, সমস্ত ভাষ্য ও টীকার আবশ্যকীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ এবং প্রতিশ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা। গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা আর নাই—ইহা সকলেই বলিতেছেন।

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তত্ত্বসমূহের এমন সুন্দর প্রণালীতে আলোচনা এখন পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের সাধনা দ্বারা জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা অন্য কোথাও এখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম ষট্‌ক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূল্য ৪।০ ; দ্বিতীয় ষট্‌ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় মূল্য ৪।০ ; তৃতীয় ষট্‌ক ১৩ অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় মূল্য ৪।০।

ভদ্রা—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত। মহাভারতীয় সুভদ্রা-চরিত অবলম্বনে সামাজিক উপন্যাস। বিবাহ জীবনের নব অনুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। প্রতি যুবকের পাঠ করা উচিত। মূল্য ১।০।

কৈকেয়ী—মানুষ আপনা হইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মূল। দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হইতে পারেন—রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে। কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী ও কৌশল্যা-চরিত্র ধরিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। না কাঁদিয়া পড়া যায় না। মূল্য ।০ আনা।

ভারতসমর ১ম ভাগ—মূল মহাভারত, কালিসিংহের অনুবাদ এবং কাশী দাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমুখ পত্রিকা বলেন—এমন ভাবে মহাভারতের চরিত্র সমরের উপযোগী করিয়া কেহ পূর্ব্বে দেখান নাই। যেমন ভাষা তেমনি শিক্ষা

পুরাতনকে নূতন করিয়া এরূপে কেহ আঁকেন নাই। প্রতি স্থানেই তাবে লেখা। অতি উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৸৹ আনা।

সাবিত্রী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—সর্ব্বজন প্রশংসিত এই পুস্তক প্রতি স্ত্রীলোকের পাঠ করা উচিত। সাবিত্রী সত্যবানের চরিত্র এরূপ ভাবে দেখান হইয়াছে যে, যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছা করে। বহুজনে ইহার ভাবা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। মূল্য ।৹ আনা।

উৎসব—মাসিক পত্র ৮ম বৎসর চলিতেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলেন আজ কালকার কোন পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বঙ্গবাসী বলেন এতদিনে হিন্দুর পাঠ্য মাসিক পত্রিকা দেখিলাম। যেমন বিষয় বৈচিত্র তেমনি লেখার কৌশল। বাজে কথা, বাজে গল্প একবারে নাই। যাহাতে জীবনে উপকার হয়, সাধনা হয়, তাহা অনন্ত ভাবায় মধুর করিয়া লেখা। মূল্য বার্ষিক ১৷৹ মাত্র। আর এক সুবিধা, যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহারা ঋগ্বেদসংহিতা, মাণ্ডূক্য উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ এই চারিখানি পুস্তক কাগজের সঙ্গে সঙ্গেই পাইতে থাকিবেন।

শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী—প্রকাশক।
উৎসব অফিস,—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য—১৷০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৶৹ আনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটী বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত।

Registered No. C, 543.

৯ম বর্ষ।] পৌষ, ১৩২১ সাল। [৯ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২॥০, সিকি পৃষ্ঠা ১॥০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৶০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, পৌষ। [৯ম সংখ্যা।

শ্রুতি বাক্য। (৩২৫)

ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তিঃ।

কথং বন্ধঃ ? কথং মোক্ষঃ ?

আত্মেশ্বর জীবঃ অনাত্মনাং দেহাদীনামাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমান আত্মনো বন্ধঃ। তন্নিবৃত্তির্মোক্ষঃ।

কা বিদ্যা ? কাঽবিদ্যেতি ?

যা তদভিমানং কারয়তি সা অবিদ্যা। সোঽভিমানো যয়ানিবর্ত্ততে সা বিদ্যা।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতুরীয়ং চ কথম্ ?

মন আদি চতুর্দ্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈরাদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদোপলভতে তদাত্মনো জাগরণম্।

তদ্বাসনাসহিতৈশ্চতুর্দ্দশকরণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়াঞ্ছব্দাদীন্ যদোপলভতে তদাত্মনঃ স্বপ্নম্।

চতুর্দ্দশ করণোপরমাৎ বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন্নোপলভতে তদাত্মনঃ সুষুপ্তম্।

অবস্থাত্রয় ভাবাভাবসাক্ষী স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা তদা তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে।

অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময়ানন্দময়কোশঃ কথম্ ?

অন্নকার্য্যাণাং কোশানাং সমূহোঽন্নময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে।

প্রাণাদিচতুর্দ্দশবায়ুভেদা অন্নময়কোশে যদা বর্ত্তন্তে তদা প্রাণময়কোশ ইত্যুচ্চতে।

এতৎ কোশদ্বয়ং সংসক্তং মন আদি চতুর্দ্দশকরণৈরাত্মা শব্দাদিবিষয়সঙ্কল্পাদীন্ ধর্ম্মান্ যদা করোতি তদা মনোময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে।

এতৎ কোশত্রয়সংসক্তং তদ্গতবিশেষজ্ঞো যদা ভাসতে তদা বিজ্ঞানময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে।

এতৎ কোশচতুষ্টয়ং সংসক্তং স্বকারণাজ্ঞানে বটকণিকায়ামিব বৃক্ষো যদা বর্ত্ততে তদানন্দময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে।

কর্ত্তা ? জীবঃ ?

সুখদুঃখবুদ্ধ্যা শ্রেয়োঽন্তঃকর্ত্তা যদা তদা ইষ্টবিষয়েবুদ্ধিঃ সুখবুদ্ধিঃ অনিষ্টবিষয়ে বুদ্ধি দুঃখ বুদ্ধিঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ সুখদুঃখহেতবঃ। পুণ্যাপাপকর্ম্মানুসারী ভূত্বা প্রাপ্তশরীর সংযোগমপ্রাপ্তশরীর সংযোগমিব কুর্ব্বাণো যদা দৃশ্যতে তদোপহিত জীব ইত্যুচ্যতে।

পঞ্চবর্গঃ ? ক্ষেত্রজ্ঞঃ ?

মন আদিশ্চ প্রাণাদিশ্চেচ্ছাদিশ্চ সত্বাদিশ্চ পুণ্যাদিশ্চৈতে পঞ্চবর্গা ইত্যেতেষাং পঞ্চবর্গাণাং ধর্ম্মীভূতাত্মা জ্ঞানাদৃতে ন বিনশ্যত্যাত্মসন্নিধৌ নিত্যত্বেন প্রতীয়মান আত্মোপাধি র্য স্তল্লিঙ্গশরীরং হৃদ্‌গ্রন্থিরিত্যুচ্যতে।

তত্র যৎ প্রকাশতে চৈতন্যং স ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে।

সাক্ষী কূটস্থোঽন্তর্যামী কথম্ ?

জ্ঞাতৃ জ্ঞানজ্ঞেয়ানামাবির্ভাব তিরোভাব জ্ঞাতা স্বয়মাবির্ভাব তিরোভাব রহিতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ সাক্ষীত্যুচ্যতে।

ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্তং সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিষু অবশিষ্টতয়োপলভ্যমানঃ সর্ব্বপ্রাণি-বুদ্ধিস্থো যদা তদা কূটস্থ ইত্যুচ্যতে।

কূটস্থোপহিত ভেদানাং স্বরূপলাভহেতুর্ভূত্বা মণিগণে সূত্রমিব সর্ব্বক্ষেত্রেষু অনস্যূতত্বেন যদা কাশতে আত্মা তদান্তর্যামীত্যুচ্যতে।

প্রত্যগাত্মা পরাত্মা মায়া চেতি কথম্ ?

সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং কটকমুকুটাদ্যুপাধি রহিত সুবর্ণ-ঘনবৎ বিজ্ঞান চিন্মাত্র স্বভাবাত্মা যদা ভাসতে তদা ত্বং পদার্থঃ।

সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। সত্যমবিনাশি। অবিনাশি নাম দেশ কাল বস্তু নিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি তৎ অবিনাশি।

জ্ঞানং নামোৎপত্তি বিনাশরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যুচ্যতে।

অনন্তং নাম মৃদ্বিকারেষু মৃদিব স্বর্ণবিকারেষু স্বর্ণমিব তন্তুবিকারেষু তন্তুরিব অব্যক্তাদিসৃষ্টি প্রপঞ্চেষু পূর্ণং ব্যাপকং চৈতন্যং অনন্তং ইত্যুচ্যতে।

আনন্দং নাম সুখচৈতন্য স্বরূপোঽপরিমিতানন্দ সমুদ্রোঽবশিষ্ট সুখস্বরূপশ্চানন্দ ইত্যুচ্যতে।

এতৎ বস্তু চতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশ কাল বস্তু নিমিত্তেষু অব্যভিচারী তৎপদার্থঃ পরমাত্মেত্যুচ্যতে।

ত্বং পদার্থাদৌপাধিকাত্তৎ পদার্থাদৌপাধিক ভেদাৎ বিলক্ষণমাকাশবৎ সূক্ষ্মং কেবল সত্তামাত্র স্বভাবং পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে।

মায়া নাম অনাদিরন্তবতী প্রমাণাপ্রমাণ সাধারণা ন সতী না সতী ন সদসতী স্বয়মধিকা বিকাররহিতা নিরূপ্যমাণা সতীতরলক্ষণ শূন্যা সা মায়েত্যুচ্চতে।

অজ্ঞানং তুচ্ছাপ্যসতী কালত্রয়েঽপি পামরাণাং বাস্তবী চ সত্ত্ববুদ্ধির্লৌকিকানা-মিদমিত্থমিত্যনির্ব্বচনীয়া বক্তুং ন শক্যতে।

নৈব ভবাম্যহং দেবো নেন্দ্রিয়াণি দশৈবতু।
ন বুদ্ধির্ন মনঃ শশ্বৎ নাহঙ্কারস্তথৈবচ॥
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো বুদ্ধ্যাদীনাং হি সর্ব্বদা।
সাক্ষ্যহং সর্ব্বদানিত্য শ্চিন্মাত্রোঽহং ন সংশয়ঃ॥
নাহং কর্ত্তা নৈব ভোক্তা প্রকৃতেঃ সাক্ষিরূপকঃ।
মৎসান্নিধ্যাৎ প্রবর্ত্তন্তে দেহাত্মা অজড়া ইব॥
স্থাণুর্নিত্যং সদানন্দঃ শুদ্ধো জ্ঞানময়োঽমলঃ।
আত্মাহং সর্ব্বভূতানাং বিভুঃ সাক্ষী ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মৈবাহং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যং নাহং বেদ্যং ব্যোমবাতাদিরূপম্।
রূপং নাহং নাম নাহং ন কর্ম্ম ব্রহ্মৈবাহং সচ্চিদানন্দরূপম্॥
নাহং দেহো জন্ম মৃত্যু কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।
নাহং চেতঃ শোকমোহৌ কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতোম ইত্যুপনিষদ্॥
ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তিঃ।
ইতি সর্ব্বসারোপনিষৎ সমাপ্তা॥

উদ্বোধন।

দিন গেল অস্ত রবি এল শেষ বেলা,
এখনো বসিয়া রবে লয়ে মিছে খেলা?
উঠ যাত্রী চল পারে,
বন্দী কেন কারাগারে?
চুরি করে নেছ এযে আপনার হার,
রাজা তুমি খেলা ছলে সেজেছ চামার।
কেন হেথা এসেছিলে
সেকি সব ভূলে গেলে,
আঁখি জল ছলছলি কেন অচেতন?
নিজ হাতে গড়া এযে সাধের বাঁধন।
ঊর্ণনাভ সম হায়?
ঘিরিয়াছ আপনায়,
ফিরিবে যে কোন পথে রাখ নাই দ্বার;
আপনি আপনা ঢুঁড়ি কর হাহাকার।
দেখ বন্ধু! দেখ স্মরি,
ছদ্ম বেশ আছ পরি,
সিংহ শিশু ডরে কভু হেরি ফেরুপাল?
মুক্ত তুমি ছিন্ন কর মিথ্যা মায়াজাল।

মৃঃ—

ঘর ভাল নয়।

সত্য সত্যই কি আমার আপনার কেহ নাই? ঘরের সবাই জ্বালাতন করে, দুর্ব্বাক্য বলে, বহু ক্লেশ দেয়, এই ত আমার ক্লেশ? ঘরের সবাই এমন কাজ করে

যাহাতে আমি বলিতেও পারি না ডাকিতেও পারি না এই ত? এই যাতনাই কি এত বেশী?

শেষ মুহূর্ত্তে এই আপনার যাহারা তাহারা কেমন আপনার বুঝাইয়া যাইবে, ইহাও ত একবার মনে কর। কত লোকের ত দেখ কে যেন একজন আসিয়া জোর করিয়া ইহাদের হাত হইতে ছাড়াইয়া শত যাতনা দিতে দিতে কোথায় লইয়া যায়! কি আশ্চর্য্য ভ্রান্তি! যাহারা চিরদিন কষ্ট দিতেছে তাহাদিগকে ছাড়িতে হইবে বলিয়া ক্লেশ? কাজেই আমার মত নির্ব্বোধ আর কে? বহু ক্লেশ দিয়াও এই ঘর ছাড়নই উচিত। আর একটা কথা মনে রাখা উচিত—ভিতরে জান ইহারা দারুণ শত্রু। প্রাণান্ত না করিয়া ইহারা ছাড়িবে না। কিন্তু বাহিরে ইহাদের সঙ্গে গোলমাল করিও না। বিপদে ত আছই; আরও অসহ্য হইবে। সব সহ্য কর। আর ইহারা নিত্য তোমায় তোমার দূরবন্ধুকে স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া ইহাদের অপমানে ভিতরে সন্তুষ্ট হও। কারণ শত্রু হইলেও ইহারাই বন্ধু। দুঃখ দেয় বলিয়াই জানাইবার সুবিধা। যে যথার্থ আপনার দুঃখই যেন তাহার কাছে পাঠাইয়া দেয়। ইতি—

পদচিহ্ন।

প্রেমের কল্পনা কল্পিত মুরতি
তুমি যে আমার বঁধু,
না এস আসিবে থাক চিরকাল
হৃদয় জুড়িয়া সুধু।
রহুক মরমে সরমের ব্যাথা
বাজুক অন্তর যন্ত্র,
তবু যেন কভু, ভুলিনা ভুলিনা
ও মনোমোহন মন্ত্র।
হউক কল্পনা আকাশ কুসুম
আমার কপালে হবে,
(বল) এ আশা ভাঙ্গিয়া, কুয়াসা ঢালিয়া
কি ফল ফলিবে তবে।

তোমার আশায় প্রতি ক্ষণ পল
যেন গো আমার যায়,
নিশ্বাস প্রশ্বাসে পদ শব্দ যেন
মাখান থাকে গো তায়।
সুরভি চন্দনে সাজান শ্রীপদ
আসিতে যাইতে তায়,
(সুধু) রেখাটি ধরিয়া চলিব হরষে,
যেখানে পরাণ যায়।
একে অমানিশা তাহাতে আবার,
ঘন ঘটা মহারোলে,
কি মহান্ শব্দ কর্ণে লাগে তালা
বরজ পড়িছে কোলে।
হারায়েছ ভ্রান্ত দুর্ভাগ্য পথিক
আপন গন্তব্য স্থান,
ক্ষণিকে হাসিয়া উঠিল বিজলী
পরশে পাইল প্রাণ।
নিত্য নৈমিত্তিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক
সকলি রেখার লেখা,
ক্ষণ মহাক্ষণ হয় চিরকাল
ক্ষণিকে পাইলে দেখা
তবে মুছনা মুছনা সাধের রেখাটি
এ মোর সুখের দিন,
আমি জনমে জনমে খুঁজিয়া লইব
ও রাঙ্গা পায়ের চিন্।

রাঃ—

এমন হয় কেন ?

তুমি শান্ত হইলেই আমাতে আর বৃথা তরঙ্গ তুলিতে কেহ থাকেনা। তোমাকে শান্ত করিবার জন্য জীবন ভরিয়া, যতদিন হইতে বুঝিয়াছি ততদিন হইতে কতকি করিতেছি। তোমায় নাম দিলাম, সৎসঙ্গ দিলাম সৎশাস্ত্র দিলাম—কৈ তুমি তোমার ভাব ছাড়িয়া আমার ভাবে আসিলে ? ক্ষণকালের জন্য চুপ, পরে যা ছিলে তাই। ইহাত আমি চাই না। আমি চাই চিরতরে তুমি আমার হও। অন্য কারও আর না হও। যা করিবে আমার সঙ্গেই কর। আমাকে ফাঁকি দিয়া কিছুই না কর। তবেই আমি ও তুমি আনন্দে থাকি। তা হইতেছে কৈ ? কেবল ফাঁকি, কেবল দুঃখ। প্রথমে সুখ ভাবিয়া যাও, শেষে দুঃখ কর। চিরদিনত এই করিতেছ ? কবে ভাল হইবে ? কত জপ, ধ্যান, বিচার ত করিলে, কত শাস্ত্র ত পড়িলে, কত পড়াইলে, কত শুনিলে, কত শুনাইলে কিন্তু য্যায়সাকে ত্যায়সা। সেই অল্পেই বেঁহুস। কিছুই ত গেল না। তাই বলি কেন এমন হয় ?

কেন এমন হয় ? সমুদ্রে তুমি যাহা দাও তাহাই সমুদ্র দুরে ফেলিয়া দিয়া যায়। কারণ সমুদ্র সদাই তরঙ্গঘাতে ব্যাকুল। সমুদ্র থামাইতে হইলে, যে সমুদ্র গড়িয়াছে তাকে বুঝি ধরিতে হয়। হতাশ হইলেই বা কি হইবে ? তুমি ও সমুদ্র অপেক্ষা কিছুতেই কম নও সমুদ্রে উর্ম্মিমালা আর তোমাতেও ষড়োর্ম্মি। জরা মৃত্যু দেহের, ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের, আর শোক মোহ মনের। এই ষড়োর্ম্মি আঘাতে সংসার সাগর নিয়ত ক্ষুব্ধ। তাই বলি চেষ্টা কর, আর যে সাগর নাচায় তারে ধর।

কে সে ? দেখ তুমি পিশাচবৎ ভ্রান্ত হইয়া ছুটাছুটি কর কেন ? তুমি শান্ত হইয়া আপনাকে আপনি দেখ, দেখিবে তুমিই যে সে। আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া কষ্ট কেন পাও।

অহো চিত্ত কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাবৎ।
অভিন্নং পশ্য চাত্মানং রাগত্যাগাৎ সুখী ভব ॥

কারণ ত্বমেব তত্ত্বং হি বিকার বর্জ্জিতম্। তুমিই যে তত্ত্ব। তুমি ধ্যান ধারণা কর কার ? আপনাকে আপনি দেখ—দেখিয়া শান্ত হও। তোমার সমস্ত কোলাহল যে মিথ্যা ? তুমিই যে সেই। ইতি।

স্নান বিধি।

অন্য কোন দেশে স্নান আহার ইত্যাদি ব্যাপারকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। আমাদের দেশে স্নানাহারাদি কার্য্যও যজ্ঞ। স্নানাহার ব্যাপারের সহিত ঈশ্বর চিন্তা জড়িত। ইহাই মুখ্য, শরীরের কার্য্য গৌণ মাত্র। তাই স্নানের বিধি আছে। স্নানের প্রকার ভেদ এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা শুধু এক প্রকার বিধির কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিকেছি।

সপ্তবিধ স্নানের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চেতি স্নানং সপ্তবিধ স্মৃতম্॥

(১) মান্ত্র। (৪) বায়ুস্নান।
(২) পার্থিব। (৫) দিব্যস্নান। (৭) মানস স্নান।
(৩) আগ্নেয়। (৬) জলস্নান।

ভগবান পরাশর এই সপ্তবিধ স্নানের লক্ষণ দিয়াছেন।

ওঁ শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদা লিপ্তস্তু পার্থিবম্।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং স্নানং গোরজমানিলম্॥
আতপে চৈব যাবৃষ্টি দিব্যস্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিষু স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
ধ্যানং যন্মসা বিষ্ণোর্ম্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
অসামর্থ্যেন কার্য্যস্য কালদেশাদ্যপেক্ষয়া॥
এতত্তুল্যফলং জ্ঞেয়মিতি প্রাহ পরাশরঃ॥

(১) ওঁ শন্ন অপো ধন্বন্যা ইত্যাদি মন্ত্র শাস্ত্রবিধি মত উচ্চারণ করিতে করিতে আকাশ মস্তক আকাশ, পৃথিবী মস্তক আকাশ এবং পৃথিবী মস্তক আকাশে যে জল প্রোক্ষণ তাহাই মন্ত্রস্নান।

(২) গঙ্গা মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করা হইতেছে পার্থিব স্নান।

(৩) সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা হইতেছে আগ্নেয় স্নান।

(৪) গো পদোত্থিত ধূলিকণা অঙ্গে লাগিলে বায়ুস্নান হয়।

(৫) রৌদ্র ও বৃষ্টি কালে জলে ভিজিলে দিব্য স্নান হয়।

(৬) নদী সমুদ্র ইত্যাদির জলে যে স্নান তাহা জল স্নান।

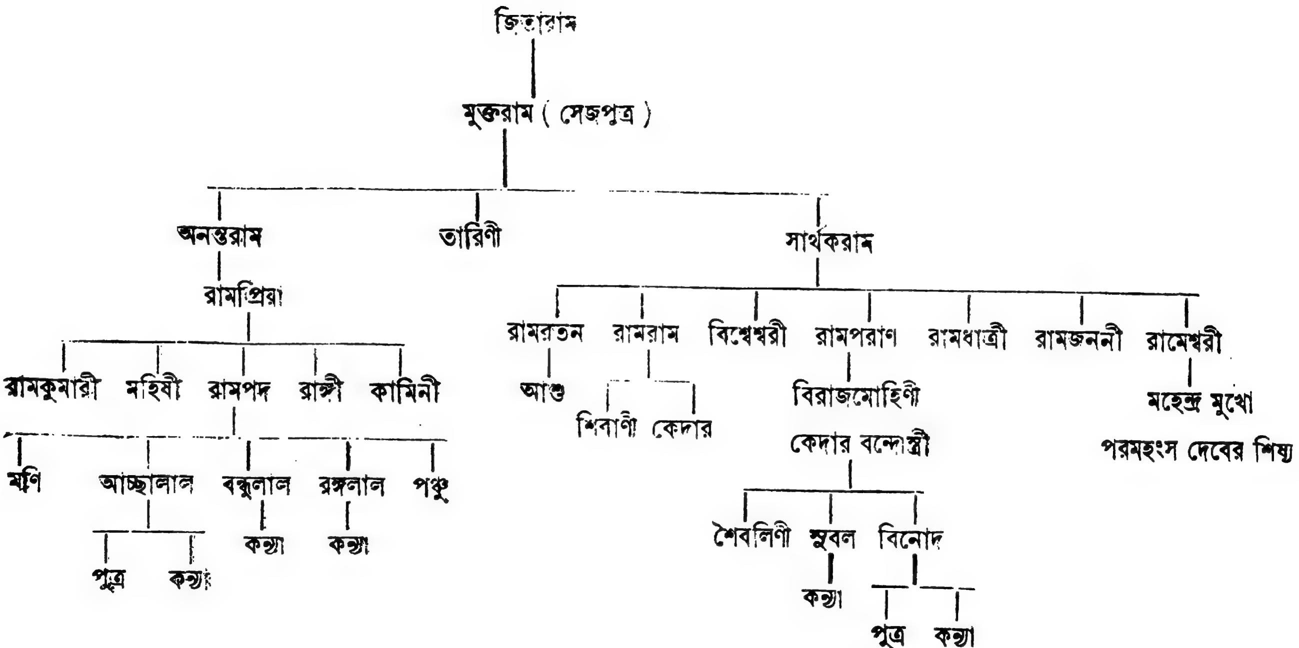
(৭) মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান রূপ যে স্নান তাহাই মানস স্নান। দেশ কাল অনুসারে জল স্নান করিতে অসমর্থ হইলে ইহাদের কোন প্রকার স্নানেও কার্য্য হয়। এই সপ্ত প্রকারের সকল প্রকারেই তুল্য ফল।

আমরা এখানে বামন পুরাণোক্ত মানস স্নান বিধি উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

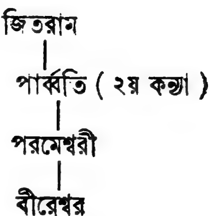
শ্রীগণেশায় নমঃ।

স্বস্থিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মন্ত্রমূর্ত্তিং হরিং স্মরেৎ।
অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজম্॥ ১॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্।
শ্যামলং শান্তবদনং দিব্যপীতাম্বরাবৃতম্॥ ২॥
দিব্য চন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুহাসং শুভেক্ষণম্।
অনেক রত্ন সংচ্ছন্ন স্ফুরন্মকর কুণ্ডলম্॥ ৩॥
নারদাদিভিরাসেব্যং ভাস্বৎ বিমল কঙ্কনম্।
সকিঙ্কিনীক কেয়ূর হার নূপুর শোভিতম্॥ ৪॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঢ্য পদপাথোরূহ দ্বয়ম্।
তৎপাদোদকজাং গঙ্গাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি॥ ৫॥
চিন্তয়েৎ ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তীং স্বকান্ তনুম্।
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমতোদ্দেহগতং মলম্॥ ৬॥
তৎক্ষণাদ্বিরজো মর্ত্ত্যো জায়তে স্ফটিকোপমঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ শুদ্ধ্যর্থং মানসং স্নানমাচরেৎ॥ ৭॥
ইদং মানসিকং স্নানং প্রোক্তং হরিহরাদিভিঃ।
ইদং স্নানবরং মন্ত্র সহস্রাদধিকং স্মৃতম্॥ ৮॥

রজস্তমো মোহজালান্ জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিজান্।
বাঙ্মনঃ কায়জান্ দোষান্ ন বৈতান্নামভির্দ্দহেৎ ॥ ৯ ॥
সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থেষু স্নানাৎ কোটিযুতং ফলম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
অকালমৃত্যুমতিক্রম্য জীবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
নমঃ শিবায়ৈঃ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমোনমঃ।
নমস্ত্রিপথগামিন্যৈ বিশ্বেমূর্ত্ত্যৈ নমোনমঃ ॥ ১১ ॥
নমোস্তু পাপহারিণ্যৈ ভাগিরথ্যৈ নমোনমঃ।
ইড়া ভাগিরথীগঙ্গা পিঙ্গলা যমুনানদী।
তয়োর্মধ্যে গতানাড়ী সুযুম্নাখ্যা সরস্বতী ॥ ১২ ॥
জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগ দ্বেষ মলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাগতিম্ ॥ ১৩ ॥
এবং যঃ প্রত্যহং স্মৃত্বা মানসং স্নানমাচরেৎ।
অপি নীল ঘনশ্যামং কমলায়ত লোচনম্ ॥ ১৪ ॥
স্মরামি পুণ্ডরীকাক্ষং তেন স্নাতোভবাম্যহম্।
অচ্যুতোহমনন্তোহং গোবিন্দোঽমহং হরিঃ।
আনন্দোঽমশেষোঽমজোঽমমৃতোস্ম্যহম্ ॥ ১৫ ॥
নিত্যোহং নির্ব্বিকল্পোহং নিরাকারোঽমব্যয়ঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোহং পরিপূর্ণোস্মি সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী মুক্তোঽমিতি ভাবয়েৎ।
অশক্তশ্চেৎ ভাবয়িতুং বাক্যমেতৎ সদাভ্যসেৎ ॥ ১৭ ॥
বাক্যাভ্যসনমাত্রেণ ব্রহ্মীভূতো ভবেন্নরঃ।
স্বদেহশ্চ পরংব্রহ্ম পদং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
ইতি শ্রীবামন পুরাণোক্ত মানসিক স্নানবিধি সম্পূর্ণ।


জিতারাম
মুক্তরাম (সেজপুত্র)
অনন্তরাম
তারিণী
সার্থকরাম
রামপ্রিয়া
রামকুমারী
মহিষী
রামপদ
রাঙ্গী
কামিনী
মণি
আচ্ছালাল
বন্ধুলাল
রঙ্গলাল
পঞ্চু
পুত্র
কন্যা
কন্যা
কন্যা
রামরতন
রামরাম
বিশ্বেশ্বরী
রামপরাণ
রামধাত্রী
রামজননী
রামেশ্বরী
আশু
শিবাণী
কেদার
বিরাজমোহিণী
কেদার বন্দোস্ত্রী
মহেন্দ্র মুখো
পরমহংস দেবের শিষ্য
শৈবলিণী
সুবল
বিনোদ
কন্যা
পুত্র
কন্যা

- জিতারাম
  - আত্মারাম (কনিষ্ঠ পুত্র)
    - তিতি
      - নীলকমল
        - শ্রীমন্ত
          - পতিতপাবণী
            - বিধবা স্ত্রী
        - কামাখ্যা
          - তরঙ্গিণী
            - বিধবা স্ত্রী
        - অন্নদা
    - বিমলা
    - রেবতী
      - কুমারী
      - রামধাত্রী
      - ক্ষেতু
        - মানদা
        - রাখাল
        - মাখন
        - ননী
          - কন্যা
      - যত্ন
        - শারী কন্যা পাগল
    - রামমোহন ইহার বংশ পরে দেখ
    - ভজরাম ইঁহার বংশ পরে দেখ



বিপদি ধৈর্য্যম্।

খৃষ্টদেব কাষ্ঠদণ্ডের উপরে বাঁধা পড়িয়া বড় বড় কাঁটার দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও অতি অল্পমাত্র বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি বিষম যাতনা। তুমি সেই অবস্থায় আপনাকে একবার পাতিত করিয়া দেখ দেখি কতটুকু তুমি সহ্য করিতে পার।

তোমার মেরুদণ্ডকে ও স্কন্ধের হাড়কে খৃষ্টদেবের যাতনা দণ্ড মনে করিয়া লাও। এই কাষ্ঠদণ্ডে তুমি বদ্ধ। আর তোমার হাতে পায়ে মাথায় কাঁটা ঠোকা হইতেছে। ইহা তোমাকে সহ্য করিতে হইবে।

একজন সাধু—হউক তিনি বিদেশী, ইহা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সংসার ও তোমার যাতনা দণ্ড। ইহার সমস্ত যাতনা খৃষ্টের মত তুমি সহ্য করিতে শিক্ষা কর। বড় ভাল হইবে।

যদি এই দেশের দৃষ্টান্ত চাও তবে ভীষ্মদেবে আইস। বর্ষার বারিধারার মত বিপদ শর তোমার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। একটা কাঁটা ফুটিলে মানুষ সহিতে পারে না। কিন্তু এই ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত।

তুমি মনে মনে এই বিপদ শরশয্যায় আপনাকে শায়িত করিতে অভ্যাস কর। ঐরূপে শয়ন করিয়া মধুসূদনের প্রতীক্ষা করিতে থাক। সর্ব্বদা নাম কর।

বিপদে কাতর হইও না। পূর্ব্ব দুই দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া সেইরূপ অবস্থায় আপনাকে ফেলিয়া পুত্র কন্যা স্বজন বন্ধু বান্ধবকে শিক্ষা দাও কেমন করিয়া বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া নাম করিতে হয়। কেমন করিয়া বিপদেও প্রসন্ন থাকিতে হয়।

এ সব দৃষ্টান্ত এক রকমের। আর এক দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীভগবান্ দুরন্ত শীতেও রাজরাজেশ্বরীকে সঙ্গে লইয়া খালি পায়ে গোদাবরী স্নানে যাইতেন। বিনা শয্যায় শয়ন করিতেন। বনের মধ্যে শয্যা কোথায়? তুমি এত বাবু হইলে চলিবে কি? সাধক আবার কি বাবু হয়? শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া নাম করিয়া যাও।

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অন্য কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাতেই বা অসন্তোষের কারণ কি? বিশেষ—চিত্তকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া তোমার কোন লাভ নাই। যতক্ষণ কর্ম্ম কর ততক্ষণ না হয় খৃষ্টের যন্ত্রণা-কাষ্ঠে ঝুলান দেহের মত থাক। কিন্তু যখনই ছাড়া পাও তখনই ডাকাতে আইস।

তা কি কর? ২৪ ঘণ্টা কি ধর্ম্ম লইয়া থাকা যায়? এই না তোমার উত্তর। এইটিই তোমার অধঃপাতের কারণ। থাকা যায় বৈকি। না থাকিতে যদি চাও তবে পুনঃ পুনঃ যাতনা-কাষ্ঠে ঝুলিবে। সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে হইবে।

সময় বৃথা যায় যে? কয়দিন ভবে থাকিবে তা কি জান? এক মুহূর্ত্তও বৃথা ক্ষয় করিও না। নাম কর, কথা চাও—লীলায় যোগ দাও তোমার খোস গল্প অপেক্ষা রস ও পাইবে আর অন্তিমেও ঠকিবে না।

যখনই নামে আলস্য আসিবে তখনই উদ্যম জাগাও। মনকে ধমকাও। বল মরিবে এই ত ভয় দেখাইতেছ? আরে মরণ ত আছেই। তবে গাধা ডাকিয়া, কুকুর ডাকিয়া, শৃগাল ডাকিয়া, ছাগাল ডাকিয়া, ভেড়া ডাকিয়া মরিবে কেন, শ্রীভগবানের নাম ডাকিয়া যাহাতে মরিতে পার, তার জন্য সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকা অভ্যাস কর। যাতনা-দণ্ডে বদ্ধ হইয়াছ, কাঁটায় বিদ্ধ করিতেছে স্মরণ করিয়া নাম ডাক। এক ক্ষণও বৃথা ব্যয় করিও না। ভাল হইবে! ইতি।

কুন্তী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভোজ নগরের শেষ সীমা এই রাজার গড়। দৃঢ় প্রাচীরে ঘেরা। ইহার মধ্যে রাজ প্রাসাদ অতিথিশালা ইত্যাদি আরো কত বিভাগ আছে। ইহার পরেই যমুনা নদী। গড়ের সম্মুখে নিবিড় জনতা পরিপূর্ণ সৌধ ও কুটিরা-কর্ণি নগর। নগর মধ্যে বিস্তৃত ও সঙ্কীর্ণ কত গলি ও পথ। সে গুলিতে বড় বেশী লোকের গতি বিধি নাই। তবে তাহাদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠতম পথ যাহা রাজার গড়ের সিংহ দ্বারে আসিয়া মিলিত হইয়াছে; সে পথে আজ বিস্তর জনতা। একটানা লোকের ঠেল চলিয়াছে। কেবল উষ্ণীবে ঢাকা মাথা আর না না রঙ্গের পরিচ্ছদ। তাহার মধ্যে আবার গতিশীল হাতী ঘোড়া ও রথ আছে।

আজ কুন্তীদেবীর স্বয়ম্বর। যত দেশের রাজা আজ ভোজভবনে নামিতেছেন। কেহ সহস্র সেনা লইয়া—কেহ পঞ্চ সহস্র এবং কাহার সঙ্গে দশ সহস্র সেনা আছে। তাই রাজ্যের লোক সেই দিকে ঝুঁকিতেছে।

গড়ের সিংহ দ্বারের দুই পার্শ্বে রাজগণকে অভিবাদন করিবার জন্য কাতার বাঁধিয়া সশস্ত্র সৈন্যদল পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারের নিম্নে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ সঙ্গে স্বয়ং রাজা কুন্তীভোজ অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান। যেমন কোন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন অমনি সৈন্যগণ অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল কাওয়াজ করিয়া স্থির হইতেছে আর কুন্তীভোজ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে দুর্গ মধ্যে লইয়া যাইতেছেন এবং প্রস্তরে বাঁধান অঙ্গন দিয়া প্রাসাদের অনতিদূরে শ্বেত প্রস্তরময় কুন্তীর স্বয়ংবরসভা চল্লিশ দুয়ারীতে বসাইয়া আসিতেছেন। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের সঙ্গে আগত সৈন্যগণকে বাহিরে লইয়া গিয়া শিবির সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।

চল্লিশ দুয়ারী কেবল কারু কার্য্য খোদিত স্তম্ভ শ্রেণীসংলগ্ন চল্লিশটি খিলানে স্থাপিত ছাদ। তাহা আবার এই স্বয়ম্বরোৎসবে চিত্রে, পতাকায়, ঝাড়, ফানুস এবং পুষ্প মাল্যে সজ্জিত। তাহার একদিক হইতে রাজ প্রাসাদের দ্বার পর্য্যন্ত কৃত্রিম পুষ্প ও লতাচ্ছাদিত পথ। পথের উপরে সুকোমল সুত্রাসন বিস্তৃত। এই পথে কুন্তীদেবী স্বয়ম্বর সভায় আসিবেন।

পৃথিবীর রাজা আজ ভোজ ভবনে একত্রিত হইয়া চল্লিশ দুয়ারীর আসর পূর্ণ করিয়া বসিলেন। কোন আসন খালি পড়িয়া রহিল না। অপরাহ্নের অস্তগামী সূর্য্য দূরে দুর্গ প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে উর্দ্ধে খিলান শ্রেণীর ভিতর দিয়া চল্লিশ দুয়ারীর শ্বেত হর্ম্যতলে স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নৃপতিগণের দৃষ্টি কুন্তীদেবীর অপেক্ষায় প্রাসাদ সংলগ্ন পথের দিকে। কাহার মুখে বাক্য নাই। ধীর—স্থির—যেন নীরব পুত্তলিকাবৎ।

এইবার দূরে প্রাসাদ দ্বারে রক্তোৎপল দল তুল্য সুকোমল করে বর-মাল্য ধারণ করিয়া বসনাভরণ-ভূষিতা কুন্তীদেবী সখিগণ সঙ্গে দেখা দিলেন। ধীরে ধীরে সুত্রাসন বিস্তৃত পথ দিয়া চল্লিশ দুয়ারীতে উঠিলেন। নৃপতিগণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ। তাহাদের দৃষ্টি কুন্তীদেবীর দিকে।

কুন্তীদেবী বর-মাল্য করে, মূর্ত্তিমতী কমলার ন্যায় এক একটি রাজার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলেন আর তাঁহাদের নয়ন তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

এইরূপে কুন্তীদেবী সকল রাজার নিকট দিয়া চল্লিশ দুয়ারীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিলেন এবং অবশেষে যে আসনে পাণ্ডু বসিয়াছিলেন সেই স্থানে আসিলেন। তিনি এত নৃপতিগণের মধ্যে তাঁহাকেই মনোনীত পতি নির্ব্বাচিত করিলেন। তাঁহার গলে

সেই রমণীয় বর মালা দিলেন। সভা গৃহ সাধ্বী সাধ্বী রবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাৎ হইতে কুন্তীদেবীর সখীগণ একসঙ্গে শঙ্খে ফুৎকার দিলেন। তাহার একীভূত ধ্বনি সভা-গৃহে প্রতিধ্বনি করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইল। তারপর তাহারা রাজ-কন্যা ও পাণ্ডুকে মধ্যে রাখিয়া দুই দিক হইতে শুভ্র চামর ব্যজন করিতে করিতে পূর্ব্ব পথে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রাস্ত হইলে তারকা মণ্ডলী যেমন মূকের ন্যায় গগণে ক্ষীণ রশ্মি বিকাশ করিতে থাকে, কুন্তী-দেবীর অদর্শনে সভাগৃহের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। রাজগণ আর বসিয়া থাকিয়া কি করিবেন, সভা ভঙ্গ করিয়া একে একে স্বরাজ্যে ফিরিতে লাগিলেন ?

(ক্রমশঃ)

সমুদ্র ও মন।

সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ, মনের সেইরূপ লয় বিক্ষেপ। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র জল ভিন্ন আর কি ? মনের তরঙ্গ মনের সত্তা ভিন্ন আর কি ? সমুদ্রই সমুদ্রের তরঙ্গ শান্ত করিতে পারে। মনই মনের লয় বিক্ষেপ দূর করিতে পারে। সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সমুদ্রকে নিস্তরঙ্গ করিতে পারেন। মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাও মনকে লয় বিক্ষেপ শূন্য করিতে পারেন।

মনের দেবতা মনের ভিতর আছেনই। এ দেবতা কোথায় নাই ? অধিষ্ঠান চৈতন্যের অভাব কোথায় ? সূর্য্যের ভিতরে দেবতা আছেন স্থির বিশ্বাস করিয়া ডাক, প্রার্থনা কর, ক্ষমা চাও। নিত্য কর। দেবতা শুনিবেন। হৃদয়েও সূর্য্য আছেন। নিত্য তারে ডাক। ক্ষমা চাও। আর কখন অন্যায় করিবনা বলিয়া সেই চরণে শিরোলুণ্টন কর। দেবতা শুনিবেন। শুনিয়া সহজ কথায় তোমাকে বলিবেন—এতদিন করিয়াছ আর করিও না। তুমি বল পাইবে। লোভ হইতেছে ভোগ করি। দেবতা বলিতেছেন—অনেকবার ত ভোগ করিয়াছ বল আর করিয়া কি হইবে ? করিবনা বল তুমি বল পাইবে।

বিচারই সেই দেবতার প্রধান সচিব। সচিব তোমার মনকে বিচার দ্বারা প্রবুদ্ধ করেন। বলেন মন তুমি ভিতরে সত্তারূপী পরম শান্ত পরম দেবতা। আর

বাহিরে তুমি অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া। অথচ তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নয়, মনও সেইরূপ পরম শান্ত ব্রহ্মের উপর মিথ্যা ইন্দ্রজাল।

চিত্ত তুমি আপন সত্তায় পরম তত্ত্ব। আপন স্বরূপে সবই নারায়ণ। নারায়ণই মায়া মাখিয়া বিচিত্র জগৎ। স্থাণু যেমন অজ্ঞান মাখিয়া পুরুষ সেইরূপ। তবে আর ইন্দ্রজাল তুলিতেছ কেন? একবারে সব সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পার না—আচ্ছা শুভ সঙ্কল্প তুল। সকলই ত পার, তবে উপরের এই ইন্দ্রজাল ছাড়িয়া ভিতরে আপনার শান্ত সত্তায় মিশিয়া যাও না। তোমার নিবৃত্তিতে সবাই শান্ত হউক। উপরে একটা শব্দের সমুদ্র কিন্তু ভিতরে একটি নিস্তব্ধ আনন্দ সাগর। এই নিস্তব্ধ রাজ্যের রাণী সেই। তারে ডাক না। গায়ত্রী ভিন্ন পরম পদে পৌঁছাইতে আর কেহ পারে না। ইতি।

সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৃহীর পক্ষে এতটা কঠোর ব্যবস্থা সবই প্রায় ঠিক থাকে কেবল তিনি পুত্রোৎপাদনের জন্য ঋতুস্নাত স্ত্রীতে কামমোহিত না হইয়া একদিন বা দুই দিন উপগত হইতে পারেন। পরে স্ত্রী গর্ভবতী হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে মুমুক্ষুর সকল আচরণই পালন করা তাঁহার উচিত। ইহাই গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য।

এখন আর সেদিন নাই, সে শিক্ষা নাই, এখন আর পিতামাতাগণ আপনারা আচরণ করিয়া সন্তানকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে পারেন না—ফলে অকালে পিতামাতার স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, কত পিতা মাতা মরিতেছে। পিতামাতার ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতেছে এবং কেহ কেহ বহুদিন পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করিবার পর ইহ সংসার হইতে বিদায় লইয়া পিতামাতাকে ধনে প্রাণে মারিতেছে। যদি বা সন্তান বাঁচিল তো সে বিকৃত বুদ্ধি ও পশু প্রকৃতির হইল, নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারেই তাহার আনন্দ দেখা গেল, পিতামাতা বহু চেষ্টাতেও তাহাকে ঠিক পথে রাখিতে পারিলেন না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করতঃ জীবন বীমার ব্যবস্থা হইল। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে গৃহীকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় বুঝিলে?

কনিষ্ঠ—বাস্তবিক তোমার এই কথা গুলি ভাবিলে রক্ত শুকাইয়া যায়। এখন বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি যে, মাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই এতদিনের সভ্য ও পুরাতন জাতিটা কিরূপ দ্রুততম গতিতে ধ্বংস ও বিস্মৃতির গর্ভে লুণ্ঠিত হইবার জন্য ছুটিয়াছে। আচ্ছা, এই সমস্ত ব্যাভিচারের কাজ যাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গিয়াছে, তাহাদের উপায় কি?

জ্যেষ্ঠ—উপায় নিত্য তিনবেলা শ্রীভগবানের নিকট (Confession) অপরাধ স্বীকার করন। এইরূপ কার্য্য যদি নিত্য তিন বেলা চলিতে থাকে তবে আপন কুকার্য্য বা কুরীতির বা কু অভ্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে—আপন চরিত্র আপনি সংশোধিত হইয়া যায়, নিজেকে ঠিক পথে রাখা চলে। নতুবা কু অভ্যাসগ্রস্ত রোগীর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প।

ক—আমাদের নিত্য ক্রিয়ার এই Confession পদ্ধতি আছে নাকি? তোমার এক একটা কথা কেমন অদ্ভুত।

জ্যে—কেন, আমার কথা অদ্ভুত হইল কিসে? প্রত্যহ বৈদিক সন্ধ্যাচরণকালে যে পুনরাচমন মন্ত্র পাঠ কর তাহার অর্থ কি, তাহা কি কোনও দিন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? সেই যে "মুন্যকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্" "হস্তাভ্যাম্ পদ্‌ভ্যামুদরেণশিশ্না" "যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি" প্রভৃতি বাক্য—ইহাদের সার্থকতা কি? প্রত্যহ তিন বেলা যদি নিজকৃত কুকর্ম্মের জন্য শ্রীভগবানের নিকট এইরূপে কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রলোভন জয়ের জন্য শক্তি প্রার্থনা করা যায় তবে কি আর অসৎ অভ্যাস স্থায়ী হইয়া জীবকে দুঃখ মগ্ন করিতে পারে? না, এইরূপে প্রত্যহ কাতর প্রার্থনা করিয়া কার্য্যকালে জীব কখন দুরাচার হইতে পারে?

ক—এত অতি সুন্দর নিয়ম দেখিতেছি। এখন সহজ সরল সত্য কথার ভিতর দিয়া চরিত্র গঠনের এমন সাধু ব্যবস্থার কথা আজ কাল কেহ একবার ভাবিয়াও দেখে না। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে? যাক্, দাদা এই ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলে কি ফল তাহাত বলিলে না।

জ্যে—ব্রহ্মচর্য্যের পরিণাম অমৃতত্ব।

ক—বুঝিলাম না।

জ্যে—আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মলাভ জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাই ব্রহ্মচর্য্য—কাজেই যাহা কিছু করা যায় তাহা যদি সেই ব্রহ্মোদ্দেশেই করা যায়, তাঁহার প্রীতির জন্য করা যায় তাহা হইলে তাহাও ব্রহ্মচর্য্য। এইরূপে যখন

পূর্ণভাবে তাঁহার সন্তোষের জন্যই অহংকর্ত্তা ভাব ভুলিয়া সব কাজ করা হয় তখন তিনিই আসিয়া আপন প্রতিজ্ঞা অনুসারে জীবকে সত্বর মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দেন। অমৃতত্ব আর কাহাকে বলে?

ক—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্যের যে যথেষ্ট উপকারিতা আছে তাহা আমি দু এক খানা চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যায়ন করিয়া বুঝিয়াছি এবং তোমার মুখে এই সব কথা শুনিয়া সে ধারণা আরও দৃঢ় হইল। কিন্তু ইহা যে মানুষকে অমৃতত্ব বা চিরশান্তি দিতে পারে তাহা কোনও দিন ভাবিতে চেষ্টা করি নাই। যাহা হউক আজ তোমার এই সকল কথায় আমার বড় আনন্দ হইল। কিরূপ প্রণালীতে অভ্যাসকে নিয়মিত করিলে শুভ হয় ও শ্রেয়োলাভ করা যায় তাহা অবগত হইয়া যে কত তৃপ্তি হইল তাহা বলিতে পারি না। এইবার অপরিগ্রহের কথা কিছু বল না? তোমাকে কি বিরক্ত করিতেছি?

জ্যেষ্ঠ—এইরূপ বিষয়ের আলোচনাই ব্রাহ্মণের কার্য্য। ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে কি বিরক্ত হইতে আছে? এখন অপরিগ্রহের বিষয় তোমায় কিছু বলিতেছি।

দেহরক্ষাতিরিক্ত-ভোগ সাধনাস্বীকারঃ অপরিগ্রহঃ।

দেহ রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ না করাই অপরিগ্রহ।

কনিষ্ঠ—মানুষ কি চট্ করিয়া এমন নিস্পৃহ হইতে পারে?

জ্যেষ্ঠ—যিনি পারেন তিনি ভাগ্যবান। আর যিনি চট্ করিয়া না পারেন তিনি বিষয়ের আহরণ, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা দোষ অনুভব করিয়া তাহা হইতে বিরত হন। এইরূপে বিরত হওয়াও অপরিগ্রহ।

কনিষ্ঠ—এই দোষগুলি একটু পরিষ্কার করিয়া বল না?

জ্যেষ্ঠ—বিষয়ের উপার্জ্জনে কত ক্লেশ, কত শ্রম, কত লাঞ্ছনা, কত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। ইহাই বিষয়ের অর্জ্জন দোষ। প্রাণান্ত করিয়া বিষয় অর্জ্জিত হইল, কিন্তু পাছে তাহা অন্যে ঠকাইয়া লয়, বা চুরি করিয়া লয়, বা নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতাতে অথবা অযোগ্য পুত্রের অপব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায় এই সকল দুশ্চিন্তায় যে মানুষ কত কাতর হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ইহাই রক্ষণ দোষ। বসিয়া খাইলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরাইয়া যায় সুতরাং মানুষের সঞ্চিত বিষয় যে দুইদিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে

তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সঞ্চিত ধনের এইরূপ ক্ষয়াশঙ্কাই ক্ষয়দোষ। আফিমের নেশায় যেমন মৌতাতের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়া যায় সেইরূপ বিষয় ভোগ করিতে করিতে ভোগলালসা ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়। দুরাকাঙ্খা পিশাচের মত মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং তখন ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে সে ব্যক্তি বিশেষ অন্তর্দ্দাহ ভোগ করে। ইহা বিষয়ের সঙ্গদোষ। বিষয়ীকে বিষয় ভোগ করিতে দেখিলে যে অনেকের চক্ষু টাটায়, মন ঈর্ষায় পূর্ণ হয় তাহাত নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছ। এইরূপ পরশ্রীকাতর যাহারা তাহারা কত দুঃখী বল দেখী? ইহাই হিংসাদোষ। এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, আনন্দলাভার্থ অপরিগ্রহ সাধন একান্ত আবশ্যক।

কনিষ্ঠ—তুমি কি বলিতে চাও যে, এই সকল বিবেচনা করিয়া মানুষের আর অর্জ্জনশীল হওয়া উচিত নহে? সকলেরই অপরিগ্রহ সাধক হওয়া উচিত? তাহা হইলে সমাজ টিকিবে কিরূপে?

জ্যেষ্ঠ—সমাজের দুঃখ দূর করিবার জন্যই অপরিগ্রহ সাধনের ব্যবস্থা—তাহার মূল উৎপাটনের জন্য নহে। আমি এমন কথা বলি নাই যাহাতে বুঝায় যে বিষয়ে কোনও প্রয়োজন নাই, অথবা যে ব্যক্তি বিষয় অর্জ্জনে যত্নশীল হইবে সে নিরয়গামী হইবে। বরং সমাজে থাকিয়া যে ব্যক্তি ধনার্জ্জন না করে সেই-ই পাপভাগী।

আমি বলিতেছিলাম দুরাকাঙ্খার অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখ। যে ব্যক্তি আকাঙ্খা করে, সে আকাঙ্খিত বস্তু লাভের চেষ্টাতে কত দুঃখই ভোগ করে অথবা অভিলষিত বস্তু না পাইলে কত মর্ম্মপীড়া অনুভব করে? এই ত গেল আকাঙ্খাকারীর কথা। তার পর যাহাদের উপর উৎপাৎ, উপদ্রব, অত্যাচার করিয়া আকাঙ্খা পরিপূরণের চেষ্টা করা হয় তাহাদের অবস্থা একবার ভাব দেখি? আহারের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু মানুষের অনাবশ্যক বেশ ভূষার দিকে তাকাও দেখিবে কত নিরীহ বন্য পশু পক্ষীর অকারণ হত্যাপাপ তাহার আপাদ মস্তক গ্রাস করিয়াছে। তার পর লোকযাত্রার দিকে তাকাও দেখিবে দু'দশ জনের রাক্ষসী প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য কত দরিদ্র, কত অনাথ, কত হতভাগিনী, নিতান্ত হীন ও অনুপযুক্ত বেতনে আধপেটা খাইয়া কত মিল, কত ফ্যাক্টরিতে, খাটিয়া দেহপাত করিতেছে। জগতের এই লোকধ্বংসকর ভয়াবহ দুঃখের প্রতিকারের জন্য পরম করুণ হৃদয় প্রাচান মহর্ষিগণ, কুশিক্ষা ও কুবাসনার ফল যে অনুচিত ভোগ লালসা তাহা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই অপরিগ্রহ।

কনিষ্ঠ—ভোগলালসাই যদি না থাকে তবে উপার্জ্জন করিবে কেন ?

জ্যেষ্ঠ—তোমার দেহ রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত পদার্থ অন্যের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া ; সুশিক্ষার বিস্তার দ্বারা তাহাদের নৈতিক জীবন ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতি সাধন করিবে বলিয়া। তোমার লুচি পোলাও, খাট পালঙ্ক, বাড়ী গাড়ী বা কলত্রাদির বৃথা আড়ম্বর প্রকাশক অনাবশ্যক আসবাব আভরণের জন্য তোমার উপার্জ্জন নহে। বুঝিলে ?

কনিষ্ঠ—বুঝিলাম ; কিন্তু এরূপে চলা বড় শক্ত। আর কথাটাও যেন ইউরোপের সোসালিষ্ট (Socialist) দলের কথার মত।

জ্যেষ্ঠ—মানুষের এমন অনেক প্রবৃত্তি আছে যাহা প্রায় সকল দেশেই একরূপ। তাই আজ ইউরোপের ধনবান সম্প্রদায় যে Socialist দলের জ্বালায় সদা শঙ্কিত, কখন কাহার প্রাণ যায়, তাহার বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অনুধাবন করিয়া প্রাচীন মহাপুরুষেরা সমাজের কল্যানের জন্য অপরিগ্রহ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই সকল সাধন যাহাতে প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনে কার্য্যকর হয় তজ্জন্য আবাল্য যৌবন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সুশিক্ষার উৎকৃষ্টতম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ফলে সুশিক্ষা হইতে উৎপন্ন পবিত্র ও সাধুভাব তাহাদের অস্থিমজ্জার প্রতি পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহাদিগকে মুর্ত্তিমান সংযমে পরিণত করিত। তাহা না হইলে ভারতের হিন্দুর অস্তিত্ব এতদিন কোন্ বিস্মৃতির গর্ভে চিরবিশ্রাম লাভ করিত তাহা কে বলিতে পারে ?

কনিষ্ঠ—তুমি ত ব্যক্তিগত অপরিগ্রহ সাধনের কথা বলিতে গিয়া সমাজগত সাধনের কথারও অভাস দিতেছ। কিন্তু অপরিগ্রহরূপ সাধন ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে সমাজ পোষণে কোথায় ক্রিয়াশীল তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

জ্যেষ্ঠ—চক্ষু বুজিয়া থাকিলে দেখা যায় না। প্রাচীন মহাপুরুষগণ সমাজের পূর্ণতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যে কাজে, এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, সেই কাজেরই তাঁহারা একটা সুন্দর সামঞ্জস্য স্থির করিয়া দিতেন। এই জন্য একদিকে তাঁহারা যেমন কুম্ভকারকে কর্ম্মকারের বৃত্তি হরণে অধিকার দেন নাই বা চর্ম্মকারকে ক্ষৌরকারের বৃত্তি লোপ করিবার অনুমতি দেন নাই কিম্বা ব্রাহ্মণের বৈশ্যের বৃত্তিগ্রাসের পথ রাখেন নাই, অন্যদিকে আবার উপার্জ্জিত বিত্তের ত্যাগ দ্বারা যাহাতে ভোগলালসা দমিত হয়, সেই জন্য যজ্ঞাদির বিধিও প্রণয়ন করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপনের

বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর এই সমাজপুষ্টির দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিয়াই তাঁহারা আজকালকার মত কাপড়ের কল করিয়া বা লোহার কার-খানা বানাইয়া লক্ষ লক্ষ তাঁতীর বা কামারের গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। যাহাদের সহস্র সহস্র অর্ণবযান সাগর বক্ষ মথিত করিয়া দেশ দেশান্তরে পণ্য বহন করিত, যাহাদের শিল্পীগণ বিমানচারী রথ প্রস্তুত করিতেও অনভিজ্ঞ ছিল না, যাহাদের শিল্পকলা, জ্ঞানগরিমা, সমাজ শৃঙ্খলা আজিও জগতে অতুলনীয় তাহাদের মাথায় কি ছাই একটা মাকু চালাইবার বড় কারখানা তৈয়ার করিবার মত বুদ্ধি ছিল না? আসল কথা ভারতের নীতি, ধর্ম্ম ও প্রাণ সমাজ পোষক—আর এইরূপ আদর্শ যাহাদের নহে তাহাদের দেশের নীতি, ধর্ম্ম ও প্রাণ সমাজ শোষক। তাই ভারতের আদর্শ দেবত্ব, ইউরোপের আদর্শ—রাক্ষসত্ব। কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখের গ্রাস কৌশলে কাড়িয়া আনিয়া নিজের অনাবশ্যক ভোগলালসা ও নারকীয় দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিতে হয়, ইউরোপের শিক্ষা তাহাই শিখায়। এই শিক্ষার বশে ঐ সকল দেশে একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা নাই, আছে কেবল Survival of the fittest নীতির অনুসরণ করিয়া জগতের ও আপনাদের দুঃখ বর্দ্ধনের চেষ্টা। এই সর্ব্বগ্রাসী দুঃখ এক অপরিগ্রহ সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই দূর হইতে পারে না। বুঝিলে, ব্যক্তিগত অপরিগ্রহ সাধন কেমন করিয়া সমাজগত হইয়া পড়ে?

কনিষ্ঠ—অপরিগ্রহ সাধন যে মানুষের সুখশান্তির সঙ্গে এমন ভাবে সম্বন্ধযুক্ত তাহা কোনও দিন চিন্তা করি নাই। কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহার অনুশীলন করাও বড় শক্ত।

জ্যেষ্ঠ—সে ত নিশ্চয়ই। তুমি কি জীরার মূল্যে হীরা কিনিতে চাও? এ সাধন বড় কঠিন। তুমি ব্যবসায়ের খাতিরে অহিংসা পরায়ণ হইতে পার, সত্যবাদী হইতে পার, পরদ্রব্য গ্রহণ না করিতে পার, কিন্তু অপরিগ্রহ সাধনে তোমার আর সেটুকু চলিবে না। এখানে তোমায় দোকানদারী ছাড়িতেই হইবে, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। বুঝিলে?

কনিষ্ঠ—বড় কঠিন কথা।

জ্যেষ্ঠ—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি কি এত অল্পেই লাভ করিবার জিনিষ? ভগবান স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন,—

"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।"

সঙ্কীর্ণতা ও তুচ্ছ ভোগলালসা বিসর্জ্জন দিয়া যে ব্যক্তি সংযত হইতে পারে নাই সেই ব্যক্তি কখনও যোগ অর্থাৎ নিত্যানন্দ পদলাভের অধিকারী হইতে পারে না—ইহাই আমার মত।

কনিষ্ঠ—তবেই হইল, সুখশান্তি লাভার্থ অভাব বোধকে একেবারে হটাইয়া দিবার জন্য যত রকমে সংযত হইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আর এই চেষ্টার নাম যমসাধন—কেমন এই ত?

জ্যেষ্ঠ—ঠিক তাহা নহে। তোমার এই সমগ্র চেষ্টার নাম আত্মসাধন বা পুরুষার্থসাধন। যম সাধনে কেবল অহিংসাদি পাঁচটী বিশেষ সাধনের কথা বলা হইয়াছে মাত্র।

কনিষ্ঠ—আচ্ছা তাহাই স্বীকার। কিন্তু এই পাঁচটী সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলেই ত যথেষ্ট আনন্দ লাভ করা যায়—অন্য সাধনের আর প্রয়োজন কি?

জ্যেষ্ঠ—প্রয়োজন আছে বৈকি। যম সাধনে মাত্র তুমি সাঁচ্চা ভাল মানুষ বা Perfect gentleman হইতে পার। ইহার উপরে যাইতে পার না। অন্য অন্য সাধনে তোমাকে এই অবস্থারও উপরের পরদায় উঠাইয়া দিবে—তোমাকে আত্মবিৎ বিবেকী করিয়া আনন্দস্বরূপে পঁহুছাইয়া দিবে। বুঝিলে?

কনিষ্ঠ—কিন্তু বর্ত্তমান সংসারে ত যমসাধনেরই অনেক বিঘ্ন দেখিতেছি। কত লোক কত কথা বলিবে, হয় ত আদালতে গিয়া মিথ্যার পরিবর্ত্তে সত্য কহিয়া মোকর্দ্দমা হারিয়া পৈত্রিক বিষয়টুকু খোয়াইতে হইবে, ফলে হয় ত না খাইয়া মরিতে হইবে। যম সাধনেরই যখন এই অন্তরায় তখন অন্যান্য সাধনের কথা ত ছাড়িয়াই দিতে হয়।

জ্যেষ্ঠ—তুমি ভুল বলিতেছ। তুমি যদি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া এই সাধনার পথে লাগিয়া পড় তবে দেখিবে নারায়ণ তাঁহারই আপন প্রতিজ্ঞা যে "যোগক্ষেমং-বহাম্যহং" বাক্য, তাহা স্মরণ করিয়া তোমার সকল ভার মাথায় করিয়া বহন করিতেছেন। এমন যদি তিনি না করিবেন তবে কি তিনি এতদিন ধরিয়া জগন্নাথ, কাঙালের ঠাকুর, দয়াময় প্রভৃতি আখ্যা এই অকৃতজ্ঞ জগতের কাছে লাভ করিতে পারিতেন? তার পর কথা, তুমি যে সুপবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এ কথা ভুলিও না। ভুলিও না "ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে" ব্রাহ্মণের এই দেহ তুচ্ছ কামনা উপভোগের জন্য নহে। ইহা ইহজগতে কষ্টসাধ্য তপস্যা করিবার জন্য ও পরজগতে আনন্দসাগরে মিশিবার জন্য—"কৃচ্ছ্রায় তপসে

চেহ, প্রেত্যানন্তসুখায় চ।" সুতরাং সংসারের হিসাবী বিজ্ঞেরা যাহাই বলুক না কেন তাহা শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিও না, লক্ষ্মী ঘরে আসিল কি না তজ্জন্য লালসা-চঞ্চল হইও না। আর যখন একদিন মরিতেই হইবে তখন মরণের ভয়ে দুঃখিত হইয়া সাধনার পথ ছাড়িয়া লাভ কি? কেহ রোগে ভুগিয়া হাগিয়া মরে, কেহ সাপ বাঘের মুখে মরে, কেহ গাছ হইতে পড়িয়া বা জলে ডুবিয়া মরে, তুমি না হয় সাধনা করিয়া মরিবে। তফাৎ ত এই? কিন্তু মনে রাখিও "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এই সাধন ধর্ম্মের অতি সামান্য অনুষ্ঠানও জীবকে মহা-ভয় বা মৃত্যু হইতেও রক্ষা করে—অমৃতত্ব দান করে। তাই বলিতেছি পরের কথায় বা অর্থের চিন্তায় বা মরণের ভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণের অবশ্য অবলম্বনীয় এই ন্যায়-পথ হইতে বিচলিত হইও না। হৃদয় দুর্ব্বল হইলে মনে মনে কেবল দৃঢ়ভাবে আবৃত্তি করিও—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ, অথবা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মী গৃহে সমাবিশতু, গচ্ছতু বা যথেচ্ছম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু, যুগান্তরে বা,
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

আজ এই পর্য্যন্ত থাক। কাল আবার দেখা যাইবে। শ্রীগুরুর্জয়তু।

ক্রমশঃ।

আকাশে সূর্য্য প্রকাশ যেমন দেখা যায় না সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মে এই জগৎ-প্রকাশও দেখা যায় না। মেঘ ও সঙ্কল্প-মেঘ যেমন দর্শন কালে এক, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে এই জগৎ।

যেমন স্বপ্নদৃষ্ট স্বচ্ছনগর, দর্শনকালে জাগ্রৎদৃষ্ট নগরের সমান, সেইরূপ স্বচ্ছ এই দৃশ্য জগৎ সঙ্কল্প জগতের সমান।

আচ্ছা অত্যন্ত মলিন এই দৃশ্যজগৎ স্বচ্ছতম চিৎ মাত্র কিরূপে?

স্বপ্নে যখন কিছু দেখা যায় তাহা স্বপ্নদর্শন সময়ে জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুর সমান হইলেও জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুর মত মলিনভাবে দেখা যায় না, কিন্তু তাহা স্বচ্ছভাবেই প্রতীত হয়। সুতরাং চেত্যতারহিত চিৎরূপ এই জগৎ কেবল ব্যোমই। শূন্য, ব্যোম, জগৎ এ সকল চিন্ময় ব্রহ্মেরই নাম।

অনুভূতান্যপীমানি জগন্তি ব্যোমরূপিণি।
পৃথ্ব্যাদীনি ন সন্ত্যেব স্বপ্নসঙ্কল্পয়োরিব॥ উ।১৫।৬

অনুভূত হইলেও পৃথিব্যাদি এই সমস্ত শূন্য স্বরূপ জগৎ নাই। যেমন স্বপ্ন-সঙ্কল্প স্বপ্নকালে অনুভূত হইলেও নাই সেইরূপ।

জগদাকাশমেবেদং যথা হি ব্যোম্নি মৌক্তিকম্।
বিমলে ভাতি স্বাত্মৈব জগৎ চিদ্গগনং যথা॥ উ ১৫।১॥

এই জগৎ, আকাশই বটে। ইহা চিৎরূপী আকাশ। আকাশটা শূন্যই। শূন্যকে লোকে বলে কিছুই নহে। ইহা ভুল। আকাশ পঞ্চভূতের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভূত। আকাশটা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র আছে। কিন্তু আকাশকে কি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায়? আকাশকে যেন দেখিতেছি মনে হয়। ঐ নীল গগনের মত। কিন্তু আকাশে নীলিমা নাই। শূন্য আকাশের কোন রূপ নাই। আকাশকে জানা যায় আকাশের গুণ যে শব্দ তদ্দারা। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান—ইনিই ব্রহ্ম। ইঁনি কিন্তু আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। আকাশকেও ওতপ্রোতভাবে ধরিয়া আছেন। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদের মত ব্রহ্ম ফাঁকা কিছু নহে। ইহা সূক্ষ্ম আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইলেও ইঁহাকে জানা যায় তখন, যখন চিৎব্রহ্ম মায়াগুণ আশ্রয় করিয়া গুণবান মত হয়েন। আকাশও মায়া

এবং গুণও মায়া, ব্রহ্ম কিন্তু গুণাতীত। যখন তিনি গুণবান্ মত হয়েন, তখন মায়া অবলম্বনেই তাঁহার রূপ ও গুণ হয়।

বলিতেছিলাম জগৎটা চিৎরূপী আকাশ। তাই যদি হইল, তবে জগৎটা পৃথক্‌রূপে প্রকাশ হয় কিরূপে ?

যেমন বিমল ব্যোমে ভ্রমদ্বারা মুক্তার মালা লম্বমান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে ভ্রমদ্বারা জগৎ যেন দেখা যায়। চিৎগগন যাহা তাহা আত্মাই। জগৎও আত্মাই।

অনুৎকীর্ণৈব ভাতীব ত্রিজগচ্ছালভঞ্জিকা।
চিৎস্তম্ভে নৈব সোৎকীর্ণা ন চোৎকর্ত্তাত্র বিদ্যতে ॥ উ ১৫।২ ॥

ত্রিজগৎটা বিশাল চিৎস্তম্ভে এক অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা মত প্রকাশ পাইতেছে। খোদাই করা হয় নাই, এমন কোটি কোটি আকার বিশিষ্ট এই তিন জগৎ সর্ব্বদাই চিৎস্তম্ভের ভিতরে। যে সমস্ত আকার দেখা যাইতেছে তাহা ভ্রমে দেখা যাইতেছে, একমাত্র বিশাল চিৎই বিশাল স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে। এই শালভঞ্জিকা উৎকীর্ণও নহে, ইহার উৎকর্ত্তা কেহ নাই।

সমুদ্রেন্তর্জ্জলস্পন্দাঃ স্বভাবাদন্ত্যতা অপি।
বীচিবেগা ভবন্তীব পরে দৃশ্যবিদস্তথা। উ ১৫।৩

স্বভাব অর্থে আপনার প্রভাব—আপনার মহিমা।

পরে পরব্রহ্মে দৃশ্যবিদো জগৎপ্রত্যয়াঃ—পরব্রহ্মে এই যে জগৎ প্রতীতি ইহা সমুদ্রের ভিতরের জলরাশি যেমন সমুদ্রপ্রভাবেই প্রস্পন্দিত হয়, আপন প্রভাবেই সমুদ্রে যেমন বীচিবেগ—তরঙ্গবেগ প্রসারিত হয়—সেইরূপ।

সূর্য্য কিরণ দ্বারা গবাক্ষজালছিদ্রপ্রবাহিত দণ্ডাকার যেমন ধূলিকণা—সেই-রূপে চৈতন্যসূর্য্যে ভাসমান এই জগৎ। ক্ষুদ্র পরমাণু, গবাক্ষছিদ্র নিঃসৃত প্রভাত সূর্য্যকিরণ ভিন্ন যেমন দেখা যায় না; সেইরূপ স্বচৈতন্য ব্যতিরেকে তাহাতে ভাসমান মত এই জগৎ দেখাই যায় না। আত্মা কর্ত্তৃক কল্পিত ভ্রান্তিই জগদ্দর্শনের মূল। জ্ঞানাকাশরূপী ব্রহ্মই ভ্রমে যেন জগৎরূপে দাঁড়াইয়াছেন। বিজ্ঞানাকাশে স্থূলপিণ্ডাকার এই জগৎ ইহা—

মরুনদ্যাং জলমিব ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ।৭।

ইহা মরুনদীতে জলভ্রান্তি মত বাস্তবিক কোথাও নাই ।

পিণ্ডাকার এই জগৎ সঙ্কল্প-নগরের ন্যায় অলীক। জগদ্দর্শন মরুমরীচিকাতে নদী ভ্রান্তির মত ভ্রান্তি মাত্র।

যেভাবে জগদ্দর্শনের কথা বলিলাম সে ভাব না আসা পর্য্যন্ত চিত্তবিশ্রান্তি হইতেই পারে না। সেই ভাব আনয়নের সুবিধা জন্য শ্রবণভূষণ মণ্ডপোপাখ্যান শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে পূর্ব্বোপদিষ্ট কথাগুলির অর্থ সংশয়শূন্য ভাবে তোমার চিত্তে প্রতিভাত হইবে। এই হইলেই চিত্ত বিশ্রাম লাভ করিবে।

জগদ্দর্শনটা যে ভ্রান্তি মাত্র—আমার বোধবৃদ্ধি জন্য মণ্ডপোপাখ্যান সত্বর আমার নিকটে কৃপা করিয়া বিবৃত করুন।

---

১৫ সর্গ

বা

১ম অধ্যায়

রাণী ও রাজা

নরপতি পদ্ম এই মহীপীঠে রাজত্ব করিতেন। লীলা তাঁহার রাণী। হাল ফ্যাশনে প্রথমেই নায়ক নায়িকার একটা প্রণয় ঘনাইয়া আনা আবশ্যক। আর সেই ঘনান প্রণয়ের পরিসমাপ্তি দেখাইবার জন্য বিবাহটাও দেখাইতে হয় অথবা ক্রিলভটা যদি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ফুটিয়া উঠে তবে অন্ততঃ নায়িকাটাকে বিরহবিধুরা কুমারী করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। তাহাতে নাকি উপন্যাসের গল্প শেষ হইয়া গেলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত নায়িকার বিফল প্রণয়ের পবিত্র মুখখানি পাঠকের চক্ষে আঁকা থাকে।

হায়রে ভাব আঁকা। এক ফোঁটা ভাব আঁকিতে কতই প্রয়াস, তাও আবার স্থায়ী করার ইচ্ছা। আধুনিকের এক নাম আধ্‌না। আধ্‌না যাহা তাহা উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। তত্ত্বে পৌঁছিতে পারে না।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবে কিন্তু এ সব নাই। যাহা আছে তাহা জীবের নিত্য প্রয়োজন।

যাহা হউক বশিষ্ঠ দেব একালের লোক নহেন বলিয়া একালের ফিন্‌ফিনে মিন্‌মিনে ভাবের কিছুই দেখান নাই।

রাজা রাণীর পূর্ব্বরাগ তিনি দেখান নাই, তদ্বিপরীতে তিনি রাজা রাণীকে একঘর ছেলে মেয়ের পিতা মাতা করিয়া আসরে নামাইয়াছেন। বলিতেছেন—

"পদ্মোনাম নৃপঃ শ্রীমান্ বহুপুত্রো বিবেকবান্"।

রাজা ও রাণীর রূপ ও গুণের বর্ণনা নিতান্ত অপরূপ। বশিষ্ঠ দেব কি নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনা "বহুপুত্রের পরের" অবস্থা ধরিয়া করিয়াছেন অথবা যখন বহুপুত্র হয় নাই সেই লাবণ্যবারিভরিত নবযৌবন অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। তবে ইহা শুনিয়াছি যাঁহারা

যথার্থ সতী, অভিনয় করা সতী নন অথবা যাঁহারা যথার্থ পবিত্র তাঁহারা চির সুন্দর, চিরসুন্দরী।

আমরা রাজ্ঞীলীলার বর্ণনা অগ্রে করিব। ভগবান্ বশিষ্ঠ ইহা করেন নাই। তিনি রাজার রূপই অগ্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই ক্রম-বিপর্য্যয় কেন করিতেছি তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিলাম না।

লীলা বিলাসিনী অথচ সর্ব্বসৌভাগ্যবতী। সর্ব্বসৌভাগ্যবেষ্টিতা, সুখ—প্রসন্নবদনা, কনকচম্পকোজ্জ্বল-কান্তিমতী লীলাকে দেখিলে মনে হইত যেন কমলা অবনীতে উদিতা হইয়াছেন। "সর্ব্বসৌভাগ্যবলিতা কমলেবোদিতাঽবনৌ"

কুটিলকুন্তলালঙ্কৃতা, সমন্দহসিতেক্ষণা কল্যাণী লীলা সদাই মধুরভাষিণী। লীলা ভর্তৃসেবা, পরিজনশুশ্রূষা প্রভৃতি অনুকূলাচরণে লালিতা। সানন্দ মন্থর-গামিনী, সময়ে সময়ে পরিশ্রমাতিশয্যে নিদাঘজলশীকরশোভিবক্ত্রা লীলার হাস্ত কালে দ্বিতীয় চন্দ্রমার উদয় অনুভূত হইত। সিতাঙ্গী—নির্ম্মলাঙ্গী, কর্ণিকাগৌরী—পদ্মকর্ণিকার ন্যায় গৌরবর্ণা, আলম্বিকুন্তলভরা বিদ্যুৎবিলাসমনোহর লীলার মুখকমল অলকারূপ অলিজালে বড়ই মনোহর বোধ হইত। বোধ হইত লীলা যেন একটি গতিশীলা সরোজিনী "জঙ্গমেব সরোজিনী"।

রাজা বহু সময়ে আদর করিয়া বলিতেন লীলা তুমি আমার সৌভাগ্যৈক-নিকেতন। চন্দ্রসুন্দর-মুখি! সত্য সত্যই তুমি আমার প্রাণপ্রদান-ঔষধী। রাজা আদর করিয়া বিদেহরাজপুত্রীর প্রতি রঘুনাথের সম্বোধনগুলি যখন বলিতেন, বলিতেন—

কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু বেশ্যা, রঙ্গেষু সখী—

তখন লীলা স্মিতবিকসিত গণ্ডে, ব্রীড়বিভ্রান্তনেত্রে ক্ষণকাল নিম্নমুখী হইয়া থাকিত পরক্ষণেই সলিলস্থ-সরোজনেত্রে অমৃতাপ্লুত-শীতল-কটাক্ষে রাজারদিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকিত। রাজা অনেক সময়ে ঐরূপ দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিয়া উঠিতেন —মুগ্ধে! মুগ্ধে আমি কি বলিয়া তোমায় যে আদর করিতে হয় তাহা জানি না।

সত্যই স্ত্রীজনের এমন সৌভাগ্য আর কোথায়? স্বামীর আদরে যিনি আদরিণী তাঁহার মত সুন্দরী কি আর জগতে আছে?

কুটিলকুন্তলা লীলা অনেক সময়ে উন্মুক্ত-কেশত্রজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিত। রাজা কখন কখন অতি ধীর পদসঞ্চারে লীলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন। লীলা যেন সর্ব্বদা রাজাকে লইয়াই থাকিত। রাজা মনে করিতেন অলক্ষিতে আসিয়া লীলাকে বিস্মিত করিবেন। লীলা কি মানসচক্ষে রাজার গতিবিধি সর্ব্বদা দেখিত? প্রেমে কি ইহা হয়? লীলা রাজাকে নিঃশব্দে আসিতে দেখিয়াও যেন বিস্মিত হইত না। রাজা আসিলেই লীলা একবারে কত কথা কহিত। কথা কহিতে কহিতে বিগলিত-চিকুরা লীলা সময়ে সময়ে বড় গম্ভির মূর্ত্তি ধারণ করিত। সে সময়ে লীলা যাহা বলিত তাহা কোন্ ভাবের কথা আমরা যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। লীলা বলিত—হে লীলানাথ! আমি তোমায় প্রণাম করি। হে বিশ্বনাথ, হে দয়াময়, হে দীনবন্ধো, হে দয়াসিন্ধো! আমার অনেক সময়ে মনে হয় তুমি আমায় "লীলারহস্য" একবার বুঝাইয়া দাও।

রাজা লীলার ভাব দেখিয়া কি ভাবে যেন ভাবিত হইতেন; হইয়া বলিতেন এ রহস্য বলিতে আমি বুঝি সম্পূর্ণ অসমর্থ। সহস্র জিহ্বা দিলেও বুঝি ইহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। দেবাদিদেব মহাদেব যেমন শৈলাধিরাজতনয়াকে বলিতেন

স্বস্যৈব চরিতং বক্তুং সমর্থা স্বয়মেব হি।

তোমার চরিত্র বলিতে তুমিই সমর্থা রাজাও সেইরূপ বলিতেন।

আমরা বলিতে পারি না স্ত্রীলোক পতি-নারায়ণ-ব্রত আচরণ করিলে কি লীলার মত হয়? তবে আমাদের মনে হয় যে, যে ভালবাসা অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া থাকে না তাহা ভালবাসা নহে; তাহা ভালবাসার আভাস। ইহাই শেষে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া প্রেম হইতে কামে পরিণত হয়।

রাজা বলিতেন যেমন বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার লীলা, মায়াই বলিতে পারেন সেইরূপ আমার লীলার চরিত্র আমার লীলাই বলিতে সমর্থা। রাজা বলিতেন দেখ লীলা! আমার অন্তরঙ্গ সচিবেরা আমায় কতবার বলিয়াছে যেদিন আমরা

আমাদের রাজ্ঞীর দর্শন পাই যেদিন আমরা এই সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদা, ফুল্লেন্দীবর-লোচনা, ভক্তিকল্পলতিকা সাক্ষাৎ ভগবতীকে প্রণাম করিবার সুযোগ পাই, সে দিন কোথা হইতে যেন আমাদের উপরে কতই সৌভাগ্যামৃত বর্ষিত হয়; বলিতে পারি না কেন সেদিন শত্রুর গর্ব্ব সমূহ আপনা হইতে খর্ব্ব হইয়া যায়; আমরা যেন সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করি। রাজা বলিতেন "লীলা" "তুমি কি" একথা আমিও জানি না। কি বলিব লীলা! যখন তুমি ঐ অম্বুজপত্রকান্তিনয়নে আমারদিকে চাও তখন তোমার আনন্দোদ্ভবকম্পস্নিগ্ধনয়নে নয়ন রাখিয়া আমি যেন কি হইয়া যাই। সরোরুহাক্ষি! তুমি আমার সকলেন্দ্রিয় আহ্লাদকারিণী। জ্যোতির্ম্ময়ি! আমি তোমায় বহুরূপে সাজাই তথাপি আমার তৃপ্তি, পূর্ণ হয় না। আপীনস্তনজঘন ধৃগ্ যৌবনবতি! তুমি আমার এই রাজকুলের রাজ্যলক্ষ্মী। তুমি সান্দ্রানুরাগ-তরল ঈক্ষণে যখন আমারদিকে চকিত দৃষ্টি কর, তখন আমার হৃদয় মধ্যে চকিতে কি যেন কি স্ফুরিত হয়—তাহা আমি ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। তোমার মন্দহাস্য সময়ে তোমার ঐ দরফুল্লকপোলরেখা, তোমার ঐ সুন্দর বিম্বাধর আর ঐ চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত চারু গণ্ডস্থলের কি যে শোভা হয় তাহার বর্ণনা বুঝি করা যায় না।

আমরা রাজ্ঞীর রূপবর্ণনা করিতে গিয়া অনেক কথা বলিলাম। আরও একটু বলিব। ইহা বশিষ্ঠ দেবেরই কথা। বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন

পুষ্পকান্তিবিশিষ্টা, গুঞ্জাফলপরিকল্পিত-হারধারিণী, প্রবালহস্তা, প্রেমময়ী লীলা যখন কর্পূরচূর্ণ হিমবারি বিলোড়িত চন্দনে দেহযষ্টী চর্চ্চিত করিত, আর তাহার উপর সুজাতগন্ধ পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে রাজার অভ্যর্থনা জন্য প্রাসাদদ্বার পর্য্যন্ত আগমন করিত, তখন মনে হইত যেন বিকশিত পুষ্পোত্তাষিতা এই সঞ্চারিণী লতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মূর্ত্তিমতী বসন্তশোভা।

স্পর্শনাহ্লাদকারিণী, অবদাততনু-স্বচ্ছদেহা, পুণ্যসলিলা, হংসবিলাসিনী, মনোহারিণী গঙ্গার মত এই লীলাকে দেখিলে মনে হইত যেন গঙ্গাভাবই দেহ ধারণ করিয়া ধরাতলে বিচরণ করিতেছে।

পতিসেবানিরতা লীলাকে দেখিলে লোকে ভাবিত যেন সকল জীবের

আনন্দদায়ী ভূতলাগত কামদেবের পরিচর্য্যা জন্য দ্বিতীয় রতিই অবনীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

উদ্বিগ্নে প্রোদ্বিগ্না মুদিতে মুদিতা সমাকুলা কুলিতে।
প্রতিবিম্বসমা কান্তা সংক্রুদ্ধে কেবলং ভীতা॥ উ। ১৫। ৩১॥

ছায়ারন্যায় স্বামীর অনুগতা এই লীলা স্বামীর উদ্বেগে উদ্বেগবতী, স্বামীর আনন্দে আনন্দিতা, স্বামীর ব্যাকুলতায় ব্যাকুলিতা হইত। সদাই লীলা স্বামীর চিত্তবৃত্তানুসারিণী হইলেও কেবল স্বামীকে ক্রুদ্ধা দেখিলে ভীতা হইতেন।

লীলার রূপ গুণ এইরূপ। আর রাজার? কুলসরোবরে বিকশিত পদ্মমত এই শ্রীমান্, বিবেকবান্, বহুপুত্র পদ্মভূপতি বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা পালনে সাগরের মত, শত্রুতিমিরের ভাস্কর, কান্তারূপ কুমুদিনীর চন্দ্রমা, দোষতৃণের হুতাশন, দেবগণের সুমেরু, ভবসাগরের যশশ্চন্দ্র, সদ্‌গুণ হংসের সরোবর, কমল সমূহের নির্ম্মল ভাস্কর, সংগ্রামরূপ লতার পবন, মনোমাতঙ্গের কেশরী, সমস্ত বিদ্যার দয়িত, সমস্ত আশ্চর্য্য গুণের আকর। রাজা সহিষ্ণুতায় সমুদ্রমন্থনে দেব দানব বিক্ষোভ বিলাসের মন্দর পর্ব্বত, বিলাস পুষ্পরাশির বসন্তকাল, সৌভাগ্য পুষ্পের পুষ্পধন্বা, লীলালতানৃত্যের মারুত এবং সাহস উৎসাহে কেশব। তিনি সৌজন্যকুমুদের শরৎজ্যোৎস্না, দুশ্চেষ্টা বিষবল্লীর অনল।

এই সর্ব্বগুণান্বিত পদ্মনরপতির প্রিয়া ভার্য্যাই সেই লীলা।



মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণঞ্চ রিশাদসম্।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥৭॥

পদানুসরণী] অহমস্মিন্ কর্ম্মণি হবিঃ প্রদানায় পূতদক্ষং পবিত্রবলং মিত্রং হুবে। তথা রিশাদসম্ রিশানাং হিংসকানামদসম্ অত্তারম্ বরুণঞ্চ হুবে আহ্বয়ামি। কীদৃশৌ মিত্রাবরুণৌ? ঘৃতাচীং ধিয়ং সাধন্তৌ ঘৃতমুদকমঞ্চতি ভূমিং প্রাপয়তি যাধীবর্ষণ-কর্ম্ম, তাং ঘৃতাচীং ধিয়ম্ সাধন্তা সাধয়ন্তৌ কুর্ব্বন্তৌ। যৌ দেবৌ অস্মদ্ হিংসকানাং বিনাশকৌ যৌ চ বর্ষণকর্ম্মসম্পাদকৌ, তাবহং দেবৌ মিত্রাবরুণৌ পবিত্রবলৌ হবিঃপ্রদানায় অস্মিন্ কর্ম্মণি আহ্বয়ামীতি নিকৃষ্টিঃ।

পদ-নিষ্যন্দিনী] মিত্রং (মিত্রদেবকে) হুবে (আহ্বান করিতেছি) পূতদক্ষম্ (পবিত্রবলসম্পন্ন) বরুণঞ্চ (বরুণকেও) রিশাদসম্ (হিংস্র রাক্ষসগণের বিনাশকারী) ধিয়ম্ (কর্ম্ম) ঘৃতাচীম্ (বর্ষণ-রূপ) সাধন্তা (সম্পাদক)।

বঙ্গানুবাদ] আমি (এই যজ্ঞকার্য্য হবিঃ প্রদানের জন্য) পবিত্র বলসম্পন্ন মিত্র নামক দেবতাকে ও হিংস্রস্বভাব রাক্ষসগণের বিনাশক বরুণদেবকে আহ্বান করিতেছি। ইহাঁরা উভয়ে জলবর্ষণকারী।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্ম] ভগবন্! 'পূতদক্ষং' 'রিশাদসং' 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' এই বিশেষণ-ত্রয়ের সার্থকতা কি?

আচার্য্য] বৎস! বৈদিক শব্দনিচয়ের সার্থকতা বিচার কিরূপ প্রণালীতে করিতে হইবে, তাহা পরে তোমায় বিস্তৃতভাবে বলিব, আপাততঃ, সংক্ষেপে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

বৎস! যে শব্দ যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ উচ্চারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতেই সেই শব্দের সার্থকতা।. কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির উদ্দেশ্য যজ্ঞ নিষ্পাদন দ্বারা কর্ম্মাধিকারী যাজ্ঞিকের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন, সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধি-সম্পাদনে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা দ্বারাই কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রুতির সার্থকতা বুঝিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বহু

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ঋগ্বেদ ছাপা ভুল হওয়ায় এই ফর্ম্মা সংশোধন করিয়া ছাপা হইল।

কথা আলোচিত হইয়াছে তাহা দ্বারাই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—রজস্তমোময় অন্ধাবরণ বিগলিত হইলে পর চিত্তের যে স্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বেশ-স্ফুরণ উহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। যাজ্ঞিক রজস্তমোময় লয়-বিক্ষেপ বা পাপরাশি প্রক্ষালন পূর্ব্বক এই সত্ত্বস্ফুরণের জন্ত সতত চেষ্টিত। যাজ্ঞিক এই জন্যই মন্ত্রের শরণাপন্ন। লৌকিক শব্দ-সমূহে যেমন লৌকিক ভাব-সমূহ নিহিত থাকে, বৈদিক শব্দ-সমূহেও সেইরূপ অলৌকিক ভাব-সমূহ নিহিত রহিয়াছে। বেদমন্ত্র-সমূহ কর্ম্মাধিকারীর হৃদয়ে আপন ভাব-রাশি ঢালিয়া উহা প্রক্ষালন করেন।

মানব-হৃদয় সম্বন্ধ-লোলুপ। বিনা সম্বন্ধে মানব ভজিতে মজিতে অনভ্যস্ত। বিনাস্বার্থেও মানব এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায় না, তাই শ্রুতি লয়-বিক্ষেপ-সঙ্গ-পরিশ্রান্ত জীবের লয়বিক্ষেপখণ্ডন-যোগ্য বিশেষণগুলি দ্বারা আপন অঙ্গ সুশোভিত করিয়া পাপ-প্রক্ষালন-ব্যস্ত অধিকারীকে আকর্ষণ করিতেছেন। আলোচ্য মন্ত্রের 'পূতদক্ষম্' 'রিশাদসম্' 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' সেইরূপ বিশেষণ। অধিকারী পাপময় অপবিত্র-বলের প্রেরণায় বহু পাপ করিয়া কোষকারের মত আপন বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সুতরাং দেবতার বিশেষণ,—'পূতদক্ষম্' মিত্রদেব পবিত্রবল-সম্পন্ন। শ্রুতি ইঙ্গিত করিতেছেন,—এই পবিত্রবল-সম্পন্ন মিত্রদেব, তোমার বলের পবিত্রতা-সম্পাদন দ্বারা তোমার লয়বিক্ষেপ খণ্ডন করিয়া দিবেন, তুমি এই পাপহারী দেবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দাসভাবে ইহাঁকে ভজিতে এবং ইহাঁরই ভাবে মজিতে অভ্যস্ত হও। 'রিশাদসম্' বিশেষণও এইরূপ অর্থবিশেষই প্রকাশ করিতেছে—'রিশাদসম্' অর্থে হিংস্রস্বভাব রাক্ষসগণের বিনাশক। বাহিরের রাক্ষস তুমি না দেখিতে পার, কিন্তু মানস রাক্ষসের উপদ্রব ত সর্ব্বদাই তোমার লাগিয়া আছে, তুমি বরুণ দেবের শরণাপন্ন হও—ইনি তোমার প্রতি হিংসা-পরায়ণ রাক্ষসকুলের সংহার করিয়া দিবেন। শ্রীবিশ্বামিত্র যেমন যজ্ঞব্যাপারে রাক্ষসসমূহ কর্তৃক উপদ্রুত ও শ্রীরামরূপী যজ্ঞেশ্বরের শরাণাপন্ন হইয়া যজ্ঞেশ্বরের রাক্ষসবিনাশিনী করুণায় নিরাপদ্ হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ বরুণদেবের শরণাপন্ন হও, নিরাপদ্ হইবে, এবং নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।

অপিচ ইহাঁরা উভয়ে 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' ইহাঁরা জলবর্ষণকারী। অন্নের জন্যই জগতে যত দুশ্চিন্তা, যত অসংবদ্ধ প্রলাপ, যত লয়বিক্ষেপ। জীব 'পেটের ক্ষুধায়, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায়, মনের ক্ষুধায়, নানারূপ অন্নের অন্বেষণে,

বিবিধ অন্নের চিন্তায় নিয়তই ব্যাপৃত রহিয়াছে; যাবৎ জীব লিঙ্গদেহে অহং অভিমান করিয়া অন্নময়-দেহচিন্তা হইতে অপসারণ করিতে না পারিতেছে, তাবৎ অন্নাভাব নিবারণ ভিন্ন ইহা দ্বারা সাধনা অসম্ভব, তাই শ্রুতি বহুস্থানে আপন আধিভৌতিক ব্যাখ্যামুখে দেবগণের নিকট অন্নকষ্ট-কাতর আপন সন্তানের জন্য অন্ন প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানেও এই জন্যই বিশেষণ 'ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা' মিত্র ও বরুণ জলবর্ষণকারী, পার্থিব শস্যসম্পদ্ পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৃথিবীকে 'শস্যশ্যামলা' করিবার জন্য যে সুবৃষ্টি আবশ্যক, মিত্র ও বরুণ সেই সুবৃষ্টি সম্পাদন করেন—তুমি ইহাঁদের শরণাপন্ন হও, ইহাঁরাই জলবর্ষণ দ্বারা তোমার অন্নাভাব দূর করিবেন।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধা বৃতস্পৃশা।
ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮

পদানুসরণী] হে মিত্রাবরুণৌ! যুবাম্ ক্রতুং প্রবর্ত্তমানমিমং সোমযাগম্ আশাথে আনশাথে ব্যাপ্তবন্তাবিতি যাবৎ। কেন নিমিত্তেন ঋতেন অবশ্যম্ভাবিতয়া সত্যেন ফলেন। অস্মভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ যুবাম্? ঋতাবৃধৌ ঋতমিত্যুদকনাম্ সত্যং বা—যজ্ঞোবেতি যাস্কঃ। উদকাদীনা মন্যতমস্য বর্দ্ধয়িতারৌ। অতএব ঋতস্পৃশা উদকাদীনামন্যতমং স্পৃশন্তৌ। কীদৃশং ক্রতুম্? বৃহন্তম্ অঙ্গৈরুপাঙ্গৈ শ্চাতিপ্রৌঢ়ম্॥ হে মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! উদকস্য সত্যস্য যজ্ঞস্যবা বর্দ্ধয়িতারৌ যুবা মুদকাদীনামন্যতমং স্পৃশন্তৌ অবশ্যম্ভাবা সত্যং ফলমস্মভ্যং দাতুম্ অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চাতি সমৃদ্ধমিমং সোমযাগ পরিব্যাপ্তবন্তাবিতিপিণ্ডিতোঽর্থঃ।

পদ-নিষ্যন্দিনী] ঋতেন (অবশ্যম্ভাবী অবিতথ ফল আমাদিগকে দান করিতে) মিত্রাবরুণা (হে মিত্রাবরুণদেব!) ঋতাবৃধা (জল, সত্য বা যজ্ঞের পরিবর্দ্ধক) ঋতস্পৃশা (জল, সত্য বা যজ্ঞ স্পর্শ করতঃ) ক্রতুম্ এই অচিরপ্রবৃত্ত সোমযাগকে) বৃহন্তম্ (অতিসমৃদ্ধ) আশাথে (পরিব্যাপ্ত হইয়াছ)।

বঙ্গানুবাদ] হে দেব মিত্রাবরুণ! তোমরা জল, যজ্ঞ বা সত্যের পরিবর্দ্ধক। তোমরা জল, যজ্ঞ বা সত্য স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল দান করিবার জন্য এই অঙ্গ ও উপাঙ্গে সমৃদ্ধ সোমযাগের চারিদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়াছ ॥৮॥

— —

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্ম] ভগবন্! আপনি 'ঋতাবৃধা' এই পদের ব্যাখ্যায় বলিলেন—ঋত অর্থে জল, যজ্ঞ বা সত্য, মিত্রাবরুণ এতৎসমুদয়ের বর্দ্ধক, ঋতস্পৃশা স্থলেও ঋতশব্দের ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমার প্রশ্ন এই—জল, যজ্ঞ ও সত্যমধ্যে কোন্ অর্থ আমি গ্রহণ করিব?

আচার্য্য] বৎস, ত্রিবিধ অধিকারীর জন্য ত্রিবিধ অর্থ উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা আধিভৌতিক অধিকারী তাঁহারা যোগক্ষেম নির্ব্বাহের জন্য ভৌতিক পদার্থনিচয়কেই আবশ্যক মনে করেন; এরূপ অধিকারী ঋত শব্দের জল অর্থ গ্রহণ করিবেন—যে জলে পার্থিব অন্ন উৎপন্ন হয়—মিত্রাবরুণ সেই জলের বর্দ্ধক, তাঁহারা জলে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সোমযাগে অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল জলদান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন; আর যাঁহারা অধিযজ্ঞ-সেবী যজ্ঞপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তাঁহারা যজ্ঞপুরুষের ক্রমবিবর্দ্ধিনী মূর্ত্তিদর্শনেই রুচিসম্পন্ন; তাঁহারা সেই ভাবেই মন্ত্রার্থ ধারণা করিবেন, আর যাঁহারা যজ্ঞপুরুষের নামরূপ ধারণায় সিদ্ধমনোরথ হইয়া তাঁহার সত্যস্বরূপে অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে তদ্‌ভাব ভাবিত হইয়া মন্ত্রার্থ ধারণা করাই স্বাভাবিক।

ব্রহ্ম] ভগবান্, ঋত শব্দের ত্রিবিধ অর্থের আবশ্যকতা বুঝিলাম। কিন্তু 'ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে' অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে সমৃদ্ধ সোমযাগ নামক ক্রতুতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; এইবাক্যে আমার এক প্রশ্ন উঠিতেছে—দেবতা সোমযাগে পরিব্যাপ্ত হইবেন কিরূপে?

আচার্য্য] বৎস, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগকে যাগ কহে, আবার সোম-সংস্কারযুক্ত যাগকে ক্রতু কহে; সুতরাং ক্রতুশব্দে সোমসংস্কারযুক্ত দ্রব্যত্যাগরূপ ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার সাক্ষাৎ কর্ত্তা অধ্বর্য্যু, অর্থাৎ যজুর্ব্বেদবিৎ ঋত্বিক্। ক্রিয়া, কর্ত্তার ইচ্ছা জন্য, ইচ্ছা কর্ত্তার জ্ঞান জন্য। যজমান বা ঋত্বিকের এই ক্রিয়া, ইচ্ছা ও জ্ঞান সর্ব্বতঃ পরিব্যাপক যজ্ঞপুরুষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত নহে কি? তদ্ভিন্ন যখন সেই যজ্ঞপুরুষ মিত্রাবরুণরূপ মূর্ত্তি অবলম্বনে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া লৌহ-কর্ষণকারী অয়স্কান্তের ন্যায় যাজ্ঞিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, তখন আকৃষ্ট যাজ্ঞিক সর্ব্বতঃ তদীয় বিভূতি দ্বারা পরিব্যাপ্ত অবলোকন করিয়া বলিতেছেন—'ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে'।

৯ম বর্ষ।] মাঘ, ১৩২১ সাল। [১০ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দোস দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৷০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪৷৷০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷৷০, সিকি পৃষ্ঠা ১৷৷০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা।

আশ্রিতা।

আজি পলে পলে কাহার বল গো
চরণ পরশ লাগি
(আমি) লুণ্ঠিত মস্তকে ধরণী চুম্বনে
সতত পড়িয়া থাকি?
তৃষিত শ্রবণ সকল শবদে
হৃদয় পঞ্জর মাঝে
মধুর কল্লোলে দয়া প্রেম গীতি
আপনি আপনি বাজে।
ফুলের মুকুটে কুসুম নূপুরে
ভরিয়া উঠে যে নাসা
পড়ে যে ছড়ায়ে দিগ্ দিগন্তরে
অনন্ত প্রেমের আশা।

আজ হেমন্ত পরশে শীতের সন্ধ্যায়
খুঁজিয়া পাইনি ফুল
[তাই] অশ্রু কণা লয়ে মালাটি গাঁথিয়া
সাজাব চরণ মূল।
ফুলয় কুন্তলে ধুইয়া মুছিয়া
রাখিব সারাটি পথ
আনন্দ সূচনা আম্র পল্লবেতে
বসাব মঙ্গল ঘট
বেদ যে নিশ্বাস শাস্ত্র অঙ্গ ভূষা
ধরম যে মুখ্য প্রাণ
তাই শাস্ত্র মত করি আয়োজন
গাহিব তোমারি গান
দাও শক্তি প্রাণে জাগ্রত স্বপনে
সুস্নিগ্ধকরুণা তুমি
আবার বলিব পুনঃ পুনঃ বলি
একান্ত আশ্রিতা আমি।

আশ্রিত।

পুনঃ পুনঃ বলিব—চিরদিনই বলি আমি তোমার একান্ত আশ্রিত। আহা! আশ্রিত হইতে বড় সুখ। কোন জালা নাই, কোন ভাবনা নাই। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলা আমি কিছুই জানি না আমার প্রতিপালক জানেন।

আশ্রিত অত্যজ্য। দোষ ত আশ্রিত করিতেই পারে না। যদি কখন হইয়া যায় শাস্ত্রমত আশ্রিত কৃপার পাত্র। সত্যই শ্রীগুরু সেবক ল। এত করুণা আর কোথায় সম্ভবে?

হে গুরো! তুমি প্রসন্ন হও। আমায় খুব কঠিন করিয়া দাও। আর আমার এই প্রাণের দীন ভাবকে তুমি আশ্রয় দাও। তুমি জ্ঞান স্বরূপ,

আনন্দ স্বরূপ। দোষ দেখিলে দোষ দেখাইয়া দাও উপেক্ষা করিও না। প্রভু! আমায় জাগাইয়া দিও আমি সব লুটাইব ঐ শ্রীপদে। সত্য কথা আমার ধৈর্য্য নাই, মতির স্থিরতা নাই। তাই মহা বিপদে পড়িয়া হে দিনবন্ধো! তোমায় ডাকিতেছি। এস এস ঠাকুর আমার যে আর কেহ নাই। আমি সুখ আশায় দুঃখের প্রলেপ মাখিয়া দেখ কি সং সাজিয়াছি। এস—তুমি আসিয়া করুণা কর—আমায় রক্ষা কর। আর কিছুই চাইনা। বল আর কি চাহিব? তুমি যে সবই জান। সত্য কথা তোমার করুণা কত আমিত বলিতে জানি না। যেন কত শান্ত কত মিষ্ট এ করুণার ধারা প্রাণে বহিয়া যায়। অহো! ধন্য আমি।

আবার কি মহা মূর্খ আমি। এ ধারা সত্ত্বেও কেন বিষের ধারায় স্নান করি। ঝাঁপ দিতেই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিল এযে সে নয়। সে হ'লে কি এ জ্বালা উঠে? ইহাই তাহার মায়া। কিন্তু যে আশ্রিত তাহার উপরও এসব কেন? বল আরও কি তোমার বাকী আছে? তুমি আমার প্রাণের লুকান কথা বা কাজ কেমন ক'রে চুরি কর? বল এ বিদ্যা কি তোমার চিরাভ্যস্ত? তবে দেখ আমার প্রত্যেক কর্ম্মে তুমি ঠিক চোরের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও। তোমার দৃষ্টির অনুভবে আমি সদা সতর্ক থাকিব। আমি ইহাই চাই। নতুবা আমি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিনা।

আমি শীঘ্রই কখন তাতিনা। একটুতেও অনর্থ হয় না। আমি যে আশ্রিত। আমি কৃপার পাত্রী। যে আশ্রিত তার অপমান নাই। এর বড় কষ্ট বা দুঃখ আসিলে প্রতিপালকের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকে। যা করা উচিত সে করিয়া দিবে এই ভাবিয়া। যখন পুনঃ পুনঃ বিপদে পড়িয়া স্মরণ করি তখন কত কি বলিতে ইচ্ছা করে। সাধে কি তোমার নাম দীনশরণ অনাথ বল্লভ? এত করুণা যদি না হবে তবে পাপী তাপী দাঁড়াবে কোথায়? তবে পার কর, পার কর বলিয়া ভবকুলে বসিয়া কেনই বা তোমায় ডাকিবে? এমন ক'রে পাপের বোঝা নিজে মাথায় তুলিয়া, আদর করে হাত ধরে ভব পারে আর কে লইয়া যাইতে পারে? এমন করে প্রাণের কথা টানিয়া আর কে বাহির করিতে পারে? আমি চিরকালই জানি আমার উন্নতি বা অবনতি আমি নিজে ধরিতে পারিনা। আমার দোষ গুণ বিচারের কর্ত্তাই তুমি। তুমি যাহা বলিয়া দাও আমি শতবার মাথা কুটিয়াও তাহা আনিতে পারি না।

যে স্থানে থাকি সেখানে আমার কিন্তু চিত্ত শান্ত থাকেনা। চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন হয়না। অপ্রসন্ন চিত্ত স্থির হইয়া বসিতেই পারেনা। এজন্য বহু ব্যভিচার

হইয়া যায়। বিকৃত চিত্তে কখন ভাব আসেনা। ভাব না পাইলে বসাও ঠিক হয় না। আমি দেখি ঘরের কোণে যত সুখ বাহিরে তা নাই। উপস্থিত সময়ে সাধনা সম্বন্ধে ঘরই দুর্গ আমি ঘরেই ফিরিলাম সাধনা করিতে। আশীর্ব্বাদ কর অমি যেন সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। আমি মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তপস্যা করিব। ফলাফল তোমার হাতে।

মনোমায়া।

পৌষমাস। মাসের অর্দ্ধেক বিগত প্রায়। ১৩২১ সাল। আজ ১৩ই সোমবার শুক্লা, একাদশী। পূর্ব্ব রাত্রিতে বেশ শীত পড়িয়াছিল।

শেষ রাত্রে কি স্বপ্ন দেখা হইতেছিল মনে নাই। যখন দেহে চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন বুঝিলাম একটা যাতনা অনুভব করিতেছি। আর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মানুষ যেমন জড়ান কথায় নাম ডাকে সেইরূপ ভাবে অতিশয় ভয়ে কাতর হইয়া জড়ান কথায় সীতারাম সীতারাম করিতেছি।

আমার মনে হইতেছিল যেন অতিশয় ভীতিপ্রদ কোন মূর্ত্তি আমার গলার কাছে আমার গায়ের লেপের উপর বসিয়া আমার দম বন্ধ করিয়া দিতেছে। আর আমি বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। মনে হইতেছে যমদূতটাকে ঐস্থান হইতে সরাইয়া দি। সেই জন্য চেষ্টাও' করিতেছি। কিন্তু হাত নাড়িবার সামর্থ্য আমার নাই। যাতনায় গোঁ গোঁ করিয়া সীতারাম সীতারাম করিতেছি। কতক্ষণ এইরূপ যম-যাতনা ভোগ হইয়াছিল বলিতে পারি না। কিন্তু মনে হইতেছে যেন দুই চারিবার নাম ডাকিতেই আমি বল পাইলাম এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম। মনে হইল যেন আধ সেকেণ্ডের জন্য যাতনা পাইলাম। কিন্তু অতিশয় বিষম যাতনা।

কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সকলকেই ত মরিতে হয় দেখিতেছি। আপনারা ত ডাক্তার মানুষ। অনেক প্রকারের মৃত্যু ত দেখেন। কোন্ প্রকারের মৃত্যু অল্পকষ্টপ্রদ বলিয়া আপনার মনে হয়? ডাক্তারবাবু বলিলেন "হার্ট ফেলের মৃত্যুই ভাল। তখন আমি বলিয়াছিলাম যখন এক ক্ষণের যাতনাও বহুক্ষণ ব্যাপি মনে হয়, তখন কোন প্রকার অজ্ঞান মৃত্যুই সুবিধা জনক নহে। স্বপ্নব্যাপারে কথাটার সত্যতা অনুভব হইল। মনোমায়া এরূপ বিষমবস্তু যে

এক ক্ষণকেও বহুক্ষণ করা ইহার পক্ষে অসাধ্য নহে। শাস্ত্রেও পাই রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রেই দ্বাদশ বৎসরের যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। গাধি ব্রাহ্মণ জলে ডুবিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ করিতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময় টুকুর মধ্যে আপনার মৃত্যু দেখিলেন, চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইলেন, চাণ্ডালিণী বিবাহ করিলেন, পুত্র কন্যা বহু হইল, শেষে কীর দেশের রাজা হইলেন, দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিলেন শেষে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। অথচ একটি ডুব দিতে যতটুকু সময় লাগে তাহার মধ্যেই এই ভোগ হইল। নারদ ঋষিও স্নান করিতে নাবিয়া একবার ডুব দিতে যে সময় লাগে তন্মধ্যে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এক রাজার সঙ্গে বিবাহ হইল। পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র কত হইল। যুদ্ধে রাজা মরিলেন, পুত্র কন্যা সব মরিল। আবার তর্পণ করিতে গিয়া যেমন জলে ডুব দিলেন অমনি নারদত্ব প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে একক্ষণেই তাঁহার এত ভোগ হইল কিরূপে? স্নান করিয়া উঠিবা মাত্র দেখিলেন ভগবান তাঁহার বীণা ও কৌপিন লইয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভগবানের হাতে বীণা কৌপিন দিয়া তিনি জলে নাবিয়াছিলেন স্নান করিতে। মনোমায়াতে অসম্ভবও সম্ভব হয় শাস্ত্র ইহা দেখাইতেছেন।

বলিতেছিলাম স্বপ্নে যে যাতনা ভোগ হইল মরণ মূর্চ্ছায় বুঝি এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়। এই ভোগ করায় মন।

এই যে মৃত্যুভয় ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? এই প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয়।

মৃত্যুভয় নিবারণের ত্রিবিধ উপায় শাস্ত্রে পাওয়া যায়। (১) সর্ব্বদা নাম জপে মৃত্যুভয় থাকে না।

(২) যে ভয় উৎপাদন করে সেও সে—এই ভাবনা যিনি করিতে পারেন তাঁহারও মৃত্যুভয় থাকে না।

(৩) মৃত্যু ভয়টা মনোমায়া। ইহা মনেরই কল্পনা। ইহা অজ্ঞান প্রসূত। প্রকৃতপক্ষে আত্মাই আছেন, আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। যাহা আছে বলিয়া লোকে দেখে তাহা অজ্ঞানেই দেখে। অজ্ঞান যাহার দুর হইয়াছে তিনি দেখেন রজ্জুটাই সর্প মত দেখাইতেছিল, বাস্তবিক সর্প বলিয়া কোন কিছুই নাই। অজ্ঞানই ইহা দেখাইতেছিল। জ্ঞানলাভে বুঝা গেল, অজ্ঞান পলাইয়াছে। আরও বলা যায় সমুদ্রের যে তরঙ্গ তাহাও জল হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। তবে স্থির শান্ত যে জল তাহাই চঞ্চল হইয়া তরঙ্গরূপে ভাঙ্গে ভাসে মাত্র। চঞ্চলতাটুকু মায়ার খেলা

উপরোক্ত তিন প্রকার উপায়ের প্রথম উপায়টি যাঁহারা অবলম্বন করেন তাঁহারা বিশ্বাসী ভক্ত; দ্বিতীয়টি যথার্থ ভক্তের উপায় আর শেষটি জ্ঞানীর উপায়।

এখন এই মৃত্যু ভয়টিকে আরও একটুকু বিশদ করা যাউক।

কোন পথিক রাস্তা হাঁটিতেছে। সম্মুখেই বন, বনের পাশ দিয়া রাস্তা। রাস্তার পার্শ্বে ঝোপ। ঝোপের ভিতরে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র। পথিক নিকটে আসিবা মাত্র ব্যাঘ্রটি সম্মুখে পড়িল। পথিক ব্যাঘ্র দেখিয়াছে, ব্যাঘ্রই আক্রমণের উপক্রম করিতেছে। পথিকের হাতে আত্ম রক্ষার কোন কিছুই নাই। পথিক ভয় পাইয়াছে, কিন্তু হতবুদ্ধি হয় নাই। সে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবানের নাম লইয়া চলিয়াছে। সম্মুখে মৃত্যু দেখিয়া আরও কাতরভাবে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই তাহার অভ্যাস করা আছে—ঠাকুর আমি আশ্রিত। আমার রক্ষা-কর্ত্তা তুমি। এই ভাবটি ভিত্তি করিয়াই সে নাম করে। ব্যাঘ্র দেখিয়া সে বড় কাতর ভাবে নাম করিতেছে।

নামের বিশ্বাস তাহার অত্যন্ত প্রবল। ভয়ে কাতর হইয়া সে নাম করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। শ্রীভগবান তাহার মধ্যে থাকিয়া ব্যাঘ্রের মনের গতি ফিরাইয়া দিলেন। ব্যাঘ্র পথিককে কিছুই বলিল না। বন মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। পথিকের প্রাণরক্ষা হইল। শ্রীভগবান তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তকে রক্ষা করিলেন। বিশ্বাসী ভক্তের রক্ষা এইরূপ।

প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি ব্যাঘ্র দেখিবা মাত্র দেখিলেন ব্যাঘ্রমূর্ত্তিতে তাঁহারই হৃদয়ের রাজা। তাঁহার ভয় হইল না। কাহাকে ভয় হইবে? "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে" এই যাঁহার হয় কৃষ্ণ দেখিয়া তাঁহার ভয় হইবে কেন? ধ্রুব এই ভাব লইয়া ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া ব্যাঘ্রের দিকে কৃষ্ণমাখা চক্ষে চাহিলেন ব্যাঘ্র আপন মনে জল পান করিয়া ধীরে ধীরে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। ভক্তের রক্ষা এইরূপ।

আর জ্ঞানী? বিশ্বাসী ভয়ে সীতারাম সীতারাম করিতে করিতে রক্ষা পায়, ভক্ত ব্যাঘ্রকেও সীতারাম দেখিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে আর জ্ঞানী ব্যাঘ্রকে মনোমায়া ভাবিয়া দেখিতে দেখিতে আর কিছুই দেখে না। দেখে একমাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্যই সর্ব্বত্র। মনোমায়া সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যকেই ব্যাঘ্ররূপে বিবর্ত্তিত করিয়াছিল। মনের সঙ্কল্প যেমন ইচ্ছা মাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্যে মিলাইয়া যায়, সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন মায়া চঞ্চলত শূন্য হইয়া শান্ত সমুদ্রই থাকে জ্ঞানী দেখেন

সঙ্কল্প ইচ্ছা মাত্র, কোথাও পূর্ব্বাভ্যাস বশে উঠে সত্য, কিন্তু বিচার মাত্রেই তাহা সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের কোলেই লয় হইয়া যায়।

ক্রম অনুসারে বিশ্বাসী, ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধনা করিতে পারিলে কোথাও ক্রম-মুক্তি কোথাও সদ্যোমুক্তি। যাঁহার যাঁহাতে রুচি অথবা যাঁহার যাঁহাতে অধিকার।

স্বপ্নে ভয় দেখিয়া সীতারাম সীতারাম করা ভাল। এইটুকুর জন্য জাগ্রতে সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সীতারাম সীতারাম করিয়া ভয় দুঃখ ভাবনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা ভাল। প্রথম অবস্থা ইহা। দ্বিতীয় অবস্থায় ভয়ের বস্তুকে সীতারাম ভাবিয়া নির্ভয় হওয়া ভাল। এই অবস্থার জন্য হৃদয়ের রাজাকে শত্রু, মিত্র, হিংসা, দ্বেষ সকলের মধ্যে দেখিতে অভ্যাস করা ভাল। রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা এ সকলই যে সে। সে ভিন্ন যে কেহই নাই। "গঙ্গা মেরে রাম" অভ্যাস করিতে করিতে "সবই মেরে রাম" হইয়া যাওয়া বড় ভাল। শেষ অবস্থায় তত্ত্বটি জানিয়া সকলই মায়া "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" হইয়া যাওয়া ভাল। ইহারই জন্য মনোমায়া যাহা তুলিতেছে, লয় বিক্ষেপ যাহাই তুলিতেছে তাহাকেই মিথ্যা মায়া ভাবিয়া স্বরূপে আসা অত্যন্ত ভাল। এখন সর্ব্বদা করিতে হইবে এই—

(১) সর্ব্বদা নাম করা।

(২) মন যখন যখন নাম ছাড়িয়া অন্য কিছু লইয়া থাকিবে ইহা যখন ধরা যায় তখন বেশ করিয়া মনকে ধম্‌কান, বেশ করিয়া তিরস্কার করা। এই ধম্‌কানার অভ্যাস এমন করিতে হইবে যেমন স্বপ্নকালেও মনকে স্বপ্নে ধম্‌কান যায়।

(৩) বৃক্ষে, লতায়, পুষ্পে, ফলে, আকাশে, জলে, সূর্য্যে, আগুণে, অন্নে, ব্যঞ্জনে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, পশুতে, পাখীতে, মানুষে, মানুষীতে, শত্রুতে, মিত্রেতে, সুন্দরে কুৎসিতে, বৈদ্যে, রোগে, ডাক্তারে ঔষধে, সর্ব্বত্র হৃদয়ের রাজাকে স্মরণ করিতে অভ্যাস করিতে হয়। নিজের হৃদয়ে যাঁহাকে ধ্যান করিতে হয় সর্ব্ব জনের হৃদয়ে তিনি ইহা স্মরণ অভ্যাস চাই। এমন কোন কিছু দেখা চাই না যাহাতে বেঁহুস হইয়া তাঁহাকে দেখা ভুল হইয়া যায়। ত্রিসন্ধ্যায় এইরূপ ধ্যান ও বাহিরে এইরূপে স্মরণ করিতে করিতে যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফুরে হইয়া যাইবে। এটি কিন্তু তাহাকে বিশেষরূপে ভাল না বাসিতে পারিলে হইবে না। অনুরাগমার্গে ইহা সহজ। আবার বিশ্বাসে করিতে করিতে অনুরাগ আসিয়াও যায়।

(৪) মনোমায়া যাহা তুলিতেছে তাহা মিথ্যা। যাহা তুলিয়া জগৎরূপে দেখাইতেছে তাহা মায়ারই কার্য্য। চৈতন্যটি বস্তু—বাকি যাহা তাহা অবস্তু তাহা

নাই। ব্রহ্মই মায়া দ্বারা বিচিত্র অন্তর্জ্জগৎ ও বিচিত্র বহির্জ্জগত্ রূপে বিবর্ত্তিত হওয়ার মত হইতেছেন। ফলে তিনি তিনিই আছেন। অধিষ্ঠান চৈতন্য তিনিই। তিনি সর্ব্বদাই আপনি আপনি থাকিয়াও মায়া সঙ্গে একই বহু হইয়া মিথ্যা খেলা করিতেছেন ইহা লোককে দেখাইতেছেন। সাধনা কর ও এই সব চিন্তা কর। বাকী তিনি করিয়া দিবেন।

আত্মজ্ঞান।

আত্ম-ভিন্ন আরও কিছু আছে এটা যিনি দেখেন তিনি তপস্যা যাহা করুন, ব্রত দান ইত্যাদি যাহাই কেন করুন না শত কোটি কল্পেও দেহ হইতে, মন হইতে, অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। পীঠমালা তন্ত্রে মহাদেব এই কথা বলিয়াছেন।

মুক্তিকোপনিষদ্‌ও এইরূপ ভাবের কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন জ্ঞান ভিন্ন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি আর কিছুতেই হইতে পারে না।

যোগবাশিষ্ঠ বলেন—আত্মজ্ঞান, আত্মকথা ভিন্ন দান, তপ, বেদপাঠ—কিছুতেই সংসার ক্লেশ দূর হইবে না।

অনুভবটি যাহা তদ্দ্বারা বস্তুটি আছে এই জ্ঞান লাভ হয়। আত্মা আছেন—আমার মধ্যেই আছেন ইহার অনুভব সকলেই করিতে পারেন। ইহাতে আত্মা আছেন এই জ্ঞানটি লাভ হয়। এইটিই কিন্তু সে আত্ম জ্ঞান নহে যদ্দ্বারা মুক্তি হইতে পারে।

আত্মা যে সৎ—আত্মা আছেন ইহাদ্বারা আত্মার স্বরূপটি কিছু জানা গেল না। আত্মাই যে পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ, অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ ইহা জানিলে মুক্তি হইবে তদ্ভিন্ন নহে।

হিন্দুধর্ম্মের সার উপদেশ।

(১)

হিন্দুধর্ম্ম জীবকে কি শিক্ষা দেন?

জীবকে বলেন মুক্ত হও।

কি হইতে মুক্ত হইবে?

বন্ধন হইতে।

কে বন্ধন করিয়াছে ?

দেহ, মন, অজ্ঞান এবং জগৎ।

কিরূপে ?

তুমি আমি দেহের বশে আছি কি না, মনের বশে চলি কি না, অজ্ঞানের বশে দুঃখ পাই কিনা—ইহা ত সকলেই জানে।

এ সকলের বশে না থাকিলে কি হয় ?

কোন দুঃখ আর থাকে না। নিত্য সুখ।

ইহাই কি মুক্তি ?

তদ্ভিন্ন আর কি ? কাহারও হাতে বাঁধা না পড়িতেই আমি স্বাধীন হইলাম। কষ্ট দিতে আর কেহ রহিল না। দেহও কষ্ট দিতে পারিল না, মন পারিলনা, সংসার পারিল না, অজ্ঞান পারিল না। ইহাই মুক্তি।

কিরূপে মুক্তি লাভ হইবে।

তুমি একবার আমায় দেখ তাহা হইলেই আমার মুক্তি হইবে।

কিরূপে ?

তুমি যে আমায় দেখিতেছ সেটা কিন্তু আমার জানা চাই।

আমি ত শত ভাবেই তোমায় দেখি। তুমিও ত তাহা জানিতেছ।

বিশ্বাসে দেখি বটে কিন্তু শত মানুষ বা শত মানুষীর চক্ষে দেখা হইলেই ত হয় না। স্বরূপে দেখা চাই।

সচ্চিদানন্দরূপে থাকিয়া দেখা দিতে হইবে ?

তাহা না হইলে আমি বুঝিব কিরূপে তুমিই দেখিতেছ। তোমাকে না জানিলে কিরূপে বুঝিব তুমিই দেখিতেছ।

আমাকে জানাইয়া দিতে হইবে ?

হইবেনা ? আগে তুমি কে জানাইয়া দাও তবে ত বুঝিব তুমি আমায় দেখিতেছ তবেই আম'র মুক্তি হইবে।

আমাকে জানাই আত্ম জ্ঞান।



মিলনে।

হিয়া 'পরে হিয়া রাখি,
তবু ব্যবধান দেখি ;
আমারে তোমার বলি কবে নেবে হায় ?

চিরদিন হেলা ফেলা,
আমার ফুরায় বেলা ;
একি খেলা লীলাময় ! তোমায় আমায় ?

একি এ হৃদয় নাথ !
বাড়ায়ে দিতেছ হাত,
ভিখারী কি ভিক্ষা দিবে রাজাধিরাজারে ?

আমারে দিয়াছ যাহা,
কোথা আমি পাব তাহা ;
বিনিময়ে কিবা চাহ কি দিব তোমারে ?

দয়াময় ! একি ছল,
আঁখি পূরি আসে জল ;
যাহা চাহ কাড়ি লহ কি কাজ বিচারে ?

কি কয়েছি অভিমানে
অমনি শুনেছ কানে ;
কি রতন অনাটন তোমার ভাণ্ডারে ?

তোমারি এ বিশ্ব ঠাঁই,
কিছু না খুঁজিয়া পাই ;
আমারে ফুরাতে চাহি তোমার মাঝারে ;

জানি না কোথায় শেষ—
চেয়ে থাকি অনিমেষ ;
ভাষাহীন একি প্রেম দিয়েছ আমারে ;

সকলি হয়গো ভুল,
খুঁজিয়া না পাই কূল,
ডুবিয়া যেতেছি যেন অসীম পাথারে।

"বাসনায় দাও আগুন জ্বেলে।"

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।

আমি জন্মি নাই আমি মরিও না। জন্ম ও হয় নাই মরণ নাই তবে আমি কি ? আর এই যে দেখিতেছি আমার পিতা মাতা ছিলেন, জন্মস্থান আছে, বালক কালের খেলা, যৌবনের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, কাজ কর্ম্ম, তার পরে এতদিন পর্য্যন্ত জীবন ধারণ এ সব তবে কি ?

যাহার জন্মই হয় না তার ঘাড়ে এত কর্ম্ম চাপিল কিরূপে ?

তুমি যে সমস্ত গত কর্ম্মের কথা মনে করিয়া রাখিয়াছ সেই সমস্ত অবস্থা এখন কোথায় ?

আমার স্মৃতিতে আছে।

স্মৃতিতে যাহা থাকে তাহা ত কল্পনা। এ সব তবে কল্পনা।

পূর্ব্বে যাহা করা হয় তাহারই স্মৃতি থাকে। পূর্ব্বে যাহা করা গিয়াছে তাহাই সংস্কার রূপে স্মৃতিতে আছে। স্মৃতিরাকাশরূপা চ যথা তজ্জন্তথৈবতে। স্মৃতি আকাশ রূপা। আবার স্মৃতি হইতে যাহা জন্মে তাহাও শূন্য স্বরূপ। তাই ত বলিতেছি এ সমস্ত এখন কল্পনায় আছে। এ সমস্ত কল্পনার মূল পূর্ব্ব কর্ম্ম। আচ্ছা—দেখ দেখি এখন ত প্রথম হইতে বহু গত কার্য্যসংস্কার স্মরণ করিতে পারিতেছ। কিন্তু অনেক ভুলিয়াও গিয়াছ। প্রধান প্রধান সংস্কার মাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু মরণ মূর্চ্ছার সময়ে এ সমস্ত সংস্কারের কিছুই মনে থাকিবে না। যদি

মনে থাকিত তবে তুমি বলিতে পারিতে পূর্ব্বে কি ছিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কি কি করিয়াছ ? তা যখন মনে নাই তখন বলিতে হইবে মরণমূর্চ্ছায় কিছুই মনে থাকে না, যাহা মনে থাকে সেইগুলি বাসনা। এই বাসনা দ্বারা তুমি বদ্ধ।

তুমি এক ক্ষণের জন্যও ভুলিতে পার না যে তুমি জন্মিয়াছ, তোমার জন্ম স্থান আছে, পিতা মাতা আছে বা ছিল, তুমি কত কর্ম্ম করিয়াছ ইত্যাদি। যতদিন না তুমি এই সমস্ত বাসনা ভুলিতে পারিতেছ ততদিন তুমি বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছ না। কাজেই তুমি বাসনা দেখিতেছ বলিয়া ব্রহ্মদর্শন তোমার হইতেই পারে না।

মরণ-মূর্চ্ছায় এক জীবনের বাসনা, যাহা উপস্থিত দেহ ধরিয়া উঠিয়াছিল—তাহা ভুল হইয়া গেল সত্য, কিন্তু মৃত্যুকালে পূর্ব্বের যে যে বাসনা প্রবল ছিল সেইগুলি আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহে রহিল। ইহাদের দ্বারা আবার তোমার জন্ম হইল কর্ম্মও চলিল। বল ইহার বিরাম কোথায় ?

বাসনা হইতে মুক্ত হইবে কিরূপে ?

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য—বাসনা পর্য্যন্ত মিথ্যা। বাসনার জন্ম ভ্রম জ্ঞান হইতে। রজ্জুতে যে সর্প জ্ঞান হয়, সে সর্প জ্ঞানটা মিথ্যা। রজ্জু রজ্জুই আছে। ভ্রম জ্ঞানটি তাহাতে আরোপ হয় মাত্র। ইহাই মায়ার কার্য্য। এই ভ্রম জ্ঞানটি দূর হইলে তবে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে।

মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান কর। সৎসঙ্গ ও সৎ শাস্ত্র অবলম্বন কর—ইহা দৃষ্টে সাধনা করিতে থাক—প্রথমে চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম কর, করিয়া ভগবানের আশ্রয়রূপ ভক্তি যোগ অনুষ্ঠান কর, পরে বিচার দ্বারা বুঝ যে, আত্মাই আছেন আর কিছুই নাই। চুপ করিয়া যাওয়াই প্রধান সাধনা। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহা হয়।

জয়মাল্য।

চল্‌তে গিয়ে কাঁটা-পথে,
ফলটি হ'লো ভালো।
তুল্‌তে যত বনের ফুল
মাল্য হয়ে গেলো।

দংশি' শতবৃন্ত নখে—
বিষের ধারা ঢেলে।
শেষে, আকুল হৃদে মালার ডোরে
রাখ্‌তে হ'লো ভুলে!

হ'লো, প্রাণের এ যে স্নেহের দান—
সাপের শিরে মণি।
হায়রে, হায়! আমার মত
কে আর তবে ধনী?

শ্রীহ—

তিরুপতিতে চিঠি।

প্রিয়তম!

তোমার চিঠি পাইলাম। বরাবরই পাই। আর আমার বলিবারও কিছু নাই জানিবারও কিছুই নাই। যাহা তুমি জানাইয়া দিয়াছ তাহা শুনিয়াই আমার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই আমাদের শেষ জন্ম।

আজ ৯ বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে। তুমি লিখিয়াছ নানান কৌশলে তুমি আসিয়া আমাকে দেখিয়া গিয়াছ। আর আমি? আমি বুঝি চুপ্‌ করিয়া আছি? তোমার শয়নগৃহ সাজাইয়া রাখিয়া আসে কে? তোমার বিছানা কে প্রস্তুত করে? যতক্ষণ না তুমি নিদ্রা যাও ততক্ষণ আমি নিকটেই থাকি। প্রত্যহ শাশুড়ীমাতার সঙ্গে থাকিয়া আমি সমস্ত আহারের আয়োজন করিয়া আসি। আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস করিতে পার না। তুমি আমায় দেখিতে পাও না। আমি কিন্তু সব করি। তুমি আগামি কল্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও সর্ব্বত্র আমার পায়ের চিহ্ন দেখিবে। আগামি পূর্ণিমায় আমাকে তোমার বাড়ী পাঠাইবে। আর ত দিন নাই। যখন যাইব তখন সব শুনিও আমি কখন কি করিতাম আর কি করিয়া করিতাম। তুমি যে আমাকে দেখিতে আসিতে তা আমি জানিতাম। তুমি আসিয়া এখানে যাহা যাহা করিয়া যাইতে আমি সব দেখিয়াছি। আমি তোমার

কাছে গিয়া সব বলিব। একটা কথা মাত্র বলি। তুমি আমাদের সমুদ্রের ধারে যে মন্দির আছে তাহাতে আমার নাম লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ। তুমি চলিয়া গেলেই তাহা দেখিয়াছি। তুমি আর একদিন আসিয়া দেখিও তাহার নীচে আমি কি লিখিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু তুমি কি? অমন করিয়া কি যেখানে সেখানে আমার নাম লেখে? যদি অন্য কেহ দেখিত তবে কি মনে করিত। বিশেষ—মা যদি দেখিতেন তবে কি হইত বল দেখি?

আর একটা কথা আজ বলিব। ছেলেবেলায় আমিই তোমার সঙ্গিনী ছিলাম। আমাকে তুমি কত ভালবাসিতে। আমার মৃত্যু হয় নাই। ওটা কপট মৃত্যু। মা আমার একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে আমাদের এ জন্মটাও বৃথা যাইত। এখন ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এখন আর ভয় কি? তার পরে তুমি যাহা বলিয়াছ তাই শুনিবার জন্য আমি কত জন্ম ঘুরিতেছি। তুমি জান না আমরা কি। আমি গুরুকৃপায় সব জানিয়াছি।

আমি আগে যাই দাঁড়াও তার পরে কত কি করিব দেখিও।

আর কি লিখিব। তোমার আর একটি ব্যাপারের কথা লিখিতেছি আর লিখিব না। দেখ গো এত কথা আমি তোমার জানি যে আমার সব লিনখিতে ভাল লাগে। কিন্তু এত কি লেখা যায়? তবু লিখিতে হয়। না লিখিয়াও থাকা যায় না। বিশেষ আমার লেখা তোমায় বড় ভাল লাগে।

আমার এখন ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আমাদের দেশের এই নিয়ম খুব ভাল। বিবাহ হইয়াছে ৭ বৎসরে। আর এই নয় বৎসর আমি মার কাছে আছি। মা আমায় সব শিখাইয়াছেন। আমি তোমার কাছে গেলেই তুমি দেখিবে কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছিলে কেন? তুমি আমার শাশুড়ীর কাছে ও আমার খুড়শাশুড়ীর কাছে যে অত নাটক পড়িতে—তুমি কি মনে কর আমার শাশুড়ী কিছুই বুঝেন না? তাঁহারা দুই ভগ্নীতে কি বলিতেন তা জান? তাঁহারা বলিতেন—বাছা যতই কেন না চঞ্চলতা দেখাও—নাটকই পড় আর উপন্যাসই শুনাও বৌমার ১৬ বৎসর বয়স না হইলে কখনই আনিব না। আমার শাশুড়ী কিন্তু আমাদিগকে সাধারণ স্ত্রী পুরুষের মত মনে করিয়াছেন। আমাদের যে এই শেষ জন্ম তা তিনি জানেন না। তুমি আমাকে পাইবার জন্য বহু জন্ম ধরিয়া যে বহু ক্লেশ করিতেছ আহা তাহা যদি তিনি জানিতেন তাহা হইলে তিনি আর একরূপ হইয়া যাইতেন।

যাই হউক আমি ত যাইতেছি। আমি গেলেই দেখিবে তুমি পরম শান্ত হইয়া যাইবে। আমার কি হইবে তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিও। ইহার পরেই আমাদের নূতন খেলা আরম্ভ হইবে। এই খেলাই শেষ খেলা। ইহার কথা আমি তোমাকে এখন কিছুই বলিব না। কিন্তু যাহা কিছু করিব সবই সেই শেষ লক্ষ্য করিয়া। আজ ত্রয়োদশী—আজ হইতেই যাত্রা হইয়া রহিল। সব আয়োজন হইতেছে। এই পূর্ণিমাতেই ঠিক ষোলবৎসর পূর্ণ হইবে তাই এই বিলম্ব। নতুবা আজই যাওয়া হইত। আমার কিন্তু এই রাণীর মত যাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মা যখন এইরূপে পাঠাইতেছেন তখন না বলিবার যো নাই। বিশেষ তুমিও রাজা মানুষ। তোমার সম্ভ্রম বজায় রাখা চাই। কিন্তু সম্ভ্রম মানে ত জান। সম্যক্ রূপে ভ্রম যাহা তাহাই সম্ভ্রম। এই সম্ভ্রম রক্ষা করাই চাই। নতুবা অভিনয় হয় না। তবে আমি প্রণাম হইতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেমন আমার উদ্দেশ্য সফল হয়। ইতি

তোমারই—

যথা সময়ে চিঠি আসিল। রাজা একবার দুইবার তিনবার কতবার পড়িলেন। আবার পড়িলেন। আবার পড়িলেন। পড়িয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঘর নির্জ্জন। কাহারও আসিবার হুকুম নাই। একমাত্র মা ও কাকীমার জন্য পৃথক নিয়ম।

রাজা কতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন "এই সেই"।

কে সেই? বলিতে বলিতে রাজমাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

স্মৃতি-বাক্য।

পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে স্মৃতি বলেন অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অকথ্য-কথন, সন্ধ্যাদি বিহিত কার্য্যের অকরণ, নিষিদ্ধ বস্তু সেবন, অযাজ্য-যাজন ইত্যাদি কার্য্য পাপ-কার্য্য।

যাহারা পাপ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার পরে আর ঐরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না তাহাদের পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

স্মৃতি বলেন জপ, তপশ্চরণ, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ্, বেদান্ত, বেদের সংহিতাভাগ, মধুব্রাতাদি মন্ত্র, অঘমর্ষণ মন্ত্র, অথর্ব্বশির, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত, রাজন রৌহিণ নামক সাম ইত্যাদি এবং প্রাণায়াম এবং সাবিত্রী এই সমস্ত দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়।

উপবাসের জন্য পয়োমাত্র ভোজন, শাকমাত্র ভোজন, ফলমাত্র ভক্ষণ, যব ভোজন, ঘৃত ভোজন, সোম পান, এই সকল দ্বারাও পাপ নাশ হয়।

পুণ্য পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, তীর্থস্থান, ঋষিদিগের নিবাস স্থান, গোষ্ঠ এই সকল দেশে গমন করিলেও পাপক্ষয় হয়। অপরিচিত যাত্রীসঙ্গে গমন ভাল, দলবাঁধিয়া গমনে অন্য কার্য্য করা হইয়া যায়। লোকের মধ্যে যাহার পাপ রাষ্ট্র এখন হয় নাই সে ব্যক্তি গুপ্তভাবে বহুবার প্রাণায়াম করিয়া স্নানান্তে অঘমর্ষণ জপ করিবে। সহস্র গায়ত্রী জপও বিধি।

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য কথা অভ্যাস, আর্দ্রবস্ত্রে ভূমিতে শয়ন, অনশন ইহা তপশ্চর্য্য।

সুবর্ণ, গো, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি, তিল, ঘৃত ও অন্ন দানেও পাপ ক্ষয় হয়।

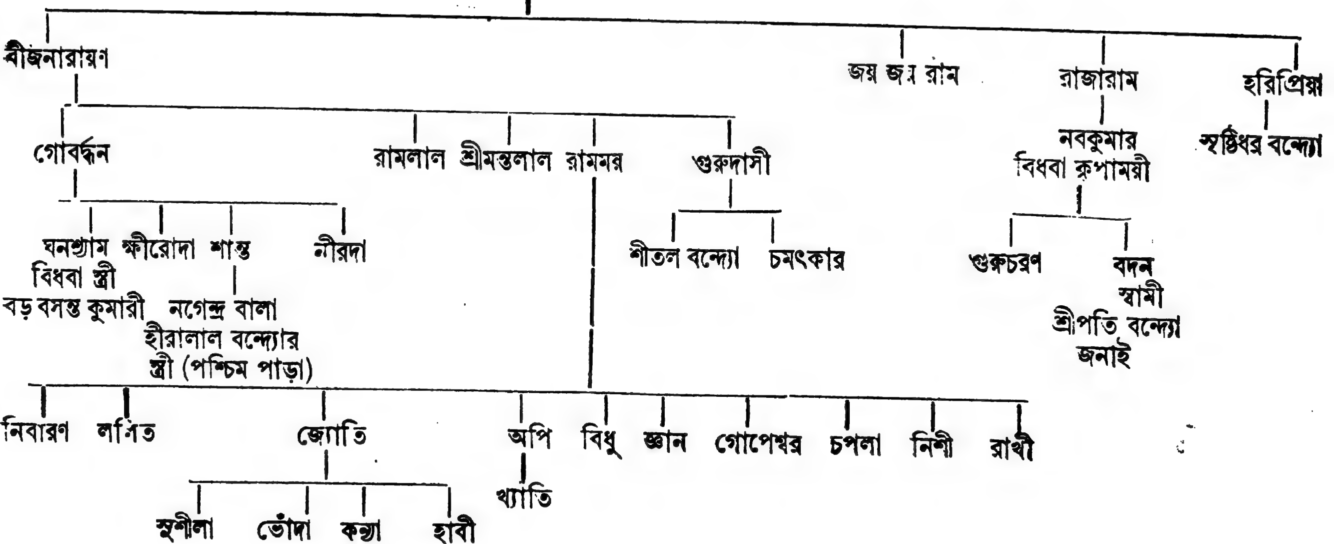
যাহারা জন্মান্তরে পাপ করিয়া আসিয়াছে যাহাদের লক্ষণ স্মৃতি বলিতেছেন—

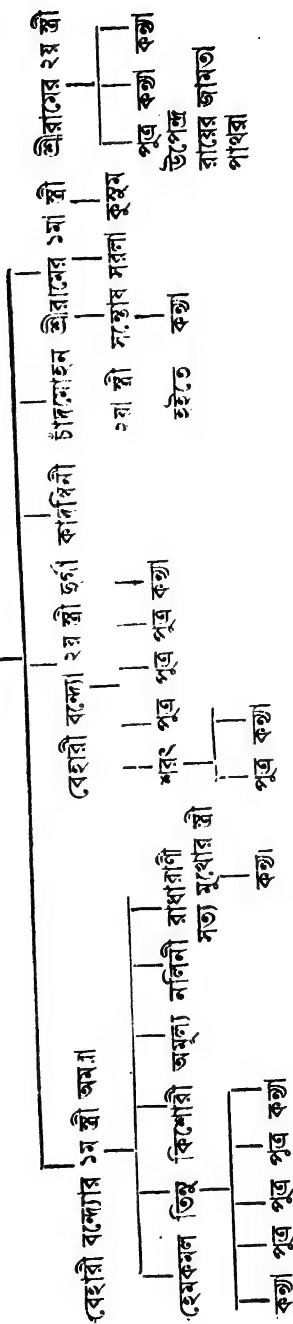
গলৎকুষ্ঠ রোগী ব্রহ্মবধ কারী; শ্যাবদন্ত বিশিষ্ঠ ব্যক্তি মদ্যপায়ী; পঙ্গু অন্ধ গুরুতল্পগামী; সোণা চোর, দদ্রুরোগ গ্রস্ত ও কুনখী, বস্ত্রচোর, ধবলরোগযুক্ত ভোজ্য-দ্রব্য-হারীর- অজীর্ণ রোগ; দোঠোকা—নাকপচা, কাণভাঙ্গান ব্যক্তি মুখে পচা গন্ধ ইত্যাদি।

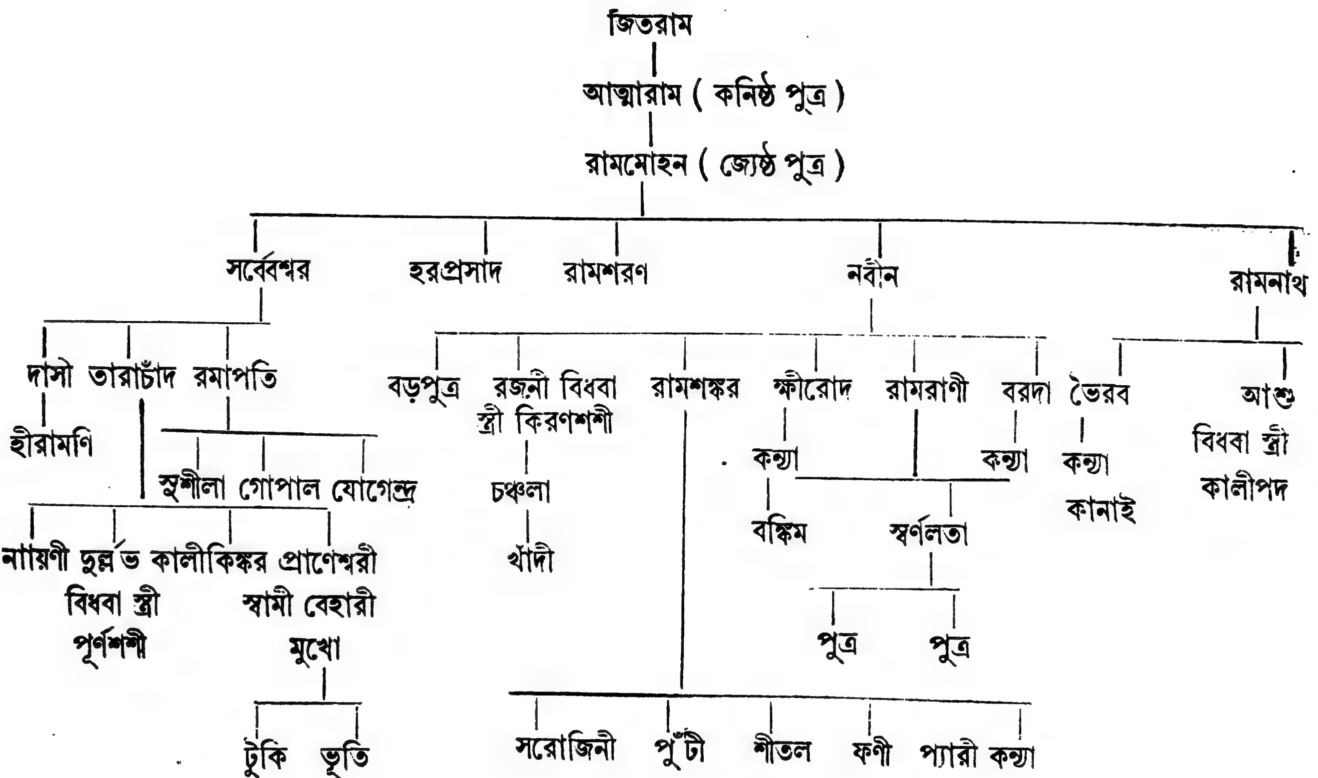
মজুমদার বংশাবলী ।

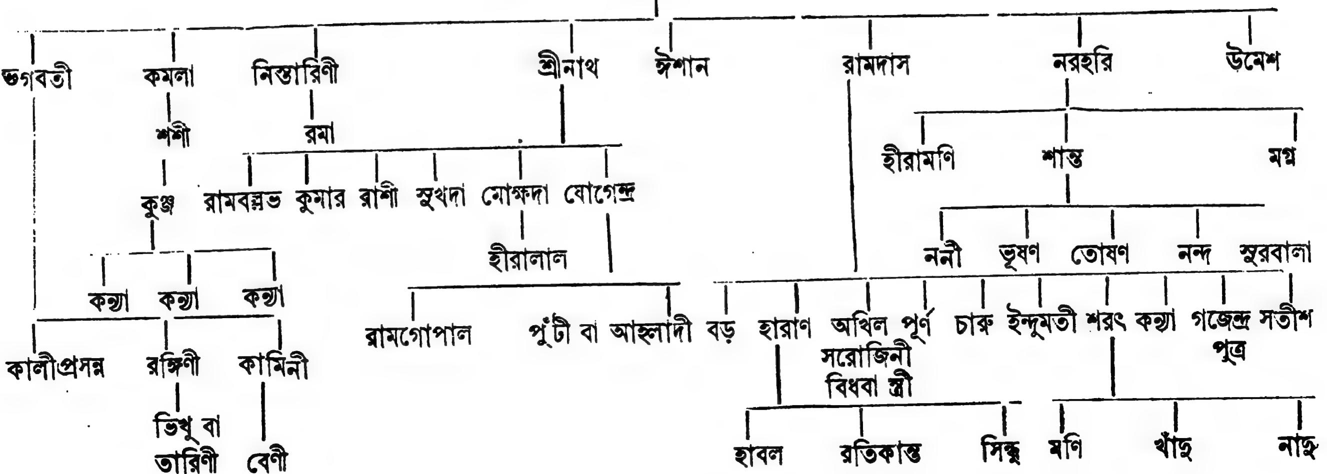
জিতারাম মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র [মেজ]

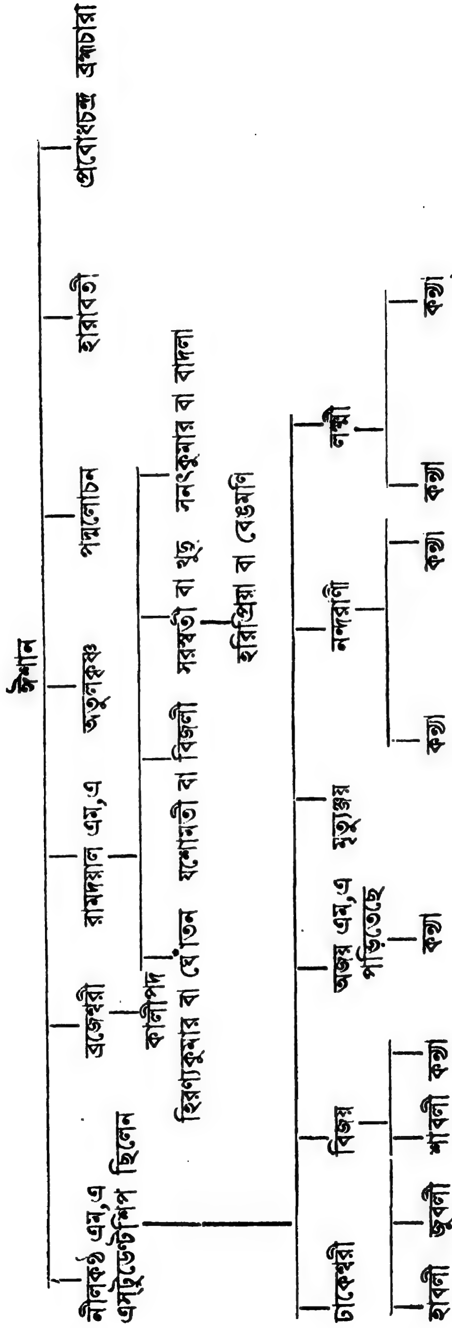
মানিকরাম [বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন আত্মারামের পরামর্শ লইতেন]




সৃষ্টিধর বন্দ্যো
বেহারী বন্দ্যোর ১ম স্ত্রী অমলা
হেমকমল
তিনু
কিশোরী
অমূল্য
নলিনী
রাধারাণী
সত্য মুখোর স্ত্রী
কন্যা
কন্যা পুত্র পুত্র পুত্র কন্যা
বেহারী বন্দ্যো ২য় স্ত্রী দুর্গা
শরৎ পুত্র পুত্র পুত্র কন্যা
পুত্র কন্যা
কাদম্বিনী
চাঁদমোহন
শ্রীরামের ১মা স্ত্রী
২য়া স্ত্রী
হইতে
সন্তোষ
কন্যা
সরলা
কুসুম
শ্রীরামের ২য় স্ত্রী
পুত্র কন্যা কন্যা
উপেন্দ্র
রায়ের জামতা
পাথরা


জিতরাম
আত্মারাম (কনিষ্ঠ পুত্র)
রামমোহন (জ্যেষ্ঠ পুত্র)
সর্ব্বেশ্বর
হরপ্রসাদ
রামশরণ
নবীন
রামনাথ
দাসী
তারাচাঁদ
রমাপতি
হীরামণি
সুশীলা
গোপাল
যোগেন্দ্র
নায়ণী
দুর্ল্লভ
কালীকিঙ্কর
প্রাণেশ্বরী
বিধবা স্ত্রী
পূর্ণশশী
স্বামী বেহারী
মুখো
টুকি
ভূতি
বড়পুত্র
রজনী বিধবা
স্ত্রী কিরণশশী
চঞ্চলা
খাঁদী
রামশঙ্কর
সরোজিনী
পুঁটী
শীতল
ফণী
প্যারী
কন্যা
ক্ষীরোদ
কন্যা
বঙ্কিম
রামরাণী
স্বর্ণলতা
পুত্র
পুত্র
বরদা
কন্যা
ভৈরব
কন্যা
কানাই
আশু
বিধবা স্ত্রী
কালীপদ


জিতরামের (কনিষ্ঠ পুত্র)
আত্মারাম
আত্মারামের (কনিষ্ঠ পুত্র) ভজরাম
ভগবতী
কমলা
নিস্তারিণী
শ্রীনাথ
ঈশান
রামদাস
নরহরি
উমেশ
শশী
রমা
হীরামণি
শান্ত
মগ্ন
কুঞ্জ
রামবল্লভ
কুমার
রাশী
সুখদা
মোক্ষদা
যোগেন্দ্র
হীরালাল
ননী
ভূষণ
তোষণ
নন্দ
সুরবালা
কন্যা
কন্যা
কন্যা
রামগোপাল
পুঁটী বা আহ্লাদী
বড়
হারাণ
অখিল
পূর্ণ
চারু
ইন্দুমতী
শরৎ
কন্যা
গজেন্দ্র
সতীশ
পুত্র
সরোজিনী
বিধবা স্ত্রী
কালীপ্রসন্ন
রঙ্গিণী
কামিনী
ভিখু বা
তারিণী
বেণী
হাবল
রতিকান্ত
সিন্ধু
মণি
খাঁদু
নাদু


ঈশান
নীলকণ্ঠ এম,এ
এস্‌টুডেণ্টশিপ ছিলেন
ব্রজেশ্বরী
রামদয়াল এম,এ
অতুলকৃষ্ণ
পদ্মলোচন
হারাবতী
প্রবোধচন্দ্র ব্রহ্মচারা
কালীপদ
হিরণ্যকুমার বা ঘোঁতন
যশোমতী বা বিজলী
সরস্বতী বা খুড়
সনৎকুমার বা বাদলা
হরিপ্রিয়া বা বেঙমণি
ঢাকেশ্বরী
বিজয়
অজয় এম,এ
পড়িতেছে
মৃত্যুঞ্জয়
নন্দরাণী
লক্ষ্মী
হাবলী
জুবলী
শাবলী
কন্যা
কন্যা
কন্যা
কন্যা
কন্যা
কন্যা

"অতএ তোহারি বিশোয়াসা।"

মৃত্যুভয়? প্রায় শোনা যায় মৃত্যুভয় লোকে করে না। এমন কি যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহাদের শরীর সুস্থ যতদিন থাকে ততদিন মৃত্যুচিন্তা তাহাদিগকে একবারও কাতর করে না।

আর যখন রোগে ধরে? শুনিয়াছি তখন মরিবার ভয় আইসে।

পশু পক্ষী প্রভৃতি জন্তু যখন আহারাদি কর্ম্ম লইয়া মাতিয়া থাকে, আর বালক, যুবক, অজ্ঞানী সুস্থ বৃদ্ধ যখন কর্ম্মবাসনা লইয়া মত্ত থাকে তখন মৃত্যুকে ভয় করে না সত্য। কিন্তু পাখী সর্প দেখিলে ভয়ে চীৎকার করে, সকলে ভূত দেখিলে ভীত হয় পাছে ভূত মারিয়া ফেলে। রোগে ছুঁইলে মানুষ ভয় পায় পাছে বা মরিয়া যায়। মৃত্যুভয় সকলেরই আছে।

মৃত্যুর ভয় জীবের কেন হয়?

মৃত্যু যন্ত্রণা বড় বিষম যন্ত্রণা। অনেকবার মরিয়াছে, অনেকবার দারুণ যাতনা ভোগ করিয়াছে, তাই জীব মৃত্যুর আভাস পাইলে বড় ভীত হয়। যাহা চিত্তে বাস করে তাহাই বাসনা। চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ। যাহাতে প্রাণ বড় আকুল হয় তাহারই সংস্কার চিত্তে গুরুতর ভাবে থাকিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাকুল করিবার বস্তু মৃত্যু। এই জন্য শত ভুলিয়া থাকিলেও সর্ব্ব জীবের বাসনায় মৃত্যুভয়ের প্রবল সংস্কার থাকেই। মৃত্যুতে যদি যাতনা না থাকিত তবে মৃত্যুতে ভয় কেন হইবে? বেশ ত হাসিতে হাসিতে দেহ ছাড়িয়া ধারণাভ্যাসের দেশে চলিয়া যাইব। তাহাতে ভয় কি? কিন্তু ধারণাভ্যাস যাহার নাই সে মৃত্যুকালে কোথায় যাইবে তাহারও ঠিক নাই। বিশেষতঃ সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার মৃত্যু বিভীষিকা ত আছেই।

সবই ত বুঝিলাম। কিন্তু মৃত্যুভয় হইতে অব্যাহতি কি আছে? নিশ্চয়ই আছে জ্ঞানীর মৃত্যুভয় আদৌ নাই। জ্ঞানী জানেন যে, যার জন্মই নাই তার আবার মৃত্যু-ভয় কি? ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। কোন জীব চৈতন্য জন্মে নাই, কাজেই কোন চৈতন্যের মৃত্যুও নাই। মৃত্যুভয়টা বা মৃত্যুটা যাহা হয় সেটা আরোপ মাত্র। যাহা আছে তাহা চিরদিনই আছে। তাহার উপরে একটা মিথ্যা কোন কিছু যেন ভাসে। সেই মিথ্যা যেটা ভাসে, সেটা সত্য সত্যই নাই। তবুও যেন আছে মত বোধ হয়। ক্রমে সেই ভ্রম বোধটা এত প্রবল হইয়া যায় যে, আদত বস্তুকে ঢাকিয়া রাখিয়া মিথ্যাটাই সত্যের স্থান অধিকার করে। যেমন রজ্জুতে যে

সর্প ভ্রমটা ভাসে সেটা আদৌ নাই, সেইরূপ নিত্য চৈতন্যের উপর দেহ ভ্রম, জগৎ ভ্রম, চিত্ত ভ্রম, এই সব জাগিয়া চৈতন্যকে একবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ভ্রমটাই পুনঃ পুনঃ মরে।

কি বলিতে চাও ?

বলিতে চাই তত্ত্বটি যাহা, আত্মাটি যাহা, চেতনাটি যাহা তাহা ভাল করিয়া ধর। ধরিয়া অভ্যাস কর, তুমি দেহ নও, তুমি মন নও, তোমার সম্মুখে যে জগৎটা দেখা যাইতেছে সেটা ব্রহ্মরজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত ভাসিয়াছে মাত্র—ব্রহ্মই বিবর্ত্তিত হইয়া জগৎ রূপে ভাসিয়াছেন এই সত্য জ্ঞানটি বেশ করিয়া বুঝিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। যতদিন না সর্ব্বদা ইহা মনে থাকিতেছে ততদিন ইহার পুনঃ পুনঃ আলো- চনা করা চাই।

তার পর আরও কতক গুলি নিতান্ত আবশ্যকীয় অভ্যাস করিবার কৌশল বলা যাইতেছে—এই গুলি লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা কর মৃত্যুভয় ইত্যাদি কিছুই থাকিবেনা। সর্ব্বদা পরম সন্তোষের ভাবে থাকিবে।

কি ? বল !

যে চৈতন্য বা চিৎ বা জ্ঞান সর্ব্বদা পরিপূর্ণভাবে আছেন তাঁহারই নাম তোমার ইষ্টমন্ত্র। তিনিই তোমার ইষ্টদেবতা। তিনিই তোমার গুরু।

যত দিন অন্য কিছু দেখিতেছ ততদিন ইহা জানিও যে সেই মূলের বস্তুটির উপরেই অন্য মিথ্যা নামরূপ জড়িত কোন কিছু ভাসিয়াছে। মিথ্যারও যে অস্তিত্ব তাহা সেই মূলের সত্যটি আছেন বলিয়া। মূল সত্যটি অধিষ্ঠান চৈতন্য। সেইটিই বস্তু আর সমস্ত অবস্তু। উপাসনা ইঁহারই হয়। নামরূপ ইঁহারই।

যাহা করিতে হইবে শ্রবণ কর।

(১) সর্ব্বদা নাম কর। আর নামটি যে সব সাজিয়াছে তাহাও নিত্য অভ্যাস কর।

(২) মূর্ত্তি যাহা যেখানে দেখ তাহা সেই চেতন বস্তুর নাম রূপ যে ইষ্টমন্ত্র বা ইষ্টদেবতা বা গুরু তাহাই। লোক সঙ্গে যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ নাম করিবে আর সকল জীবই তোমার ইষ্ট নাম ইহা মনে করিবে।

(৩) নামীর লীলা চিন্তা কর। এ চিন্তা হইবে চিত্তাকাশে। লীলা হয় সূক্ষ্ম জগতে। স্থূলে নহে। প্রত্যহ সঙ্কল্প কর যেন চিত্তাকাশে ধারণাভ্যাসের স্থানে লীলা দেখিতেছ। ধারণাভ্যাসের স্থানটি বিশেষরূপে প্রত্যহ সঙ্কল্পে আনিতে হইবে।

(৪) ধারণাভ্যাসী হইয়া শেষে বিচারবান হও। জপ ধ্যান ইত্যাদি যাহা কিছু সমস্তই করে প্রকৃতি। আর পুরুষ কিছুই করেন না তিনি প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র। তুমি পুরুষে অভিমান কর, করিয়া দ্রষ্টা ভাবে থাক। আর দেখ প্রকৃতির এক অংশ—নিবৃত্তি অংশ প্রকৃতির অপর অংশ অর্থাৎ প্রবৃত্তি অংশকে কর্ম্ম করাইতেছে।

এই ভাবে তোমার মধ্যে কর্ম্ম চলিলেও তুমি কিন্তু অহং অভিমান বর্জ্জিত হইয়া রহিলে। কর্ম্ম যা হয় হউক তাতে তোমার কি? যে কর্ম্ম করে ফলাফল, লাভ—অলাভ, সুখ দুঃখ তার। কর্ম্মে তোমার অভিমান যখন না থাকে তখন সুখ দুঃখটাও তোমার অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া যাইবে। তখন মৃত্যুভয় একেবারে যাইবে।

কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান এই তিনের কথা বলা হইল। কর্ম্মটা চিত্তশুদ্ধি জন্য। ভক্তিটি চিত্তাকাশে লীলায় একাগ্রতা জন্য। জ্ঞানটি এই জীবনেই মুক্ত হইবার জন্য।

ভক্তিতে কি মৃত্যুভয় যায় না?

যাইবেনা কেন? ভক্তিতে শ্রীভগবান্ তোমার হাতে ধরিয়া মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ করাইয়া দেন।

"নহি কল্যাণ কৃত কশ্চিৎ বিনাশং তাত গচ্ছতি।"

"নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"

এই গুলি ভারি আশ্বাসের উক্তি!

যাহা করিতে বলিতেছ তাহা আবার একবার অতি সংক্ষেপে বলিব?

বল।

সর্ব্বদা নাম কর।

যাহা কিছু দেখ বা শুন বা ভাব সকলকেই বা সকলটাতেই নামী ভাবনা কর। সর্ব্বত্র নামী দেখিয়া, নামী ভাবিয়া, নামী স্মরিয়া রাগ দ্বেষ দূর কর। এই যে তুমি কাহার উপর বিরক্ত হইব? এই যে তুমি কাহার উপর রাগ করিব? এই যে তুমি কাহাকে ঘৃণা করিব? এই যে তুমি কাহাকে অবজ্ঞা করিব? এই যে তুমি কাহাকে ভয় করিব? এ যে তুমিই করিতেছ কোথায় পলাইব? এই ভাবে লোক সঙ্গে সর্ব্বত্র নামী চৈতন্যের স্মরণে স্মরণে যদি রাগ, দ্বেষ, ভয়, ভাবনা, ঘৃণা, অবজ্ঞা, অথবা ইন্দ্রিয় আসক্তি ইন্দ্রিয় বিলাসাদি কামের কার্য্য ত্যাগ করিতে পার তবে

তুমি তু তু করতে তু ভয়া হইয়া যাইবে। শেষে সে মনকেও বলিবে এই যে সে। লয় বিক্ষেপকেও বলিবে এরাও সে। তখন ক্যা স্ফূর্ত্তি।

যখন নির্জ্জন পাইবে তখন নামীর লীলা চিন্তা কর। জ্যোতির ভিতরে জ্যোতির পদ্মে উলট জলে ভাসিয়া চলিয়াছ। শেষে সেই দেশ, সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্য ভরা স্থান, সেই বৃক্ষ, সেই মণ্ডপ। তুমি একা। যেমন যেমন ভাবিতেছ তেমনি ভাবে সে আসিতেছে। কত সুখ। কেউ নাই সব আছে। একা আবার সে সঙ্গে। কখন মিলন কখন বিরহ। কখন সাক্ষাতে পূজা, কখন মানসে। কখন বলা সে যেখান দিয়া হাঁটে সেখানটা কেন আমার হৃদয় হইয়া যায় না, সে যে দর্পণে মুখ দেখে তা কেন আমার অঙ্গজ্যোতি হয় না, সে যে সরোবরে স্নান করে তা কেন জলরূপী আমি হইয়া যাই না—এই রকম কত কি।

নাম করা, লোক সঙ্গে নামী ভাবনা করা, নির্জ্জনে নামী সঙ্গে কথা কওয়া, কখন মিলনে হাসা, কষ্টি নষ্টি করা, কখন বিরহে একটু জ্বালা একটু পোড়া। এই সবে যখন নাম নামী দিয়া হৃদয় ভরিয়া যায় তখন বিচারবান বা বিচারবতী হওয়া—যা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। ইতি—১৫।৬।১৩২১।

সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুদুদ্দসং সুনিপুণং যথকামনিপাতিনং।
চিত্তং রক্খেথ মেধাবী, চিত্তং গুত্তং সুখাবহম্॥

[দুর্ব্বোধ্য, ধূর্ত্ত এবং ইচ্ছাক্রমে যথা তথা ভ্রমণশীল, মনোবৃত্তির প্রতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কারণ সুরক্ষিত চিত্তই সুখাবহ।]

শ্রীভগবান বুদ্ধদেবোক্ত ধর্ম্মপদ, চিত্তবগ্গো

নিয়ম।

ক—নিয়ম বলিলে কি বুঝায়? এবং তদাচরণে কি ফল হয়?

জো—ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন—

"শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটী সাধনের সমষ্টির নাম নিয়ম এবং এতদাচরণে চিত্তশুদ্ধি ও শান্তি লাভ হয়।

ক—কিরূপে এই সাধন পাঁচটী আয়ত্ব হইয়া যায়?

জ্যে—প্রথমে শৌচ সাধনের বিষয় বলিতেছি। শৌচং—মৃজ্জলাদি জনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদিচ বাহ্যং, আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্"। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা মার্জ্জন করিয়া এবং পবিত্র বস্তু আহার করিয়া বাহ্যশুচিত্ব নিষ্পন্ন করিতে হয়, পরে সাধুর সহিত মিত্রতা, দুঃখীর প্রতি করুণা ও সহানুভূতি প্রকাশ, সুখীর সুখ দেখিলে হর্ষ প্রকাশ ও পাপীর পাপ দেখিয়া তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া মনের ময়লা কাটাইতে হয়। অর্থাৎ শৌচ সাধনে অন্তর্ব্বহিঃ উভয়ে বিশুদ্ধি লাভ হয়।

ক—মনের ময়লা কাটাইতে পারিলেই তো চিত্তশুদ্ধি ঘটে। তবে আবার বহিঃশুদ্ধির প্রয়োজন কি?

জ্যে—গোড়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছ? আমি যে তোমায় বলিয়াছি জগতে সুখ দুঃখ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই—উহা আমাদের ভ্রমময় ধারণা মাত্র। যতদিন এই ভ্রমের মল আমাদের জ্ঞানটুকুকে ঢাকিয়া রাখিবে ততদিন আমরা সুখ দুঃখের মধ্যে নাকানি চোবানি খাইবই। যদি কোনও দিন এই ভ্রম ধারণা বা অজ্ঞান মল পরিষ্কার হয় তখন বুঝিব জগতের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নাই—আমি নিত্য নির্লিপ্ত আনন্দ স্বরূপ। এই যে নিজেকে নিত্য নির্লিপ্ত আনন্দ স্বরূপ বলিয়া দৃঢ় ধারণা করা—ইহাই আত্মদর্শন। আত্মশুদ্ধি ভিন্ন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ আবরণকারী মলের অপসারণ ব্যতীত আত্মদর্শন কি সম্ভব?

ক—না, তাহা সম্ভব হইবে কিরূপে?

জ্যে—এখন 'আত্মা' শব্দটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর। অভিধানে লেখা আছে—"আত্মা—দেহে, ধৃতৌ, জীবে, স্বভাবে, পরমাত্মনি।" অর্থাৎ আত্মা বলিলে দেহ বুঝায়, ধারণাশক্তি বুঝায়, জীবভাব বুঝায়, স্বভাব বা প্রকৃতি বুঝায় এবং সর্ব্বাধার ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বুঝায়। শাস্ত্র বলেন, পুরুষ আপন সংকল্প ফলে অন্ন—প্রাণ—মন—বিজ্ঞান—আনন্দ এই পঞ্চকোষময় দেহপুরে অবস্থান করিতেছেন। যখন আমরা এই অন্নময় কোষে আত্ম স্থাপন করি অর্থাৎ দেহটাই আমি বলিয়া বুঝি তখন আত্মা শব্দে দেহই নির্দ্দিষ্ট হয়। যখন

প্রাণময় কোষে আত্মনিবেশ হয় তখন আত্মা অর্থে ধৃতি ইত্যাদি। এই রূপে যখন পরমাত্মায় আত্মনিবেশ হয় তখনই আত্মদর্শন লাভ বা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ঘটে।

বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি আমি উভয়েই দেহাত্মবাদী। এখন যদি কেহ তোমার দেহকে আঘাত করে তবে তুমি লাঠি লইয়া দাঁড়াও, কেহ 'শালা' বলিলে তুমি তাহার বাপান্ত কর। সুতরাং এইরূপ অবস্থা বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আত্মা শব্দের অর্থ দেহ—অন্য কিছু নহে। মুখে অনেকে অনেক বক্তৃতা মারিবে; কিন্তু আসলে সে গণ্ডী পার হওয়া বড় কঠিন। সুতরাং আত্মদর্শন বা পরমাত্মায় আত্মনিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যে কোষে আত্মনিবেশ করিয়াছে তাহাকে সেই কোষের বিশুদ্ধি সম্পাদনার্থ প্রাণপণ করিতেই হইবে। নচেৎ আনন্দ লাভ তাহার ভাগ্যে নাই। তুমি আমি দেহ ও মনকেই বিশেষ ভাবে অনুভব করি, আর প্রাণকে কতক কতক অনুভব করি। অর্থাৎ আমি যে দেহ দ্বারাই কর্ম্ম ও ভোগাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করি, মনের দ্বারাই সর্ব্ব বিষয় অনুভব করি ইহা বুঝিবার জন্য কোনও পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রাণকে শ্বাস প্রশ্বাসের গতির অধিক আর বুঝিতে পারি না। সুতরাং এই অবস্থায় আনন্দ লাভের জন্য আত্মশুদ্ধির অনুষ্ঠান করিতে গেলেই অন্তর্বহিঃ উভয়েই শুচি হইতে হইবে অর্থাৎ মৃজ্জলাদি দ্বারা ও শুভ আহার দ্বারা দেহের পবিত্রতা ও "মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা" সাধন দ্বারা মনের পবিত্রতা ও প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণস্পন্দনের স্বচ্ছন্দতা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। বুঝিলে?

ক—বুঝিলাম। কিন্তু অনেকে দেহশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখাকে শুচিবাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তাঁহারা বলেন মনের লক্ষ্য উচ্চ থাকিলে আহার বিহারের শুচিতার জন্য মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। অনেকে এই মতের পক্ষ সমর্থনের জন্য বলেন "মন চাঙ্গা, তো কটোরা মে গঙ্গা"।

জ্যে—যাহারা এইরূপ বলে তাহারা মূঢ় তার্কিক। তাহারা কোন দিনও শাস্ত্রাজ্ঞা অবহেলা করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করিবে না। সুতরাং সে সকল ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দাও। তবে তোমার সন্দেহ নাশের জন্য এই পর্য্যন্ত বলি "আচারহীনং ন পুনন্তি-বেদাঃ" সদাচারহীন বা শৌচাচার হীন ব্যক্তি পুঁথি পড়া বৈদিক জ্ঞান দ্বারা পবিত্র হইতে পারে না। পুস্তকাদি পড়িয়া শৌচাচার হীন যে জ্ঞান তাহা বাচিক জ্ঞান মাত্র। তাহাতে সভায় বক্তৃতা করিয়া বা বড় পুঁথি লিখিয়া প্রশংসা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না। নিমন্ত্রণ খাওয়ার স্বপ্ন দেখিলে মুখের লালে বালিশ ভিজিয়া যায় বটে, কিন্তু পেট ভরে না। এ

বিষয়ের অন্যান্য বিশেষ কথা প্রাণায়াম আলোচনা কালে যথাসাধ্য বলিব। আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে ?

ক—শৌচ সাধনের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন ?

জ্যে—শাস্ত্রে বলেন এই শৌচসাধনের ফলে—

"সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ" ভবতীতি ॥

উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শৌচসাধনের ফলে প্রথমে দেহ বা অন্নময় কোষ নির্ম্মল হয়—দেহ নির্ম্মানকারী কীটাণুগুলি শুভ ভাবাপন্ন হয়। তদ্দ্বারা "সৌমনস্য" মনের পবিত্রতা উৎপন্ন হয়, মন প্রসন্ন হইলে একাগ্রতা জন্মে। মনের স্থিরতারূপ একাগ্রতা সাধিত হইলে ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয় এবং এইরূপে জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ হইলে আত্মদর্শন বা আনন্দলাভের যোগ্যতা জন্মে। সুতরাং আচার হীন ব্যক্তির আত্মজ্ঞান লাভের কথা দূরে থাকুক, তাহার যথার্থভাবে Morally pure হওয়ারও কোনও সম্ভাবনা নাই।

ক—আহারে, ব্যবহারে শুচি হইলে যে বাস্তবিকই যথেষ্ট উপকার লাভ করা যায় তাহাতে জানিতে পারিয়া আজ বড় আনন্দ হইল। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র যেরূপ হইয়াছে তাহতে এত সুন্দর জিনিষ একেবারে বিনাশের মুখে গিয়া পড়িয়াছে।

জ্যে—তাই মানুষের দুঃখও এত বাড়িয়াছে।

ক—যাক্ সে কথা। এখন বল দেখি, সন্তোষ লাভ করা যায় কিরূপে ? অসন্তোষের আগুনে ত সকলেই জ্বলিয়া মরিতেছে।

জ্যে—তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভাবের বোধই দুঃখের হেতু। এই অভাববোধ দূর করিতে পারিলেই সন্তোষের অধিকারী হওয়া যায়। যথাপ্রাপ্ত আহারে যিনি তৃপ্তিলাভ করেন, যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম যিনি শুধু কর্ত্তব্য হিসাবে করিয়া যান তিনিই যথার্থ সন্তোষের অধিকারী। শ্রীভগবানে বিশ্বাস থাকিলে, তাঁহার বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিলে, দেহাত্মপ্রীতির জন্য কামনা ত্যাগ করিতে পারিলে এবং তাহার ফলে প্রসন্ন মনে কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে পারিলে সন্তোষ লাভ হইবেই।

ক—আমাদের মত হতভাগ্যের এ ভাব আসিবে কিরূপে ?

জ্যে—সে জন্য চেষ্টা বা তপস্যা চাই।

ক—তপস্যা বলিতে কি বুঝায় ? চেষ্টা মাত্রই কি তপস্যা ?

জ্যে।—না "তপঃ দ্বন্দ্ব সহনম্"। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত আতপ, নিন্দা স্তুতি, হর্ষ

বিষাদ, মান অপমান প্রভৃতিকে দন্দ্ব বলে। ইহা সহ্য করা যায় যে চেষ্টার ফলে, তাহার নাম তপস্যা। সামান্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া অশেষ ক্লেশ নিবারণের জন্য যে চেষ্টা করা হয়, তাহার নাম তপস্যা। এক কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, স্বস্থ হইবার জন্য চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তি সকলের যথোপযুক্ত স্ফুরণের জন্য অধ্যবসায় সহকারে যে বিশেষ চেষ্টা করা হয় তাহার নাম তপস্যা।

ক—জলে পড়িয়া শুধু হাত পা ছুড়িলেই যেমন সাঁতার দেওয়া হয় না, তাহার জন্য যেমন একটা পদ্ধতি অনুসারে হস্ত পদাদির সঞ্চালন আবশ্যক তেমনি এই তপস্যারূপ সন্তরণ-বিদ্যার পদ্ধতি অবগত হইব কিরূপে ?

জ্যে—শাস্ত্রানুশীলনে বা গুরুমুখে। এই শাস্ত্রানুশীলন বা ইষ্টমন্ত্র জপান্তর গুরুবাক্য বোধের চেষ্টার নামই স্বাধ্যায়।

"স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রানামধ্যয়নং প্রণবজপো বা।"

ক—মোক্ষশাস্ত্র বলিলে কি বুঝিব ?

জ্যে—জ্ঞান না হইলে সুখ দুঃখের হাত এড়াইবার উপায় নাই আবার জ্ঞানীর নিকট ভিন্ন জ্ঞানোপদেশ পাওয়ার ও সম্ভাবনা নাই। আমাদের শাস্ত্রসমূহ পরম জ্ঞানী আর্য্য মহর্ষিগণের জ্ঞানরত্নে সমলঙ্কৃত। সুতরাং সেই পূজ্যপাদ মহাপুরুষগণের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিতে যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে তবে তাহাকে শাস্ত্রাধ্যায়ন করিতেই হইবে। কেন না, এই শাস্ত্রানুশীলন করা ও মহর্ষিগণের সঙ্গ লাভ করা একই কথা। এইরূপে আহৃত জ্ঞান উপযুক্ত কর্ম্ম সহযোগে যখন পরিপক্ক ও সুদৃঢ় হয় তখন শ্রীভগবানকে সর্ব্বত্রই অনুভব করা যায় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে তাঁহাতেই অবস্থিত তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়, মুক্তি করতলগত হইয়া পড়ে। যে শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলে এই মুক্তিপ্রদ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহার নাম মোক্ষশাস্ত্র।

ক—বুঝিলাম না।

জ্যে—এই যে জগৎ দেখিতেছ, তাহাতে কোন্ কোন্ বস্তুর বর্ত্তমানতা উপলব্ধি কর ?

ক—তিনটী বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। (১) কতকগুলি ভূত, (২) আমি, (৩) সকলের নিয়ন্তা এক সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ বা শ্রীভগবান্।

জ্যে—এখন বল দেখি, এই তিনের বিষয় যদি না জানা যায় তবে কি দুঃখের অবসান হইতে পারে, মুক্তি সম্ভব ?

ক—না।

জ্যে—তাহা হইলে ভূত সকলকে জানিতে হইলে বহির্ব্বিজ্ঞান বা গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ণ, শারীর-তত্ত্ব-বিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে হইবে। 'আমি' ধারণাকারী মন বা চিত্তকে জানিতে হইলে সমাজ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। আর তারপর শ্রীভগবান্‌কে জানিতে হইলে পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইবে। তবেই হইল ভূত, জীব ও ভগবান এই তিনটীর প্রকৃত সংবাদ লাভ করিতে হইলে বহির্ব্বিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানদ্যোতক সমস্ত শাস্ত্রই মোক্ষশাস্ত্র—তবে ইহার মধ্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকেই বিশেষ ভাবে মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়।

ক—নিয়ম সাধনের চারিটী অঙ্গ বুঝিলাম। বাকী রহিল ঈশ্বর প্রণিধান; তাহা কি আজ বলিবে?

জ্যে—ঈশ্বর প্রণিধান যে কি, তাহা আমি নিজেই জানি না, তা' তোমাকে বলিব কি প্রকারে? তবে ঈশ্বর প্রণিধান বুঝিবার আগে গোটাকতক দরকারী কথা বুঝিয়া রাখা আবশ্যক।

ক—কি কথা দাদা?

জ্যে—বহির্ব্বিজ্ঞান, অন্তর্ব্বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিয়া যত রকমের জ্ঞানই অর্জ্জন কর না কেন, মনে রাখিও তাহা ঈশ্বর প্রণিধান জন্য। জ্ঞানের সিদ্ধির নেশায় ভোর হইলে আসল নষ্ট হইয়া যাইবে—পূজার বাসন মাজিয়া চক্‌চকে করিয়া তুলিলেই পূজা শেষ হয় না। জ্ঞানক্ষারে চিত্ত মার্জ্জিত হইলেই আত্ম-দর্শন হয় না। তজ্জন্য উৎকৃষ্ট বিচার চাই, শুশ্রূষা তুষ্ট সদ্‌গুরুর জ্ঞানপূত উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ চাই, আপনার অন্তর্ব্বর্ত্তী পৌরুষরূপী নারায়ণের অর্চ্চনা চাই—ও সর্ব্বোপরি তাঁহার সর্ব্বশিবপ্রদ জগন্মঙ্গল শুভ কৃপাদৃষ্টি চাই। নহিলে শুধু একটা অতি তুচ্ছ জ্ঞানের কণা কুড়াইয়া যে ব্যক্তি নেশার ঘোরে আপনার গর্ব্বের পতাকা উড়াইতে চায় সে শাস্ত্রবাহী গর্দ্দভ। বহন ক্লেশ ও চালকের কষাঘাত ভিন্ন সে আর বিশেষ কিছুই লাভ করে না। তাই বলিতেছিলাম যত জ্ঞানই অর্জ্জন কর না কেন—তাহা তোমার অহঙ্কারের জয়ধ্বজা উড়াইবার জন্য নহে; তাহা সেই দুর্দ্দম অহঙ্কারের গর্ব্বোন্নত পতাকাকে সেই পরম মঙ্গলাস্পদ জ্ঞানময়ের শ্রীচরণপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত করিবার জন্য;

তোমার যথা সর্ব্বস্ব বলিতে যাহা আছে—তাহা সেই "বিজ্ঞানময়ানন্দং ব্রহ্ম" পদে চিরতরে মিশাইবার জন্য। জানি না অন্যের মত কি?

ক—আমি যেন ক্রমে মুগ্ধ হইতেছি। স্বাধ্যায় যেন তপস্যার একটা খুব বড় অংশ হইয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে স্বাধ্যায় না হইলে উত্তর তপস্যায় বল পাওয়া যাইবে না।

জ্য—ঠিক তাই। কৌমারে স্বাধ্যায় সাধনই প্রথম তপস্যা—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।" শুধু শাস্ত্র পাঠ করিলেই হইবে না, তাহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। এই যে শাস্ত্রের বা উপদেশের ভাবটাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা—ইহাই তপস্যা। যে আত্মোন্নতি প্রার্থনা করে তাহাকে সেই সংকল্পের প্রথম হইতে শাস্ত্রমূর্ত্তি হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হয়; সহস্র বাধা বিঘ্ন, শত প্রলোভন জয় করিয়া দ্বন্দ্বসহিষ্ণু বা তপঃ পরায়ণ হইতে হয়। নতুবা তাহার অধীত বিদ্যা তাহার মস্তিষ্কের ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমশঃ।

সুলভে ধর্ম্ম পুস্তক।

কত কথা উপকথার বই, কত নভেল নাটক, কত চরিত্র অচরিত্রের পুস্তক, কত সুন্দর বাঁধা, সুন্দর ছাপা, পুস্তক লোকে আদর করিয়া আগ্রহ করিয়া কত দাম দিয়া কিনে কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তক তাহারা সস্তা না হইলে কখনই কিনিবে না। সখ করিবার যেন সময় বহিয়া যাইতেছে কিন্তু ধর্ম্ম করিবার সময় তাহারা অফুরন্ত মনে করে। মুখেও বলে ধর্ম্ম করবার সময় অনেক আছে এই বেলা সখগুলা মিটাইয়া লইয়া যাউক কিন্তু ভাই বড়ই ভুল বুঝিতেছ সখ কি মিটিবার—

মনোরথানাম্ ন সমাপ্তিরস্তি।
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দ লক্ষৈঃ॥

ভাই তোমার কতটুকু জীবন তা মনে ভাবিলে না কর্ত্তব্যটাকে ঠেলিয়া এক ধারে ফেলিয়া রাখিয়া অকার্য্যে মাতিয়া গেলে তাও শেষ করিতে পারিলে না, তোমার একুল ওকুল দুকুল গেল!

তুমি যে ধর্ম্ম করিতে বাধ্য তোমাকে সজ্ঞানে অজ্ঞানে ধর্ম্ম পালন করিতেই হইবে, তোমার জীবনই যে ধর্ম্ম পালনার্থ। তোমার শরীরের ধর্ম্ম আছে, তোমার

ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম আছে, তোমার মনের ধর্ম্ম আছে—তুমি যে ধর্ম্ম ছাড়া এক পাও চলিতে পার না; তুমি ধর্ম্ম পথ ছাড়িয়া একটু বাঁকা রাস্তায় গেলে তাড়না ভর্ৎসনা সহ্য কর, কত যন্ত্রনা ভোগ কর ও আবার কাঁদিয়া কাতর হইয়া কত আক্ষেপ করিতে করিতে সোজা রাস্তায় আসিয়া হাজির হও কিন্তু বাঁকা পথে চলিবার ইচ্ছাটা তোমার বড় প্রবল। সেইখানে তুমি মনে কর তুমি স্বাধীন। এটা কিন্তু মস্ত ভুল। তুমি চির-কালই ধর্ম্মের অধীন; ধর্ম্মের অধীনেই তোমার সত্বার পূর্ণ বিকাশ।

আমরা বিকৃত ইচ্ছা লইয়া ঘরকন্না করি বলে ধর্ম্মের যাহা কিছু তাহা একটু সুবিধামত না পাইলে লই না। ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি সহজ বোধ্য ভাষায়, সুবিধা দরে না পাইলে কেহ লইবে না কারণ ধর্ম্মের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করে কে? যথার্থ কথা বলিতে গেলে ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি সুলভে সাধারণে প্রচার হওয়া উচিত। সাধারণের মতিগতি ফিরাইতে হইলে, সাধারণের মন তৈয়ারি করিয়া লইতে হইলে ধর্ম্ম-পুস্তক-গুলির সুলভে বহুল প্রচার আবশ্যক। কারণ "গো-রস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকায়"। রাজ সহায়তা ভিন্ন এ কার্য্য সু-সংসাধিত হওয়া কঠিন। আজ কাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইতেছে আবার সেই পুস্তকগুলি প্রকাশার্থ পরের নিকট অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘৃণ্য দাস্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। পরাধীনের তপস্যা হয় না। তপস্যা না থাকিলে শাস্ত্র চর্চ্চা হয় না। কর্ম্মহীন জ্ঞান শিমুল ফুলের ন্যায় গন্ধহীন বর্ণ ছটা মাত্র। তাই যাঁহারা সদা তপস্যা নিরত নহেন তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন না। অনেক মনস্বী আজকাল জড়বিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞান সামাঞ্জস্য করিয়া জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেছেন তাহাতে ভাষার ছটা আছে, গবেষণার পরিচয় আছে কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে আসল বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মের প্রচার হইতেছে, সুলভে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ তাহার নিদর্শন। অনেকে শাস্ত্রের ইচ্ছামত অর্থ করিয়া লইয়া সাম্প্রদায়িকতায় সৃষ্টি করিতেছেন তাহার ফলে সমাজে বিষম বিপদ উপস্থিত হইতেছে। এ বিষম বিপদে কে রক্ষা করিবে? এ ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনে কয় জন স্বধর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণের প্রকৃত শাস্ত্র তত্ত্বানুশীলনে যথার্থ অবসর আছে? প্রকৃত শাস্ত্র তত্ত্ব প্রকাশে কাহার বিপুল অর্থ আছে? বেদ বিক্রয় শাস্ত্র নিষিদ্ধ কিন্তু বেদ বিক্রয় না করিয়া উপায়ন্তর কি? কে এই দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিবেন!

লীলা উপন্যাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লালার দুঃখ।

শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে যখন লালাস্থান দর্শন করিতেন তখন লীলাস্থানগুলি তাঁহাকে কাতর করিত। একদিন মাধবী কত সুখ-দর্শন ছিল। আর আজ এই বিরহকালে? শ্রীমতী বলিতেছেন—

এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সতত ধেয়ায়।

আমাদের শ্রীমতীও এরূপ অভিনয় করিয়াছেন কি না তাহা মূলে নাই। কিন্তু

আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস পরিপাটীর কারণে॥

শ্রীমতী লীলার ইহা ঘটিয়াছিল। যাহার সৌভাগ্য থাকে তাহারই ঘটে।

আর লীলার সৌভাগ্য? এ সৌভাগ্যের ত শেষ ছিল না। লীলা রাজার আদরে আদরিণী হইয়াই সৌভাগ্যবতী। স্বামীর আদরে আদরিণী হইয়াই লীলা বিলাসিনী।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেখানে যাহা জানা ছিল রাজা ভূতলচারিণী এই অপ্সরার সহিত তাহাই জড়িত করিয়াছিলেন। লীলার অকৃত্রিম প্রেমরসে সাদ্রচিত্ত হইয়া সকল সুন্দর স্থানে রাজা লীলাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। কখন উদ্যান বন গুল্মে, কখন তমাল বনে, কখন রমণীয় পুষ্পমণ্ডপে, কখন লতাগৃহে, কখন বসন্তোদ্যান দোলায়, কখন ক্রীড়া পুষ্করিণীতে, কখন চন্দনবৃক্ষশোভিত পর্ব্বতে, কখন

কোকিলকুজিত বসন্তবনরাজিতে, কখন জলধারাবর্ষি নির্ঝরপ্রদেশে, কখন শৈলতটে, কখন মুনির আশ্রমে—রাজা সমস্ত সুখময় স্থানে রাণীকে লইয়া ভ্রমণ করিতেন।

কত পুরাণ প্রসঙ্গ, কত লৌকিক পরিহাস, কত মনোহর শাস্ত্র আখ্যান রাজা রাণী ভোগ করিতেন। কখন হস্তিপৃষ্ঠে, কখন অশ্বারোহণে, কখন জলযানে, কখন বা পাদচারে—যখন যাহা রমণীয় বোধ হইত রাজা রাণীকে লইয়া তাহাই করিতেন।

বলিতেছিলাম রাজ্ঞী লীলা বিলাসিনী কিন্তু সৌভাগ্যবতী। আর তুমি? তুমি কখন স্থায়ীভাবে স্বামীর আদরে আদরিণী হইলে না—তোমার সৌভাগ্যই বা কি, তোমার বিলাসই বা কি? তোমার সৌভাগ্য ত দুই দিনেই ফুরাইয়া গেল। কেন গেল? শাস্ত্রে শুনি বিনা তপস্যায় সৌভাগ্য হয় না। তুমি বুঝি নানা তাড়নায় এক আধদিন তপস্যা করিয়াছিলে, তাই দুদিনেই তোমার স্বামীর আদর গেল? "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" তোমার দুই দিনের পুণ্যসঞ্চয়—দুই দিনের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করাইয়া পুণ্যক্ষয়ে সঞ্চিত পাপরাশি তোমায় আবার দুঃখ সাগরে ফেলিয়া দিল।

স্বামীর আদরই স্ত্রীজনের স্বর্গ। সেটুকু যেমন যায় অমনি স্ত্রীলোকের সংসার নরকতুল্য। স্বামীর অনাদরে শোকতাপের অবধি কোথায়? স্বামীকে বাদ দিয়া, স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া স্ত্রীজনের ধর্ম্ম কোথায়? অন্ততঃ ঋষিদিগের ভারতে ইহা হয় না। স্বামীকে লুকাইয়া যাহা করা যায়, স্ত্রীজনের তাহাই ব্যভিচার। স্বামীকে গোপন করিয়া যুবা গুরু ধরাও যা আর ব্যভিচারিণী হওয়াও তাই। ইহার উপর আবার বিলাস? ছি ছি! ব্যভিচার! তুমি ত স্বর্গচ্যুতা হইয়াছ তার উপর সাজ-সজ্জা যখন কর তখন কার জন্য তাহা কর ভাবিয়া দেখ। ইহা পাপ; এই পাপ করিয়া তুমি কত ঘৃণিত স্তরে নামিতেছ চিন্তা করিয়া দেখিও। স্বামীর আদরকে নারায়ণের আদর যদি কখন না ভাবিতে পার তবে তোমার সতীধর্ম্ম থাকে কোথায়? তোমার আবার সৌভাগ্য কি?

জিজ্ঞাসা করিতেছ ব্যভিচারের প্রতীকার কি? স্বামীর আদরে যে বঞ্চিত সে করিবে কি?

স্বামী সঙ্গ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম হয় না। সধবারও নহে, বিধবারও নহে। বিধবার মৃত স্বামী-স্মৃতি আর সধবার জীবিত স্বামী স্মরণ—ইহাই তাঁহাদের ধ্যানের

অবলম্বন। স্বামীতে নারায়ণভাব আরোপ ইহাই নারীধর্ম্ম। ইহাই এই জাতির সৌভাগ্য।

হইতে পারে তোমার অদৃষ্ট দোষে স্বামী অন্যরূপ। ইহাতে বুঝিতে হইবে তোমার তপস্যার অভাব আছে। তপস্যার ফলে সকল সৌভাগ্য আসিয়া উদিত হয়। একলব্যকে গুরু দ্রোণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। একলব্য কিন্তু আবার একটা নূতন গুরু কাড়েন নাই। গোপনে দ্রোণগুরুর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিই তাঁহার গুরু-স্থানীয় হইয়াছিল। স্বামীসুখে বঞ্চিত হইতেছ, ঐ স্বামীকেই দেবতা ভাবিয়া গোপনে উপাসনা কর। সমস্ত বিলাসিতা রূপ ব্যভিচার বর্জ্জন করিয়া সাধনা কর, আবার শুভদিন আসিবে। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ত নিত্যকর্ম্ম করাই চাই। তবে ঢাক ঢোল পিটিয়া কোন কিছু ধর্ম্মাচরণ করিও না। গোপনে ধর্ম্মাচরণ কর। উপদেশ যদি দরকার হয়, তাহার জন্য পিতা বা পিতৃস্থানীয় অনেকে আছেন। তোমার ঐকান্তিকতার অভাব যদি না হয়, পটের ছবি বা মৃণ্ময় স্বামীমূর্ত্তিই তোমায় উপদেশ করিবেন।

আবার সংসারের কার্য্যেও তাঁরে ডাকা হয় হয়। সংসারের কার্য্যে ডাকা হইবে তখন যখন নিজের সুখের দিকে না তাকাইয়া আর সকলের সুখের জন্য নিজের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে। ইহা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পাপ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে—সন্তুষ্ট চিত্তে ক্লেশ সহ্য করায় তুমি নির্ম্মল হইতেছ ইহাতেই শেষে তুমি আনন্দ পাইবে। তোমার সতীত্ব আবার ফিরিয়া আসিবে। সতীস্ত্রীর স্বামী কি কখন দোষ বিশিষ্ট থাকিতে পারেন? সতীত্বের বলই স্ত্রীজনের যথার্থ বল। তপস্যা কর—সকল দুঃখ সহ্য করিয়া নিত্যকর্ম্ম কর আর দুঃখটাকে আনন্দের দ্বার ভাবিয়া গৃহ ধর্ম্ম কর নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের উদয় হইবে।

আমরা বলিতেছিলাম লীলার সুখ, লীলার সৌভাগ্য ইহার যেন অন্ত ছিল না। এত সুখ, এত সমৃদ্ধি, এত স্বামীসোহাগ কার ভাগ্যে ঘটে?

এ ভাবে কি চলিবে?

কি ভাবে?

এই ছাঁচে।

কেন চলিবে না?

সময় নাই।

এটা কি ঠিক কথা ?

না হয় মহারামায়ণের আকর্ষণ বড় বেশী। এত বেশী যে সেখানে যাহা আছে তাহার উপর এই হাল্কা সমাজের মত করিয়া সখীসম্বাদ দেওয়া—এর আর সময় নাই।

সখী সম্বাদ কিরূপ মতলবে চলিত ?

লীলার দুই সখী থাকিত। একজন যোগ মায়া আর একজন ভোগ মায়া। একজন নিবৃত্তি একজন প্রবৃত্তি। একজন সুরুচি আর একজন সুনীতি। দুজনের ভিন্ন ভিন্ন পথ। কিন্তু লীলা চলিবে মধ্যপথে। ভোগকে একবারে ত্যাগ নহে এবং যোগকেও একবারে গ্রহণ নহে। ধীরে ধীরে ভোগকেই যোগের পথে লওয়া। ত্যাগটার উপর প্রথম প্রথম বেশী জোর দেওয়া নাই কিন্তু গ্রহণের উপরেই জোর বেশী। ক্রমে গ্রহণ এত হইবে যে ত্যাগ আপনি আপনি আসিয়া যাইবে। সকল কার্য্যে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন, অহং কর্ত্তা অভিমান বর্জ্জন জন্য বিচার ও ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া করিলেই ইহা হয়।

বলিতেছ এত করিতে কিন্তু সময় নাই ? তবে কিরূপে চলিবে ?

যেমন আছে তেমনি।

ইহা কি উপন্যাসের মতন ?

নিশ্চয়ই। কখন পুরাতন হইবে না এমন উপন্যাস।

সকলের ঘরের কথা।

তবে তাই হউক। এখনও উৎপত্তি চলিতেছে। ইহার পরে স্থিতি তাহার পরে উপশম। তাহার পরে দুই নির্ব্বাণ। তাই বুঝি সময় নাই।

সত্যই। অত করিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত পৌছিবার সময় থাকিবে না।

আর এক কথা। আজ কাল কার গল্প বানানার উপর এত বিদ্বেষ করিলে চলিবে কেন ?

সকল জিনিষেরই ব্যবহার আছে। জীবন গঠন বড় কঠিন। প্রাণপণে সেই চেষ্টা থাকা চাই। অনুষ্ঠানের গুরু পরিশ্রমের পর কখন কখন ফিন্ ফিনে গল্পটা চাট্‌নির মত ব্যবহার করা ও যায়।

ভাল লোকে ত তাই করেন ?

প্রায় না। অনুষ্ঠানের পরিশ্রম ত প্রায় নাই। তার উপরে এখন যেন সবই

চাট্নি। মনের ও দেহের প্রকৃত সুস্থতার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা যেন নাই বলিলেই হয়।

তাহা কি?

তাহা ছন্দ। শরীরকে ছন্দ মত স্পন্দিত করিতে পারিলে শরীর সচ্ছন্দে থাকে। বাক্যও এইরূপ মন ও বাক্যকেও ছন্দ মত স্পন্দিত করা আবশ্যক।

তুমি কি বলিতে চাও এখন আর কাহারও সচ্ছন্দ শরীর নাই। মন এবং ছন্দ মত হয় না?

হইবে না কেন? হয়। কিন্তু তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুণ্য কর্ম্ম ফলে আইসে। ইহা কিন্তু স্থায়ী হয় না। আমি বলিতে ছিলাম যাহা পূর্ব্ব পুণ্য ফলে স্বাভাবিক ভাবে আইসে তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক কৌশল তাহাকে বলে সাধনা। একালে সাধনার অভাব প্রায় সর্ব্বত্র। তপস্যা নাই বলিয়া এই জাতির সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া আসিতেছে না। আধুনিক গ্রন্থে প্রায়ই সাধনার কথা থাকে না। শুধু কথা। কাজ নাই।

কিন্তু ভগবান বশিষ্ঠের গুরু ভাব বুঝিবে কে?

বুঝিবার চেষ্টাও করা উচিত। তাহা না করিয়া দুর্ব্বল জীবের রুচি যাহা তাহার অনুকূল কথাই কি বলিতে হইবে? বশিষ্ঠ দেবের গল্পাংশ বড় বিস্ময়কর। তার উপর তাঁহার কাব্যাংশ আরও মধুর। বুঝিতে পারিলে ইহাই স্থায়ী বস্তুর স্বরূপ ধরায়।

তুমি ত সময় নাই বলিয়া দুই চারিটা নূতন চরিত্র ইহাতে বসাইবে না। সময় করিতে পারিলে যেন ভাল হইত। আচ্ছা কিরূপ ভাবে নূতন কথা আনিতে তাহার একটু আভাস দিলে হয় না?

আচ্ছা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে একটু বলিতেছি। যেরূপ করিয়া বলিলে নিজের প্রাণ এক সময়ে তৃপ্ত হইত সেরূপ করিয়া কিন্তু বলা হইবে না।

আচ্ছা তাহাই হউক।

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইও মঝু গাত॥

যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোই বিজনে পঁহু বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥

যোগমায়া—আমাদের রাজ্ঞীর মুখে এই সব ত শুনিয়াছ?

ভোগমায়া—শুনিয়াছি। কিন্তু এ সব কি?

যোগমায়া—তুই কি? এমন সুন্দর কথা তুই বুঝিস্‌নি।

ভোগমায়া—তুমি একটু বলনা কেন।

যোগমায়া—দেখ্‌রে যে যাহারে ভাল বাসে সে চায় সর্ব্বদা তারে লইয়াই থাকুক। মনে হয় যে পথে সে যায় তার অরুণচরণ তলের মাটী আমি হইয়া থাকি। সে যেন আমার শরীরেই পদক্ষেপ করিয়া চলে। যে দর্পণে সে মুখ দেখে তার মধ্যে যেন আমার অঙ্গের জ্যোতিই থাকে। আমার অঙ্গ জ্যোতিই যেন তার মুখ দেখার দর্পণ হয়। যে সরোবরে সে স্নান করে আমার অঙ্গ গলিয়া যেন তার জল হয়। সে যেন সলিলরূপী আমার অঙ্গেই স্নান করে। যে বীজনে সে বাতাস লাগায় সে বীজনের মৃদু বায়ু তা যেন আমরই অঙ্গ হয়। আমার অঙ্গ বায়ু আকার ধারণ করিয়া যেন তারে শীতল করে। যে যে স্থানে সে ভ্রমণ করে তার কাছে কাছে আমার অঙ্গই যেন গগনরূপী হইয়া থাকে।

ভোগমায়া—এও নাকি হয়? একজনেয় চলার পথে হৃদয় পাতিয়া দেওয়া, তার স্নানের জল হওয়া, তার মুখ দেখার দর্পণ হওয়া এসব কি কথা? এ কল্পনা করা কেন?

যোগমায়া—আরে এ সব হইল "ভাব"। "ভাব" যাহা তাহা কি স্থূলে হয়? চিত্তাকাশে এই সব ভাব লইয়া থাকিতে থাকিতে স্থূল দেহ ভুল হইয়া যায়—তখন আতিবাহিক দেহে বা ভাবনাময় দেহে অভূত পূর্ব্ব আনন্দ হয়।

ভোগমায়া—থাক তুমি তোমার আতিবাহিক লইয়া। আমি দেখি তুমিই রাজীকে পাগল করিয়াছ।

যোগমায়া—তা বেশ করিয়াছি। রাণী কি পাগল?

ভোগমায়া—তার আর বাকি কি?

যোগমায়া—বলিস্ কি?

ভোগমায়া—আহা গো—কিছুই যেন জানেন না। শুন নাই কি রাণীর চব্বিশ ঘণ্টা কি সাধ যায়? পূর্ব্ব দ্বাপরে শ্রীমতীর সঙ্গে শ্রীভগবানের যে লীলা সেই লীলাই রাণী। সর্ব্বদা লীলাই সাধ যায়।

যোগমায়া—তোর যায় না? সত্যি বলিস্।

ভোগমায়া—সত্যি। দূর তা কেন? পাই কি?

যোগমায়া—পাস্‌নি তাই নাই। কেমন?

ভোগমায়া—তুমিওত রাজ্ঞীর দলের। তোমাদের ভাবের কথা আর একবার বল দেখি শুনি। একলা একলা সঙ্কল্পে ভাবনা ময় দেহে যা করিতে হয় একবার বলত।

যোগমায়া—মুখে নহি নহি ভিতরে সাদা চাই এই না?

যোগমায়া—হাঁ গো তাই। এখন বল।

যোগমায়া—সুন্দর, বড়ই সুন্দর। প্রভাত হইতেছে। শ্রীমতীর সখীগণ বৃন্দা দেবীকে বলিতেছেন—

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বৃন্দা দেবী মুখ চাই
রতিরস আলসে শুতি রহু দুঁহু জন
তুরিতঁহি দেহ জাগাই।
তুরিতঁহি করত পয়াণ।
রাই জাগাই লেই নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোয়ত বিহান।

আহা! কত সুন্দর! চিত্তাকাশে প্রণবরূপিণী, বীজরূপিণী, নামরূপিণী প্রেমময়ী আর প্রেমময়ের বিলাস কত সুন্দর!

ভোগমায়া—তার পরে বল না।

যোগমায়া—সখীরা বৃন্দা দেবীকে বলিতেছে—

শারী শুক পিক সকল পক্ষীগণ
তুহুঁ সব দেহ জাগাই
জটিলা গমন সবহুঁ মেলি ভাগই
শুনইতে জাগই রাই।

রাই জাগিতেছেন—

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই
জাগিল রসবতী রাই
বানরী কক্‌খটী চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতঁহি শ্যাম জাগাই।
শুন বর নাগর কান!
তুরিতঁহি বেশ বনাহ যতন করি
যামিনী ভেল অবসান।
শারীশুক পিক কপোত ঘন কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করুনাদ
নগরক লোক, সব জাগি বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ।

ভোগমায়া—এও নাকি মানুষ পারে? ছি ছি মেয়ে যেন কি?

যোগমায়া—শোন্ তার পরে। ঠাকুরটি কেমন তাই দেখ—

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলকা দেই সাঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি।
মাধব সিন্দুর দেয়ল সাঁথে।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

মূল, সমস্ত ভাষ্য ও টীকার আবশ্যকীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ এবং প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা। গীতার এরূপ বিষদ ব্যাখ্যা আর নাই—ইহা সকলেই বলিতেছেন।

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তত্ত্বসমূহের এমন প্রণালীতে আলোচনা এখন পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের সাধনা দ্বারা জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা অন্য কোথাও এখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম ষট্‌ক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূল্য ৪।০; দ্বিতীয় ষট্‌ক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় মূল্য ৪।০; তৃতীয় ষট্‌ক ১৩ অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় মূল্য ৪।০।

ভদ্রা—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত। মহাভারতীয় সুভদ্রা-চরিত অবলম্বনে সামাজিক উপন্যাস। বিবাহ জীবনের নব অনুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। প্রতি যুবকের পাঠ করা উচিত। মূল্য ১।০।

কৈকেয়ী—মানুষ আপনা হইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মূল। দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হইতে পারেন—রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে। কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী ও কৌশল্যা চরিত্র ধরিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। না কাঁদিয়া পড়া যায় না। মূল্য ।০ আনা।

ভারতসমর ১ম ভাগ—মূল মহাভারত, কালিসিংহের অনুবাদ এবং কাশী দাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমুখ পত্রিকা বলেন—এমন ভাবে মহাভারতের চরিত্র সময়ের উপযোগী করিয়া কেহ পূর্ব্বে দেখান নাই। যেমন ভাষা তেমনি শিক্ষা পুরাতনকে নূতন করিয়া এরূপে কেহ আঁকেন নাই। প্রতি স্থানেই ভাবে লেখা। অতি উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৸০ আনা।

উৎসব—মাসিক পত্র, ৯ম বৎসর চলিতেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলেন আজ কালকার কোনও পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বঙ্গবাসী

বলেন এতদিনে হিন্দু পাঠ্য মাসিক পত্রিকা দেখিলাম। যেমন বিষয় বৈচিত্র তেমনি লেখার কৌশল। বাজে কথা, বাজে গল্প একবারে নাই। যাহাতে জীবনে উপকার হয়, সাধনা হয়, তাহা জ্বলন্ত ভাষায় মধুর করিয়া লেখা। মূল্য বার্ষিক ১॥০ মাত্র। আর এক সুবিধা, যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইবেন তাঁহারা ঋগ্বেদসংহিতা, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, আধ্যাত্মরামায়ণ এই চারিখানি পুস্তক ধারাবাহিকরূপে এই কাগজেই পাইবেন।

শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী—প্রকাশক।

উৎসব অফিস,—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য—১।০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৵০ আনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্‌গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত।

উদ্বোধন—স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত "রামকৃষ্ণ মিশন" পরিচালিত মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সডাক ২৲ টাকা। উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই সর্ব্বদা পাওয়া যায়। উদ্বোধন-গ্রাহকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। সবিশেষ জানিতে হইলে ৴১০ টিকিট সহ কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পুস্তকের তালিকার জন্য লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১২,১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগ্‌বাজার কলিকাতা।

মালঞ্চ।

নূতন ধরণে সরস সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র।

আগামী ১৩২১ সনের বৈশাখ হইতে বাহির হইবে।

সম্পাদক—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ।

প্রকাশক—সাহিত্য প্রচার সমিতি লিমিটেড্।

২৪নং ষ্ট্রাণ্ড্ রোড, কলিকাতা।

পত্রিকার আকার—ডিমাই আট পেজি ১৫ ফর্ম্মা ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

পত্রিকায় কি কি থাকিবে—প্রথম অংশ—(প্রায় দুই তৃতীয় ভাগ)— (ক) মৌলিক গল্প উপন্যাস নাটক কাব্য ইত্যাদি। (খ) প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প উপন্যাস কাব্য নাটকাদির অনুবাদ বা সরল বঙ্গীয় সার সঙ্কলন। (গ) বিদেশী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকগণের গল্প, উপন্যাস ও নাটকাদির অনুবাদ বা সরল বঙ্গীয় সার সঙ্কলন। (গল্প উপন্যাসাদি যথাসাধ্য চিত্রশোভিত করা হইবে।)

দ্বিতীয় অংশ—(বাকী তৃতীয়ভাগ)—(ক) সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়সমূহের আলোচনা। (খ) বিবিধ দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুককর তথ্য সংগ্রহ। (গ) বিবিধ কৌতুক রঙ্গ ইত্যাদি। বিস্তারিত বিবরণ অনুসন্ধান করুন।

লেখক শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন বঙ্গভাষার সুপরিচিত, তাঁহার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশের মাহাত্ম্যে, মাধুর্য্য—বিচিত্র ঘটনার সন্নিবেশে ও বিকাশে, নৈপুণ্য—চিন্তার মৌলিকতায়।

বঙ্গের পাঠক পাঠিকাগণ কালীপ্রসন্ন বাবুর, অন্যান্য পুস্তকের সহিত সুপরিচিত—রাজপুত কাহিনী, ঋণপরিশোধ, সরলচণ্ডি, লহর আর্য্যনারী ইত্যাদি।

শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত

কার্য্যাধ্যক্ষ।

To Let.

Registered No. C. 583.

৯ম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩২১ সাল। [১১শ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১৷৷০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪৷৷০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷৷০, সিকি পৃষ্ঠা ১৷৷০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৴০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

যোগেচ্ছুর চিত্তবিনোদন।

যেখানে দৃষ্টি পড়ে, সূর্য্যমণ্ডলে, অগ্নি শিখায় এমন কি নীল-আকাশে নীল-জলে, শূন্যে, পর্ব্বত গাত্রে যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই যদি একটির পর একটি করিয়া ছয়টি পদ্ম ভাসে তবে কেমন হয়? নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন দলবিশিষ্ট, বিভিন্ন বর্ণের ছয়টি পদ্ম যদি কোন কিছু অবলম্বনে ভাবনা করা যায় তবে বড় ভাল হয়। যদি কখন যোগ পথ অবলম্বন করা হয় তবে এই পূর্ব্বের কার্য্যটিতে বড় সুবিধা হইবে।

প্রথম পদ্মটি রক্তবর্ণ চতুর্দ্দল।
দ্বিতীয়টি বিদ্যুৎ বর্ণ ষড়দল।
তৃতীয়টি নীলবর্ণ দশ দল।
চতুর্থটি লাল-প্রবালবর্ণ দ্বাদশ দল!
পঞ্চমটি ধূম্রবর্ণ ষোড়ষ দল।
ষষ্ঠটি শুভ্রবর্ণ দ্বিদল।

উপরে উপরে এই ছয়টি পদ্ম সাজাইয়া ভাবনা করা, আবার তার পরে এই ছয়টি পদ্মকে মেরুদণ্ডের ভিতরে ভাবনা করা অত্যন্ত ভাল। ভাবনার একটা সহজ সঙ্কেত বলাও যায়। ইষ্টমন্ত্র জপ বা গায়ত্রী জপ অথবা গায়ত্রী পুটিত ইষ্টমন্ত্র জপ

অনেকেই অভ্যাস করিতে পারেন। মেরুদণ্ডের মধ্যে পদ্মের স্থানগুলি জানিয়া লইয়া, এক এক স্থানে একশত করিয়া জপ অভ্যাস করিলে, ছয় শত জপ হয়। যাঁহারা মালা না লইয়া সহস্র জপ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা তালু মধ্যে চতুঃষষ্টি দল, ব্রহ্মরন্ধ্রে শতদল এবং মস্তকে সহস্র দল এই তিন পদ্মে বসিয়া তিন শত এবং বিন্দু-স্থানে শেষ শত জপ করিলেই সহস্রবার জপ হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ও দলের সহিত পদ্মচিন্তার অভ্যাসটিও করা হয়। গুরুর নিকট হইতে প্রাণায়াম পাইবার পূর্ব্বে ইহা করা থাকিলে অথবা পাইবার পরে অন্য সময়ে অভ্যাস করিয়া লইলে বড় সুবিধা। ইতি।

আবার পাওয়ার কথা।

ভুলে যাওয়াই সাধকের দুঃখ। তাই পুনঃ পুনঃ এক কথা বহু ভাবে পুনরুক্তি। ইহা কিন্তু সাহিত্যিকের ভাল লাগে না। সাধক হওয়া ভাল না সাহিত্যিক ভাল? আমরা বলি সাহিত্যিক সাধক হইয়া পুনরুক্তি করুন এই ভাল। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ত অনেক হইল। এত হইল যে লোকে আর পরের সৌন্দর্য্য দেখিতে চায় না। আপনার মুখ যেমনই হউক না কেন, আর মাথায় চুল থাকুক আর নাই থাকুক মানুষ যেমন প্রায়—টেকো মাথাতেও চুলই ফিরায় আর আপনার মুখ দেখিয়া কত কি করে, সেইরূপ সবাই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আপনার সৌন্দর্য্য আপনি দেখিতে দেখিতে সারা হয়,—তা অন্যে দেখুক আর নাই দেখুক। আমরা বলি বিদ্মহে করিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ একই বিষয় নানাভাবে বল, এই ভাল।

(১) তুমি আছ, সর্ব্বত্র আছ, সর্ব্ব বস্তুর ভিতরে বাহিরে আছ—এইটি যখন একবারও ভুল না হয়; যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা ভাবি, যা কিছু করি; আমার ভাবনা ও কর্ম্ম, তোমার ভাবনা ও কর্ম্ম, জগতের মধ্যে যাহা আছে তাহা ও তাহাদের কর্ম্ম—এই সমস্ত যখন তুমি ভিন্ন হয় না, তুমি আছ বলিয়া দেহের, মনের, জগতের অস্তিত্ব; তোমার, সবার, উপরেই যখন এই সব ভাঙ্গে ভাসে; অন্তর্জ্জগতে বা বহির্জ্জগতে যাহা হয় তাহা সমস্তই মায়িক; মায়ার খেলার ভিতরে তুমিই আছ; আপন স্বরূপেই আছ; মায়া সদা বিকার প্রাপ্ত হইলেও ইনি

তোমার যখন কোন বিকার উৎপন্ন করিতে পারেন না ; আর আমি চেতন বলিয়া চৈতন্যই যখন আমার প্রয়োজন ; মায়া বা মায়ার সমস্ত কার্য্যে থাকায় যখন আমার কোন কার্য্যই হয় না তখন সর্ব্ব বস্তুর কোলে কোলে অধিষ্ঠান চৈতন্যটি সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত ইহা যখন হয়, তখন বিশ্বাসে তোমাকে পাওয়া হয়। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারিলে ভাল মন্দ যা হয়, সবই তোমার জ্ঞাতসারে হইতেছে ভাবিয়া সদা সন্তুষ্ট থাকা যায়।

(২) কার্য্যে পাওয়া হইতেছে আমার প্রতি কার্য্যে তোমাকে স্মরণ করা, সর্ব্ব কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করা, যখন ঠিক ঠিক হইতে থাকে তখন তোমাকে কার্য্যে পাওয়া হয়। কত কার্য্যে মানুষ তোমাকে ভুলিয়া শুধু কার্য্য লইয়াই থাকে ? আবার তোমার আজ্ঞা হইতেছে সর্ব্ব কর্ম্মকালে "তোমাকে স্মরণ করিতে হইবে।" "তৎ কুরুষ্বমদর্পণম্" তোমারই শ্রীমুখের বাক্য এই। কিন্তু আগে কার্য্যটি হইয়া যায়, তার পরে মনে হয় হায় তোমাকে ত স্মরণ করিয়া, কার্য্যটি তোমাকে অর্পণ করা হইল না। কেহ কেহ এমনও আছেন যে কত কর্ম্ম হইয়া যাইতেছে কিন্তু আদৌ তোমার স্মরণ হইতেছে না এ সব লোক তোমার মানেই না, তাহারা আর কর্ম্মে তোমায় পাইবে কি ? কর্ম্মে পাওয়া হইতেছে তাহা, যাহাতে কোন কর্ম্ম, কোন বাক্য, এমন কি কোন ভাবনা, কোন সঙ্কল্পও তোমাকে না স্মরণ করিয়া উঠিবে না—তখন হইবে কর্ম্মে তোমায় পাওয়া। সমুদ্র বক্ষেই তরঙ্গ উঠে। শুধুই তরঙ্গ দেখা যখন হয়—স্থির সমুদ্রের ভাবনা যখন একেবারেই থাকে না তখন যাহা হয় তাহার সহিত কর্ম্ম তোমাকে না অর্পণ করিয়া করার তুলনা হয়।

ভাবনা বাক্য কর্ম্মরূপ ভিতরে বাহিরের কর্ম্মে প্রথমেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের স্মরণ কর, করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ কর, তবেই কর্ম্মে পাওয়া হইল।

(৩। ৪) ভাবে পাওয়া যাহা তাহা আরও সরস। এ পাওয়ার নানাপ্রকার সাত্ত্বিক বিকারের আনন্দ আছে। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণে যখন অহল্যার ভাব মনে জাগে সঙ্গে সঙ্গে অহল্যা উদ্ধারের ভাবটিতে যেন নিজের হৃদয়ে ঐ চরণ স্পর্শ করিতেছি ভাবনা আসিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উদ্বেলিত হওয়ার মত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন হইল ভাবে পাওয়া। এ পাওয়াতেও মায়িক ব্যাপার আছে। কারণ মায়া না হইলে তোমার খেলা হয় না। কিন্তু সত্যে পাওয়াটি যাহা তাহা হইতেছে স্থিতি। আর কিছুই নাই খণ্ডচৈতন্য অখণ্ডচৈতন্যে মিশিয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তুমি মাত্রে সব অবসান যখন হয় ; দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন ; কর্ত্তা ক্রিয়া

কর্ম্ম ; জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়—সর্ব্বপ্রকার ত্রিপুটী গলিয়া এক পরম রমণীয় অখণ্ড চৈতন্য মাত্রই যখন অবশিষ্ট থাকে ; এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই হইতেছে সত্যে পাওয়া বা সত্য স্বরূপে অবস্থান করা। ইহা আয়ত্তের পরে জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিতে ইচ্ছা মত যাওয়া আসা অথচ আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকা—ইহাই শেষ। সাধনা ভিন্ন এ সব পাওয়ার কোন পাওয়াই হয় না। যার যেমন অধিকার সে সেই ভাবেই পাউক, পাইয়া ধন্য হউক, ইহাই প্রার্থনা।

ব্রজগাথা।

কহিতে প্রিয়কথা মরমে জাগে ব্যথা
প্রকাশি উঠে সখি গোপন ব্যাকুলতা ;
বক্ষ দুরু দুরু কণ্টকিত তনুলতা,
বদনে অরুণিমা সজল আঁখি পাতা।

গুমরি বাজে যে বীণা আপন ভবনে,
চাহিত বাঁধিতে তারে সরম বাঁধনে ;
ওগো ! লুকাতে চাহে প্রেম পড়ে যে ধরা,
বৃথা সে অনুযোগ সে ত মরমে মরা।

ওগো ! পরাণে বাজে বাঁশী দিবস নিশি,
কলঙ্কী বলি সাধে প্রচারে দিশি দিশি ?
এবে নয়ন জলে সখি সাধে কি ভাসি ;
কি সুখ ল'ভে সে বল রাধারে উদাসি ॥

****

একখানি চিঠি।

শ্রীচরণ কমলেষু

প্রণামানন্তর সেবকের নিবেদন——

পর পর দুইখানি বিস্তৃত পত্র পাইয়াছি। গভীর বিষাদের নিবিড় নীরদে দুইখানি পত্রই সমাচ্ছন্ন। পত্র দুখানি যে হৃদয়ের বার্ত্তাবহ সে হৃদয়খানি যেন বিষাদে কালিমাপূর্ণ; সে হৃদয়াকাশে যেন সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই,—আছে কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার, হতাশারূপ ঘনকৃষ্ণ-মেঘ; সে হৃদয়ে যেন শক্তি নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই,—আছে কেবল দুর্ব্বলতা, বিষাদ আর অবসাদ! আপনার মধুর হৃদয়ের এই যাতনাময় চিত্র যে এই প্রথম দেখিলাম এমন নহে; এই মর্ম্মভেদী চিত্রের সহিত আমি বহু পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছি; নূতন দেখিতেছি এই টুকু যে ছবি ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়াছে,—যাহা ইতঃ পূর্ব্বে অস্পষ্ট ছিল এক্ষণে তাহা বেশ স্পষ্ট ফুটিয়াছে; ম্লান, প্রাণহীন, চিত্র ধীরে ধীরে কালক্রমে জ্বলন্ত, জীবন্ত, জীবনে পরিণত হইয়াছে।

সকলই আমাদের কর্ম্মফল। কেন আজ হৃদয়ের এই শোচনীয় অবস্থা? কিসে সুখ গেল? কি কারণে শান্তি অন্তর্হিত হইল? আছেও ত সব,—তবে অভাব কিসের? কোন্ অভাবে এত ক্লান্তি? অর্থ? দিন ত চলিয়া যাইতেছে। মান, যশ? তাহাও ত একটু আছে। তবে হৃদয় এত ব্যথিত কেন? যাহা চাই তাহা পাই না, পাওয়ার আশাও ধীরে ধীরে নিবিয়া যাইতেছে। তাই হতাশ, তাই বিষাদ, তাই হা হুতাশ, মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, তাই কাতর ক্রন্দন!

কেন এমন হইল? যাহা চাই তাহা পাই না কেন? যাহার অভাবে আজ হৃদয় কাঁদিতেছে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কি করিয়াছি? তল্লাভলালসাকে ত অনেকদিনই হৃদয় মন্দিরে পূজা করিতেছি; কিন্তু সেই শুভেচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছি কি? চিরদিনই ভাবিতেছি সকল ত্যাগ না করিলে তাঁহার পূজা করা যায় না; অথচ যতটুকু অবসর পাই তাহা তাঁহার বিধানমত পূজায় নিযুক্ত না করিয়া 'আমার কিছু হইল না'—এই-বিষাদ-কাহিনীর চিন্তায় নিয়োজিত করিতেছি। সকল ত্যাগের শক্তি বর্ত্তমানে নাই অথচ সকল ত্যাগে প্রতীক্ষায় সব জীবন কাটিয়া গেল। বিষাদ আসিবে বৈ কি? অপরাধ আমাদের।

অবসাদ ত আসিয়াছে, মৃত্যুও ত নিকটে ; এখন করি কি ? বাকি জীবনটুকুও কি অবসাদ ও বিষাদ লইয়া কাটাইব ? তাহা হইলেই ত এ জীবন বৃথা কাটিল !

উপায় নাহি কি ? নিশ্চয়ই আছে।অতীত অতীত, উহাকে ফিরাইবার সাধ্য কাহারও নাই,—শত আক্ষেপেও অতীতের একটি তরঙ্গও তাহার পাতা ফিরাইবেনা।

"পশে যে প্রবাহ বহি অকুল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত সদনে ?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?"

তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য ? যে অতীত কালের উপর আর এখন আমাদের কর্তৃত্ব নাই সেই অতীতের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাকি জীবনটুকু বৃথা কাটাইব কি ? ইহাতে ত লাভ নাই, সমূহ ক্ষতিই আছে। এইরূপে জীবন কাটাইলে কেবল ভারই বাড়িয়া যাইবে, বিষাদের ছায়া আরও গাঢ় হইবে। অতীত ত আক্ষেপের কারণ হইয়াছেই, আর এইরূপে এক্ষণে অতীতের জন্য বৃথা অনুতাপ লইয়া বসিয়া থাকিলে বর্ত্তমানও বিষাদের কারণ হইবে। ক্রমে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এক নিরবচ্ছিন্ন বিষাদে পরিণত হইবে। সে কি ভীষণ জীবন ! তবে করি কি ?

যাও অতীত কাল, তোমার নিষ্ঠুর শ্মশানে বসিয়া আর কাঁদিব না,—তোমার জ্বালাময় চিতানল আর হৃদয়ে ধরিব না। না, আমি অধমাধম, আমি ভজন পূজন বিহীন মহাপাপী, আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও। তুমি আমাকে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত, শিশির বিধৌত, তুষার শুভ্র, মল্লিকার ন্যায় সুন্দর করিয়া পাঠাইয়াছিলে ; তুমি আমাকে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি দিয়াছিলে ; তুমি আমাকে অসীম শক্তি সুযোগ দিয়াছিলে ! আমি আজ কত ধুলা-কাদা মাখিয়াছি, তোমার শক্তির অপ-ব্যবহার করিয়াছি, তোমার প্রদত্ত সুযোগ অবহেলায় হারাইয়াছি !! ধর এই মলিন, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, প্রাণ; তোমার "মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছা'য়ে" চরণপ্রান্তে রাখ তুমি আর্ত্তের ত্রাতা, তুমি নিরাশার আশা ; তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

"নিরাশ্রয় জন, পথ যার নাই সেও আছে তব ভবনে" ; আমি মর্ম্ম পীড়ায় পীড়িত, আমি আশ্রয় বিহীন, আমি নিরাশা-নিপীড়িত, তোমার চরণে আমাকে আশ্রয় দাও। যখন স্বাস্থ্য ছিল, যখন শক্তি ছিল তখন তোমার দিকে চাহি নাই। আজ এই বার্দ্ধক্যে, রোগ-শোক কাতরাবস্থায় চরণে আসিয়াছি। চরণে স্থান

দাও; আমার অতীত ক্ষমা কর; আমাকে নববলে বলীয়ান্ কর; আমার বর্ত্তমান্ ও ভবিষ্যৎ তুমি পরিচালনা কর।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

আসুন, এইরূপে পরিতাপময় অতীতকে মায়ের চরণে বিসর্জ্জন দিয়া বর্ত্তমানে যথাশক্তি কাজ করিয়া প্রফুল্ল হই। প্রফুল্লতা যথায় নাই জীবন তথায় নাই; যাহার জীবন নাই সে মৃত; মৃত ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই ভাবে এখনও আরম্ভ করিলে হয়ত কালে কিছু হইবে; আর এখনও বিষাদ লইয়া বসিয়া থাকিলে অচিরে মৃত্যু হইতে পারে।

একটা কথা আমাদিগকে বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা কেহ কেহ সময়ে সময়ে মনে করি এই বিষাদই ব্যাকুলতা। বিষাদ কিন্তু ব্যাকুলতা নহে। যেমন কোরকে কীট, মানব হৃদয়ে তেমনই বিষাদ ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে, কীট যেমন প্রসূনের জীবন হরণ করে, বিষাদ তেমনই অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দেয়। অকাল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রুকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া আমাদের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আরও ভয়ের কথা এই যে এই ভীষণ শত্রু ছদ্মবেশী,—সে ব্যাকুলতার বেশ পরিধান করিয়া আমাদিগকে ভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। এই শত্রুকে আমাদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখা দরকার। সে যেন তাহার ছদ্মবেশে আমাদিগকে প্রতারিত করিতে না পারে। ব্যাকুলতা; সাধন-ভজন-সম্ভূত; বিষাদ ভজন-পূজন বিহীন—আমার কল্পনা-প্রসূত; বিষাদের জন্মদাতা কর্ম্মশূন্য ইচ্ছা; ব্যাকুলতার জনয়িতা প্রেম। বিষাদ ও ব্যাকুলতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু,—যেমন আলো ও ছায়া। ব্যাকুলতা স্বর্গের দ্বারে লইয়া যায়, বিষাদ নরকের পথ পরিষ্কার করে। এই কথাটি বুঝিয়া বিষাদকে পরিত্যাগ করতঃ ভজন-পূজন অবলম্বন করিতে হইবে।

পূজা করিব কি প্রকারে? সংসারে থাকিতে হইলে যে অর্থ চাই। অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে সাধারণের ন্যায় কাজ-কর্ম্ম করিতে হয়। আমরা এখন সাধারণ,—সুতরাং জোর করিয়া অসাধারণ সাজিলে ত চলিবে না। কিছুকাল সাধনা করিলে যখন শক্তি জন্মিবে তখন অসাধারণ ভাবে থাকিতে পারিব,— এক্ষণে দশ জনের ন্যায় হইয়া থাকিতে হইবে। অথচ একটু পৃথক ভাবেও থাকিতে হইবে। সংসারে থাকিয়া সাংসারিক নানা প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সাধন ভজন করা কঠিন। কথা খুবই সত্য। কিন্তু যদি শরীর ভাল না হয়,

যদি আজিও মন গঠিত না হইয়া থাকে, কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি যদি না জন্মিয়া থাকে, প্রলোভন জয় করিতে যদি না শিখিয়া থাকি, তবে এই সংসারকেই "দুর্গ" স্বরূপ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সংসারে থাকিয়া যতটুকু হয় তাহা করিয়াই শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে,—তাঁহার চরণে মনস্থির করিয়া শক্তি ভিক্ষা করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর 'ভাল লোক',— ব্যগ্র হৃদয়ে আমরা যদি যথা অবসর তাঁহাকে ডাকিতে থাকি তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে ডাকিবার সুযোগ করিয়া দিবেনই দিবেন। আজ আমাদের অবসর কম হইতে পারে, দু'দিন পরে নিশ্চয়ই অবসর বেশী হইবে। এক্ষণে যে সুযোগ আছে যদি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করি তাহাহইলে নিশ্চয়ই অধিকতর সুযোগ করিয়া দিবেনই দিবেন। কাজ কঠিন? সংসারের সমুদ্রগর্জ্জন মাঝে বাস করিব, অথচ শান্তচিত্তে কর্ত্তব্য করিয়া প্রফুল্লিত প্রাণে অবসর সময় পূজায় দিব। কঠিনই ত। খুব কঠিন। চারিদিকে প্রবল ঝড় উঠিবে অথচ আমরা অচল রহিব, কঠিন নয় ত কি? অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কাজের মত কাজ যেটী, সেটী ত কখনও সহজ হয় না। অসার আমোদ প্রমোদ যদি করিতে চাহি তবে অতি সহজেই করিতে পারি, কিন্তু যদি একটু সার বস্তুর অন্বেষণ করিতে যাই অমনই কত কঠিনই বোধ হয়। স্রোতে শরীর ভাসাইয়া দেওয়া অতি সহজ; স্রোত-মাঝে স্থির হওয়াই ত কঠিন। কাজের মত কাজ যাহা কিছু তাহাই কঠিন; যত কিছু অকাজ তাহাই সহজ। কাঠিন্য দেখিয়া যদি পশ্চাৎপদ হই তবে সর্ব্ব বিষয়েই পশ্চাতে থাকিতে হইবে। সুতরাং কঠিন হইলেও উহা করিতেই হইবে, কারণ "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়ণায়।" সমস্যা, কি ভাবে সংসারে চলিবে? সংসারে যখন আপাততঃ থাকিতেই হইতেছে তখন সংসারের কাজও করিতে হইবে। গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থ উপায় করিবার জন্য কাজ কিছু করিতে হইবে। কাজ যখন করিতেই হইতেছে তখন কার্য্যকালে তুমি প্রসন্ন হও বলিতে বলিতে কাজে মনোযোগ দেওয়া ভাল,— কারণ মনোযোগ সহকারে কাজ করিলে কাজ শীঘ্র ও সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইবে। তাহাতে আমাদের সময় বাঁচিবে ও আত্মপ্রসাদ জন্মিবে; পূজার বেশ সুবিধা হইবে। আর যদি কার্য্যকালে বসিয়া বসিয়া ভাবি 'হায়! অসার কাজে কাল কাটাইতেছি!' তাহা হইলে একঘণ্টার কাজে দুই ঘণ্টা লাগিবে অথচ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে না। সময় বৃথা নষ্ট হইবে, লাভ হইবে বিরক্তি, এত সামান্য কাজও ঠিক করিয়া করিতে পারি না।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের বর্ত্তমানকর্ত্তব্য, অতীত ও অতীত-সহ বিজড়িত বিষাদকে মায়ের চরণে সমর্পণ করিয়া, স্ফূর্ত্তি সহকারে অপরিহার্য্য সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ, বিধান মত সাধন ভজন করা। কিছুকাল এই ভাবে চলিতে পারিলে অবসাদ ক্লিষ্ট ধমণীতে আবার আশার শোনিত প্রবাহ বহিবে আবার প্রাণ জাগিবে, অবসাদ, বিষাদ দূরে পলাইবে, আবার জগত সুন্দর লাগিবে তাঁহার কৃপাও মিলিবে। আমার ত আশা এই।

জননি! যদি কোন ভূল হইয়া থাকে দেখাইয়া দিও। তোমার পরম ভক্তের মধুর হইতে মধুর হৃদয়কে ক্ষণিক শান্তি দানের চেষ্টা করিলাম। যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিও, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিও। নীরব থাকিলে কি, মা, ভাল হইত; পীড়িত হৃদয়কে বিষাদের কথা শুনাইয়া অধিকতর পীড়িত করিলে কি, মা, ভাল হইত; কি জানি! ভাল মন্দ না বুঝিয়া করিয়া ফেলিলাম এককাজ। মা ক্ষমা করিও। ইতি—

প্রণত সেবক

****

দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করা।

অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা হইতেছে দুর্ব্বল চিত্তের প্রধান লক্ষণ। বিচার পূর্ব্বক অঙ্গীকার করা এবং অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য প্রাণপণ করা ইহাই হইতেছে সবল চিত্তের চিহ্ন। "ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ" সজ্জনগণের বাক্য কখন স্খলন হয় না, ইহা হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি বাক্য। যাঁহারা যথার্থ চরিত্রবান্ তাঁহাদের অঙ্গীকারের অন্যথা কখনও হইতে পারে না। যথার্থ ধার্ম্মিক যিনি, তিনি সম্পূর্ণ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলেও কখন বাক্যের বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। আর কপট ধার্ম্মিক যিনি তিনি নানা ওজরে কথা ঘুরাইয়া লয়েন। তিনি ধর্ম্মের অবমাননা তত দেখেন না, যত দেখেন নিজের সুবিধা অসুবিধা।

চিত্তকে একবার সবল করিতে পারিলে অতি সহজেই চরিত্র গঠিত হইয়া যায়। কি ব্যবহারিক জগৎ, কি ধর্ম্মজগৎ, সর্ব্বত্রই সবল চিত্তের জয়। চিত্তকে সবল না করা পর্য্যন্ত কখনও চরিত্রবান্ হওয়া যায় না।

ধৰ্ম্মভাবে চিত্তকে বলবান করার নাম প্রকৃত সবল চিত্ত হওয়া। সবল চিত্তের দুষ্ট লোকও থাকে। ইহারা অতি নৃশংস। কোন পাপ কর্ম্ম করিতে ইহারা সঙ্কুচিত হয় না। আজ কালকার দিনে কলি মাহাত্ম্যে এইরূপ লোকের সংখ্যাই বেশী হইতেছে। আমরা এই প্রবন্ধে দুষ্ট সবল চিত্তের কথা বলিব না। বলিব ধার্ম্মিক চিত্ত সবলতার কথা।

চিত্তকে সবল করিতে হইলে মনের কাছে খাঁটি হইতে হইবে। মনের নিকট যাহা অঙ্গীকার করা যায়, প্রথমে তাহা পালন করার জন্য প্রাণপণ করা চাই। মনের কাছে যা তা অঙ্গীকার না করিয়া, প্রথমে শাস্ত্রবিহিত অঙ্গীকার করা উচিত। মনে করা হউক যথাসময়ে ত্রিসন্ধ্যা করা—এই বিহিত অঙ্গীকার করা হইল। এই অঙ্গীকার রক্ষা করিতেই হইবে, শত অসুবিধা আসুক, ইহা পালন করাই চাই। সেইজন্য ঐ ঐ সময়ের ব্যবহারিক কাজগুলি অন্য সময়ে করিতে হইবে। প্রাতঃসন্ধ্যা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে করিতে হইবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা আহারের পূর্ব্বে এবং সায়ংসন্ধ্যা সূর্য্যাস্তগমনের ২৪মিনিট পূর্ব্বে করিতেই হইবে। যখন ইহা অঙ্গীকার করা হইল তখন যাহাতে ইহা প্রতিপালিত হয় তাহা করিতেই হইবে। সায়ংকালে হাওয়া খাওয়া বন্ধ করা চাই, তদ্ভিন্ন যথাসময়ে সায়ংসন্ধ্যা হয় না। হাওয়া খাওয়া দরকার যদি নিতান্তই হয় তবে তাহার জন্য এমন সময় করা চাই যাহাতে সায়ং সন্ধ্যার ক্ষতি না হয়। আর এক কথা চরিত্রবান বলে তাঁহাকে যিনি শাস্ত্রমত কর্ম্ম করেন। আপনি অন্যের মত হইয়া যাননা অন্যকে নিজের মত করেন। লোকের খাতির এখানে রাখা চাই না। বন্ধু বান্ধবকে বুঝাইয়া দেওয়া চাই ইহাই সকলের কর্ত্তব্য। প্রাতঃসন্ধ্যাও যথা সময়ে করার জন্য রাত্রির আহার কম করা এবং বাজে কাজে রাত্রি ১২টার পর শয়নের ব্যবস্থা দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য। লোকের খাতির রক্ষার জন্য শাস্ত্র অমান্য করা নিতান্ত পাপ। প্রতি সন্ধ্যায় অন্ততঃ ৩০০শত করিয়া গায়ত্রী জপ করাও মধ্যম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধি। করিব অঙ্গীকার করিয়া কিছুতেই ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। অতি সামান্য বিষয় হইতে অঙ্গীকার রক্ষা অভ্যাস কর। করিয়া দেখ ছয় মাসের মধ্যেই চিত্তের বল বুঝিবে। ইতি

শিবরাত্রি

শিবরাত্রি আসিল, গেল। তোমার প্রসন্নতার অনুভব কতটুকু দিয়া গেল?

গেল বৈকি। তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া, যিনিই শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যথাশক্তি বিধি পূর্ব্বক করিবেন, তিনি চিত্তের প্রসন্নতা অনুভব করিবেনই। চিত্তের প্রসন্নতাটি হইতেছে গ্লানিশূন্য সুখ। গ্লানিশূন্য সুখে চিত্তটি প্রসন্ন হইলেই বোঝাগেল তুমি প্রসন্ন হইয়াছ। সর্ব্বদা শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনে যখন চিত্ত এইরূপে প্রসন্নতা অনুভব করিতে থাকে—যখন প্রসন্নতা প্রবাহ ক্রমে চলিতে থাকে, তখন জানা গেল যে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধি বলে তাহাকে যেখানে চিত্তের রজ ও তমগুণ অথবা লয় ও বিক্ষেপ চিত্তকে ব্যাকুল করে না, রাগ দ্বেষ জন্মায় না কিন্তু এক সত্ত্ব গুণের প্রকাশে, সর্ব্বদা যেন যা দেখি যা শুনি, তাহার মধ্যে একখানা হাসিভরা মুখ, একটি আনন্দ প্রবাহ অনুভব সীমায় আইসে।

শিবরাত্রিতে কি ইহা আসিয়াছিল?

যিনি শাস্ত্রকে নিজের সুবিধা মত না ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যথাশক্তি ঋষিগণের প্রদর্শিত বিধিতে চলিয়াছেন তিনিই জানেন আসিয়াছিল কি না।

শিবরাত্রির পূর্ব্বদিন করিতে হয় সংযম, সংযমের দিন হবিষ্যান্ন আহার এবং রাত্রে ফল মূল দুগ্ধ পর্য্যন্ত চলিতে পারে। শিবরাত্রের দিন --সমস্ত দিন ধরিয়া যিনি যে সাধনা করেন তাহাই করিতে হয়। যাহারা শ্রীগুরুর নিকট প্রাণায়ামাদি লইয়াছেন তাঁহারা প্রাতঃসন্ধ্যার পরে তিনশত ও পঞ্চবিংশ এবং মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার পরে ঐ সংখ্যায় কার্য্য যদি করিয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে একহাজার বার করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র শ্বাসে শ্বাসে ও কুম্ভকে যদি করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা জানেন যে রাত্রের উপবাসে কোন রূপ নিদ্রার আক্রমণ হয় কিনা।

শিবরাত্রি গিয়াছে রামনবমী আসিতেছে। শিবরাত্রি, রামনবমী, উত্থান, শয়ন, ভীম একাদশী, জন্মাষ্টমী ও মহাষ্টমী এই উপবাসগুলিতে উপবাসের সঙ্গে রাত্রি জাগরণই হইতেছে বিধি। বিশেষ প্রথমোক্ত দুইটিতে। মহাষ্টমীতে ত আছেই। সম্পূর্ণ প্রসন্নতা অনুভব করিতে হইলে উপবাসের সঙ্গে রাত্রি জাগরণ আবশ্যক। তবে যা তা লইয়া রাত্রি জাগরণ উচিত নহে। দিনের বেলা সাধনা বিশেষ রূপে করিলেই আপনা হইতে রাত্রি জাগিবার শক্তি পাওয়া যায়। তখন চারি প্রহরে চারিবার পূজা এবং শাস্ত্রাদি পাঠ, স্তব পাঠ, লীলা সঙ্গীত এই ভাবে

সহজেই রাত্রি জাগা যায়। উপবাসের পরদিন পারণকালে একদিনের অনাহার সুধশুদ্ধ আদায় করিয়া লওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পারণ, ক্ষুধা রাখিয়া করা উচিত। এবং অন্নাহারও সাত্ত্বিক ও অল্প পরিমাণে হওয়া উচিত। উপবাসের পরদিন কিছুতেই দিবানিদ্রা করা উচিত নহে। দিবানিদ্রাতে সাধারণতঃ আয়ু-ক্ষয় হয়। উপবাসের পরের দিন দিবা নিদ্রাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। ঐ দিন নিদ্রার আক্রমণ অত্যন্ত অধিক হয় সত্য কিন্তু ধর্ম্ম কথায় দিনটি কাটাইয়া রাত্রিতে ফলমূল দুগ্ধ সেবন করিয়া যদি কেহ ব্রত সমাপন করিয়া থাকেন তিনিই জানেন শরীর মন ও বাক্য কোন এক অপূর্ব্ব ছন্দে তখন স্পন্দিত হয় এবং ঐ সচ্ছন্দ ভাব কত দীর্ঘ কাল ধরিয়া আনন্দ দিয়া থাকে। ঋষিগণের বাক্য কত সত্য তাহা সম্মুখের রামনবমীতে করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এ আনন্দের মত আনন্দ বহু অর্থব্যয়েও পাওয়া যায় না। কঠোর তপস্যাও যাঁহারা অনভ্যাস জন্য না পারেন, তাঁহারা সন্ধ্যাদি ক্রিয়া, কিছু বেশী বেশী জপ এবং রাত্রি কালের শাস্ত্র বিধিমত কার্য্য ও শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেখুন নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিবেন। একবার অনুভব করিলে বরাবর উহা লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে। কিছু কিছু করাতেও লাভ আছে সত্য, কিন্তু উপবাস করিলে শরীর খারাপ হইবে বা রোগ হইবে বা মরিয়া যাইব এইরূপ ভয় বাতুলতা মাত্র। কারণ উপবাসে মানুষ মরে না। বরং উপবাসে আয়ু দীর্ঘ হয়। সহজ সাধনা উপবাস। বিশেষ মৃত্যুকালে ডাক্তারবাবুরা কতই উপবাস করান ভাবিলে মৃত্যুর পূর্ব্বে উপবাস অভ্যাস করার ভয় দূর হয়। করিয়া দেখিলে মন্দ কি?

দোল পূর্ণিমা—

(১)

এ দোল পূর্ণিমা বড় শুভদিন
কি জানি কি মনে করে।
সরক্ত অধরে হাসিটি ভরিয়া
এলে এ দীনের ঘরে॥

জীবন ব্যাপী আঁধার মাঝে ওগো
কুড়ায়ে পাইনু রত্ন।
কি দিয়ে করিব প্রিয়সম্ভাষণ
(আমি) কি দিয়ে জানাব যত্ন॥

ভাল মন্দ কিছু নাহি আহরণ
বসাতে আসন নাই।
রোদন জড়িত মলিন বদনে
চাহিয়া রহিনু তাই

হৃদি বিদারক কাতর কণ্ঠের
নীরব আহ্বানে নাগ
নিমিষে ভরিলে হৃদয় আমার
অমূল্য রতনে কত।

তরল অন্তরে করুণার ছবি
স্বতই রয়েছে আঁকা
তবে সাজে কি তাহার
সাজিয়া-গুজিয়া কঠিন হইয়া থাকা।

সাজানু সুন্দর সে রাঙ্গা চরণ
লালে লাল হ'ল ফাগে
ফেলিতে চরণ দ্রুত গিয়া পাতি
হৃদয় আসন আগে

চকিত পরশে তড়িত প্রবাহ
বহিল মরমে কত
তন্মাত্রে গঠিত কি সুন্দর তুমি
তাই কি মধুর এত ?

বরষে বরষে ঋতুর পরশে
বিলাও রূপের ডালি
রূপ তোয়নিধি পরিপূর্ণ সদা
হয়নি কভুত খালি।

বিভাবসুপরে উড়ুরাজ ভালে
পাখীর পাখায় টিপ
আকাশ গলায় নক্ষত্র মালায়
সাজাও সাঁঝের দীপ।

চারু শিল্পী তুমি তোমায় সাজাই
কি দিয়ে বলত আমি
ধেয়ানু চরণ অবনত মুখে
বুঝিয়া মরম তুমি—

ললাট পরশি স্নেহ আশীর্ব্বাদে
করিলে জীবন দান।
এই কি অমৃত দেবভোগ্য সুধা
যা পিয়ে অমর প্রাণ ?

মরমে রহিল তোমার করুণা
ভূত ভবিষ্যত ভুলি
ব্যাকুল বাসনা মনের মানস
বলিনু সকলি খুলি।

টুটিল সরম। কল্লোলিনী মত—
কহিনু কতই কথা
প্রীতিভরা চক্ষে থির শ্রবণে
শুনিলে প্রলাপগাথা।

শিখাইলে ধীরে জ্ঞান ভক্তি প্রেম
বিশ্বাসে কথার ছন্দ
ফিরিবার পথে রোপিয়া কণ্টক
গমন করিলে বন্দ।

তখন রজনী জোছনায় ভরা
উপরে হাসিছে ইন্দু—
এখনও রয়েছে সেদিনের চিহ্ন
ললাটে আবির বিন্দু।

কত কাল গেল কত কাল এল
আরত দিলে না দেখা
শত আবরণে তবু কি পেরেছ
মুছিতে সাধের রেখা।

না ডাকিতে তুমি আপনি এসেছ
সরল বিশ্বাসী বলে
কেন যুক্তি তবে শিখাইয়া হরি
এখন গোপন হ'লে ?

সেদিনের মত উলঙ্গ পরাণ
উন্মত্ত পাপিয়া বঁধু।
নির্ব্বাক ভাসায় নির্ব্বারিণী গায়
ছড়ায়ে কতই মধু

আকুল যমুনা থেকে থেকে হাসে
চাঁদের ছায়াটি মাখি
এস এস হরি তোমায় আমায়
আবার তেমনি থাকি।

****

জীবের দুঃখ।

(পঞ্চম প্রবন্ধ)

হে ভগবন্! তোমার অবতার সম্বন্ধে প্রাচীন ভারত ও নবীন জগতে যে ভাতৃবিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা "নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি তৎপ্রসাদং বিনা বুধাঃ"—বুদ্ধিমান্ জনেও তোমার প্রসাদ ভিন্ন নিশ্চয় করিতে সমর্থ নহে। তোমার কৃপা ভিন্ন আধুনিক জগতের এই বিরোধের মীমাংসা হইবে না। আবার তোমার কৃপাও যাহা, তাহা আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও অনুভব করিতে পারিব না। সেইজন্য আমরা এই বিবাদভঞ্জনে চেষ্টা করিতেছি; এখন তুমি প্রসন্ন হইলেই আমাদের কর্ম্ম নিষ্পত্তি হয়, নতুবা নহে।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তিনি সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও সমকালে সগুণ হয়েন—অবতার হয়েন, আত্মা হয়েন। আর আত্মা, অবতার এবং সগুণ যিনি, তিনি এই সমস্ত হইয়াও সমকালে নির্গুণ। আত্মা কিরূপে পরমাত্মা, আবার তাহাই কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এখন তিনিই অবতার কিরূপে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমরা আবার বলি, প্রাচীন ভারতের সহিত নবীন ধর্ম্ম-জগতের প্রধান বিবাদ হইতেছে অবতার লইয়া। খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম বরং মানুষের উপর ঈশ্বরভাব আরোপ করিবেন কিন্তু ঈশ্বর যে মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী হইয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা স্বীকার করিবেন না। কার্য্যতঃ হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের অবতারতত্ত্বে মিল থাকিলেও বাক্যে ঘোরতর অমিল। অবতারতত্ত্ব যদি আজ নবীন জগৎ বুঝেন তবে আর ইহাকে পুতুল পূজা বলিতে কাহারও সাধ্য হয় না। আমরা খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের কোন সমালোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু এই ভারতের মানুষ যখন ইউরোপের অনুকরণ করিয়া অবতারতত্ত্ব অস্বীকার করেন এবং নূতন ধর্ম্ম গঠন করিতে চান, তখন আমরা তাঁহাদের যুক্তি সম্যক্‌রূপে বিচার করা আবশ্যক মনে করি।

নবীন ভারতে রাজা রামমোহন রায়, অবতার হইতে পারে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রথমে স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। যে ভ্রান্তযুক্তি দ্বারা তিনি অবতার উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, আমরা তাহার বিচার পরে করিতেছি; কিন্তু তাঁহার মত অন্য

বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিও যে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে চান, ইহাই তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষার জন্য কপটতা মাত্র।

শাস্ত্র সর্ব্বত্রই অবতার স্বীকার করেন। বেদে স্মৃতিতে, পুরাণে, তন্ত্রে, ইতিহাসে সর্ব্বত্রই আমরা অবতারের প্রাধান্য দেখি। তথাপি রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে কপট শ্লোক উদ্ধার করিয়া সাধারণ মানুষের ভ্রম উৎপাদন করিয়াছেন।

যে শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া তিনি অবতারতত্ত্ব অস্বীকার করিতে চান, তাহা এই,—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগিরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো তত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন জন্য যেথান হইতে যে শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, উদ্ধৃত শ্লোকের নিম্নেই তাহার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লোকটি কোথাকার শ্লোক, তাহা তিনি গোপন করিয়াছেন কেন? আমরা নিজে যতদূর দেখিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহাতে দেখি, এইটি মহাভারতের শ্লোকও নহে, ভাগবতের শ্লোকও নহে। যাঁহারা শাস্ত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—এই শ্লোকটি ঋষিপ্রণীত নহে এবং হইতেও পারে না। এই শ্লোকের অর্থটি বুঝিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অর্থ এই,—

[হে জগদীশ! আপনার রূপ নাই, তথাপি আমি ধ্যানের সুবিধার জন্য আপনার যে রূপ বর্ণনা করিয়াছি, তাহা আমার প্রথম বিকলতা দোষ।]

(মায়া রহিত যখন তুমি, তখন তোমার রূপ নাই, কি আছে কেহ জানে না; কিন্তু মায়া সহিত যখন তুমি তখন তোমার অজস্ররূপ "ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রং" শ্রীশঙ্কর।)

হে অখিলগুরো! আপনি বাক্যের অগোচর তথাপি আমি স্তব স্তুতি দ্বারা আপনার অনির্ব্বাচনীয়তা যে দূর করিয়াছি, তাহাই আমার দ্বিতীয় বিকলতা দোষ।

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বব্যাপী। তথাপি আপনি নানা তীর্থে মূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই যে আমি তীর্থযাত্রা দ্বারা আপনার সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনাশ

করিয়াছি, ইহাই আমার তৃতীয় বিকলতা দোষ। এই মৎকৃত তিন বিকলতা দোষ আপনি ক্ষমা করুন।]

জগদীশ্বরের রূপ নাই কাজেই রূপ ধরিয়া ধ্যান হয় না। তিনি অবাঙ মনস-গোচর, কাজেই তাঁহার গুণের স্তব হয় না; আবার তিনি সর্ব্বব্যাপী। তীর্থে যদি তিনি বসিয়া থাকেন তবে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের বিনাশ হয়। রাজা রামমোহন রায় এই শ্লোকের বলে হিন্দুজাতিকে বুঝাইলেন,—তোমরা কোন তীর্থে যাইও না; তোমরা শ্রীভগবানের যশোগান করিও না; আবার তোমরা তাঁহার রূপের ধ্যানও করিও না। অর্থাৎ ভগবানের মূর্ত্তি হইতে পারে না। অতএব অবতার বলিয়া কোন কিছুই হয় নাই, হইতে পারেও না।

শাস্ত্রের শ্লোক তুলিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। শাস্ত্রের পরেও তাঁহার যুক্তি আছে। শ্লোকটি যে ঋষিপ্রণীত নহে তাহা দেখাইতে গেলে তাঁহার যুক্তিটীর বিচার করা আবশ্যক। তাঁহার পুস্তক হইতে তাঁহার যুক্তিটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওয়া সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে। অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন: আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন। এই নিমিত্ত স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না; যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ ও আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল তাঁহাতে উত্থাপিত হইবেক।"

উদ্ধৃত শ্লোকের "ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং" দোষ ইহাই। কাজেই এই যুক্তি বিচার দ্বারা শ্লোকটিরও আংশিক বিচার হইবে।

রাজা রামমোহনের ভয় এই যে, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, মূর্ত্তি ধরিলেই যখন তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের ধ্বংস হয়, অখণ্ড হইতে যখন তাঁহাকে খণ্ডত্বে নামিতে হয়, অপরিচ্ছিন্ন হইতে যখন তাঁহাকে দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে হয়, নিরাকার হইতে যখন তাঁহাকে সাকার হইতে হয়, তখন ব্রহ্মের মূর্ত্তি গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব নহে। ব্রহ্মের মূর্ত্তি যাহা, তাহা মনুষ্যকৃত। ব্রহ্মের রূপ মানুষে কল্পনা করিয়াছে। কাজেই রূপবান্ ঈশ্বর উপাসনা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

যদি ইহাই হইল, তবে ব্রহ্মের আদিসঙ্কল্প যে "অহং বহুস্যাম্", এই শ্রুতি বাক্যের দশা কি হইবে? প্রতিবাদ করা বা নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তথাপি হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূল কারণ বলিয়া রাজার যুক্তিদোষ শাস্ত্র যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। একটা ভুল যুক্তি লইয়া ভাই ভাই বিবাদ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করাও ভীষণ বিকলতাদোষ। এই বিকলতা দোষ প্রথমেই পরিহার করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়াও "অহং বহুস্যাম্" যখন হয়েন, তখন কি তাঁহার স্বরূপের ধ্বংস হয়? "অহং বহুস্যাম্" ত শ্রুতিবাক্য। "অহং বহুস্যাম্ ত সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত। আমরা বহুস্থানে দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায় প্রায়শঃ শাস্ত্র অমান্য করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনি শাস্ত্রকে কাটাকুটি করিয়া নিজের মত গড়িতে চেষ্টা করেন নাই। তবেই ত হইল "অহং বহুস্যাম্" হইলে যখন ব্রহ্ম আপন পরিপূর্ণ স্বভাবে থাকেন না—অথচ শাস্ত্র সর্ব্বত্রই অহং বহু হইব, ব্রহ্মের এই আদি সঙ্কল্পের কথা বলিতেছেন অথচ ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ নিরাকারও বলিতেছেন, তখন আমরা রাজার মতাবলম্বিগণকে জিজ্ঞাসা করি, এই দুয়ের সমন্বয় হয় কিরূপে? শাস্ত্র কিন্তু সহজেই ইহার সমন্বয় করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, স্থূল যাহা জগতে দেখা যায়, তাহার আদি অবস্থাটি সূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম যাহা, তাহা মূলে আতিবাহিক, ভাবনাময়, সঙ্কল্পময়, মনোময়। শ্রীভগবানের স্থূলমূর্ত্তি যাহা, তাহা আদিতে আতিবাহিক, ভাবনাময়, মনোময়, সঙ্কল্পময়। স্থূল যাহা, তাহা সূক্ষ্মেরই প্রকট মূর্ত্তি। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাও আদিতে সঙ্কল্পমূর্ত্তিতেই ছিল। খৃষ্টধর্ম্মের "Let there be light and there was light" এই কথায় আলো যাহা, তাহা প্রকট হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের সঙ্কল্প রূপেই ছিল। কিন্তু এই ব্রহ্মও রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম নহেন। এ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, মায়াজড়িত ব্রহ্ম,—আর রাজা রামমোহন রায় যে ব্রহ্মের কথা বলিতেছেন, উদ্ধৃত শ্লোকে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, যাঁহার রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, যিনি অপরিচ্ছিন্ন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। শ্রুতি তুরীয় ব্রহ্মকেই নিরাকার বলেন, অন্য তিন পাদ সাকার। বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ উভয়াত্মক পাদ—এইগুলিও সাকার। ব্রহ্ম আপন স্বরূপে আপনি আপনিভাবে সর্ব্বদা নিরাকার থাকিয়াও সগুণ হয়েন কিরূপে, আকার ধরেন কিরূপে, শাস্ত্র তাহাও দেখাইয়াছেন।

মানুষের পক্ষ হইতেও এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। একজন মানুষ এক

এক দিনে কত কোটি কোটি সঙ্কল্প করে। এক একটি সঙ্কল্পে অভিমান করিয়া যখন সে কার্য্য করে, তখন তাহাকে ঐ সঙ্কল্পের মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি অনন্ত কোটি সঙ্কল্প তুলিতে পারে, সে ব্যক্তি একটিতে অভিমান করিলে, একটি সঙ্কল্প মূর্ত্তি ধরিলেও যখন তাহার স্বরূপের ধ্বংস হয় না বরং স্বরূপে অবস্থান করিয়াও একটি মাত্র সঙ্কল্পে সে মূর্ত্তিমান্ হয়—একটা মানুষের পক্ষে যখন ইহা অসম্ভব নহে, তখন ব্রহ্ম যে মায়ার সাহায্যে আপন স্বরূপে অবস্থান করিয়াও বহু মূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে? যাত্রার বালক কৈবর্ত্তের ছেলে থাকিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় করিতে পারে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ থাকিয়াও বালক সাজিয়া যদি ছেলেদের সহিত ঘোড়া ঘোড়া খেলিতে পারে, অথবা ধর্ম্মযাজক বাল্যকাল হইতে প্রাচীন বয়সের মধ্যে কত কি করিয়াও—এবং সেই কত কি করা নিজে সর্ব্বদা জানিয়াও যখন ধাম্মিক সাজিয়া বেদীর উপরে বসিয়া ধর্ম্মযাজক মূর্ত্তিতে ধর্ম্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও রামকৃষ্ণাদি অবতার রূপে যে লীলা করিতে পারেন না, ইহা কি শ্রদ্ধার কথা?

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব বলেন—

চিৎ প্রকাশিকা নিত্যা স্বাত্মন্যেবাবসংস্থিতা।
ইদমন্তর্জগদ্ধত্তে সন্নিবেশং যথা শীলা॥ যোঃ নিঃ পূ ৩১।৩৬

স্ফটিক শীলা, স্ফটিক শীলা থাকিয়াও যেমন আপনাতে বননদ্যাদির প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ প্রকাশাত্মিকা নিত্যা চিৎ আপন স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও আপনার অন্তরে এই জগদভাব ধারণ করেন।

অদ্বিতীয়া দধানেকং বিকারাদিবিবর্জ্জিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি স্পন্দতে নো ন বর্দ্ধতে॥ ঐ ৩৭

অদ্বিতীয়া চিতি নির্ব্বিকার ভাবে এই জগন্মূর্ত্তি ধারণ করিলেও কদাচ অস্তমিত, উদিত বা বর্দ্ধিত হইতেছেন না।

সঙ্কল্পাৎ জীবতামেত্য নিঃসঙ্কল্পাত্মনাত্মনা।
চিজ্জড়ং নো জড়ং ভাবং ভাবয়ন্তি স্বসংস্থিতা॥২৮॥

সঙ্কল্প বলে ঐ চিতি জীবভাব ধারণ করিলেও নিঃসঙ্কল্পভাবে আপনাতে আপনি অবস্থান পূর্ব্বক ঐ জড় জগত্‌কে অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা করতঃ স্ব স্বরূপেই অবস্থিত আছেন।

রজ্জুটা সর্ব্বদা রজ্জু থাকিয়াও যদি অজ্ঞানে সর্পরূপে প্রতীত হইতে পারে, তবে ব্রহ্ম আপন স্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়া দ্বারা অবতার রূপে প্রকাশ হইতে কেন না পারিবেন? গীতাওকি এই কথা বলিতেছেন না? যখন তিনি বলিতেছেন :—

অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬

যিনি নিগুর্ণ ব্রহ্ম তিনি অজ অব্যয়াত্মা। যখন তিনি সগুণ, তখন তিনি ভূত সকলের ঈশ্বর। ঐ নিগুর্ণ আত্মাই সগুণ হইয়া আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া দ্বারা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবতার হয়েন। এই জন্যই অবতারকে মায়া মানুষ, মায়া মানুষী বলা হয়। ফলে মায়া বলিয়া কোন কিছু যদি স্বীকার না করা যায়, তবে কেহই পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অপূর্ণ জগতের উৎপত্তি দেখাইতে পারেন না; নিরাকার হইতে সাকার আনিতে পারেন না; অপরিচ্ছিন্ন হইতে পরিচ্ছিন্নের উৎপত্তি প্রমাণ করিতে পারেন না। অথচ মায়া যতই অঘটন ঘটনা কেন দেখান না, যতই কেন ইন্দ্রজাল তুলুন না, তিনি ব্রহ্মের কোনই বিকার করিতে সমর্থ নহেন। জগত্টা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, বিকার নহে। অবতারও ব্রহ্মের বিকার নহে, স্বরূপের ধ্বংসও নহে।

আধুনিক বৈষ্ণবেরাও বলিতে পারেন রামকৃষ্ণাদি যদি রজ্জুতে সর্প মতই হয়েন, তবে ত ভক্তি মার্গটির মূল্য এক কপর্দ্দক হইয়া যায়। এ কথার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—যতদিন জীব মায়ার মধ্যে রহিয়াছে, ততদিন মায়া-মানুষের উপাসনার মূল্য এক কপর্দ্দক নহে—সাত রাজার ধন মাণিক। কিন্তু মায়া অতিক্রম যখন করিতে পারিবে, তখন বল উপাসনা কার জন্য? অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ আছে, কিন্তু জ্ঞানী যখন অভেদে স্থিতি লাভ করেন, যখন এক হইয়া স্থিত হয়েন, তখন তাঁহার নিকটে জগত্টা কোথায়?

আধুনিক বৈষ্ণবেরা যদি মনে করেন মূর্ত্তিটিকে নিত্য না বলিতে পারিলে ভক্তির সবই নষ্ট হইল—ইহাও ত বিষম উৎপাত মনে হয়। চিরদিনই মায়া-মানুষের মায়া মানুষীর পূজা আছে। শ্রুতিতেও অবতার পূজা আছে। প্রাচীন ভারতে ত এ ভয় ছিল না? নামরূপকে মিথ্যা জানিয়াও নামরূপের সাহায্যে নিত্য রাম-কৃষ্ণাদি পাওয়া যায়, এ বিষয়ে ত সন্দেহ ছিল না। মানুষের দেহটাই যেমন মানুষ নহে, কিন্তু প্রকৃত মানুষটির প্রকাশ নামরূপ ভিন্ন অন্যরূপে যেমন

হয় না, তেমনি নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ যদি না থাকে, তবে জগত্‌কর্ত্তা কাহার নিকট প্রকাশ হইবেন?

অস্তিভাতিপ্রিয়ই তিনি, নামরূপটি তাঁহার মায়া। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রমীমাংসার কথাও বলা আবশ্যক। জগজ্জননীএকবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, মায়া ত মিথ্যা, তবে শক্তি পূজা কি জন্য হয়?

ভগবন্ দেবদেবেশ মিথ্যামায়েতি বিশ্রুতা।
তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ॥
শ্রদ্ধা না জায়তে ক্বাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ।
দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো॥

দেবীর উপাসনাটাত মায়াশ্রিত। মায়া যাহা, তাহা মিথ্যা। মিথ্যার উপাসনাতে মুক্তি হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ মিথ্যা বস্তুতে কখন শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না।

আধুনিক জগৎ কি এইরূপ মিথ্যার ভয়ে নামরূপকেও সত্য বলিতে চান? প্রাচীন ভারত ত তাঁহাদের মত সিদ্ধান্ত করেন না।

মহাদেব উত্তর করিলেন,—

নাহং সুমুখি! মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে ক্বচিৎ।
মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্॥

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, মায়ার উপাসনা কোন কালেই নাই, মায়াতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যেরই উপাসনা হয়। চৈতন্য সর্ব্বকালেই সত্য। আবার সত্যের সঙ্গে থাকেন বলিয়া মায়াও চৈতন্যদীপ্তা হইয়া সত্য মত বোধ হয়। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" তিনি আপন মহিমায় মায়ার কুহক নিরস্ত করিয়া অবস্থিত বলিয়া তিনি মায়াধীশ এবং মায়াতীত ব্রহ্ম। আর সেই সত্য ব্রহ্মে এই ত্রিবিধসৃষ্টি যে অমৃষামত বোধ হয়, যত্র ত্রিসর্গোমৃষা সে কেবল তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ঃ, সে কেবল মরুমারীচিকাতে যেমন জলভ্রম সেইরূপ একটা বিনিময়ব্যাপারে সাধিত হয় বলিয়া। আমরা বুঝিতে পারি না, নামরূপের সাহায্যে সেই সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের উপাসনা যদি করা যায়, তাহাতে দোষ হয় কিরূপে? তাহাতেই বা ভক্তির মূল্য কপর্দ্দক কিরূপে? অরুন্ধতী দর্শনন্যায়ে যেমন সেই সূক্ষ্ম নক্ষত্র দেখাইবার জন্য একটা স্থূল নক্ষত্রকে অরুন্ধতী বলা হয় এবং তাহাতে একাগ্রতা সিদ্ধ হইলে, বলা হয়—ঐ স্থূল নক্ষত্রটি অরুন্ধতী নহে, উহার কোলের সূক্ষ্ম নক্ষত্রটি অরুন্ধতী আর তুমি সূক্ষ্মকে একেবারে দেখিতে পাইবে না বলিয়া তোমাকে একটি অবলম্বন দেওয়া হইয়াছিল,

সেইরূপ সূক্ষ্ম চৈতন্যকে কোনরূপে মানুষ পায় না বলিয়া মায়ার সাহায্যে নামরূপের সাহায্যে তাহাকে পাইবার কৌশলই ইহা। আর এই যে তাঁহার মায়া মানুষ মূর্ত্তি এ মূর্ত্তি মানুষের কল্পনা নহে। মায়াই তাঁহাকে লইয়া ঈশ্বর ও জীব ভাব কল্পনা করেন। ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ইহা মানুষের নহে, মায়ার কল্পনা। শ্রুতি এই জন্য বলেন,—"ময়ি জীবত্বমীশ্বত্বং কল্পিতং বস্তুতো নাহি।" "মায়াকল্পিতদেশকালকলনা বৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্"। "যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্" ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রে ইহা পাওয়া যায়। ইহাতে নবীন জগতের ভয়ের কারণ কি বুঝা যায় না। মূর্ত্তিও যেমন বিবর্ত্ত, জগৎটাও তাঁহাতে মায়াকৃত বিবর্ত্ত মাত্র। ইহাতে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বা রাম-কৃষ্ণাদির বিকার কিরূপে হইবে? মায়ার ভিতরে থাকা পর্য্যন্ত ঐরূপ উপাসনা, কিন্তু,—

অবিজ্ঞাতে তত্ত্বে পরিগণনমাসীৎ প্রথমতঃ
শিবোঽহং য়ং পূজেয়ং গুরুরয়মহং পূজক ইতি!
ইদানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীত মনঘং
শিবঃ কঃ পূজা কা গুরুরপি চ কঃ কোঽহমিতিচ।

তাই আমরা বলিতেছি, তোমার রূপের ধ্যানে, তোমার যশোগানে, তোমার জন্য তীর্থাদিভ্রমণে বিকলতা হইতেই পারে না। বরং ইহাই আবশ্যক। কারণ যখন তুমি আপন স্বরূপে আপনি আপনিই থাক, তখন "বেদা যত্র নিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠীতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি" এখানে উপাসনাও নাই, পূজাও নাই, এমন কি দ্বিতীয় কেহই নাই; কে কাহার পূজা করিবে? তাই আমারা বলিতেছি, যিনি নির্গুণ তিনিই সমকালে আত্মা অবতার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম। নবীন জগৎ এই গুলিকে পৃথক্ ভাবে, স্বতন্ত্র ভাবে যদি গ্রহণ করে, তবে তাহার বিষম ভ্রম ' বারান্তরে অন্যকথা আলোচনা করা হইবে।

ভাল থাকা।

স্থূল জগতে কত লোকে কত ভাবে ভাল থাকিতে ইচ্ছা করে—চেষ্টাও করে। কিন্তু স্থূল জগতকে লইয়া কয় জন মনুষ্য ভাল আছে? কয় জন ভাল থাকিয়া

ছিল ? যাহা হয় না—যাহা হইতে পারে না তাহা যদি মানুষ বুঝিতে চেষ্টা করে তবে বুঝি মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিবার উন্মত্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যাহা সম্ভব তাহার জন্যই পুরুষকার করিতে প্রাণ পণ করিতে পারে।

এই স্থূল জগতে জীবনের কোন অবস্থায় শান্ত ভাব ভাল লাগে। কোন উৎপাৎ থাকিবে না, কোন ভয় থাকিবে না, কেহ বিরক্ত করিবার থাকিবে না। জগৎটার চারিদিকে শুধু গোলাপ ফুটিয়া থাকিবে, শুধু প্রস্ফুট পদ্ম ভাসিয়া থাকিবে; আর পদ্মে পদ্মে ভ্রমর ঝঙ্কার করিবে, ফুলে ফুলে প্রজাপতি খেলা করিবে। কোন জিনিষ এখানে শুষ্ক থাকিবে না, কেহ এখানে কাঁদিবে না, কেহ বিরস মুখে থাকিবে না। এখানে সবাই সাত্ত্বিক হইবে, কেহ কাহারও হিংসা করিবে না; কোথাও কাহারও রোগ শোক আধি ব্যাধি থাকিবে না; চারিদিকে যাহা দেখিবে তাহাই যেন হাসি মুখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে।

এই স্থূল জগতে এ সব হয় না। কাজেই বড় ঘরের পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্যও সব সুখ, সব হাসি, সব সুখের দৃশ্য এখানে স্থায়ী হয় না। তবু যদি তাঁহারা মনে করেন যতদিন পারি ততদিন ত সুখটা ভোগ করি—তবে যাঁহারা প্রথম জীবনে এই সুখ ভোগের চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের শেষ জীবনটা দেখিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। তাহা কেহ দেখিবেও না। সাবধান কেহ বুঝি পূর্ব্ব হইতে হয় না। করে, ঠকে শেষে যখন আর উপায় নাই তখন ফস্তায়।

কিন্তু স্থূল জগতে সব সুন্দর কোথাও নাই। সব সুন্দর মিলে ভাবনা রাজ্যে। সাধনা বলে যাঁহারা ভাবনা রাজ্যে নিত্য থাকিতে পারেন তাঁহারা চিরদিন নবীন কিশোর নবীনা কিশোরী লইয়া শুধু গোলাপ, শুধু পদ্ম, শুধু ভ্রমর, শুধু প্রজাপতি শুধু চাঁদের জোৎস্না, শুধু নদীতীরে পূর্ণিমার রাত্রে বালুকার উপরে জোৎস্নার ঘুম লইয়া থাকিতে পারেন।

স্থূল জগতে যতদূর সম্ভব নয়ন শ্রবণ রসায়ন বস্তু সংগ্রহ করিবার সুবিধা যাঁহাদের আছে তাঁহারা ভাবনা রাজ্যে যাইবার জন্য ঐ বস্তু গুলিকে তাঁহার উদ্দীপক ভাবে সংগ্রহ করিতে পারেন। ভক্তি রাজ্যে স্থিতির জন্য সাধনার উদ্দীপক বস্তু সংগ্রহ করা সাধকেরই সাজে। বিলাসের জন্য ঐরূপ করা সভ্য জগতের বাতুলতা মাত্র।

জীবনে আবার এমন দিন আইসে তখন অস্বভাবিক যাহা কিছু—অস্থায়ী যাহা কিছু তাহা যেন ভাল লাগে না। সংসারেও থাকিব অথচ অপ্রীতিকর কিছুই

থাকিবে না—সব হাসি সব সুখ, সর্ব্বত্র গোলাপ, সর্ব্বকালে জ্যোৎস্না ইহা হইতেই পারে না। গোলাপ শুখাইবে না, ফুলের পাপড়ী ঝরিয়া পড়িবে না, প্রজাপতিকে পক্ষীতে ধরিয়া খাইবে না, কেহ রোগে যাতনা পাইবে না—ইহ সংসারে ইহা অসম্ভব।

যাঁহারা ঠিক পথে চলিতেছেন তাঁহাদের কি ভাল লাগে? তাঁহাদের ভাল লাগে যেখানে রোগ শোক দমন করিয়া কেহ শান্তভাবে আছেন, যেখানে জ্বালা যন্ত্রণা গুরু দুঃখ ভার অগ্রাহ্য করিয়া কেহ হাসিতে পারিতেছেন, যেখানে মৃত্যুর ভীষণ অত্যাচার দেখিয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কেহ বলিতে পারিতেছেন এ তোমার মিথ্যা অভিনয়—ইহাতে ব্যথিত হইবার কিছু নাই।

ঐ যে সৌখিন পুরুষটি, ঐ যে বিলাসিনী নারীটি প্রথম বয়সে ইহারা সব সৌখিনতা সব বিলাসিতা করিয়াছেন; প্রথম বয়সে ইহারা সংযমটি একবারেই উপহাসের বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিয়া ছিলেন। আর এখন? এখন ইহাদের নিত্য বিলাপগাথা বুঝি শুনিতে পারা যায় না।

দেখনা ঐ যে স্ত্রীলোকটি দুঃখ করিতেছে হায়! এই দুঃখ ত আর সহিতে পারি না। হায়! আমার কি তখন কেহই ছিল না যে আমাকে এই দুঃখের কার্য্য হইতে তখন টানিয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে না পারিত। আমার আরও কত কর্ম্ম বাকী আছে? আরও কত ভোগ আমার হইবে? নারায়ণ! মধুসূদন তুমিও কেন আমায় টানিয়া রাখিলে না?

লোকে বলে বড় জটিল সমস্যা এইটি। হৃদয়ের রাজা হৃদয়ে সর্ব্বদা আছেন আমি তাঁহাকে ভজি বা না ভজি, তাঁহাকে জানি বা না জানি তিনি কেন আমায় পাপ হইতে টানিয়া রাখেন না? তিনি কেন আমায় এমন কর্ম্ম করিতে দেন, যাহার ফলে শেষে আমায় এতই যাতনা পাইতে হয়? অবোধ শিশু সাপটিকে সুন্দর দেখিয়া যখন সর্পটি ধরিতে যায় তখন মাতা দৌড়িয়া আসিয়া ছেলেকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা করেন। ছেলে ত তখন মাকে ডাকে না। তথাপি ত মা বিপদ দেখিয়া রক্ষা করেন। সেইরূপ যিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদ্রষ্টা হইয়া রাজাধিরাজরূপ রূপে হৃদয়ে বসিয়া আছেন; তিনি ত আছেন, বিপদ ত দেখিতেছেন তবে মায়ের মত না ডাকিতেও তিনি কেন রক্ষা করেন না?

এক জগতের ব্যাপার অন্য জগতে আশা করিয়া মূঢ় লোকে কথাটিকে বড় জটিল করিয়া ফেলিয়াছে। স্থূল জগতে স্থূলে রক্ষা হয় কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে রক্ষা হয়

সূক্ষ্ম ভাবে। আবার যাঁহারা সূক্ষ্মভাবনা রাজ্যে থাকিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভাবনা রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা স্থূলেও রক্ষা করেন। বহুজনে ইহা ত প্রত্যক্ষ করেন যে ভক্তকে ভগবান স্থূলেও বহু বিপদ হইতে রক্ষা করেন। সাপ বাঘের হাত হইতে নানা ভাবে রক্ষা করেন। তুমি ভাবনা রাজ্যে যাইবার সাধনা কর, সাধনা করিয়া করিয়া তুমি ভক্ত হইয়া যাও। তোমাকে শ্রীভগবান হাতে ধরিয়া এই দুঃখ সংসার সাগর হইতে পার করিয়া দিবেন। থাকিয়া দেখ তিনি করিয়া দেন কি না নিজেই বুঝিবে। তাঁহারই কথা—

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ"।

তুমি থাকিবে স্থূল লইয়া, তুমি ভাবনা রাজ্য মানিবে না, সূক্ষ্ম জগৎ—সূক্ষ্ম জগতের রাজা যিনি তিনি সর্ব্বদা ভাবনা রাজ্যে থাকেন, যিনি ভাবনা রাজ্য হইতে অবতরণ করিয়া স্থূলেও বিহার করেন সেই অবতারকে তুমি মানিবেই না, তোমার এক্ষেত্রে রক্ষা হইবে, যাহাদের চক্ষে তোমার বিপদ পড়িবে তাহাদের দ্বারা। কাহারও বিপদ দেখিলে মানুষের মধ্যে যাহার যতটুকু শক্তি সে সেই ভাবে রক্ষা করে ইহা ত দেখাই যায়। যাহাদের মধ্যে স্বার্থ প্রবল হইয়া পশুত্ব আসিয়া গিয়াছে তাহারা অবশ্য অপরের বিপদ দেখিয়াও দেখিবে না। কিন্তু যেখানে মানুষ এখনও মনুষ্যত্ব হারায় নাই, সেখানে মানুষ বিপন্ন দেখিলে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেই। আবার যে সমস্ত মহাত্মা সাধনা দ্বারা ভাবনা রাজ্যে থাকিতে পারিতেছেন তাঁহাদিগকে স্মরণ জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করিতে পারিলে তাঁহারা ভক্তকে রক্ষা করেন। কিন্তু তুমি যদি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস না কর, তোমার জড়বুদ্ধি যদি স্থূল ভিন্ন ভাবনা রাজ্যের কোন কিছুই না মানে, তবে বল তোমার রক্ষা কিরূপে হইবে?

মনে কর এক জন ভক্তির কোন সাধনা করে নাই। স্থূল জগতের ব্যাপার লইয়াই সে থাকে। এমন লোকও সাপ বাঘের হাত হইতে রক্ষা পায় দেখা যায়। কিরূপে রক্ষা পায়? বিপদে পড়িয়া যখন এইরূপ লোক একবারে নিরূপায় হয়, যখন সে একবারে হতবুদ্ধি না হইয়া প্রাণের দায়ে কতর হইয়া স্থূল জগতের সমস্ত ছাড়িয়া দেয় তখন তাহার মন স্থূল ছাড়ে বলিয়া, স্বভাবতঃ ভাবনা রাজ্যের দেবতাকে ডাকিয়া ফেলে, রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিয়া সে শরণ লয়। এ শরণ লওয়া বড় স্বাভাবিক। রজ ও তম যে কোন উপায়ে হউক চাপা পড়িলেই সত্ত্বগুণ জাগিবেই। সত্ত্বগুণের স্বভাবই শ্রীভগবানের কাছে যাওয়া। এই স্বভাব সর্ব্বজীবে

আছে বলিয়াই জীবের ঈশ্বর শরণাপত্তি অজ্ঞাত স্বারেও আসিয়া থাকে। তাই জীবের রক্ষা তিনিই করেন। যাহারা জ্ঞাতসারে ভাবনা রাজ্যে যাইবার কার্য্য অভ্যাস করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তিনি স্থূলেও রক্ষা করেন। কিন্তু অসুর প্রকৃতির মানুষ যখন ভগবান আছেন এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসকে নিজের দম্ভদ্বারা শতচেষ্টা করিয়া ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত করে তখন তাহাদের রক্ষা আর কে করিবে?

তুমি পাপ করিতে যাইবে গোপনে। কিন্তু গোপনে থাকিয়াও যিনি শরণাপন্নকে গোপনে রক্ষা করেন তাঁহাকে মানিবে না—তোমাকে পাপ হইতে, গোপন হইতে, রক্ষা করিবে কে? তাঁহাকে মান, তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাঁহাকে ডাকিতে হয় যেরূপে সে সমস্ত সাধনা কর, বুঝিবে বিশ্বাসীকে—ভক্তকে তিনি সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। আরও বিশ্বাসী বা ভক্তেরে যখন যাহা ঘটে বিশ্বাসী বা ভক্ত তাহাকেই রক্ষা বলিয়া গ্রহণ করে। ভক্ত মৃত্যুতেও ভয় পায় না। ভাবে, তাঁহার কাছে যাইতেছি। মৃত্যুতেও ভক্ত সুখ পায়—অপার আনন্দে মগ্ন হইয়া যায়। ভাবনা রাজ্যে যাইতে পারিলেত শরীরের ক্লেশও অনুভূত হয় না। ভাবনা রাজ্যে থাকিতে পারিলে মৃত্যুও ভয় উৎপাদন করিতে পারে না। শাস্ত্র তাই বলেন ধারণাভ্যাসী হও। নিত্য ভাবনা রাজ্যে তাঁহার কাছে বসিবার বা উপাসনা করিবার অভ্যাস কর সর্ব্ব বিপদ হইতে তোমার রক্ষা হইবে। আর যদি তাঁহার তত্ত্বটি এই জীবনেই বুঝিতে পার তবে এইখানেই তিনি তোমাকে তাঁহার সঙ্গে এক করিয়া লইয়া থাকেন। ভাবনা রাজ্যে ভক্ত সর্ব্বদা নির্ভয়। আর চিৎ রাজ্যে জ্ঞানী চিন্ময় রূপে এই জীবনেই অবস্থান করেন। তাই ভগবান বলেন "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্" জ্ঞানী আত্ম ভাবেই—চৈতন্য ভাবেই অবস্থান করেন, আর স্বপ্ন, জাগ্রত সুষুপ্তি লইয়া খেলাও করেন।

ভাল থাকিতে চাও ত ধারণাভ্যাসী ভক্ত হও—হইয়া বিচারবান্ জ্ঞানী হও। বড়ই ভাল হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা কর ভাবনা রাজ্যে থাকিবার সাধনা কি? উত্তরে শাস্ত্র বলেন একান্তে যখন প্রত্যহ নিত্য ক্রিয়া করিবে তখন প্রথমেই এইটি ভাবিয়া লইবে যে আমি চেতন—চেতন, চেতনের উপাসনা করিতে যাইতেছে। আমি চেতন ইহার বিচার পূর্ব্বেই শুনিয়া রাখা উচিত।

দ্বিতীয় কার্য্য হইতেছে শরীর মধ্যে যে স্থানে রাজাধিরাজের স্থান, সেই স্থানে

হৃদয়ের রাজাকে স্মরণ করিয়া, করিয়া নিত্য ক্রিয়ার পরে, মানস পূজা কর। ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সেই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও, প্রণাম কর, প্রদক্ষিণ কর, ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়া পূজা কর। তাঁহার সহিত কথা কও, তাঁহার কাছে দুঃখ জানাও। মনকে এই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত রাখ তবেই ইহার বিষয় চিন্তারূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বন্ধ হইয়া যাইবে।

তৃতীয় কার্য্য হইতেছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা তুমি কে আমিই বা কে।

এই তৃতীয় কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ইহার উত্তর হইতেছে আমি চেতন। চেতন হইলেও ভ্রমে আমি আমাকে দেহদ্বারা খণ্ডিত বোধ করিয়া ফেলিয়াছি। ভ্রমজ্ঞান এত দৃঢ় হইয়া গিয়াছে যে চেতনের খণ্ড হয় না, চেতনের কোন দুঃখ নাই, চেতন কখনও মরে না অর্থাৎ জড় হয় না এগুলি বিচার দ্বারা বুঝিতে পারিলেও কার্য্যে এই ভাব থাকে না। এইজন্য একান্তে প্রত্যহ নিত্য ক্রিয়া করা চাই, মানস পূজা করা চাই, আমি চেতন, আমি নিঃসঙ্গ, আমার সহিত জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই, প্রত্যহ ইহার বিচার চাই। শুধু নিত্য ক্রিয়া কালেই এই করিব, অন্য সময়ে ইহার স্মরণও করিব না ইহা হইলেও হইবে না। ব্যবহারিক জগতেও স্মরণ রাখা চাই। আমি খণ্ড চৈতন্য হইয়া যে অখণ্ড চৈতন্যকে ডাকি তিনিই আছেন তাঁহার উপরে বিচিত্র সৃষ্টি যাহা ভাসিয়াছে সে বিচিত্র ভাব সত্য সত্য ভ্রমজ্ঞান জনিত উপলব্ধি মাত্র। যেমন সমুদ্রকে তরঙ্গ ভাবে দেখা হয়—তরঙ্গ কিন্তু জলই তথাপি তরঙ্গ আকারে আকারিত হওয়া, এটা ভ্রমেই দেখা হয়, চক্ষের দোষেই দেখা হয় সেইরূপ ভ্রম জ্ঞানেই ব্রহ্মকেই মানুষ পশু পক্ষী আকাশ বায়ু ভাবেই দেখা হয় মাত্র। বিচিত্র ভাবে যে দেখা এটা আত্মমায়া দ্বারাই হয়। কাজেই রাগ দ্বেষ, শত্রুতা মিত্রতা, ভালবাসা, মন্দ বাসা সেই পূর্ণ সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের উপরেই মায়ার খেলা মাত্র। "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ"—স্থূলে যাহা দেখি, সূক্ষ্মে মনের খেলাও যাহা দেখি তাহা মায়া মাত্র। এ সব মিথ্যা। মিথ্যাগুলি অখণ্ড তাঁহার উপর ভাসে মাত্র। এই ভাবিয়া জগতের খেলা অগ্রাহ্য করিয়া চেতন পুরুষকে সর্ব্বত্র দেখার অভ্যাস করিয়া ফেল, চেতন চেতনের সহিত মিশিবে। সংসার-দুঃখ আর থাকিবে না। ইতি—

কুন্তী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই রাত্রে পাণ্ডুর সহিত কুন্তীদেবীর বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন ভীষ্মদেব, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর ; পাণ্ডু এবং পট্টবস্ত্র পরিহিতা টুক্‌টুকে বধু লইয়া রথে উঠিলেন। রথ যথাসময়ে কত দেশ দেশান্তরের মধ্য দিয়া হস্তিনার প্রাসাদের দ্বারে আসিয়া লাগিল। বস্ত্রাবৃতনেত্রা গান্ধারী দাসী ও সখীগণের সাহায্যে হাতড়াইয়া কোনওরূপে বর ও কন্যা বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। সপ্তাহ কাল ধরিয়া হস্তিনার ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বাহিল। দীন দুঃখী প্রজারা এই কয়দিন উদর পূর্ণ করিয়া রাজ বাটীতে কত ক্ষীর, মিঠাই ও মিষ্টান্ন খাইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দান ও দক্ষিণার মোট, মুটের মাথায় চাপাইয়া, বাহকের সহিত একত্রে গৃহে ফিরিলেন।

বিবাহের কিছু দিন না যাইতে যাইতে ভীষ্মদেব আবার মদ্র রাজকন্যা শল্যের ভগিনী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর সম্বন্ধ স্থির করিলেন। আবার পাণ্ডুর বিবাহ। পুনরায় অন্তঃপুর ছেলে, মেয়ে, চাকর, চাকরাণী, আত্মীয় ও কুটুম্বিনী-গণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজ্যে বাজনা বাদ্যের রবে কাণ পাতা দায়।

"কা কস্য পরিবেদনা।" বিবাহ হইল। কিন্তু বিবাহের দুদিন পরে পাণ্ডু নব পরিণীত মাদ্রী এবং কুন্তীদেবীকে লইয়া সহসা নিরুদ্দেশ হইলেন। রাজ্য পাট গ্রহণ করিবার আশঙ্কায়, রাতারাতি মৃগয়ারছলে দুই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তিনি পুনরায় বনে পলায়ন করিলেন। এখন তাঁহার সন্ধান পাওয়া ভার।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পাণ্ডু আর হস্তিনায় ফিরিলেন না। তিনি পত্নীদ্বয় সঙ্গে, বনে বনে মৃগ শীকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে বনের যেখানে সেখানে আবাস সংস্থাপন করিয়া রজনী যাপন করিতেন।

এইরূপে বনে মৃগয়া করিতে করিতে কতদিনের পর একদিন পাণ্ডু অজানিতে এক মৃগরূপী ঋষি বধ করিয়া শাপ গ্রস্ত হইলেন। ঋষি মৃত্যুকালে তাঁহাকে— "স্ত্রীর স্পর্শে মৃত্যু হইবে।" বলিয়া শাপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। শাপগ্রস্ত হইয়া পাণ্ডু ভোগ ও বিলাসীতা পরিত্যাগ করিলেন—রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া

ঋষি ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় বল্কল ধারণ করিলেন। ত্রিসন্ধ্যা ও নিত্য নিয়মিতরূপে ভজন সাধনাদিতে মন দিলেন। বলিতে কি তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, আহার ও বিহার সমস্ত ঋষিগণের ন্যায় হইয়া উঠিল। তিনি দিনান্তে একবার মাত্র একপাকে স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া আহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনেক দিন যায়। পাণ্ডুর বড় ইচ্ছা তাঁহার একটী পুত্র হয়। তিনি তাঁহার আশপাশের প্রতিবেশী ঋষি পুত্র এবং ঋষি কন্যাগণকে বনে ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতে দেখেন, আর ভাবেন, আমার যদি এইরূপ একটি ছেলে কিম্বা মেয়ে হইত। তাহারা কলরব করিয়া পূজার ফুল তুলিত, জল আনিত তিনি তাহাদের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে তাহাদের সুকুমার ভাব ভঙ্গী দেখিতেন।

পাণ্ডুর যখন মনের অবস্থা এই প্রকার তখন একদিন কুন্তীদেবী তাঁহাকে আপন দুর্ব্বাসা-দত্ত বরমন্ত্রের কথা বলিলেন। পাণ্ডু শুনিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি কুন্তীকে বলিলেন—"তুমি একথা আমায় এতদিন কেন বল নাই ?

কুন্তী বলিলেন—"মনে ছিল না।"

পাণ্ডু উত্তর করিলেন—"তোমার কাছে যখন এমন বরমন্ত্র আছে তখন অতি সত্বর পুত্র লাভে যত্নবতী হও।"

কুন্তী পতির আদেশ পাইবা মাত্র নির্জ্জনে গিয়া দেবতাদিগকে স্মরণ করিলেন এবং যথাসময়ে তাঁহার অনূঢ়া অবস্থার মত তাঁহাদিগের বরে তিনি একে একে তিনটী সুন্দর পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজের বরে তাঁহার যে পুত্র হইল তাঁহার নাম যুধিষ্ঠির ; পবনদেবের বরে যে পুত্র হইল তাঁহার নাম ভীম এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বরে যে হইল তাঁহার নাম অর্জ্জুন রাখিলেন। একাধিক ক্রমে তিন পুত্রের মুখ দেখিয়া পাণ্ডুর মুখে আর আনন্দ ধরে না।

এখন মাদ্রী শুনিলেন যে তাঁহার কুন্তীদিদি মন্ত্রের স্বভাবে তিন পুত্র লাভ করিয়াছেন। এই আর আছে কোথায় ! তিনি দিদিকে ধরিয়া বলিলেন আমায় মন্ত্র দিতে হইবে। কুন্তী স্বীকার করিলেন কিন্তু একবারের ভিন্ন দ্বিতীয়বার দিবেন না বলিলেন। মাদ্রী বলিলেন—"আচ্ছা দিদি তাই দাও।"

কুন্তী মন্ত্র দিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি মাদ্রী বুঝিয়া বুঝিয়া দেবতাদিগের মধ্যে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে স্মরণ করিলেন। তাঁহাদের বরে তিনি দুই পুত্র লাভ করিলেন। তাঁহাদের নাম হইল নকুল ও সহদেব।

এদিকে নিরুদ্দেশ হইবার পর পাণ্ডুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্র লাভের বিষয় কাহার কাছে ছাপা রহিল না। আর কেহ জানুক বা না জানুক, যুধিষ্ঠিরের জন্মগ্রহণের অনতিকাল পরে এ বার্ত্তা সর্ব্বাগ্রে গিয়া গান্ধারীর কাণে উঠিল। তবে ত. যাহার আগে ছেলে হইয়াছে, সেই রাজত্ব পাইবে। এই ঈর্ষা বশতঃ গান্ধারী গর্ভপাত করিলেন। শেষে এ নির্ব্বুদ্ধিতার ফল এই হইল যে, গান্ধারীদেবী কেবলমাত্র একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। তখন সমস্ত অন্তঃপুর মধ্যে রাণীর ছেলে হইয়াছে—পুত্র হইয়াছে এই প্রকার একটা রব উঠিল। একজন দাসী রাজসভায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কিন্তু কোথায় সে ছেলে আর কোথায় কি! ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরে আসিয়া শ্রবণ করিলেন যে, রাণী একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছেন। তিনি এই অভাবনীয় ঘটনার কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া, মহামুনি ব্যাসদেবকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। কারণ ব্যাসদেব এক সময়ে গান্ধারীদেবীকে, "তুমি শত পুত্রের জননী হও।" বলিয়া বর দিয়াছিলেন।

অন্তর্যামী—স্বয়ং নারায়ণ স্বরূপ ব্যাসদেব আসিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন ও প্রকৃত কথ. গোপন করিয়া "আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না।" বলিয়া রাজাকে এক শত একটি ঘৃতপূর্ণ কুণ্ড আনাইতে বলিলেন। কুণ্ড আসিলে তিনি পিণ্ডটীর উপর সরু ধারায় জলসেচন করিতে লাগিলেন; করিতে করিতে পিণ্ডটী শত ধার বিভক্ত হইয়া এক শত একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডে পরিণত হইল। তখন তিনি সেগুলিকে তুলিয়া পৃথক এক একটী কুণ্ডে ডুবাইয়া রাখিতে লাগিলেন এবং এরূপ করা হইলে, একটী আনাড় কক্ষে কুণ্ডগুলি সারি সারি বসাইয়া বলিয়া গেলেন, "যাবৎ উহারা জন্ম লাভ করিয়া কাঁদিয়া উঠে তাবৎ তোমাদের কেহ এগুলিতে হাত দিও না।"

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, ভীমের জন্ম গ্রহণের অল্পদিন পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম পুত্র কুণ্ড মধ্যে জন্মলাভ করিয়া গর্দ্দভের চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সে দিন আকাশ শকুনি, গৃধিনী ও চীলে ভরিয়া গেল, অকস্মাৎ দিনমনি ম্লান ও নিষ্প্রভঃ হইয়া পড়িলেন, বিনা মেঘে ঘন ঘন বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, দিকে দিকে ধক্ ধক্ দিক্ দাহ ও উল্কাপাতের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং অন্যান্য আরো নানাবিধ অমঙ্গল ও অশুভ সূচক চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন সকলে এক মত হইয়া যুক্তকরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিল, "মহারাজ, আপনার বড় অলক্ষণে পুত্র হই-

য়াছে, আপনি উহাকে অচিরে পরিত্যাগ করুন, নতুবা আপনার কোন প্রকারে কুশল দেখিতেছি না। কিন্তু বাৎসল্য হেতু রাজা এমনি মোহাচ্ছন্ন যে তিনি তাহাদের সে কথা কর্ণে তুলিলেন না।

ক্রমে ক্রমে এই প্রকারে যথা সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র ও এক কন্যা কুণ্ড মধ্যে জন্ম লাভ করিয়া, হস্তিনায় বাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্য্যোধন, তৎ কনিষ্ঠের নাম দুঃশাসন, এবং কন্যাটির নাম হইল দুঃশলা; আর এমনি সব অন্যান্য ছেলেদেরও নামে নাম মিলাইয়া নামকরণ হইল।

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু হইতে কৌরব ও পাণ্ডব নামে দুই কুল উদ্ভব হইল। পাণ্ডুর যে পঞ্চপুত্র তাঁহারা পাণ্ডব নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্রকে লোকে কৌরব বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু পাণ্ডুর ভাগ্যে পুত্রসঙ্গ লাভ বড় বেশী দিন ঘটিয়া উঠে নাই। জানি না কিরূপে একদিন তাঁহার মাদ্রীর অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ হইয়া গেল। তিনি ঋষি শাপে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। মাদ্রী ক্রোড়ে তাঁহার দুই পুত্র নকুল ও সহদেবকে কুন্তীর করে সমর্পণ করিয়া, পাণ্ডুর অনুমৃতা হইলেন; আর কুন্তীদেবী পঞ্চপুত্র লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের দারস্থ হইলেন।

কতহুঁ যতন করি উরপর লেখই
মৃগমদচিত্রক পাঁতে।
মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল
উরপর দেয়লি হার।
তাম্বুল সাজি বদন পর দেয়ল
নিছই তনু আপনার॥
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ
চরণ কমল তলে যাবক লেখই।

ভোগ—ছি ছি!—হঠাৎ উভয়ে থতমত খাইল। দেখিল রাজ্ঞী।

রাজ্ঞী—কিরে ছিছি কিসের? "তোরা"—রাণী বলিতে গিয়া বলিলেন না। রাজ্ঞী আজ বড় বিষণ্ণ। সখীরা কোন কিছু বলিতে না বলিতে লীলা বলিতে লাগিলেন, দেখ্ আজ কদিন হইতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। সখীরা ব্যস্ত হইয়া শুনিতে চায়—ইহারা রাজ্ঞীকে বড়ই ভাল বাসিত। কে না বাসে? লীলা আপনিই বলিতে লাগিলেন;—

এ ভাবে আর হইবে না। লীলার কথা লীলা আপনিই আপনাকে বলিবে। সখী সম্বাদ আর হইবে না। লীলা আপন মনেই চিন্তা করিবে মূল গ্রন্থে যেমন আছে সেইরূপই থাকিবে। এত করিবার "সময়" আর নাই। তবে বিষয়কে সরস করিবার জন্য একটু আধটু আজ কালকার ঠাঁচের কথা থাকিতেও পারে।

লীলা একদিন চিন্তা করিতেছিলেন;—

প্রাণেভ্যোপি প্রিয়োভর্ত্তা মমৈষ জগতীপতিঃ।
যৌবনোল্লাসবান্ শ্রীমান্ কথং স্যাদজরামরঃ॥ উ। ১৬। ১৯
ভর্ত্তানেন সহোত্তুঙ্গস্তনী কুসুম সদ্মসু।
কথং স্বৈরং চিরং কান্তা রমে যুগশতান্যহম্॥ উ। ২০।
তথা যতে যত্নমতস্তপোজপযমেহিতৈঃ।
রজনীশমুখোরাজা যথা স্যাদজরামরঃ॥ উ। ২১।

আমার এই স্বামী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পৃথিবীর ঈশ্বর, যৌবন উল্লাসে সদা প্রফুল্ল। এই শ্রীমান্ আমার দয়িত কিরূপে অজর অমর হন? আমার কোন সাধত এখনও মিটিল না—আমি উত্তুঙ্গস্তনী চিরযুবতী থাকিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া কুসুমভবনে ইঁহাকে লইয়া বিহার করিতে চাই। কি করিলে আমরা কেহই বৃদ্ধ না হই? জপ তপ সংযম—যাহা করিলে আমার এই চন্দ্রবদন প্রাণেশ্বর অজর অমর হয়েন আমি তাহাই করিব। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ তপোবৃদ্ধ বিদ্যাবৃদ্ধ সকল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিব কি করিলে রাজার মৃত্যু না হয়।

রাণী মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া সকলকে ডাকাইলেন। কত বিনয় করিয়া সকলকে পুনঃ পুনঃ রাজার অমরত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন তপ জপ সংযমে সমস্ত সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু অমরত্ব লাভ হয় না।

লীলা প্রিয় বিয়োগ ভয়ে বড়ই ভীতা হইলেন। হইয়া ভাবিলেন—

মরণং ভর্ত্তুরগ্রে মে যদি দৈবাদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বদুঃখনির্ম্মুক্তা সংস্থাস্যে সুখমাত্মনি॥ উ। ১৬। ২৬॥
অথ বর্ষসহস্রেণ ভর্ত্তাদৌ চেন্মরিষ্যতি।
তৎ করিষ্যে তথা যেন জীবো গেহান্ন যাস্যতি॥ উ। ২৭॥

যদি দৈবাৎ স্বামীর অগ্রে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া আমি আত্মাতে সুখে অবস্থান করিতে পারিব। কারণ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে আমি কখনও বিচলিত হই নাই। ভাবনায়, বাক্যে ও কার্য্যে স্বামীকে গোপন করিয়া কিছুই করি নাই। কিন্তু বর্ষসহস্র পরেও স্বামী যদি অগ্রে মরেন তাহা হইলে এমন উপায় করিব যাহাতে তাঁহার জীবাত্মা আমার গৃহ হইতে আর কোথাও না যাইতে পারেন। তখন তাঁহার জীবাত্মা আমাদের শুদ্ধ অন্তর মণ্ডপে ভ্রমণ করিবেন আর আমি স্বামী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অবলোকিত হইয়া যথাসুখে বাস করিব।

আমি তাঁরে দেখিতে না পাই ক্ষতি নাই কিন্তু তিনি আমায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন ইহা যদি আমি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারি অন্ততঃ এই ভাবটি যদি বিশ্বাসেও অনুভব করিতে পারি তবে আমার দুঃখ কি?

ইহাই ত প্রেমের বীজ। আমি দেখিতে পাই বা না পাই তাহাতে কি আইসে যায় ? কিন্তু আমি যদি স্থির বিশ্বাসে বুঝিতে পারি সে আমায় সর্ব্বদা দেখিতেছে তখন আমার কত সুখ। সে আমায় কত ভালবাসে। সে আমায় দেখিলে কত সুখী হয়। আমি তারে না দেখিতে পাইলেও সে আমায় দেখিয়া সুখী হইতেছে তাহার এই সুখেই আমার সুখ।

অদ্যৈবারভ্যৈতদর্থং দেবীং জ্ঞপ্তিং সরস্বতীম্।

জপোপবাস নিয়মৈরাতোষং পূজয়াম্যহম্ ॥ উঃ। ১৬। ২৯ ॥

আজ হইতেই আমি আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য—জপ উপবাস নিয়মাদি দ্বারা জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য পূজা করিব।

লীলা মনে মনে ইহাই নিশ্চয় করিল। স্বামীকে নিজের সঙ্কল্প বলিল না নিয়ম পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিল।

স্বামীর অজ্ঞাতে উপবাস ব্রত করা কি শাস্ত্র অনুমোদন করেন ? করেন না—কারণ শাস্ত্র বলেন ঃ—

যা স্ত্রী ভর্ত্রাঽননুজ্ঞাতা উপবাস ব্রতং চরেৎ।

আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুর্মৃতা নরকমৃচ্ছতি ॥

যে স্ত্রী পতির অনুমতি না লইয়া উপবাস ব্রত করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার নরকে গমন ইচ্ছা করে।

লীলা ইহা জানিতেন। এই সন্দেহ নিরাস জন্য আবার জ্ঞানবৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—ইহাই শাস্ত্রবিধি বটে কিন্তু—

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্তৃহিতং চরেৎ।

ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ ॥

ব্রত উপবাস নিয়ম প্রভৃতি লৌকিক কার্য্য দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে স্বামীর হিতাচরণ সর্ব্বদা করা যায়।

স্বামীকে না জানাইয়াও স্বামীর হিতের জন্য ব্রত উপবাসাদি করা যায় তাহাতে শাস্ত্র বাধা দেন না।

লীলা মহোৎসাহে সাবিত্রীর মত ত্রিরাত্র ব্রত আরম্ভ করিল। এই ব্রতের নিয়ম

হইতেছে তিন রাত্রি করিয়া উপবাস এবং চতুর্থ রাত্রে পারণা "ত্রিরাত্রস্য ত্রিরাত্রস্য পর্য্যন্তে কৃত পারণা" লীলা তিন তিন রাত্রি উপবাস করিত, পরে পারণা। আবার উপবাস আবার পারণা। ইহার উপর দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী ইহাদের পূজা করিত। লীলা স্নান, দান, তপস্যা, ধ্যান ইত্যাদি কার্য্যে শরীরকে নিযুক্ত রাখিয়া সমুদায় আস্তিক্য ও সদাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। লীলা আরও যথাকালে যথোদ্যোগে যথাশাস্ত্রে এবং যথাক্রমে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিত কিন্তু ব্রত উপবাসাদির কথা স্বামীকে জানিতে দিত না।

ত্রিরাত্র শতমেবং সা বালা নিয়মশালিনী।
অনারতং তপোনিষ্ঠামতিষ্ঠৎ কষ্ট চেষ্টয়া ॥ ৩৪ ॥

অনুষ্ঠান পরায়ণা বালিকা লীলা সেই কষ্টকর তপোনিষ্ঠায় নিরত থাকিয়া ১০০টি ত্রিরাত্র ব্রত করিল।

রাজমহিষীর তপস্যায় ভগবতী গৌরবর্ণা বাগ্দেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং লীলাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন—

জয় জন্মজরাজ্বালাদাহদোষশশিপ্রভে।
জয় হার্দ্দান্ধকারৌঘনিবারণরবিপ্রভে ॥ উঃ। ১৬। ৩৭।
অম্ব মাতর্জ্জগন্মাত স্ত্রায়স্ব কৃপণামিমাম্।
ইদং বরদ্বয়ং দেহি যদহং প্রার্থয়ে শুভে ॥ উঃ। ৩৮ ॥

মা! তুমি জন্মজরা রূপ অগ্নিদাহ দোষযুক্ত জীবের নিকট জ্যোৎস্নারূপিণী এবং হৃদয়ের অন্ধকার রূপ পাপ নিবারণে সূর্য্যকিরণ স্বরূপিনী মা তুমি জয়যুক্ত হও।

হে অম্ব! হে মাতঃ! হে জগন্মাতঃ আমি কৃপণা—আমি কৃপার পাত্রী তুমি আমাকে ত্রাণ কর। আমি দুইটি বর প্রার্থনা করি। মঙ্গলময়ি ইহা আমাকে প্রদান কর।

একটি বর এই যে আমার স্বামীর দেহ বিগত হইলেও তাঁহার জীব যেন এই নিজ অন্তঃপুর মণ্ডপ হইতে অন্য কোথাও না যায়। দ্বিতীয় বর এই যে আমি ডাকিলেই যেন তোমার দর্শন পাই।

"তথাস্তু" বলিয়া সরস্বতী অন্তর্হিতা হইলেন। সাগর সমুত্থিত উর্ম্মিমালা যেমন সাগরে মিলাইয়া যায় সেইরূপ। "প্রোথায়োর্ম্মিরিবার্ণবে" ॥৪১॥

হরিণী গীতশ্রবণে কতই আনন্দিতা হয়! রাজমহিষী ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া সেইরূপ আনন্দে বিহ্বলা হইলেন।

কালচক্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পক্ষ মাস ঋতু ইহার বলয়, দিবস ইহার অরা, কেশর—প্রায় তির্যগ্ অনুপ্রোত শঙ্কু, বর্ষ ইহার দণ্ড, ক্ষণ ইহার নাভিমধ্যস্থ ছিদ্র, স্পন্দময় এই কালচক্রের ক্রম পরিবর্ত্তনে লীলার পতির আয়ুঃশেষ হইল। শুষ্কপত্রের রসের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দেহ হইতে চৈতন্য, লিঙ্গদেহে অন্তর্হিত হইল।

আর লীলা! লীলা অন্তঃপুর মণ্ডপে স্বামীর মৃতদেহ দেখিয়া জলশূন্য স্থানে পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান হইল। লীলার অধর পল্লব বিষের ন্যায় উষ্ণ নিশ্বাস পবনে বিবর্ণীকৃত হইল। শেলবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় লীলা মরণাবস্থা প্রাপ্ত হইল। লীলা মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইয়া তমসান্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। দীপালোক অলঙ্কৃত গৃহশোভা ক্ষীণালোক হইলে যেমন হতশ্রী হইয়া পড়ে লীলাও সেইরূপ হইল। প্রবাহক্ষয়ে স্রোতস্বিনীর যেমন দশা হয় এই বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেইরূপ বিরসতা প্রাপ্ত হইল।

ক্ষিপ্রমাক্রন্দিনী ক্ষিপ্রং মৌনমূকা বিয়োগিনী।
বভূব চক্রবাকীব মানিনী মরণোন্মুখী ॥ ৪৯ ॥

বিয়োগ বিধুরা লীলা কখন রোদন করে কখন মূকের ন্যায় মৌন হয়। এই মানিনী চক্রবাকীর মত মরণকৃতনিশ্চয়া হইয়া উঠিল।

অথ তামতিমাত্রবিহ্বলাং সকৃপাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পত ॥ ৫০ ॥

তখন সেই অতিমাত্র শোকবিহ্বলা বালার প্রতি আকাশ ভবা—অশরীরিণী বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী অনুকম্পা করিলেন। হ্রদের জল শুষ্কপ্রায় হইলে শফরীর প্রতি প্রথম বৃষ্টি ধারা যেরূপ অনুকম্পা করে লীলার উপরেও ইহা সেইরূপ হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

কোন্‌টি সত্য ?

"লীলা" সরস্বতী বলিতে লাগিলেন "লীলা" শবীভূত তোমার ভর্ত্তাকে পুষ্প-রাশিতে আচ্ছাদন করিয়া অন্তঃপুর মণ্ডপে স্থাপন কর। পুষ্প একটিও ম্লান হইবে না আর দেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকন্তু ইনি শীঘ্রই আবার তোমার ভর্ত্তৃত্ব করিবেন। আকাশের মত বিশদ এতদীয় এই জীব তোমার এই অন্তঃপুর মণ্ডপ হইতে শীঘ্র কোথাও যাইবে না"।

ভ্রমর-শ্রেণি-নয়না লীলা ইহা শুনিলেন, বন্ধু দিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন। তাঁহারা আশ্বাস প্রদান করিল। জল পাইলে পদ্মিনী যেরূপ হয় লীলাও সেইরূপ হইলেন।

পতিকে সেই স্থানে স্থাপন করিয়া পুষ্পরাশি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলেন। নিধানিনী দরিদ্রার ন্যায় লীলা কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

অর্দ্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে—পরিজনগণ নিদ্রিত। সেই রাত্রেই লীলা একাকিনী অন্তঃপুর মণ্ডপে আসিল। আসিয়া অতি কাতর ভাবে ভগবতী জ্ঞপ্তী দেবীকে শুদ্ধ ধ্যান সহিত বুদ্ধিতে ডাকিল। সরস্বতী আসিলেন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে আমায় কেন স্মরণ করিয়াছ ? কেনই বা তুমি শোক করিতেছ ? সংসারটা ভ্রান্তিরই প্রকাশ মাত্র। মৃগতৃষ্ণিকার সলিল মত ইহা মিথ্যা।

লীলা—মা ! আমি একাকিনী জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না "নৈকা শক্নোমি জীবিতুম্"। আমার স্বামী এখন কোথায় আছেন ? কি অবস্থায় আছেন ? কি করিতেছেন ? আমাকে তাঁর নিকটে লইয়া চল। "সমীপংনয় মাংতস্ত"।

তুমি আমিও প্রিয়জনের মৃত্যুতে কত লোকের কাছে না এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া থাকি। মৃত প্রিয়জনের দর্শন লাভ হয় যদি আমরা লীলার মত সমাধি করিতে পারি তবে।

দেবী তখন বলিতে লাগিলেন :—

বরাননে ! চিত্তাকাশ, চিদাকাশ আর এই আকাশ—আকাশ এই তিন প্রকার। তন্মধ্যে চিদাকাশটি অন্য দুই আকাশ হইতেও শূন্য। অত্যন্ত সুক্ষ্ম বলিয়া ইহাদিগের

আকাশ নাম দেওয়া হয় চিদাকাশ হইতেছেন জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। চিত্তাকাশ হইতেছে বাসনাময় জগৎ। মহাকাশ হইতেছে এই যে নীল আকাশ যাহা সর্ব্বদা যেন মানুষ দেখিতেছে। এই তিনের মধ্যে মহাকাশ স্থূল হইলেও ইহাকেও আমরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিতে পারি না। চিদাকাশটি যখন আত্মচৈতন্য আর যখন এই বিশ্ব সেই আত্মচৈতন্যের কল্পনা মাত্র তখন তুমি ইহলোকের মত পর লোকটাকেও সেই চিৎ আকাশেই কল্পনা রূপে অবস্থিতি দেখিবে। তুমি চিদাকাশ ভাবনা কর— সমাধি যোগে আত্মচৈতন্যে স্থিতি লাভ কর তুমি তোমার স্বামীকে শীঘ্রই দেখিবে এবং যেমন দেখিবে সেই রূপই অনুভব করিবে।

তচ্চিদাকাশ কোশাত্মচিদাকাশৈক ভাবনাৎ।
অবিদ্যমানমপ্যাশু দৃশ্যতে থানুভূয়তে॥ উ। ১৭। ১১॥

তৎ ত্বৎপৃষ্ট ভর্ত্তবস্থানস্থলাদি বস্তুতশ্চিদাকাশকোশাত্মকমেব অতঃ পৃথগ বিদ্যামানমপি চিদাকাশস্যৈকাগ্রচিন্তনাৎ আশু ইত এব দৃশ্যতে অথ তত্র গত্বা অনুভূয়তে চেত্যর্থঃ।

চিদাকাশটিই আত্মচৈতন্য। চিদাকাশকাশ যাহা তাহা স্পন্দনাত্মিকা কল্পনা। তোমার ভর্ত্তা কোথায় আছেন এই যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ ইহার উত্তরে জানিও তোমার স্বামীর অবস্থানস্থল চিদাকাশকোশাত্মক। অতএব তোমার স্বামী পৃথক ভাবে অন্য কোথাও নাই। তুমি চিদাকাশে একাগ্র হইয়া চিন্তা করিবা মাত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। আর ইচ্ছা করিলে সেই স্থানে যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেও পারিবে।

তুমি মহাকাশ ও চিত্তাকাশ এই উভয় শূন্য স্থান লাভ কর তবেই তুমি চিদাকাশে স্থিতি বা সমাধি লাভ করিতে পারিবে। মহাকাশে পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও এই সমস্ত দেহ ভুলিয়া যাও এবং সঙ্কল্পজালময় চিত্তও ভুলিয়া যাও এই ভাবে স্থূল সঙ্কল্প মূর্ত্তি এই বহির্জগৎ ও সূক্ষ্ম সঙ্কল্প মূর্ত্তি এই অন্তর্জগৎ ছাড়িতে পারিলেই তুমি সেই পরম পদ লাভ করিবে।

দেখ আমরা যাহা যাহা অনুভব করি—তাহার অভাবও অনুভব করিতে পারি। তত্ত্বদর্শন দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় হইলেই দ্বৈত ভাব আর উদয় হয় না। ইহা উৎকট শ্রম সাধ্য হইলেও আমার বরে তুমি অদ্বৈতে পৌছিবে।

লীলা—যাহা যাহা অনুভব করি তাহার অভাবও অনুভব করিতে পারি এ কথা সত্য হইলেও অভাব বোধটা বড়ই ক্ষণিক হয়। যোগাদি অভ্যাসেও অত্যন্তাভাবটি আর কিছুক্ষণ থাকে সত্য কিন্তু ইহা ত স্থায়ী হয় না।

সরস্বতী—আত্মদর্শন কাহাকে বলে তাহা প্রথমে জানিয়া লও।

আর কিছুই নাই, আত্মাই আছেন, দৃশ্য বস্তু কিছুই নাই যিনি দ্রষ্টা ছিলেন তিনি দৃশ্যমার্জ্জন করিয়া আত্মভাবে দ্রষ্টৃ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন কিন্তু ঐ অবস্থা সম্বন্ধে ঐ সময়ে কোন কিছুই বলিতে পারেন না। তুমি সমাধি লাভ কর পরে আমার বরে তোমার অবিদ্যাক্ষয় বা দৃশ্যমার্জ্জন অবস্থা স্থিতি লাভ করিবে। বুঝিতেছ সাধনা দ্বারা আর কিছুই নাই এই অবস্থাতে পৌছানই কিন্তু আত্মভাবে স্থিতি। আত্মাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে করিতেই এক সঙ্গে আর কিছুই নাই অনুভবরূপ আত্মস্থিতি লাভ হইবে।

সরস্বতী ইহা বলিয়াই আত্মার সম্বন্ধীয় স্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি আত্মভাবে স্থিতি লাভ করিলেন। লীলাও তখন তাঁহার বরে অবলীলাক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন।

সমস্তই কল্পনা সমস্তই মিথ্যা লীলা সরস্বতী কৃপায় ইহা ঠিক জানিয়াছিল তথাপি মিথ্যার লীলা দেখিতেই লীলার ইচ্ছা।

লীলা সমাধি লাভ করিল।

তত্তত্যাজ নিমেষেণ সান্তঃকরণপঞ্জরম্।
স্বদেহং খমিবোড্ডীনা মুক্তনীড়া বিহঙ্গমী॥ উঃ। ১৭। ১৬।

আর এক নিমেষ মধ্যেই নিজের অন্তঃকরণ রূপ পিঞ্জর ত্যাগ করিল। বিহঙ্গিনী যেমন আপনার নীড় ত্যাগ করিয়া আকাশে উড্ডীনা হয় লীলাও সেইরূপ দেহ হইতে ও মন হইতে অভিমান সরাইয়া নিমেষ মধ্যে চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিল।

লীলা যেমন ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করিল অমনি তাহার স্বামীর যে সমস্ত সঙ্কল্প ছিল তৎসমস্তই কার্য্যে নিজের মধ্যে প্রতিভাত হইতে দেখিতে পাইল। দর্পণে যেরূপ চারি ধারের বস্তুর ছায়া পড়ে সেইরূপ।

লীলা চিদাকাশে থাকিয়াই দেখিল তাহার স্বামী নিজ বাসনা কর্ম্মানুরূপ দেহ গেহ ইত্যাদি সম্পত্তি লইয়া সেই চিদাকাশ ভবনে অবস্থিত। তাঁহার চারিদিকে

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

মূল, সমস্ত ভাষ্য ও টীকার আবশ্যকীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ এবং প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা। গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা আর নাই—ইহা সকলেই বলিতেছেন।

অল্পদিনেই এই পুস্তক সকলের নিকট আদৃত। প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। সহজ বোধ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার গভীর তত্ত্বসমূহের এমন প্রণালীতে আলোচনা এখন পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানপথের সাধনা দ্বারা জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা অন্য কোথাও এখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম ষটুক ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মূল্য ৪।০; দ্বিতীয় ষটুক ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় মূল্য ৪।০; তৃতীয় ষটুক ১৩ অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় মূল্য ৪।০।

ভদ্রা—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত। মহাভারতীয় সুভদ্রা-চরিত অবলম্বনে সামাজিক উপন্যাস। বিবাহ জীবনের নব অনুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। প্রতি যুবকের পাঠ করা উচিত। মূল্য ১।০।

কৈকেয়ী—মানুষ আপনা হইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মূল। দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হইতে পারেন—রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে। কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী ও কৌশল্যা চরিত্র ধরিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। না কাঁদিয়া পড়া যায় না। মূল্য ।০ আনা।

ভারতসমর ১ম ভাগ—মূল মহাভারত, কালিসিংহের অনুবাদ এবং কাশী দাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্গবাসীপ্রমুখ পত্রিকা বলেন—এমন ভাবে মহাভারতের চরিত্র সময়ের উপযোগী করিয়া কেহ পূর্ব্বে দেখান নাই। যেমন ভাষা তেমনি শিক্ষা পুরাতনকে নূতন করিয়া এরূপে কেহ আঁকেন নাই। প্রতি স্থানেই ভাবে লেখা। অতি উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৸০ আনা।

উৎসব—মাসিক পত্র, ৯ম বৎসর চলিতেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলেন আজ কালকার কোনও পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বঙ্গবাসী

মালঞ্চ।

নূতন ধরণে সরস সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র।

আগামী ১৩২১ সনের বৈশাখ হইতে বাহির হইবে।

সম্পাদক—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ।

প্রকাশক—সাহিত্য প্রচার সমিতি লিমিটেড্।

২৪নং ষ্ট্রাণ্ড্ রোড, কলিকাতা।

পত্রিকার আকার—ডিমাই আট পেজি ১৫ ফর্ম্মা ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

পত্রিকায় কি কি থাকিবে—প্রথম অংশ—(প্রায় দুই তৃতীয় ভাগ)—(ক) মৌলিক গল্প উপন্যাস নাটক কাব্য ইত্যাদি। (খ) প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প উপন্যাস কাব্য নাটকাদির অনুবাদ বা সরল বঙ্গীয় সার সঙ্কলন। (গ) বিদেশী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকগণের গল্প, উপন্যাস ও নাটকাদির অনুবাদ বা সরল বঙ্গীয় সার সঙ্কলন। (গল্প উপন্যাসাদি যথাসাধ্য চিত্রশোভিত করা হইবে।)

দ্বিতীয় অংশ—(বাকী তৃতীয়ভাগ)—(ক) সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়সমূহের আলোচনা। (খ) বিবিধ দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুককর তথ্য সংগ্রহ। (গ) বিবিধ কৌতুক রঙ্গ ইত্যাদি। বিস্তারিত বিবরণ অনুসন্ধান করুন।

লেখক শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন বঙ্গভাষায় সুপরিচিত, তাঁহার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশের মাহাত্ম্যে, মাধুর্য্য—বিচিত্র ঘটনার সন্নিবেশে ও বিকাশে, নৈপুণ্য—চিন্তার মৌলিকতায়।

বঙ্গের পাঠক পাঠিকাগণ কালীপ্রসন্ন বাবুর, অন্যান্য পুস্তকের সহিত সুপরিচিত—রাজপুত কাহিনী, ঋণপরিশোধ, সরলচণ্ডী, লহর আর্য্যনারী ইত্যাদি।

শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

Registered No. C. 843.

... বর্ষ।] চৈত্র, ১৩২১ সাল। [১২শ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ১৷৹ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

উৎসব কার্য্যালয়—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ১॥০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ১৩১৩ সন বৈশাখ হইতে উৎসব বাহির হইতেছে। নূতন বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। চৈত্রে বর্ষ শেষ হয়।

২। প্রতিমাসে কাগজ বাহির হয়। মাস গত হইলে আগামী ১৫ই মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে, বিনামূলে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই-কার্ডে জানাইতে হইবে এবং গ্রাহক-নম্বর লিখিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া হয় না।

৪। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী এই নামে উৎসব অফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৪॥০, অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ২॥০, সিকি পৃষ্ঠা ১॥০, সিকির অর্দ্ধেক ৸৵০ আনা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

সম্পাদকের প্রার্থনা।

১। দশম বৎসরে উৎসবের কলেবর বৃদ্ধি করা হইল। মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। সকল গ্রাহকের সচ্ছল অবস্থা নহে বলিয়া।

২। প্রথম প্রথম উৎসবের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য উৎসব-অনুরাগী পাঠকগণের কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর একবার সে চেষ্টা করিতে হইবে। সরল ভাবে এই বলা যায় যদি উৎসবের দ্বারা সমাজের কিছু কার্য্য হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তবে উৎসবের প্রচারের জন্য চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা ইহার প্রয়োজন কি? পত্রিকা ত অনেকই হইতেছে।

৩। উৎসবে চারিখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক বাহির হইতেছে। ঋগ্বেদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ এবং ভাগবত। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ইহাদের সমস্ত প্রকার সাধনা এবং সাধনালব্ধ সকল প্রকার অবস্থা এই পুস্তকগুলিতে আছে। কাগজের আকার বৃদ্ধি হওয়ায় আরও কিছু বেশী বেশী করিয়া পুস্তক বাহির করা যাইবে। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থও উৎসবে অধ্যয়ন করা যাইবে।

৪। আমাদের অর্থ নাই। সেইজন্য বিচার চন্দ্রোদয়, ভারতসমর, উৎসব প্রবন্ধাবলী, মনোনিবৃত্তি, যোগবাশিষ্ঠ, শ্লোক ও শব্দনির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ আমরা পৃথক ভাবে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। উৎসবের বহুল প্রচার হইলে সহজে আমরা ঐ সমস্ত প্রচার করিতে পারিব।

৫। শ্রীগীতা পুনর্মুদ্রণের সময় আসিয়াছে। অনেকে মূল্য কমাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এবং বড় বড় অক্ষরে ছাপিতে বলিতেছেন। এই কার্য্য অর্থ সাপেক্ষ। এই সমস্ত কার্য্যে যাঁহাদের অনুরাগ আছে এবং ইহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, এই কাগজ খানা উঠিয়া গেলে এবং পুস্তকগুলির পুনঃ প্রচার বন্ধ হইয়া গেলে, যাঁহারা ভাবেন সমাজের কথঞ্চিত উন্নতির পথ বন্ধ হয়, তাঁহারা উৎসবের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য এবং পুস্তক প্রচারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে যদি একটু উৎসাহ প্রয়োগ করেন তবে অবশ্যই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবেই।

৬। চেষ্টা করা আমাদের হাতে। উৎসবের সম্পাদক, সম্পাদকের মত চেষ্টা করুন, তাহাতে উন্নতি না হয় তখন বুঝা যাইবে ইহার প্রচার ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। চেষ্টা করা যাউক - ফল ঈশ্বরের হাতে।

৭। প্রথম প্রথম একবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাতেও অনেক হইয়াছিল। এখন আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে আর একবার চেষ্টা হউক। ইহাতে না হইলে কোন আক্ষেপ থাকিবে না।

৮। যাঁহারা উৎসবের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন না তাঁহারা এই চৈত্র মাসের কাগজ পাইয়াই উৎসবের কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে জানাইবেন। নতুবা আমরা নব বর্ষের প্রথম সংখ্যা ভি পি করিলে যখন তাহা ফেরত আসিবে তাহাতে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে মাত্র। অর্থ থাকিলে লাভ বা ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইত না।

৯। বালক যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলের উপকারে লক্ষ্য রাখিয়া কাগজ চালান উচিত। কিন্তু একজনের উপর সকল ভার থাকিলে ঠিক ঠিক কার্য্য হয় না। এজন্য যাঁহার যেমন অধিকার তাঁহার সেই সেই বিষয়ে অলোচনা করা উচিত। স্বাধ্যায়টিত পন্থার প্রধান অঙ্গ। আপনি আচরণ করিয়া যদি সেই বিষয় সমাজে প্রচার করা যায় তবে নিশ্চয়ই সমাজের কল্যাণ হইবে।

১০। শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় শিবপুর হইতে আসিয়া প্রত্যহ উৎসবের কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষ কলিকাতা গার্ডনিং এসোসিয়েসনের এবং কৃষক পত্রিকার অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ মিত্র, শ্রীযুক্তসুরেশ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কৌশিকী মোহন সেন—ইহারা সকলেই উৎসবের জন্য খাটিতেছেন এবং সকলেই খাটিতে প্রস্তুত আছেন। উৎসবে ব্যক্তিগত সত্ত্বা কাহারও নাই। ইহা সাধারনের হউক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। সকলেই ইহার প্রচার ও উন্নতির জন্য বন্দোবস্ত করুন ইহাই প্রার্থনা। চেষ্টা করিলে কেন না হইবে? আর একবার চেষ্টা করা হউক। যিনি সকলের মধ্যে থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন আমাদের চেষ্টার তিনি সহায়তা করিবেন ইহা আমাদের বিশ্বাস।

বিনীত

সম্পাদক।

উৎসব।



স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৯ম বর্ষ।] ১৩২১ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

বর্ষশেষ। ১৩২১।

এই এক বৎসর ধরিয়া বলিলে কি?

বলিলাম ভারতের দুঃখ—আর তাই বা কেন—জগৎবাসীর দুঃখ—জীবের দুঃখ—কিছুতেই দূর হইবে না, যতদিন না মানুষ ঋষিদিগের শিক্ষামত জীবন চালাইতে চেষ্টা করে।

ঋষিগণের শিক্ষা কোন প্রকার উন্নতির বিরোধী নহে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা, পুরুষের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তার বিরোধী হইতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা যদি সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার বিরোধী হয়, তবে তাহা প্রকৃত স্বাধীন চিন্তা নহে। সে চিন্তা ব্যভিচারী হৃদয়ের অসংযত লালসা মাত্র।

সকল প্রকার ব্যভিচার ত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে ব্যভিচারের প্রশ্রয় পায় এরূপ কার্য্য, এরূপ ভাবনা, এরূপ বাক্য ত্যাগ করিতে হইবে। ঋষিগণ ইহারই জন্য উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

ভাবনা, বাক্য ও কার্য্যের ব্যভিচার ত্যাগ সম্বন্ধে ঋষিগণের উপদেশ কি?

আহারে পবিত্র হইতে হইবে, ব্যবহারে পবিত্র হইতে হইবে, হইয়া প্রত্যহ

তিন বেলায় নিত্যকর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম যাহা করি তাহা কেবল তোমার প্রসন্নতা অনুভব করিবার জন্য। তদ্ভিন্ন অন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করা উচিত নহে। এইরূপ ভাবে নিত্যকর্ম্ম ও ব্যবহারিক কর্ম্ম করিতে করিতে তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে।

চিত্তশুদ্ধি তাহার নাম যখন চিত্ত হইতে রাগ ও দ্বেষ বিগলিত হইয়া যায়। যখন কাহাকেও আর ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় না, যখন পাপে উপেক্ষা আসিলেও পাপীর প্রতি ঘৃণা আইসে না। যখন মৈত্রী, করুণা, মুদিতায় হৃদয় ভরিয়া যায়। কি এক করুণার চক্ষে, কি এক প্রেমের চক্ষে, কি এক কৃপা-কটাক্ষে দরিদ্র, দুর্বৃত্ত, পাপী, তাপীকে দেখা হইয়া যায়। নিজের হৃদয়ে জীবকে দয়া করিতে শিখিয়া পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবে দয়া হইয়া যায়। নিজে যাহাতে কষ্ট পাইয়াছিলাম লোকের সেই প্রকারের ক্লেশ দেখিলে স্বতই ক্লেশ দূর করিবার উপায় বলিয়া দিয়া দুঃখী জনকে সুখী দেখিতে ইচ্ছা করে।

চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাত্ত্বিক ভাব জাগিবেই। সাত্ত্বিক ভাব জাগিলে একদিকে রজ ও তমগুণ নিজের বশে থাকিবে। অন্যদিকে আপনা হইতে শ্রীভগবানের চরণে শিরোলুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা হইবেই। রজস্তমের যতটুকু ব্যবহারে সমাজের, জাতির উপকার হয়, ততটুকু মাত্র ইহারা ব্যবহৃত হইবে। সাত্ত্বিক ভাব প্রবল হইলে চিত্ত আপনিই ঈশ্বরের উপাসনা জন্য উর্দ্ধমুখে চলিবেই। তখন উহা স্থায়ী করিবার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য, জীবনকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গঠন করিবেই।

এক বৎসর ধরিয়া বলা হইল চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন উপাসনা হইতেই পারে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন ভক্তি আইসে না। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান কিছুতেই লাভ হয় না। আবার জ্ঞান ভিন্ন নিত্যানন্দে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না। ঋষিগণ এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই উপদেশ বুঝিয়া, এই উপদেশ মত জীবন কিরূপে চালান যায় তাহাই একবৎসর ধরিয়া আলোচনা করা হইল। বহুবৎসর ধরিয়া বহুভাবে ইহা বলিতে হইবে। যতদিন এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হওয়া থাকিবে, ততদিন ধরিয়া ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে। যখন ঋষিগণের কথা সবাই বলিবে, যখন ঋষিগণের উপদেশ মত সবাই চলিবে, চলিয়া চিত্ত শান্ত করিবে তখনই এ বলার নিবৃত্তি হইবে।

ইহার ফলাফল কতটুকু দেখিতেছ এ প্রশ্ন শেষে করিব। এখন জিজ্ঞাসা

করি যাহারা নিত্যকর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারা কর্ম্মের অবসানে যখন সুখাসনে উপবেশন করিবেন, তখন কিরূপভাবে ভক্তি জ্ঞান আশ্রয় করিবেন তাহা যদি একবার আবার বল ত ভাল হয়।

আচ্ছা এক রাণীর কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলিতেছি। রাণী শাস্ত্রমত নিত্য কর্ম্ম করেন। করিয়া সেই নিভৃত স্থানে বসিয়া ভাবনা করেন—আমি রাণী। আমার এই রাণীদেহ মাতার উদরে আসা হইতে পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ-ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহার পরে আরও এতদিন বহু ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। পাইয়া ইহা বালিকা কাল, যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই দেহের মূল কোথায় ছিল ?

গতবারের মরণ-মূর্চ্ছার পরেই আমি যাহা হই নাই তাহাই হইয়াছি এই স্মরণটি আমার মধ্যে উঠিয়াছিল। আমার চিত্তে যে মূলবাসনারূপিণী মায়া ছিল তাহাই এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু তুলিয়াছিল। ইহা আমার ভ্রম। কারণ আমি যাহা তাহা চেতন, তাহা আত্মা। আমি যাহা তাহা জড় নহে, আমি যাহা তাহা দেহ নহে। খাঁটিসত্য এই যে আমার জন্মও হয় নাই আমার মরণও নাই। মরণ নাই বলিয়া মরণ-মূর্চ্ছাও নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। বেদ বলেন—আর গীতাও বলেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"। যে জন্মে নাই তাহার আবার জন্মস্থান কি, তাহার আবার পিতামাতা সংসার কি ? এগুলি ভ্রম। বহুদিন ধরিয়া এই ভ্রম অভ্যাস হইয়াছে। বহুবারের মরণ-মূর্চ্ছায় এই মূল ভ্রম বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এবারকার দেহ ধারণ করার মত কতবারই ভ্রমে দেহ ধারণ করা হইয়াছে। এখন গত ভ্রম সংশোধনে প্রয়োজন নাই। উপস্থিত এই রাণীদেহ রূপ ভ্রম দূর করিতে হইবে।

এবারকার দেহ ভ্রম দূর করিবই। করিয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ করিব। সেই জন্য শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া ইষ্টদেবীকে আশ্রয় করিয়াছি।

মা আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণের গায়ত্রী—আমাদের তান্ত্রিক গায়ত্রী বা সাবিত্রী। তুমি বরণীয় ভর্গ। তোমার আশ্রয় না লইলে কোন জীব কখন সেই রমণীয়-দর্শনের নিকট পৌঁছিতে পারে না। বরণীয় ভর্গ ভিন্ন আমাদিগকে কেহই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে লইয়া যাইতে পারে না। যদি বলা হয় কেমন করিয়া লইয়া যান—উত্তরে বলি, বরণীয় ভর্গটি বুঝিলেই তাঁহার স্বভাবটি ধরা যায়। ভর্গ যিনি তিনি তেজ।

এই তেজ বিষয়ের দিকেও চলেন, আবার পরমার্থের দিকেও ছুটেন। বিষয়ের দিকের প্রবাহকে বলে প্রবৃত্তি-পথ, আর পরমার্থ দিকের প্রবাহ হইতেছে নিবৃত্তি-পথ। ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্মে ঈশ্বর স্মরণ করিবার অভ্যাসটি যখন পাকা হয়, তখন রজ ও তমগুণ সত্ত্বগুণের বশীভূত হইয়া যায়। সর্ব্বকর্ম্মাপণ দৃঢ় হইয়া গেলে, সত্ত্বগুণ প্রবল হইবেই। সত্ত্বগুণ যাঁর তিনি সর্ব্বত্র আদিত্যপথগামিনী। সাধনা দ্বারা লয় বিক্ষেপ বা রজস্তমকে নীচে ফেলিতে পারিলেই বরণীয় ভর্গ ধরা গেল। সাধকের দেহস্থ বরণীয় ভর্গ বা শুদ্ধসত্ত্ব গুণ তখন শ্রীভগবানের বরণীয় ভর্গকে ধরিতে পারিল। এই ব্যাপার সাধিত হইলেই স্থূল সংসার ভুলিয়া ভাবনা রাজ্যে আসা যায়।

তুমি আমায় ভাবনা রাজ্যে আসিতে শিখাইয়াছ। আমি তোমার কাছে শিখিয়া স্থূল সংসার ভুলিয়া সেই দহরাকাশে কতই মানসপূজা করিতাম। আবার মানস পূজার অধিকার লাভ জন্য রজস্তমকে অধঃকৃত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল করিতে কত উপবাস ব্রত করিয়াছি। উপবাস ব্রতে সাত্ত্বিক হইয়া কত প্রকারে ইষ্টদেবীকে ভজিয়াছি।

আহা! এ ভজনাকালে কত কি অপূর্ব্ব হইয়া যায়। আমার ইষ্টদেবীই ইহা করিয়া দেন। আমি দেখি কি তাঁহাকে ভজিতে ভজিতে—তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে দেখা যায় না। আর যে দেখিতেছিল, ভজিতেছিল—সেও যেন সে থাকে না। আমি থাকি না। আমি, তুমি হইয়া যায়। আহা! তখন রমণীয়-দর্শন সম্মুখে আসেন—পরমপদ নিকটে আসিয়া স্পর্শ করেন।

নদী সমুদ্রে মিশিতেছে; এখনও এক হইয়া সমুদ্র হইয়া যায় নাই। মিলনে অনন্ত সুখের অবস্থায় আসিয়াছে।

এই সময়ে তাঁহারে পাওয়া হইয়াছে। তখন কত কথা তাঁহার সহিত হয়। কত সাধের কথা তখন বলা হয়। কত সুন্দর ইহা! সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া রমণীয় দর্শনকে মানসে সেবা করিতে করিতে যখন ভাবনা গাঢ় হইয়া যায় তখন ভাবরাজ্যে সত্য সত্যই সেবা হয়। সত্যই যে হয় তাহার চিহ্ন অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের উদয়। এখানে বাহ্যদশা ভুল, অন্তর্দ্দশায় অবস্থান। সেই সময়ের কথাবার্ত্তা ভিতরে যাহা চলে তাহা কত সুন্দর।

তুমি আমায় এই ভাবকে দৃঢ় করিবার জন্য যখন পূর্ণ আনন্দ সময়ে অদৃশ্য হইয়া যাও, রাসলীলা করিতে করিতে যখন হঠাৎ লুকাইয়া পড়—তখন

হয় ভাবনা-রাজ্যে বিরহ। সেই বিরহে যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত, উৎকণ্ঠা-স্ফুটিত বিরহ ব্যথার উক্তি তাহা ত বলা যায় না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়।

রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
আমি কারে বা বুঝাই মা।
এরা হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী।

সকল ইন্দ্রিয় সেই ভাবনা-রাজ্যে তারে ভোগ করিয়াছে, সবাই অনুরাগী হইয়াছে। চক্ষু অন্তরে সেই নয়নাভিরাম রূপ দেখিতে চায়, কর্ণ অন্তরে সেই শ্রবণাভিরাম বাক্য শুনিতে চায়, নাসিকা সেই ঘ্রাণোন্মাদকারী গন্ধ পাইতে চায়, জিহ্বা সেই সুধাস্বাদ তরে কাতর হয়। কাহাকেও আর থামাইয়া রাখা যায় না। আর

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে॥

এই ব্যাকুলতা পূর্ণ হইলে সেই ঈপ্সিততম, সেই দয়িত, সেই আমার সকল সাধের সমষ্টি আবার আসিয়া হাত ধরেন, আবার আদর করেন। তখন কি হয় তা'ত বলা যায় না। চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ। কি যে দেখে তা'ত বলা যায় না। নয়ন ভ্রমর যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখপদ্মে উপবেশন করে, তখন ত কথা থাকে না। আবার যখন কথা ফুটে তখন কি কথা বাহির হয়? আহা! কত সুন্দর তাহা। কত স্বাভাবিক তাহা। ইহা পূর্ণ প্রেমের কথা। কবি বলেন—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে,
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে।

তোমায় যে সব দিতে ইচ্ছা করে। যা আমার প্রিয় আছে সবই। যা আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তাই যে তোমায় দিতে চাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আমার কি? আমার এই অমৃত, আমার এই প্রাণ, আমার এই মুখ্য প্রাণ' আমার এই আত্মা—এইত আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই তুমি নাও। আহা! যে ধন তোমায় দিব সেই ধন তুমি হে।

হউক আমি "তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হয়ে রব হে"।

চিত্তশুদ্ধির পরে যে ভক্তিযোগ তাহাত এই পর্য্যন্ত। তার পরে জ্ঞান।

জ্ঞান সাধনায় ভক্তির স্থান প্রথম। ভক্তিতে বুদ্ধি একচিন্তা প্রবাহে তীক্ষ্ণা হইবেই। ভক্তিতে ভাবনা রাজ্যে ইষ্টদেবতা বা ইষ্ট দেবীতে অনুরাগ এত বেশী হইবে যে, ইষ্টদেবী বা ইষ্টদেবতা ভিন্ন যাহা কিছু তাহা বিরাগের বস্তু হইয়া যাইবে। বৈরাগ্য উদয়ে বিচার হইবে আমি কে, ইষ্টদেবীই বা কে? ইহাই জ্ঞানমার্গ। এই বিচারের মীমাংসা এই—আত্মারূপে এই দেহে যে আমি সে আমি চৈতন্য।

দেহে অভিমান করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আমি যেন খণ্ড চৈতন্য মত রহিয়াছি। ভাবনা-রাজ্যে সাধনা দ্বারা যখন উঠি—বরণীয় ভর্গ সাহায্যে রজস্তমকে বা লয়বিক্ষেপকে কাটাইয়া যখন শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব প্রাপ্ত হই, তখন ভাবনা রাজ্যে আতিবাহিক দেহে ইষ্টদেবতাকে ভজিয়া তাঁহার কৃপায় তাঁহার সহিত মিলিতে মিলিতে মিশ্রিত হইয়া যাই। যে চৈতন্য খণ্ড ছিল তাহাই অবতারের সহিত মিশিয়া অখণ্ড থাকিয়াও ভাবনাময় দেহে মূর্ত্তি ধরিয়া খেলা করেন। ইনিই কিন্তু অব্যক্তভাবে ভূর্ভুবঃস্বর্লোক ব্যাপী, অন্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিমান্ সগুণব্রহ্ম। ইনি অব্যক্ত কিন্তু সর্ব্বব্যাপী। যতদিন সর্ব্ব আছে ততদিন ইনি সর্ব্বব্যাপী সত্য। ইনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। আকাশ কে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে ব্যাপিয়া আছেন। ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলেন "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রামসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাদি। ইঁহার প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য আপন আপন স্থানে বিধৃত হইয়া আছেন। ইঁহারই প্রশাসনে বায়ু প্রবাহিত হয়, অগ্নি দগ্ধ করে, নদী সমুদ্রে গিয়া পড়ে, মানুষ স্বধর্ম্ম করে পিতৃলোকাদি আপন আপন কর্ত্তব্য করেন। ইনি আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলায় বলা হইল না যে ইনি কোন কাজের নহেন, ইনি শূন্য। তাহা নহে। ইনি অতি সূক্ষ্ম। অথচ পরিপূর্ণ পদার্থ। সর্ব্ব বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহা তাঁহাতেই ভাসে। ইঁহারই আত্মমায়া ইঁহাকেই বিচিত্র জগৎ-রূপে দেখান। কিন্তু রজ্জুতে যেমন সত্য সত্য সর্প নাই অথচ সর্প দেখা যায়, ইঁহাতে সেইরূপ সত্য সত্য জগৎ নাই অথচ ইঁহাকেই জগৎ রূপে দেখা যায়। যে ভ্রমে এই জগৎ ভাসে সেই ভ্রম যখন জ্ঞানবিচারে তিরোহিত হয় তখন যিনি থাকেন তিনি আপনিই আপনি। মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত লয় হয় তখন যিনি থাকেন তিনি আপনি আপনি। তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। ইনি তুরীয়

ব্রহ্ম। সগুণ উপাসনা সাহায্যে সগুণব্রহ্মে পৌঁছিতে পারিলে তত্ত্ববিচার দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায়। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় যাইতে পারিলে তুরীয়ের আভাসে ক্ষণকালও স্থিতিলাভ হয়—সেইরূপ ইহা। দ্বৈত উপাসনা দ্বারাই অদ্বৈতে স্থিতি হয়। সগুণ উপাসনা পর্য্যন্ত দ্বৈতভাব। নির্গুণ উপাসনায় অদ্বৈতে স্থিতি।

এখন জ্ঞানমার্গে আত্মা, অবতার, সগুণব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম যে সমকালে এক ইহার উপলব্ধি করিতে হয়। এই উপলব্ধি বিনা ভক্তিতে হয় না। আবার ভক্তিও চিত্তশুদ্ধি বিনা হয় না। আবার চিত্তশুদ্ধিও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পূর্ব্ব পাপক্ষয় এবং নিত্যকর্ম্ম দ্বারা উপস্থিত পাপক্ষয় না করিলে হয় না। আবার নিত্যকর্ম্ম ঠিক ঠিক করিতে হইলে যাহাতে শরীর মন ও বাক্যের ব্যভিচার না হয় তজ্জন্য আহারে শুচি, ব্যবহারে শুচি, নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন ইত্যাদি না হইলে হইবে না।

কাজেই সব অনুষ্ঠানগুলি আসিয়া গেল। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান সকলগুলির কথা এই জন্য বলা চাই।

বহু বৎসর ধরিয়া তাই এই কথাই বলা হইতেছে। যতদিন চলিবে ততদিন এই কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আছে। পুনরুক্তি এত দেখিলে চলিবে কেন? পুনরুক্তি দোষ নহে, পুনরুক্তি গুণ। পুনরুক্তি অভ্যাসের সহায়তা করে। বিনা অভ্যাসে চিত্তশুদ্ধিও হয় না, ভক্তিও হয় না, জ্ঞানও হয় না, মুক্তিও হয় না।

আচ্ছা পুনরুক্তি যেমন চলিল—কিন্তু ঋষিগণ যে শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ এক কথাই বলিতেছেন তাহা যেন জীবশিক্ষার্থ। তাঁহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া না হয় ঐরূপ করিতে পারেন। কিন্তু তুমি আমি যে গন্তব্য স্থানে না গিয়া ঐরূপ শিক্ষাভার গ্রহণ করি—এটা কি ভাল?

ইহাতে কি বলিতে চাও?

বলি তাঁতি আর জোলা কাপড় বোনে আর কাপড় বেচে, কিন্তু কাপড় পরে না। কথাটা কর্কশ হয় কিন্তু ইহা কি সত্য নয়?

হাঁ শিক্ষার ব্যভিচার ত ইহা বটেই। এই শিক্ষামত কার্য্য করিতে না পারিলে কবি, গ্রন্থকার, বক্তা, উপাধ্যায়, আচার্য্য, পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক ইঁহাদের আটপৌরে ও পোষাকী চরিত্র থাকিবেই। এক্ষেত্রে ইঁহারা তাঁতি জোলাই বটেন। কিন্তু যদি কেহ আপনাকে আপনি শিক্ষা দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ শিক্ষার

কথা লেখেন, স্বাধ্যায়কে তপস্যার অঙ্গ করিয়া আপনি আচরণ করেন এবং যদি কেহ তাঁহার মত আচরণ করিতে চান, তাহার জন্য নিজের সাধনার কথাও প্রকাশ করেন—তথাপি কি তিনি তাঁতি জোলা হইবেন? কাপড় প্রস্তুত করিবেন, কাপড় বিক্রয় করিবেন কিন্তু পরিবেন না?

তাঁতি জোলা না হইলেই হইল। ইহাই কবি, গ্রন্থকার, শিক্ষক, বক্তা, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি মহোদয়গণকে বলা হইল। বেশী কি --সাবধান করা হইতেছে মাত্র। তাতিবার বা তাতাইবার কথা কিছুই বলা হইতেছে না। আত্মপ্রতারণা না হয় ইহা বলা হইতেছে।

হাঁ ঠিক কথা। সাবধানের মার নাই। ইতি।

শেষ বেলা।

দিন শেষ বাঁশী বাজে,
তবু কি ঘুমান সাজে?
হেথাকার দেওয়া নেওয়া হল না কি শোধ?
পথের সম্বল তোর
সকলি হরিল চোর,
অলসে হারালি বেলা, হায় রে, অবোধ!
খেয়া-তরি ডাক দিয়ে,
শেষবার যায় বেয়ে;
এখনো কাটেনি ঘোর মোহের স্বপন?
নিমিষে নূতন হ'য়ে,
নীতি নব অভিনয়ে;
পলকে নিতেছে কাড়ি, সোনার জীবন
তবু তার হাতে তুলি,
সে শুভ মুহূর্ত্ত গুলি;
অনা'সে দিতেছে ডারি সর্ব্বস্ব আপন।
এ অবোধে কে বুঝায়?
পাছু ফিরে নাহি চায়,
পশ্চিমে বিদায় মাগে আরক্ত তপন।
আবরি রাখিবে তারে মুদিয়া নয়ন॥

মৃঃ—

বারমাসই পূজা।

পুরাকালে মহামোহরূপ মহিষাসুর সমস্ত ত্রিভুবন জয় করিয়া ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করিলে, দেবতাগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন। অতঃপর বিষণ্ণমুখে তাঁহারা পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্মুখীন করিয়া ক্ষীরোদশায়ী মধুকৈটভারি ভগবান্ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহিষের দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশ করিয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিলেন। সমবেত দেবতামণ্ডলীর অনুযোগের কথা শুনিতে শুনিতে মধুসূদন, শঙ্কর ও ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের সেই ক্রোধ সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায়, সকলের শরীর হইতে নানা বর্ণ মিশ্রিত এক অতি মহৎ তেজ নির্গত হইল এবং জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় সেই পুঞ্জীকৃত তেজোরাশি চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া ফেলিল। সকলে সবিস্ময়ে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা দেখিলেন—সেই দিগন্তব্যাপী তেজ ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তিনি "শ্বেতাননা, কৃষ্ণনেত্রা, সংরক্তাধরপল্লবা"। তাঁহার রূপে ত্রিলোক আলোকিত হইয়া গেল। শঙ্করের তেজে তাঁহার শ্বেতসুন্দরবদনকমল উৎপন্ন হইল। যমের অংশে তাঁহার বক্রাগ্র অতিদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণবর্ণ মনোহর কেশপাশ, সন্ধ্যা হইতে বক্র স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূদ্বয়, বায়ু হইতে কর্ণযুগল, অগ্নি হইতে ত্রিনয়ন, বিষ্ণু হইতে বাহুযুগল, চন্দ্র হইতে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের অংশে কটিদেশ, বরুণের অংশে উরুদ্বয়, পৃথিবী হইতে নিতম্ব, ব্রহ্মা হইতে চরণদ্বয়, সূর্য্য হইতে চরণের অঙ্গুলি, বসুগণের অংশে হস্তের অঙ্গুলি এবং প্রজাপতির অংশে দন্ত উৎপন্ন হইল। দেবতাসকল সেই পরমাসুন্দরী দেবীকে দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে স্ব স্ব অস্ত্র উপহার দিয়া নানাপ্রকার ভূষণে সজ্জিত করিয়া দিলেন। ভগবান্ পিণাকপাণি শূল, নারায়ণ চক্র, বরুণ পাশ ও শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, পবন ধনু ও বাণপূর্ণতূণদ্বয় প্রদান করিলেন। ইন্দ্র বজ্র, ঐরাবত ঘণ্টা, যম দণ্ড, প্রজাপতি অক্ষমালা, এবং ব্রহ্মা কমণ্ডলু দিলেন। সমস্ত রোমকূপে সূর্য্যদেব আপন রশ্মি অর্পণ করিলেন। কাল তাঁহাকে নির্ম্মল খড়্গ ও চর্ম্ম প্রদান করিলেন। ক্ষীরোদ মাকে উজ্জ্বল হার, অজর বস্ত্রযুগল, চূড়ামণি, সুবর্ণময় কুণ্ডল, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র সর্ব্ববাহুতে কেয়ূর, উত্তম কণ্ঠভূষা, বিমল নূপুর, সর্ব্বঅঙ্গুলিতে রত্নময় অঙ্গুরি সকল দিয়া সাজাইয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে অভেদ্য কবচ, নানাপ্রকার অস্ত্র ও

নির্ম্মল পরশু প্রদান করিলেন। হিমাচল তাঁহাকে বাহনস্বরূপ সিংহ ও নানাপ্রকার রত্ন উপঢৌকন দিলেন। কুবের অশূন্য পানপাত্র এবং সর্ব্বনাগেশ শেষ তাঁহাকে মহামণি বিভূষিত নাগহার প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সেই সর্ব্বদেব-শরীরজা ত্রিগুণময়ী, মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী দেবীকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন। দেবতারা বলিলেন—মা, তুমি পরম মঙ্গলময়ী, তুমি কল্যাণী, তুমি শান্তিরূপিণী ভগবতি, আমরা তোমাকে শত শত প্রণাম করি। হে কালরাত্রিরূপিণি মহাদেবি! তুমি সিদ্ধি, বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিস্বরূপিণী। হে জগজ্জননি, তোমার চরণছাড়া আমাদের আর কি সম্বল আছে মা। আমরা অসুরভয়ে অত্যন্ত ভীত ও বিপন্ন হইয়াছি, তাই আজ নিরাশ্রয় হইয়া তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। মা, তুমি জগদীশ্বরী, তোমার অনন্ত শক্তি, তোমার আশ্চর্য্য মহিমা। তুমি জগতের ভিতর থাকিয়া জগৎকে পরিপালন করিতেছ অথচ জগৎ তোমাকে জানে না। তুমি মায়ার মধ্যে থাকিয়া মায়াকে পরিচালিত করিতেছ, কিন্তু মায়া তোমাকে জ্ঞাত নহে। আমরা শত্রুতাপিত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। দুরন্ত দৈত্যগণ বরদর্পিত হইয়া আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি পীড়িত করিতেছে। মাতঃ ভক্তবৎসলা, তুমি ব্যতীত আমাদিগকে কে আর রক্ষা করিবে। দেবতাগণ এইরূপ স্তব করিলে ভগবতী তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভয় দিবার মানসে অতিশয় উচ্চহাস্য করিলেন। চতুর্দিক্ সেই শব্দে পূরিত হইয়া গেল এবং এক মহান্ প্রতিশব্দ সমুত্থিত হইল। লোক সমস্ত ক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র কম্পিত হইল, পৃথিবী টলিতে লাগিল। দেবতারা সেই শব্দ শুনিয়া হৃদয়ে বল পাইলেন এবং দানবগণ চমকিত হইল। মহিষাসুর, ঐ শব্দ অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।' পরে যখন জানিতে পারিল যে দেবগণের সহায় হইয়া দেবী তাহার বিরুদ্ধে আসিতেছেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। মহিষাসুর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দেবীর রূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপের ছটায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়াছে। চরণভরে পৃথিবী যেন বসিয়া গিয়াছে। মাথার কিরীট আকাশকে যেন ঠেলিয়া ধরিয়াছে। "পাদাক্রান্ত্যানতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাং"। তাঁহার ধনুর জ্যাশব্দে পাতাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি

দিক্ সকলকে সহস্র হস্তে ব্যাপ্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অসুরগণ এই মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। পরে মোহমুগ্ধ মহিষ, কামার্ত্তচিত্তে চিন্ময়ীদেবীকে বশীভূত করিবার মানসে নানাপ্রকার বাক্যবিন্যাস দ্বারা তাঁহাকে লুব্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেবী শান্তভাবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অবশেষে মহিষাসুরকে উপহাস করিয়া বলিলেন—রে জড়বুদ্ধি মহিষ !—

"ন কাময়েহহং দেবেশং নৈব বিষ্ণুং ন শঙ্করম্।
ধনদং বরুণং নৈব ব্রহ্মাণং নচ পাবকম্॥
এতান্ দেবগণান্ হিত্বা পশুং কেনগুণেন বৈ।
বৃণোমাহং বৃথা লোকে গর্হণা মে ভবেদিতি॥"

আমি কুবের, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কাহাকেও যখন চাই না, তখন কোন্ গুণে তোর মত পশুকে পতিত্বে বরণ করিব। লোকে যে, তাহা হইলে আমাকে নিন্দা করিবে।

"যথা তে মহিষীমাতা প্রোঢ়া যবসভক্ষিণী।
নাহং তথা শৃঙ্গবতী লম্বপুচ্ছা মহোদরী॥"

তুই অধম পশু, পশুর মত পত্নী গ্রহণ করিবি। আমি ত তোর জননীর মত শৃঙ্গবতী লম্বপুচ্ছা মহোদরী তৃণসেবী মহিষী নই।

"নাহং পুরুষমিচ্ছামি পরমং পুরুষং বিনা।"

তুই কি জানিস্ না যে, আমি সেই পরমপুরুষ ব্যতীত আর কাহাকেও ইচ্ছা করি না।

"সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী হ্যকর্ত্তা নিস্পৃহঃ স্থিরঃ।
নির্গুণো নির্ম্মমোহনন্তো নিরালম্বো নিরাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগঃ সাক্ষী পূর্ণঃ পূর্ণাশয়ঃ শিবঃ॥
সর্ব্ববাসঃ ক্ষমঃ শান্তঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বভাবনঃ।
তং ত্যক্ত্বা মহিষং মন্দং কথং সেবিতুমুৎসহে॥

আমি এমন সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ পূর্ণাশয় সদাশিবকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ লোভে তোর মত মন্দবুদ্ধি অস্থিমাংসের একটা পিণ্ডস্বরূপ পশুকে ভজনা করিব।

মহিষাসুর এই সমস্ত তিরস্কার বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ক্রোধ-সংরক্তনেত্রে, ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার সমস্ত সৈন্যদলকে দেবীর প্রতি ধাবিমান হইতে আজ্ঞা করিল। তখন সেই অসুরসৈন্য মহাপরাক্রমের

সহিত দেবীকে আক্রমণ করিল এবং প্রধান প্রধান অসুরসেনাপতিগণ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, বিড়ালাক্ষ ইত্যাদি সেনানীগণ স্বীয় দলবল লইয়া নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা দেবীর সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তাহাদের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে বহু অসুর বিনাশ করিলেন। তাঁহার বাহন কেশরীও, অরণ্যে হুতাশনের ন্যায় সেই অসুর সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিয়া অসুরকুল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নিশ্বাস হইতে শতসহস্র গণ সকল সমুদ্ভূত হইয়া সেই যুদ্ধ-মহোৎসবে যোগদান করিল। বহ্নি যেমন তৃণদারুচয় দগ্ধ করে দেবী সেইরূপ অতি শীঘ্রই সেই অসুরসৈন্য বিনষ্ট করিলেন। অবশেষে স্বয়ং মহিষাসুর মাহিষরূপে সেই গণসকলকে ভীত করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। তাহার মণ্ডলাকার দ্রুতগতিতে পৃথিবী বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। লাঙ্গুলাঘাতে সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিল। তাহার সমুন্নত শৃঙ্গাঘাতে মেঘসকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং তাহার শ্বাস প্রশ্বাসে পর্ব্বত সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া নানাস্থানে পড়িতে লাগিল। সে অবলীলাক্রমে কখন পুরুষ, কখন সিংহ, কখনও বা মহাগজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দেবীর সহিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ যুদ্ধ করিলে পর, দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এক চরণ দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া কণ্ঠে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন। "পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে শূলেনৈনমতাড়য়ৎ"। তখন মহিষাসুর মহিষমূর্ত্তি হইতে যেমন নিস্ক্রান্ত হইবে, অমনি দেবী খড়্গাদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। দেবতারা বলিলেন—

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা,
নিঃশেষ দেবগণশক্তিসমূহ মূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিল দেবমহর্ষি পূজ্যাং,
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥
"যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল জগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ—
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত
অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥

* * * *

"যা মুক্তি হেতুরবিচিন্ত্যা মহাব্রতা চ,
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয় তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্ত সমস্তদোষৈ—
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥
"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধানং,
মুদ্গীতরম্য পদ পাঠতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভব ভাবনায়,
বার্ত্তাচ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥
"মেধাসি দেবি বিদিতাখিল শাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
"শ্রীঃ কৈটভারি হৃদয়ৈক কৃতাধিবাসা
গৌরীত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা॥"

* * * *

দেবগণ ভক্তিভরে এই মত স্তব করিলে জগজ্জননী তাঁহাদের প্রতি প্রসন্না হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দেবতারা তখন যুক্তকরে বলিলেন—মাতঃ, আমাদের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা আমাদের শত্রু মহিষাসুরকে বধ করাতে সম্পন্ন হইয়াছে। আর আমাদের প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই। কেবল এই এক প্রার্থনা যে, বিপদে পড়িয়া আমরা যখন তোমাকে স্মরণ করিব তুমি তখন দয়া করিয়া আমাদিগকে সকল আপদ্ হইতে রক্ষা করিও। "সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথা পরমাপদঃ। এবং সংসারে যে কেহ তোমাকে এইভাবে পূজা করিবে তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তুমি তাহার কল্যাণ বিধান করিবে এবং তাহাকে সর্ব্বসম্পদ্ প্রদান করিবে। ভগবতী দেবতাদিগের বাক্যে তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ইহাই আদি দুর্গোৎসব। ইহার পর হইতে জগতে দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তিত হইল। সত্যযুগ হইতে এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। ত্রেতাযুগে ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণবধের পূর্ব্বে অকালে মায়ের বোধন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। আজও সেইজন্য লোকে শরৎকালে মায়ের পূজা করিয়া থাকে। শরৎকালের শেষে বর্ষা, তাহার জল ঝড় বিদ্যুতের সহিত বিদায় লইলে পথঘাট পরিষ্কার হয়, সূর্য্যকিরণ যেন অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করে, নির্ম্মল আকাশে সুন্দর চাঁদ নিয়ে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার উপর আপনার আনন্দ-রশ্মি ঢালিয়া দেয়। সেই সময়ে চারিদিকে কত শিউলি দোপাটি ফুটিতে থাকে। প্রাতঃকালে তৃণপল্লবাদির উপরে শিশিরবিন্দু সূর্য্যকিরণে মুক্তাফলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতি যেন নানাভাবে আপনাকে মনোহররূপে সজ্জিত করিতে থাকেন। সকলেরই প্রাণে কি যেন একটা আনন্দ ও উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হয়। সকলেই যেন কাহার আশায় পথ চাহিয়া থাকে। সেই সময়ে মা আসিয়া থাকেন। চিরকাল মা ঐ সময়ে আসেন। মা যে এসময়ে আসেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নচেৎ এত আনন্দ কোথা হইতে আসে। যাহা দেখি তাহাতেই যেন একটা সৌন্দর্য্য মাখান আছে। আকাশ—এমন আকাশ ত কখনও দেখিতে পাই না। এমন চাঁদ ত কখনও দেখিতে পাই না। ছবি যেন সত্য হইয়া চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় অথবা সত্যই যেন ছবির আকার ধারণ করে। নিশীথ সময়ে পাপিয়ার গানে কি যেন এক স্বপ্নজগতের মাধুর্য্যময় স্মৃতি মাখান থাকে। প্রাতঃকালে মৃদুপবনহিল্লোলে যখন স্নিগ্ধ-কোমল শেফালিকাগুলি ছড়াইয়া পড়ে, দুর্ব্বাদল শিশিরবিন্দুর মুক্তাহার পরিয়া সুবর্ণময় সূর্য্যকিরণের জন্য যখন মুখ তাকাইয়া থাকে, পাখীসব আনন্দসহকারে আগমনী গান করে এবং মায়ের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ সূর্য্যদেব যখন জগৎকে আনন্দে উজ্জ্বল করিতে করিতে উদিত হন—তখন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও মনে হয় যে, জগৎটাকে কেবলই দুঃখময় করিয়া গড়া হয় নাই। এখানে প্রাণগলান একটা আনন্দের বস্তু কিছু আছে যাহার ছায়ামাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা উন্মত্ত হইয়া সংসার করিয়া থাকি। কৌশল জানিলে হয়ত এই ছায়া হইতেই প্রকৃতবস্তুটিতে যাওয়া যায়। কিন্তু সে কথায় এখন কাজ নাই। মা যে এখন আসেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মা কি আসিয়া তিন দিন পরেই আবার চলিয়া যান। না, না, তাহা কি হইতে পারে। মা যাইবেন কোথায়?

মার মত স্নেহময়ী কে আছে? তিনি কি তাঁহার সন্তানদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? তাহা হইতেই পারে না। মা চলিয়া গেলেন, ইহা যে মনে করিতেও কষ্ট হয়। দশমীর দিন মায়ের প্রতিমা বিসর্জ্জিত হয়। আমরা তাহা দেখিয়া বিষণ্ণ হই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, বিসর্জ্জনটি প্রতিমার—মায়ের কখনও বিসর্জ্জন হইতে পারে না। মা আমাদের কত ভালবাসেন। তিনি কি আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? বিজয়ায় তুমি পূজা শেষ করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলে। ভাবিলে এ বৎসর মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এইখানেই শেষ হইল। মা কিন্তু তাহা ভাবেন না। তিনি আমাদের জন্য বড় ব্যস্ত। তাই পাঁচ দিন যাইতে না যাইতেই দেখি কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে মা আবার আসিয়া ঘর আলো করিয়া বসিয়াছেন। ঘর, বাহির, চারিদিকে আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মার সে রণবেশ আর নাই, সে অসুরনাশিনী মূর্ত্তি আর নাই। এখন মায়ের আনন্দভরা সৌম্যমূর্ত্তি, সহাস্যবদন, আয়তলোচন করুণায় পরিপূর্ণ। মা এখন গৌরবর্ণা, সুরূপা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, রৌক্সপদ্ম-ব্যগ্রকরা, বরদা। হাসিতে হাসিতে মা আসিলেন, একরাত্রি আপন সন্তানদের কোলে লইয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিলেন। তাহার পর মা আবার অন্তর্হিত হইলেন। ইহার একপক্ষ পরেই, একদিন অমানিশা রাত্রিতে নিশীথ সময়ে মা আবার প্রকট হইলেন। যেমন সময় তেমনি মূর্ত্তি। দেখিয়া কেহ ভয় পাইল, কেহ আনন্দে গলিয়া গেল। এখন আর মার সে গৌরবর্ণ নাই, সে হার অঙ্গদ বলয়াদি অলঙ্কার নাই, সে দিব্য বসন ভূষণাদি নাই, সে আয়ুধ সমূহ নাই, সে বাহন নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই, সে কিছুই নাই। মা এখন উন্মাদিনী শ্মসানবাসিনী, মুণ্ডমালধারিণী, উলঙ্গিনী, মুক্তকেশী। নিবিড় অমানিশার অন্ধকারের সঙ্গে মার বর্ণ মিশিয়া গিয়াছে—মনে হয় যেন মা নিগুর্ণ অবস্থায় আপনাতে আপনি মিশিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মনে হয়, যেন সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া মার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত ঘন কেশপাশ যেন অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে এবং সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। উর্দ্ধে ও অধেঃ প্রসারিত হস্তদ্বয় দেখিলে মনে হয় যেন নীলকৃষ্ণ মৃণালতন্তুর উপর রক্তবর্ণ পদ্মফুল ফুটিয়া আছে। বামদিকে মস্তকের উপর দীর্ঘ অসি ঝলমল করিতেছে এবং উহা

হইতে রক্তবিন্দু স্খলিত হইয়া মায়ের হস্তের উপর পড়ায় বোধ হইতেছে যেন নীলকান্তমণির উপর কতকগুলি পদ্মরাগমণি ছড়ান রহিয়াছে। মায়ের চরণ-শোভা অতি মনোহর। তাঁহার প্রতিপাদবিক্ষেপে মনে হইতেছে যেন দশটি পূর্ণচন্দ্র নীলসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে যখন রক্তবর্ণ কোমল চরণতল দেখা যাইতেছে, তখন মনে হইতেছে যেন চন্দ্রের সৌভাগ্য দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া সূর্য্যদেব সেখানে আশ্রয় লইবার জন্য আপনার রক্তবর্ণ কিরণজাল দিয়া চরণতল জড়াইয়া ধরিয়াছেন। মায়ের সদম্ভ পাদবিক্ষেপে স্ফীত হৃদয়স্থিত মুণ্ডমালা, নাসালম্বিত বৃহৎ মুক্তাফলের বেসর ও বক্রাগ্র কেশরাশি সদা দোদুল্যমান। মা যেখানে পা ফেলিতেছেন, সেইখানেই যেন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আকরস্বরূপ শিবহৃদয় ফুটিয়া উঠিতেছে। অথবা শিবহৃদয় ছাড়া বুঝি মার দাঁড়াইবার আর অন্য স্থান নাই, তাই চরণতলে জ্ঞানময় সদাশিব পড়িয়া আছেন। মা আজ লোকালয় ছাড়িয়া শ্মশানে অবস্থান করিতেছেন, আলোক ছাড়িয়া অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহাও ত মায়ের করুণার বিকাশ মাত্র। এই মরণশীল জগতে মায়ের সন্তানেরা একে একে শ্মশানে যাইবে মা কি তাহা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার অথবা প্রাতঃসূর্য্যের কোমল আলোকে দাঁড়াইয়া দেখিতে পারেন? মা আমার বৎসহারা গাভীর মত আগে গিয়া শ্মশানে দাঁড়াইয়াছেন, আগে গিয়া তমোময়ী মৃত্যুর ঘোর অন্ধকারের ভিতর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মা ওখানে আছেন ইহা দেখিলে আর মরিতে ভয় কি! অন্তিম সময়ে জীব যখন কাঁপিতে কাঁপিতে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে অভয় দিবার জন্য, তাহাকে বুকে করিয়া তুলিয়া লইবার জন্যই মা এই ঘোর অন্ধকারে শ্মশানের শবরাশির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাগলের মত নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বসন নাই, ভূষণ নাই, বিশ্রাম নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল আপন মনে নাচিয়া বেড়াইতেছেন। কাহারও পূজা চান না, কাহারও সেবা চান না, কাহারও মুখ চাহিয়া থাকেন না—আপন মনে আপনি নাচিয়া বেড়ান। মা থাকিতে পারেন না, আপন সন্তানদের ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, তাই একবার আসিয়া দেখা দেন, এই সময়ে একবার প্রকট হন। একবার জানাইয়া দিয়া যান যে ভয়ের কোন কারণ নাই। লৌকিক হউক পারলৌকিক হউক সকল প্রকার ভীতি নিবারণ করিবার জন্য, সকল প্রকার বিপদ দূর করিবার জন্য তিনি কাছে কাছেই

আছেন। এই সদা নর্ত্তনশীল জগতে শিবের মত নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকিলে পাছে কেহ ধরিতে না পারে তাই মা নাচিয়া নাচিয়া আসেন। এইরূপ নৃত্য অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। ইহার আর বিরাম নাই। অথবা বিরাম হইতে পারে যদি কেহ ঐ চরণে হৃদয় ঢালিয়া দিতে পারে, যদি কেহ শিবের মত ঐ চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। তাহা হইলে বোধ হয় অন্ততঃ তাহার জন্যও মা তাঁহার অনন্ত নৃত্য ক্ষণকালের জন্য বন্ধ করিয়া একবার তাহার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়ান।

মা আসেন কিন্তু রাত্রি প্রভাত না হইতে আবার চলিয়া যান। এইরূপ লুকোচুরি মা সমস্ত বৎসরটি ধরিয়া খেলেন, কিন্তু একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে লোকে বাঁচিত কিরূপে। বারমাস বাঁচিয়া থাকিলে পর আবার কবে মা আসিবেন, কবে তাঁহার চরণযুগল দেখিতে পাইব ইহা মনে করিতে যেন কষ্ট হয়। বারমাস কাল যেন অনন্তদীর্ঘকাল বলিয়া মনে হয়। এতদিন কি মাকে ছাড়িয়া থাকা যায়। মা নিত্য আসিবেন ইহাই আমি চাই। নিত্য আসিবেন কিন্তু ছাড়িয়া যাইবেন না। মা নিত্য নূতন হইয়া আসিবেন। এক মা নিত্য নূতন হইয়া আসিবেন তাহা হইলেই আমরা সুখী হই। তাই মা দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, গঙ্গা, মনসা ইত্যাদি বেশে থাকিয়া থাকিয়া একবার দেখা দিয়া যান। শুধু তাই নয়—কখন কার্ত্তিক, কখন গণেশ, কখন শিব, কখন রাম, কখন কৃষ্ণ, কখনও অনন্ত হইয়া আসিয়া মা তাঁহার ভক্তহৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করেন। মা নানারূপে, নানা সময়ে নানাভাবে লীলা করিয়া থাকেন। মায়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বৎসরের মধ্যে তিন দিনের জন্য নহে। এ সম্বন্ধ নিত্য এবং প্রতিনিয়তের জন্য। আমরা ভুলি কিন্তু মা ইহা কখনও ভুলেন না। তাই আমরা মার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলেও মা আবার আসিয়া উপস্থিত হন। মায়ের পূজা বৎসরের মধ্যে তিন দিনের জন্য নহে। এ পূজা বারমাসের এবং অষ্ট-প্রহরের। মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার এই পূজা প্রতিনিয়ত হইতে থাকে, প্রতি কর্ম্মে, বাক্যে ও চিন্তায় হইতে থাকে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে হইতে থাকে, জীবনে ও মরণে হইতে থাকে। ইতি।

সমালোচনা।

উত্তরাখণ্ড পরিক্রম। শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, S. C. Ray Esq. নিকট পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় স্মৃতিতীর্থ মহাশয় পরিষ্কার ভাষায় উত্তরাখণ্ডের তীর্থ সমুদায়ের বিবরণ লিখিয়াছেন। তীর্থের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের লোকের অবস্থা, আচার ব্যবহার, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলিতে বলিতে হইবে না ইহাতে যাত্রীদিগের সমস্ত আবশ্যকীয় সংবাদ দিয়া গ্রন্থকার ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। এই পুস্তকের আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শাস্ত্রের উপর বিলক্ষণ শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যে দুই চারিটি গীতাও দেওয়া হইয়াছে। অনেক দিনের পর পরিষ্কার বাঙ্গলায় লিখিত এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। আশা করি, তীর্থ যাত্রী ও দেশভ্রমণেচ্ছুক ব্যক্তিদিগের ইহা বিশেষ উপকারে আসিবে।

পিতৃমাতৃ পূজা মূল্য ৵০। পতিপূজা মূল্য ৵০। ষট্‌চক্র বিবরণ সহিত গুরুপূজা। শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তত্ত্বনিধি দ্বারা সঙ্কলিত। ৬৬ নং নিমু গোস্বামীর লেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দে প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

আজকালকার দিনে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শিথিল হইয়া গিয়াছে। আশ্রমেরও ঠিক নাই। সন্ন্যাসী হইয়া গৃহীর কার্য্য ও গৃহী হইয়া সন্ন্যাসীর কার্য্য প্রায়ই লক্ষিত হইতেছে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার আশ্রমধর্ম্ম ঠিক রাখিবার জন্য পিতা, মাতা, গুরু, পতি ইহাঁদের পূজা কিরূপে করিতে হয় এবং ইহার ফলে কি পাওয়া যায় তাহাই এই সমস্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যখন সমাজের সর্ব্বত্র ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, তখন এইরূপ পুস্তক শিক্ষিত সমাজের কতদূর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে পতিপূজা পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় গ্রন্থকার মহাশয় আপনি আচরণ করিয়া যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে সমাজের কতকগুলি লোকের উপকার হইতেছে। সমস্ত পুস্তকের সর্ব্বত্র আদর হইলে বুঝা যাইবে আবার আর্য্যধর্ম্মের জীবন সঞ্চারিত হইল। আমরা আশা করি, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয় এইরূপ শিক্ষা দিয়া সমাজের উপকারার্থ যত্ন রাখিবেন।

গো গঙ্গা গায়ত্রী। মূল্য । শ্রীযুক্ত
প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান এই পুস্তকে বহু শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাতে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদের বিশেষ উপকার হওয়াই সম্ভব। যাহাতে ভারতবাসী গো গঙ্গা ও গায়ত্রীকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করেন, গ্রন্থকার তজ্জন্য বিলক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে, শব্দের অর্থ লইয়া তিনি যে রহস্য তুলিয়াছেন তাহাতে একটু চপলতা যেন হইয়াছে। আমরা দুঃখিত হইতেছি এই প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি সম্যক্‌রূপে আমরা পড়িয়া উঠিবার সময় করিতে পারি নাই। পুস্তক সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

সাধন প্রদীপ মূল্য ৮০ আনা। গুরু প্রদাপ মূল্য ১।০। সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা। শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত। এই দুই পুস্তকে তন্ত্র সম্বন্ধে প্রায় সকল সংবাদই দেওয়া হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় সরস্বতী মহাশয় যথার্থ পণ্ডিত। তন্ত্রশাস্ত্র যে ঘৃণার বস্তু নহে, গ্রন্থকর্ত্তা এই পুস্তক দুইখানিতে তাহাই দেখাইয়াছেন। তন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাতে সমাজের বহু অপকার হইতেছে। এই পুস্তকদ্বয় প্রচার করিয়া গ্রন্থকার সমাজের বহু উপকার করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে যদি সাধনার ক্রম ও পরে পরে কার্য্যগুলি নিত্যকর্ম্মের মত করিয়া লেখা হইত, তাহা হইলে ঐ মার্গের সাধকের আরও উপকার হইত। আমরা সকলকে এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি। মূল্য ৵০ আনা। শ্রীগিরিশচন্দ্র ভট্টাযার্য্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী ঢাকা। শক্তি বিষয়ে, শিব বিষয়ে এবং আগমনী লইয়া বহু গীত এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ভাবুক ভক্ত। গানগুলি বেশ হইয়াছে। সঙ্গীত, সাধনার এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই পুস্তক সঙ্গীতজ্ঞগণের এবং অপর সকলেরও যে উপকারে আসিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের সময় অল্প বলিয়া যেরূপভাবে পুস্তক পাঠ করিয়া সমালোচনা করা উচিত, সেরূপ আমরা পারি নাই; তজ্জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীগুরু। (প্রাপ্ত)

এই পৃথিবী শিক্ষার স্থান। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, আর কত কিছু শিখিতেছি এবং সেই মৃত্যু পর্য্যন্ত এইরূপ শিক্ষালাভ করিব। ইহার কত কত আমরা দেখিয়া শিখি, কত কত কে যেন ভিতর হইতে শিখাইয়া দেয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্রন্দন করে, স্তন্যপানের চেষ্টা করে; এ সকল দেখিয়া শিখেনা আপনি শিখে, তাহার পর ক্রমে হাস্য করা, উপবেশন, হামাগুড়ি, দাঁড়ান, চলন, চিন্তা করা, কথা বলা, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ, ক্রোধ, হিংসা, ইত্যাদি শিক্ষা হয়। এই সকল শিক্ষা আমরা অলক্ষিত ভাবে করিয়া থাকি এবং যাঁহারা এই সকল শিক্ষা দেন তাঁহারাও অনেকটা অলক্ষিত ভাবে দিয়া থাকেন; কিন্তু ইহার ফলে আমরা মাংসপিণ্ডরূপ স্থবির শিশু হইতে চলচ্ছক্তি ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মনুষ্যত্বে উপনীত হই। এই সকল হইতে একটি উন্নততর শিক্ষা আছে—যাহা আমাদিগকে হাতে কলমে অন্যের নিকট শিখিতে হয়। এইটি হইতেছে অর্থকরী বিদ্যা। ইহা শিখিয়া আমরা প্রত্যেকে নানারূপ অর্থাদি উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। যথা;—কৃষিকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, বস্ত্রশিল্প, কুম্ভকার বা কর্ম্মকারের কার্য, অসি-বিদ্যা, মসীবিদ্যা ইত্যাদি সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদিও কতক কতক আমাদের এই উদ্দেশ্যে শিখিতে হয় এবং এই সকল যথারীতি শিক্ষা করিলে মনের স্থবিরতা দূর হয় এবং জড়রাজ্য-মনোরাজ্যে পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল সম্বন্ধে জগতের বাহ্যদৃশ্য অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অধিকতর জ্ঞাতসার হইয়া মানব উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিদ্যাশিক্ষার্থিগণ স্বভাবতঃ তাঁহাদের শিক্ষাদাতাকে ভক্তি করিয়া থাকেন এবং শিক্ষাদাতাও ছাত্রদিগকে স্বভাবতঃ কিছু স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। বস্তুতঃ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ এইখানেই সূত্রপাত হয়।

আমাদের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা হইতেছে অধ্যাত্ম বিদ্যা যদ্দ্বারা আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ ও ভাব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাঁহাতে অনুরক্ত হই। বিষয়ের আবিলতা ও তত্ত্যাগে শান্তি বোধ করিতে করিতে ক্রমে মনুষত্ব হইতে দেবত্বে উপস্থিত হইতে পারি। যে মনুষ্য হইতে মনুষ্য এই সকল শিক্ষালাভ করে তাঁহাকেও তাহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি করে ও সাধারণও তাঁহাকে গুরু নামে অভিহিত করে।

উপরে যতপ্রকার শিক্ষার কথা বলা হইল তন্মধ্যে কোনটি আমাদিগকে অন্যে শিখায়, কোনটি বা আপনি শিখি? এই সকল শিক্ষার প্রকৃত গুরু কে? যাহা ভিতর হইতে কে যেন শিখাইয়া দেন তাহার শিক্ষক যিনি অলক্ষিত ভাবে অন্তরে বাহিরে বিরাজ করেন—সেই পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে হইবেন? যাহা আমরা অন্যের নিকট শিখিলাম বলিয়া বুঝি, তাহাও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই শিক্ষা কারণ তাঁহার সৃষ্ট জীব বা বস্তু ভিন্ন ও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত ভিন্ন আর আমরা কাহার নিকট শিক্ষা করিতে পারি? যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই পালন করিতেছেন ও তিনিই নানাপ্রকার শিক্ষাও দিতেছেন। এইজন্য হিন্দুদিগের মধ্যে গুরু শব্দটী ঈশ্বরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যালয়ে সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি শিখিতে যেমন একপ্রকারের কথা অনেকবার পড়িতে হয়, এক প্রকারের অঙ্ক অনেকবার করিতে হয়, শরীর রক্ষা ও কার্য্যোপযোগী করিতে যেমন রোজ কিছু কিছু ভ্রমণ বা শারীরিক ব্যায়ামাদি করিতে হয়—আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করিতে ও মনকে পুনঃ পুনঃ তদুপযোগী করিতে সেইরূপ নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয়, পরোপকার ও দান ইত্যাদি এবং পূজা, সন্ধ্যা, মন্ত্রজপ ইত্যাদি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত। এই সকল বিষয়ে উপদেশ ও মন্ত্র যিনি কর্ণে প্রদান করেন তিনিই মন্ত্রদাতা গুরু এবং এই মন্ত্র নেওয়ার নামই দীক্ষা। এই দীক্ষার অনুষ্ঠান হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মেই দেখা যায়; এমন কি যে ব্রাহ্মগণ সমুদয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য মনে করেন—যদিও কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে হউক এ দীক্ষার অনুষ্ঠান তাঁহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আজকাল হিন্দু সন্তানদের মধ্যে অনেকেই এ দীক্ষার আবশ্যকতা দেখেন না। বিষয়-প্রমত্ততাই যে এরূপ ভাবের প্রধান কারণ তাহার সংশয় নাই। অনেকে বিষয় বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় অনুসন্ধান করেন না। আশা-মরীচিকা ইঁহাদিগকে সর্ব্বদাই ভ্রান্তির পথে নিয়া যাইতেছে। এইরূপ লোক অনেকেই অদীক্ষিত থাকেন অথবা মন্ত্র নিয়াও কিছু করেন না। কেহ কেহ মনে করেন পরমেশ্বরকে ভাবিব, ভক্তি করিব, তাহার জন্য মন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজন কি? ভ্রমণ, সন্তরণ, অধ্যয়ন, কারুকার্য্য সকল বিষয়েই মনুষ্যের শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয় কিন্তু উঁহারা কেবল ঈশ্বরোপাসনায় শিক্ষা বা অভ্যাসের প্রয়োজন দেখেন না,—ইহার ফলে তাঁহাদের এসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতিও হয় না।—(ক্রমশঃ)

রক্ষা প্রার্থনা।

(১)

আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ।
কালের মেঘ ঘনায়ে আসে,
পড়িছে ছায়া জীবন-পাশে,
অস্তগিরি আঁধার ঘন, করিছে ধীরে আবরণ,
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ।

(২)

ঐ যে হাসে বিজলী-লতা,
মেঘের কোলে কোলে ;
বুকের মাঝে বজ্র রাখে—
শাসিতে পারে কালে।
আমার কিছু ভয় নাই,
তথাপি আমি তোমারে চাই ;
বরণ করি চরণ দু'টি মরণ-আভরণ।
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ।

(৩)

জীবনে কিছু নাহিত সুখ—
আছে ত শুধু দুঃখ।
আশার শত ঝলকে আঁখি
ভুলিয়া যায় লক্ষ্য।
তোমার যদি কিছু না থাকে—
তোমারে যদি কেহ না ডাকে ;
তথাপি, তুমি আপন ভেবে হৃদয়ে কর বিচরণ।
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ।

(৪)

রক্ষা আর নাহিক ভবে,
জেনেছি আমি সত্য।

তথাপি, কেন তোমার পানে
টানিছে মোর চিত্ত ?
জন্ম হ'লে মৃত্যু আছে,
ভৃত্য সে ত রয়েছে কাছে—
আমার কাজে, আমার সাথে,
ঘুরিয়া মরে অকারণ।
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ।

(৫)

জন্ম আর মৃত্যু মোর
নাহিক কোনও কালে।
তথাপি, আমি মায়ের কোলে
এসেছি লোকে বলে।
সাঙ্গ হ'লে এ জীবলীলা,
রঙ্গে কত কর্‌ব খেলা ;
তুমি ও আমি অভেদ মত—
অকুল পথে অশরণ।
আমারে, তুমি রক্ষা কর নারায়ণ।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জীবের দুঃখ।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

অন্য কথা পড়িবার পূর্ব্বে আমরা নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা যে সমকালে এক এই "সমকালে" ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আত্মা যিনি তিনি চেতন। অথচ এই জড়দেহের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে অনুভব করি। দেহটাকেও জড় বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি উঠে— ইহাঁরা মন ও প্রকৃতিকে জড় বলিতে একেবারেই যে নারাজ হইবেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু চেতনের লক্ষণ ও জড়ের লক্ষণ বুঝিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে।

যিনি চেতন তিনি আপনাকে আপনি জানেন—না জানা মত হইয়া থাকিলেও জানিতে পারেন এবং চেতন যিনি তিনি পরকেও জানেন। জড় যাহা তাহা আপনাকে আপনি জানে না এবং আপনি পরকেও জানে না। এই লক্ষণ ধরিলে স্পষ্ট বুঝা যায় দেহটা জড়। প্রকৃতি পর্য্যন্ত সবই জড়। প্রকৃতিটি আত্মার দেহও বটেন। তবে যে দেহকে চেতনের মত দেখায়, এটা কেবল চেতন সান্নিধ্যে জড় চৈতন্যদীপ্ত হয় বলিয়া।

স্থূলদেহে আমরা যে আত্মার অনুভব করি তিনি জীবাত্মা। এই জীবাত্মা যেন দেহে আসিয়া বা দেহ অভিমান করিয়া খণ্ড মত হইয়াছেন; পরিছিন্ন মত হইয়াছেন। কারণ দেহের মধ্যে থাকিয়া ইনি অন্য সমস্তকে, জড়কে জানেন; কিন্তু দেহের বাহিরে থাকিয়া ইনি অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। এই জন্য জীবাত্মাকে আমরা ব্যাপক ভাবে পাই না।

জীবাত্মা কিন্তু যখন ভাবনা-রাজ্যে গমন করেন, তখন অবতারের দর্শন পান এবং অবতাররূপেই স্থিতিলাভ করেন। অবতার জগতের বিশেষ বিশেষ কার্য্যোদ্ধার জন্য মনুষ্য আকারে কালে কালে অবতীর্ণ হয়েন সত্য, কিন্তু সর্ব্ব-কালে সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এখনও লীলা করেন বটে, কিন্তু কোন কোন ভাগ্যবান্ তাহা দেখিতে পান। ভাগ্যবান্‌গণ কিরূপে দেখেন? না ভাবনারাজ্যে গিয়া তবে দেখেন। ভাবনারাজ্যে গিয়া আবার স্থূলেও দেখা যাইতে পারে সে কিন্তু ভাবনারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিজনিত স্থূল মূর্ত্তি।

আমরা বলিতেছি ভাবনারাজ্যই অবতারের নিত্যলীলার স্থান। যে ভাবনা-রাজ্যে যখন যাইবে—সেই তাঁহাকে দেখিবে। যে আত্মা দেহে থাকিয়া জীবাত্মা তিনিই সমকালে ভাবনারাজ্যে অবতার। ভাবনারাজ্যে অবতাররূপে থাকি-য়াও স্থূলদেহে জীবাত্মারূপে সমকালে তিনি খেলা করেন। আবার ভাবনা-রাজ্যে যিনি তিনি অব্যক্তভাবে জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমিই জগদ্ব্যাপী হইয়া রহিয়াছি। যিনি—জীবাত্মা হইয়া বলিতেছেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (আমি জন্মিও নাই, মরিও নাই—কাজেই যিনি জন্মান নাই তাঁর জন্মস্থান অমুক দেশ, তাঁর পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র আছে এসব কথা শাস্ত্রসিদ্ধান্তমত ভ্রম জ্ঞানেই হয়) তিনিই সগুণ ব্রহ্ম হইয়া বলিতেছেন—ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"। তবে দেখা যাইতেছে স্থূলদেহে যিনি জীবাত্মা তিনি ভাবনারাজ্যে অবতার এবং

অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সগুণ ব্রহ্ম সমকালে। আবার সমকালে তিনি নির্গুণ। কারণ সর্ব্ব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে যখন সর্ব্ব বলিয়া যাহা—তাহা ভ্রম বলিয়া মনে হয়—তখন তিনি, তিনিই। কারণ যাঁহাকে সর্ব্ব বলা হয়, বিচিত্র জগৎ বলা হয়—বাস্তবিক তাহা কি? ব্রহ্ম জগৎরূপে বিবর্ত্তিত মাত্র। রজ্জু যেমন সর্ব্বদা রজ্জু থাকিয়াও সর্পরূপে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম আপনার আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়াও মায়ার সাহায্যে জগৎ-রূপে ভাসেন—ভাসিয়া আবার জগদ্ব্যাপী সগুণ ব্রহ্ম হয়েন, আবার সূক্ষ্ম ভাবনারাজ্যে অবতাররূপে খেলা করেন, আবার স্থূল জড়দেহে জীবাত্মারূপে যেন বদ্ধ হয়েন।

তত্ত্বকথা বুঝিলে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা যে সমকালে ইহা বুঝিবার কোন ক্লেশ নাই। দুগ্ধের বিকার দধি। এককালে যাহা দুগ্ধ, তাহা অপরকালে দধি। সমকালে দধি দুগ্ধ নহে। দেশ কাল যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে বিকার হইবে কিরূপে? বিশেষ দুগ্ধকে দধি হইতে হইলে তাহাতে তিন্তিড়ী ইত্যাদি সহকারী কারণের আবশ্যক হয়। ব্রহ্মের বিকার যে জগৎ হইবে তাহাতে তিন্তিড়ীর মত সহকারী কারণ কোথায়? এই জন্য বলা হয়, জগৎটি রজ্জুতে সর্প ভাসার মত ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। এই বিবর্ত্ত কথাটি বুঝিলেই বুঝা যায় নির্গুণ—সগুণ, অবতার ও আত্মা যিনি—তিনি সমকালে এক থাকিয়াও ঐ সমস্ত। এখন আমরা অন্য কথা পাড়িব।

ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা একরূপ মোটামুটি আলোচনা করিলাম।

কেন করিলাম?

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে ইহা লইয়া থাকিবার জন্য।

কিরূপে ঈশ্বরবিশ্বাসের ব্যবহার করিতে হইবে? ব্যবহার করিলেই বা কি হইবে? ইহাতে কি আমাদের দুঃখনিবৃত্তি হইবে?

মনের অশান্তিই জীবের কঠিন ব্যাধি। শারীরিক ব্যাধি ঔষধ পত্র ব্যবহারে সারিতে পারে, কিন্তু মনের ব্যাধি ঔষধ খাইলে যায় না। কোন পাপ কর্ম্ম করিলে যখন স্মৃতিতে সেই পাপকর্ম্ম-জনিত দুঃখ বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন কোন ঔষধ খাইয়া সেই দুঃখ দূর করা যায় না। পাপী আপনার পাপ ভুলিতে চেষ্টা করিতে চায়, অন্য কর্ম্ম করিয়া পাপের কথা কখন কখন ভুলিয়া থাকিতেও পারে, কিন্তু পাপের স্মৃতি কিছুতেই যায় না। কোন কিছু বিপদ

আসিলে, কোন কিছু পাড়া আসিলে, এমন কি কোন কিছু সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া বাধা পাইলে অথবা যথার্থ পবিত্র লোকের নিকটে গেলেই, পূর্ব্বকৃত —এই জন্মকৃত—পাপস্মৃতি শতবৃশ্চিক হইয়া দংশন করিবেই। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ যাহা, তাহার স্মৃতি না থাকিলেও উহা বহু ক্লেশের কার্য্য করায়। বল, কোন্ ডাক্তার এ রোগের চিকিৎসা করিবে? বল, স্মৃতি হইতে ইহা চিরতরে মুছিয়া যাইবে কিরূপে? ভাল রাস্তা, ভাল বাড়ী, ভাল সাজসজ্জা, ভাল গাড়ী, ইলেক্ট্রিক-লাইট, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান, রেল, জাহাজ, সার্চ্চ লাইট, চেপ্পে যাওয়া—এই সমস্ত সত্য সত্যই যে নিন্দার বস্তু, তাহা কেহ বলে না—তবে, এ সবে মনের শান্তি হয় না। কাজেই জীবের প্রকৃত দুঃখও এ সকলে দূর হইতে পারে না। রাজনৈতিকই হও বা বড় গ্রন্থকারই হও বা ধর্ম্মযাজকই হও বা বড় স্বদেশ-সংস্কারকই হও, দিনকতক গোলমালে দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পার সত্য, কিন্তু রোগগ্রস্ত হইয়া যখন শয্যা আশ্রয় করিতে হইবে, তখন তোমার মনের জ্বালা জুড়াইবে কে? খুব বড় শিক্ষিত লোককেও দেখিয়াছি, মরিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি বালকের মত ক্রন্দন করিয়াছেন আর বলিয়াছেন—হায়! বৃথা কার্য্যে জীবন কাটাইয়াছি। "My life is a failure." অথচ এই সব লোক ভাল বই লিখিয়াছেন, লোকের উপকার জন্য কত বক্তৃতা করিয়াছেন, দেশের জন্য, দশের জন্য, রাজার জন্য কত খাটিয়াছেন। তবু কেন ইহাঁদিগকে এত হায় হায় করিয়া মরিতে যয়? সহজ উত্তর— ইহাঁরা দেশের দশের জন্য লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছেন বটে; তজ্জন্য ইহাঁদের কিছু পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসন্নতাকে ইহাঁরা মুখ্য কর্ম্ম মনে করেন নাই; যদিও ইহাঁরা ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকেন, সেটা গৌণমাত্র। পুত্র পিতার অর্থাদি লাভ জন্য যেমন পিতার সেবা করে, বধূ শ্বশুরের নগদ টাকাটি সর্ব্বাগ্রে হস্তগত করিবার জন্য যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রে শ্বশু-রের ক্যাসবাক্সের চাবিটি হস্তগত করে, ইহাঁরাও যদি ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকেন, তবে সেই ভাবে ডাকিয়াছিলেন বলিয়া বড় হায় হায় করিয়া, বড় ভগ্নহৃদয়ে এই পৃথিবী হইতে বিতাড়িত হয়েন। ইহাঁরা কর্ম্ম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্ম-দ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করাই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা ভুলিয়া গিয়া বড় সকামভাবে কর্ম্ম করিয়াছিলেন—কর্ম্ম বিফল হইলে বড় যাতনা পাইতেন, আবার সফল হইলে আনন্দে বেহুঁস হইয়া পড়িতেন—কর্ম্ম করার

দোষ ইঁহাদের হইয়াছিল, তাই ইঁহারা নিজের মনকে শান্ত করিতে পারেন নাই —অন্যের মনকে শান্ত করা ইঁহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত হইয়াছিল।

শাস্ত্র বলেন, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম কর—ফলাফল কি হইল দেখিও না। শুধু শ্রীভগবানের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। ইহাতে সমাজের কল্যাণও হইবে এবং তোমারও চিত্ত শান্ত হইবে। তুমিও চিত্তশান্তিজন্য সুখী হইবে এবং জগতের হিতও হইবে।

তাই বলিতেছি, মনকে শান্ত করিবার জন্য যে কার্য্য, সে কার্য্যের মূলভিত্তি হইতেছে ঈশ্বরবিশ্বাস।

মনকে শান্ত করিতে না পারিলে জীবের দুঃখ দূর করিবার প্রকৃত উপায় তুমি পাইলে না। মনের শান্তি জন্য ঈশ্বরের আরাধনা আবশ্যক। ঈশ্বর-বিশ্বাসেই যদি তোমার গোলযোগ রহিয়া গেল, তবে তুমি নিজের ও অন্যের মন শান্ত করিবে কিরূপে এবং নিজের ও অন্যের দুঃখ দূর করিবে কিরূপে? "My life is a failure." বলিয়াই তোমাকে মরিতে হইবে। ইহাতে জগতের দুঃখ দূর হইল কিরূপে?

এই সমস্ত কারণে আমরা বলি যে, অগ্রে প্রাচীন ভারতের সহিত নবীন জগতের ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে গোলমালটি মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। তোমাকে নিজে মিটাইতে হইবে না। প্রাচীন ভারত ইহা মিটাইয়া দিয়াছেন। নবীন জগৎ ইহা মিটাইতে পারিতেছেন না। প্রাচীন ভারত যেরূপে মিটাইয়াছেন, তাহা আমরা কয়েক সংখ্যক "জীবের দুঃখ" প্রবন্ধে আলোচনা করিলাম। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম—নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও জীবচৈতন্য, এইগুলি সমকালে এক। নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বদা এক থাকিয়াও সমকালে সগুণ, অবতার ও জীবাত্মা। কাজেই জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনাই কর বা তাঁহাকেই অবতার ভাবে লক্ষ্য করিয়া কর—যাহা ধরিয়া উপাসনা কর না কেন, সে উপাসনা সেই নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা। এখন আমরা দৈনিক জীবনে ইহার ব্যবহার দেখাইয়া অন্য কথা আরম্ভ করিব।

"ঈশ্বর আছেন"; ইহার প্রধান প্রমাণ নিজের ভিতর। তুমি সমস্ত মানসিক ব্যাপারের দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টাভাবে থাকিতেও পার, এইটি খাঁটি সত্য। দু'য়ে দু'য়ে যেমন চারি হয়, সেইরূপ জীবে জীবে দ্রষ্টাভাবটি আছে, এইটি খাঁটি সত্য। এই দ্রষ্টাভাবের ভিতরেই ঈশ্বর আছেন, ইহা ঈশ্বর-অস্তিত্বের অভ্রান্ত

প্রমাণ। দ্রষ্টার স্বরূপটিই ঈশ্বর। কিরূপে সর্ব্বদা এই দ্রষ্টাভাবটি স্মরণে রাখা যায়, তাহার জন্যই সাধনা। বিনা সাধনায় এই দ্রষ্টৃ স্বরূপে অবস্থান করা যাইবে না। চিত্তের বহু সঙ্কল্প যতদিন থাকিবে, ততদিন এই দ্রষ্টাভাব সর্ব্বদাই ভুল হইয়া যাইবে, সেইজন্য একটিমাত্র শুভসঙ্কল্পে একাগ্র হও। ক্রমে ঐ একটি পর্য্যন্ত যখন থাকিবে না, তখন চিত্তে আর কোন বৃত্তি উঠিবে না। চিত্তের বৃত্তিগুলি যখন নিরোধ হইল, তখনই দ্রষ্টৃ স্বরূপে অবস্থান করা গেল। এই অবস্থা আয়ত্তে আনিয়া যাহা পার কর। এই অবস্থা লাভ করিয়া কোটি কোটি সংসার কর, তোমার আর পতন হইবে না। ব্রহ্ম অবতার হইয়া এই ভাবে ভূভার-হরণ কর্ম্ম করিলেও তিনি ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হন না। ইহা কিন্তু একবারে হইবে না। ইহার জন্য ক্রম অনুসারে সাধনা করিতে হইবে। যে যেমন অধিকারী, তাহাকে নিজ স্বভাবজ কর্ম্ম ধরিয়াই ক্রম অনুসারে উচ্চ উচ্চ সাধনার অধিকারী হইতে হইবে। যেমন চিত্তশুদ্ধি না করিয়া একবারে সন্ন্যাস হয় না, সেইরূপ সগুণ ঈশ্বর না ধরিয়া কখন নির্গুণ উপাসনারূপ স্থিতিলাভ হইবে না।

আমরা সাধনার কথা এখানে আলোচনা করিব না। এখানে এই মাত্র বলিতে চাই—যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি যদি ডাকা অভ্যাস কর, তিনি কিন্তু তোমার ডাক যে শুনিবেন, তাহা সগুণ হইয়াই শুনিবেন। তোমার উপাসনা যে ঈশ্বরের কাছে পৌছিল, এইটি অনুভব করাইয়া দিবেন সগুণ ব্রহ্ম অথবা অবতার অথবা জীবাত্মা। কারণ ইহাঁরা সগুণ, অবতার, জীবাত্মা হইয়াও সমকালে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই বটেন। তবেই হইল নি[illegible] সগুণ অবতার ও আত্মা—ইহাঁদের যে কোনটি অবলম্বন কর না কেন—তুমি একটি অবলম্বনে সবগুলিই পাইতেছ। প্রভেদ এই—যতদিন সগুণ রহিল, ততদিন দ্বৈতভাবে উপাসনা চলিল, কিন্তু নির্গুণে পৌছিলেই অদ্বৈতে স্থিতিলাভ হইল। একটি ক্রম-মুক্তি, অন্যটি সদ্যোমুক্তি।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি আকাশের মত তোমার আমার ভিতরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। তুমি সকল কার্য্যে অগ্রে তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা কর। সতী স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইবার ভয়ে যেমন নিজের ভাবনা, নিজের বাক্য ও নিজের কর্ম্ম ইহার কোনটিই স্বামীকে গোপন করিয়া করিতে পারেন না, তুমিও সেইরূপ ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না। বিনা সাধনায় ইহা হইতেই পারে না। ঈশ্বরস্মরণ ব্যাপারটি সর্ব্বদা তোমাতে থাকিবে না—যদি তুমি নিত্য কর্ম্মগুলি তিন বেলায় অভ্যাস না কর এবং যতদিন না তুমি নিত্যকর্ম্মগুলি ঠিক ঠিক করিবার জন্য আহার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও পবিত্রতা লাভ না কর।

(ক্রমশঃ)